



চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ



**THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS AND HUMANITIES**

খণ্ড ৩৪ ২০১৮ * Vol. XXXIV 2018



দ্যা চিটাগং ইউনিভার্সিটি
জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ

**THE CHITTAGONG UNIVERSITY
JOURNAL OF ARTS
AND HUMANITIES**

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ
Faculty of Arts and Humanities

Vol. XXXIV, 2018, Published in October 2023
সংখ্যা ৩৪, ২০১৮ অক্টোবর ২০২৩-এ প্রকাশিত

Published by
Registrar
University of Chittagong

Copyright:
University of Chittagong

Cover Designe:
Uttam Kumar Barua

Price
Tk. 600.00
US \$ 20.00

ISSN 1993-5536

This journal is an official publication of the Faculty of Arts and Humanities, University of Chittagong. Opinions expressed in the essays are authors'; they do not reflect the views either of the editor or of the University.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
সংখ্যা ৩৪, ২০১৮

নির্বাহী সম্পাদক

ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শফিউল আযম, বাংলা বিভাগ

প্রফেসর ড. সুকান্ত ভট্টাচার্য, ইংরেজি বিভাগ

প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগ

প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, দর্শন বিভাগ

প্রফেসর ড. মো. সেকান্দর চৌধুরী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ড. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ড. ফারজানা ইয়াসমিন চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

প্রফেসর ড. কুন্তল বড়ুয়া, নাট্যকলা বিভাগ

প্রফেসর সুফিয়া বেগম, চারুকলা ইনস্টিটিউট

ড. আব্দুল করিম, সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ড. সুদীপ্তা বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ

প্রফেসর ড. সুপ্তিকণা মজুমদার, সংস্কৃত বিভাগ

জনাব মুহাম্মদ আমির উদ্দিন, সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

প্রফেসর ড. মো. সেকান্দর চৌধুরী, সভাপতি, বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগ

The Chittagong University Journal of Arts & Humanities
Volume XXXIV, 2018

Executive Editor

Dr. Mohammad Mahbubul Hoque

Members

Professor Dr. Mohammad Shafiul Azam, Department of Bangla

Professor Dr. Sukanta Bhattacharjee, Department of English

Professor Dr. Nurul Islam, Department of History

Professor Dr. Md. Abdul Mannan, Department of Philosophy

Professor Dr. M. Sekander Chowdhury, Department of Islamic History & Culture

Dr. Muhammad Nezamuddin, Associate Professor, Department of Arabic

Professor Dr. Mohammad Elias Siddiki, Department of Islamic Studies

Dr. Farzana Yeasmin Chowdhury, Associate Professor, Institute of Modern Language

Professor Dr. Kuntal Barua, Department of Dramatics

Professor Sufia Begum, Institute of Fine Arts

Dr. Abdul Karim, Associate Professor, Department of Persian Language & Literature

Dr. Sudipta Barua, Associate Professor, Department of Pali

Professor Dr. Supti Kona Majumder, Department of Sanskrit

Mr. Muhammad Amir Uddin, Associate Professor, Institute of Education and Research

Professor Dr. M. Sekander Chowdhury, Department of Bangladesh Studies

সম্পাদকীয়

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের জার্নাল হিসেবে বর্তমান ভলিউমটি ৩৪তম। বাংলা, ইংরেজি, আরবি ও ফার্সি ভাষায় রচিত মোট ২০টি প্রবন্ধ এটিতে স্থান পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, সমাজ ও রাজনীতি, ভাষা ও সাহিত্য এবং দর্শনের নানাবিধ বিষয় নিয়ে লিখিত প্রবন্ধগুলোতে গবেষকদের বহুমাত্রিক মননশীলতা ও আত্মহের পরিচয় পাওয়া যায়।

ডিনের দায়িত্ব পালনকালে (২০২১-২০২৪) অনুষদ জার্নালের ৬টি ভলিউম প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ৯৯তম অনুষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার সম্পাদনায় এ সংখ্যাটি প্রথম অনলাইন ভার্সনসহ প্রকাশিত হলো; জার্নাল প্রকাশের যে জট রয়েছে তা নিরসনের জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা। সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ জার্নাল প্রকাশের জন্য যথাযথ সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্পাদনা পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রবন্ধ প্রকাশের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের দু-একজন বিলম্বে মত পাঠালেও সামগ্রিকভাবে তা তেমন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। আমি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের ধন্যবাদ জানাই। জার্নাল প্রকাশের সামগ্রিক কাজ এগিয়ে নিয়েছেন আরবি বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ ফারুকী ও ইংরেজি বিভাগের জনাব গোলাম হোসেন হাবীব (জি এইচ হাবীব), আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। অনুষদের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জনাব মুহাম্মদ আইয়ুব ও উর্ধ্বতন সহকারী জনাব মোহাম্মদ আতাউল্লাহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগের যাবতীয় কাজ করেছেন, আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেছে এবং কিছু প্রবন্ধে জার্নালের নির্ধারিত স্টাইল অনুসরণ করা যায়নি। এ জন্যে আমি সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি। জার্নাল অনলাইন করার কাজ করেছেন আইসিটি-র সিনিয়র কম্পিউটার প্রকৌশলী জনাব এস. এম. আহসানুল করিম শিমুল এবং জার্নাল মুদ্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ডেপুটি রেজিস্ট্রার) জনাব মোর্শেদুল আলম; তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে জার্নাল যথানিয়মে প্রকাশিত হবে প্রত্যাশা করছি।


৩১/১০/২০২৩

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল হক)

নির্বাহী সম্পাদক

জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, ৩৪তম সংখ্যা, ২০১৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দ্যা চিটাগং ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ
The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

সংখ্যা ৩৪, ২০১৮ (অক্টোবর ২০২৩-এ প্রকাশিত) Vol. XXXIV, 2018 (Published in October 2023)

সূচিপত্র:	পৃষ্ঠা
মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তা: প্রেক্ষিত সাপ্তাহিক জয়বাংলা সুলতানা সুকন্যা বাশার	১-১৬
বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম ড. জিনবোধি ভিক্ষু	১৭-৩৬
বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস ড. এফ, এম, এনায়েত হোসেন	৩৭-৫৬
কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের বিধান: একটি পর্যালোচনা ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী	৫৭-৮০
বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ ড. সুদীপ্তা বড়ুয়া	৮১-৯৪
পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা ড. রওশন আরা আফরোজ	৯৫-১০৮
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা ড. মুহাম্মদ এনায়েত হক	১০৯-১২৬
বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন: বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার প্রসঙ্গ শাসনানন্দ বড়ুয়া রূপন	১২৭-১৪৮

শেখ সাদির কাব্য-দর্শন	১৪৯-১৫৮
ড. আব্দুল করিম	
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার	১৫৯-১৮৬
ড. মুহাম্মদ মানজুরুল রহমান	
ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশধারা	১৮৭-১৯৮
আলতাফ হোসেন	
Interactive Approaches to Teaching the Four Core Skills of English at the Higher Secondary Level in Bangladesh: A Proposal	১৯৯-২২২
Dr. Sukanta Bhattacharjee	
Contemporary Bengali Muslim Society in the Literary Works of Kazi Motahar Hossain: Thoughts on Education and Society	২২৩-২৩৬
Dr. A. S. M Borhan Uddin	
Zeno's Paradox: A Mathematical Exposition	২৩৭-২৪৮
Dr. Akikul Haque	
Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh	২৪৯-২৬৪
Marzia Khatan Smita	
الزَّجَّاجُ: عِبْقَرِيَّتُهُ وَاتِّجَاهَاتُهُ النُّحْوِيَّةُ	২৬৫-২৮৪
(আয়-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)	
ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	

- كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقويم ২৮৫-৩০২
- (কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)
- ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন
- أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية ৩০৩-৩২০
- (ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)
- ড. মুহাম্মদ সোলাইমান
- د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣ هـ / ١٨٨٩-١٩٧٣ م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية ৩২১-৩৪৬
- (ড. ত্বাহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)
- ড. হুমায়ুন কবির
- تجلی قرآن در دیباجه بوستان سعدی ৩৪৭-৩৬০
- (Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)
- Dr. Mohammad Noor-e-Alam

মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তা: প্রেক্ষিত সাপ্তাহিক জয়বাংলা

সুলতানা সুকন্যা বাশার*

প্রতিপাদ্যসার

বাঙালি জাতির শত বছরের সংগ্রামী ইতিহাস ও হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে পূর্ণমাত্রায় উপস্থাপন করেছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত বাঙালি জাতি যখন স্বাধিকার লাভে উদগ্রীব হয়ে ওঠে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিল যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা হিসেবে বিবেচিত। এ হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যা বিশ্ব গণমাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। যুদ্ধকালীন বাঙালি জাতির ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ইতিহাস আমরা পাই বিভিন্ন পত্রপত্রিকাসহ অন্যান্য উপাদান থেকে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জয়বাংলা পত্রিকাটিতে ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন বিজ্ঞাপন। বাংলাদেশের যুদ্ধাবস্থায় জনগণের জন্য শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরিত হয়েছিল সেসব বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনের সুগঠিত শব্দবিন্যাস কিভাবে যুদ্ধাহত দেশের সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল, কেনই বা এ সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বাংলাদেশের মানুষকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলো তা নিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেছি। জয়বাংলা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কতটুকু যৌক্তিকভাবে সকলের নিকট তুলে ধরেছিল তার বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

সময়ের দাবীতে বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলার আপামর জনগণ মুক্তি পেতে রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছে স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো বিভিন্নভাবে। কেননা, দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের খবর ছাপা হলেও সরকারপন্থী পত্রিকায় স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের পক্ষের খবরই প্রকাশিত হতো। দেশীয় সেসব পত্র-পত্রিকায় যুদ্ধের খবরের পাশাপাশি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো সেগুলোতে স্বাধীনতার পক্ষে উৎসাহ জাগানিয়া শুভেচ্ছা বার্তা থাকত। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *জয়বাংলায়* প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে উল্লিখিত প্রবন্ধটি রচনার ক্ষুদ্র প্রয়াস নেয়া হয়েছে। নিজস্ব পণ্যদ্রব্যের প্রচার প্রসার ঘটাতেই মূলত পত্রিকাসমূহে বিভিন্ন কোম্পানি বিজ্ঞাপন ছাপাতো। এসব বিজ্ঞাপনে পণ্যের গুণাগুণ উল্লিখিত থাকলেও মুক্তিযুদ্ধকালীন দেশীয় পত্রিকায় পণ্যের গুণাগুণের পাশাপাশি যুদ্ধে বাঙালির পক্ষে অবস্থান নিয়ে অনুপ্রাণিত করার বিষয়টিও আমরা দেখতে পেয়েছি উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপনসমূহে। এমনকি বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ স্বাধীন বাংলাদেশের যৌক্তিকতাকে প্রমাণ করে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত বেশকিছু সংখ্যক তারিখ ও বানানরীতি সে সময়ের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু বিষয়গুলো *জয়বাংলা* পত্রিকা থেকে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপনসমূহের শুভেচ্ছাবাণীগুলো কতটা সমরোপযোগী এবং অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল তা আলোচ্য প্রবন্ধে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরিশেষে কয়েকটি বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি সংযুক্ত করা হয়েছে যা অনু ইসলাম সম্পাদিত *জয়বাংলা* গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

জয়বাংলা পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্রে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি নতুন দেশের অস্তিত্ব দেখা যায় ১৯৪৭ সালে। পাকিস্তানের দুটি অংশের একটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও অন্যটি পূর্ব বাংলা; পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যার নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান (আবুল মনসুর আহমেদ ১৯৯৫, ৩০৮)। যদিও এ পরিবর্তনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্যের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈষম্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধীরে ধীরে স্বাধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠে। রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের প্রেক্ষাপটে এ অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু হলেও নানান পরিস্থিতির দরুণ ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগ হতে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দিয়ে একে একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠনে রূপান্তর করা হয় (মহহারুল ইসলাম ১৯৭৪, ১৫৬)। এ রাজনৈতিক দলটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯২-১৯৬৩), শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) মতো বিজ্ঞ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃবর্গ। বিশিষ্ট যুবনেতা এবং পরবর্তীকালে বাঙালি জাতির জনক ও জাতীয়তাবাদের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন (অলি আহাদ ১৯৮৮, ২১৪)। প্রসঙ্গত, সময়ের বহমানতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব লাভ করেন।

পাকিস্তান সরকারের নানাবিধ অন্যায় অত্যাচারে যখন বাঙালির জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে তখনই মূলত বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে ধাবিত হয়। বাংলাদেশের মানুষের অধিকার অর্জন, দেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা এবং স্বীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে রাজনীতি করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (Sheikh Hasina 2018, 08)। তাঁর সুচিন্তিত রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলে বাঙালি জাতি পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় যা মূলত প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নায়ক ছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার আপামর জনগণ স্বাধীনতা লাভের আশায় প্রস্তুতি নিতে থাকে; এরই মাঝে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালি জাতির উপর যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালায় তাতে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ২৫শে মার্চের মধ্যরাত্রি থেকে ২৭শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে পাকিস্তানিরা গণহত্যা চালিয়েছিল (ময়হারুল ইসলাম ১৯৭৪, ৬৪৪)। মূলত পাকিস্তানের পিপলস পার্টি আওয়ামী লীগের কাছে পরাজিত হওয়ার পরেও ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো অন্যায়ভাবে নির্যাতন করতে শুরু করেছিল। এর প্রেক্ষিতে ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ দিনের ব্যবধানে ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভারতে গিয়ে প্রবাসী সরকার গঠন করেন (যা মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত) এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার তার যাত্রা শুরু করেন। বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে ১৭ই এপ্রিল এ সরকার শপথ গ্রহণ করে। এ স্থানটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল কারণ হলো এটি ছিল মুক্তাঞ্চল এবং কলকাতার সাথে সড়ক যোগাযোগের পথটিও নিরাপদ ছিল (মোঃ মাহবুবুর রহমান ১৯৯৯, ২৪৬-২৪৭)। ভারতের পূর্ণ সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার কলকাতায় তাঁদের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তন্মধ্যে পার্ক সার্কাসের ২১/এ বালু হাককাক লেনের একটি ভবনে স্থাপিত হয়েছিল তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র জয়বাংলা পত্রিকার অফিস (ফারুক আজম খান ২০১৫, ১৫)। মূলত জয়বাংলা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১১ই মে ১৯৭১ সালে। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের তথ্য, বেতার ও গণমাধ্যমের ভারপ্রাপ্ত এম এন ও ইনচার্জ আব্দুল মান্নান, দৈনিক ইত্তেফাকের শিফট-ইন-চার্জ মাহমুদুল্লাহ চৌধুরী ও স্বাধীনতা পূর্ব রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান প্রযোজক অনু ইসলাম সাপ্তাহিকটির অবকাঠামো নিয়ে বেশ আলাপ আলোচনা করার পর পত্রিকার কাগজের যোগানদাতা ও প্রিটিংয়ের স্পন্সর হিসেবে কলকাতার বিখ্যাত আনন্দবাজার গ্রুপের সহযোগিতা লাভ করেন। যদিও মুক্তিযুদ্ধে শুরুর দিকে দুদল্যমানতায় ছিল এই গ্রুপটি (জয়দীপ দে ২০২০, ০৭)। অন্যান্য সকল দিকে সাফল্যের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন আব্দুল মান্নান ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জিল্লুর রহমান এমপি। সংবাদ সংগ্রহের মূল দায়িত্ব ছিল প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও অনু ইসলামের। এ পত্রিকাটি ছিলো দুই কলামের এবং সাইজ ছিল ১৭"X১০"½", যার লেটারহেড তৈরি করেছিলেন পটুয়া কামরুল হাসান (অনু ইসলাম (সম্পা.) ২০০৭, ১,৩)। এ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন আহমদ রফিক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে ছিলেন মতিন আহমদ চৌধুরী। শিয়ালদহ স্টেশনের নিকটবর্তী একটি প্রেসও আনন্দবাজার থেকে কাগজ সংগ্রহ করে মুজিবনগর জয়বাংলা প্রেস থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আহমদ রফিক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এ পত্রিকাটি কুরিয়ার মারফত বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত। পত্রিকাটির প্রারম্ভিক মূল্য ছিল ২০ পয়সা, তবে ৩য় সংখ্যা থেকে ২৫ পয়সা মূল্য ধার্য করা হয়েছিল (হাসিনা আহমেদ ২০১১, ৩৪)। দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থেকেই শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশন, চৌরঙ্গি, গড়িয়াহাট, টালিগঞ্জ, বেলেঘাটার

রাস্তায় রাস্তায় ট্রাডিশানাল হকারদের মতো করেই জয়বাংলা বিক্রি করেছিলেন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম বীর নেতা জনাব গাজী-উল-হক। এ পত্রিকাটি এক নম্বর তালিকাভুক্ত হয়ে আওয়ামী লীগের মুখপত্র হিসেবে ৩৪টি সংখ্যা প্রকাশ করেছিল (অনু ইসলাম (সম্পা.) ২০০৭, ০৩)। যদিও মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং মুক্তাঞ্চলে আরো অনেক সংবাদ-সাময়িকপত্র বেরিয়েছিল (মুনতাসির মামুন ২০১১, ৩৯)। আলোচ্য পত্রিকাটির জয়বাংলা নামকরণ করা হয়েছিল মূলত সময়ের দাবিতেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়বাংলা স্লোগানটি ছিল চেতনা, শক্তি, আর অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাওয়ার এক প্রেরণা। এ স্লোগানের ভিত্তিতেই মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে দেশের স্বাধীনতা আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার আপামর জনগণ। এক কথায় এ স্লোগান ছিল মানসিক দৃঢ়তার এক ও অদ্বিতীয় শক্তি। বর্তমানে জয়বাংলা স্লোগানটি বাংলাদেশ হাইকোর্টের রায়ে জাতীয় স্লোগান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে (দৈনিক প্রথম আলো ১১ই মার্চ, ২০২০, ০২)। জয়বাংলায় প্রকাশিত সংবাদসমূহ নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বাঙালী সম্প্রদায়কে সচেতন করে তুলেছিল এবং বিশ্ব জনমত গঠনেও তাদের পূর্ণ সহযোগিতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করেছিল। উক্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপনে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

বিজ্ঞাপন কী ও কেন?

সাধারণত নতুন কোনো পণ্য উৎপন্ন হওয়ার পর সংবাদপত্র কিংবা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে সেই পণ্য সম্পর্কে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে বিবরণ প্রকাশ করাকে বিজ্ঞাপন বলে। অর্থাৎ, কোনো কিছু সম্পর্কে জনগণকে বিশেষভাবে জানানোই হচ্ছে বিজ্ঞাপন। সে অর্থে, বিজ্ঞাপনের শব্দগত অর্থ হচ্ছে জানানো, বিদিতকরণ বা বিশেষরূপে জ্ঞাত করানো (অনিল কুমার রায়চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী ১৯৮৪, ০২)। ইংরেজি advert শব্দটি এসেছে ল্যাটিন advertir থেকে যার অর্থ হলো: to direct attention অর্থাৎ মনোযোগকে কোনো বিশেষ লক্ষ্যে পরিচালিত করা (পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৮, ১১)। এ থেকে বোঝা যায় যে কোনো প্রচার মাধ্যমের দ্বারা জনগণকে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি আহ্বান করা। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বিজ্ঞাপনকে মন হতে পারে কোনো একটি পণ্যের বিক্রয়ের জন্য কিছু চমক সৃষ্টিকারী ধনি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞাপন বহুসংখ্যক লোককে একত্রে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সম্পর্কে ধারণা দেয়। এতে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, বিজ্ঞাপন নানা বিকল্পের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট কোনো একটা কিছু খুঁজে নেবার অধিকার দেয়। এসব বিজ্ঞাপন একই সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা, জীবনযাত্রাকে সহজতর করার লক্ষ্যেই প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় এবং এতে একটি সমাজের যাপিত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তাছাড়া মানুষ বিজ্ঞাপনের কল্যাণে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কিংবা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনেও চেষ্টা করে থাকে। বিজ্ঞাপনের ভাষা মানুষকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এর প্রমাণ আমরা পাই, ম্যাগী নুডলসের রন্ধনপ্রণালী মাত্র দুই মিনিটে সম্পন্ন করা যায়—এই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হবার পর দেশের অন্যান্য নুডলসের চেয়ে ম্যাগী নুডলসের বিক্রয় হার বেড়েছে। অথচ, অন্যান্য নুডলসও একই সময়ের মধ্যে রন্ধন উপযোগী হলেও শুধুমাত্র শব্দবিন্যাসের গুণে ম্যাগী নুডলসের বিক্রয় হার উর্ধ্বমুখী। যথাযথ শব্দের বিন্যাস মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে তোলে, যা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সহজে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছায়। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন গবেষক William M. Weilbacher বলেন, ‘Successful advertising causes some changes in the consumer's knowledge, attitudes or behaviour’ (Weilbacher 1979, 15).

সাপ্তাহিক জয়বাংলা-য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ভিত্তিক শুভেচ্ছা বার্তাসমূহ

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসে অবস্থান নিয়ে যখন জয়বাংলা পত্রিকা প্রকাশের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল তখন এ পত্রিকাটিকে সচল রাখার জন্য বিজ্ঞাপন ছাপানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কারণ বিজ্ঞাপন থেকেই সংবাদপত্রের প্রধান আয় উঠে আসে (অনিল কুমার রায়চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী ১৯৮৪, ১২)। বলা হয়ে থাকে যে Advertising is any paid form of non personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor (Bolen, Wiley 1943, 04), যার প্রেক্ষিতে উক্ত পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল এবং অষ্টম সংখ্যায় সর্বপ্রথম চারটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে চাঁদপুরের বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী গণেশ চন্দ্র সাহার প্রতিষ্ঠান “মেঘনা বিড়ি” প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছাবাণী ছিলো, ‘দেশের সেবা দেশের সেবা, দেশের সেবা দেশের সেবা’। স্পষ্টতই, প্রতীয়মান এ শুভেচ্ছাবাণী তৎকালীন যুদ্ধকে পূর্ণ সমর্থন করেছিলো। একই সংখ্যায় ‘বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর মুক্তি ফৌজদের জানাই আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি’ এ প্রীতিবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার মদন মোহনতলা স্ট্রীটের শ্যামাপদ সাহার প্রতিষ্ঠান ‘মদন মোহন ইয়ান ট্রেডিং’-এর বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনটির এই কথাগুলো মুক্তিযুদ্ধ এবং যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থনের গভীরতা সত্যিই বেশ উৎসাহ জাগানিয়া ছিল। শ্যামাপদ সাহা ছিলেন নারায়ণগঞ্জ টান বাজারের প্রসিদ্ধ সুতা ব্যবসায়ী। ১৪এ, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা-১৪তে অবস্থিত বিষহরি কেমিক্যাল ওয়াকার্স প্রাঃ লিমিটেডের বিজ্ঞাপনে উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুতকৃত বেশকিছু ঔষধের নাম ও কার্যকারিতার উল্লেখ রয়েছে। তাদের শুভেচ্ছাবার্তায় লেখা ছিল, “বাংলা দেশের মুক্তি যোদ্ধাদের শুভেচ্ছা জানাই।” উক্ত সংখ্যায় “মুক্তি সমাসন্ন ও জয়বাংলা” লেখা সিনেমার একটি পোস্টারও ছাপানো হয়েছিল যার প্রযোজক ছিলেন ধীরেন দাশগুপ্ত, পরিচালনায় উমা প্রসাদ মৈত্র, সংগীতে সুধীন দাশগুপ্ত ও কাহিনী চিত্রনাট্যে মিহির সেন। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, একজন নারী তার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন এক রাইফেলধারী পাক সৈন্যের পা জড়িয়ে ধরে। তাছাড়া খুবই হিংস্র চেহারার এক পাক সৈন্যসহ আরো পাঁচজন পাক সৈন্যের ছবি রয়েছে ঐ পোস্টারে। মাদ্রাজ সিনে ল্যাবরেটরী প্রযোজিত পরিবেশিত এ সিনেমার পোস্টারের অগ্রভাগে লেখা রয়েছে ‘আঘাত যতই হানবে তুমি ততই জীবন জাগবে...’ এ পোস্টারের প্রেরণা জাগানিয়া বার্তাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও পক্ষেই ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, সে সময় মুক্তিযুদ্ধনির্ভর বহু সিনেমা ভারতে তৈরি হয়েছিলো, যা মূলত মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতাকে বহির্বিশ্বে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বেশ সহযোগিতা করেছিলো।

পরবর্তী সংখ্যায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনগুলোর সাথে দেখা যায় আরো তিনটি নতুন বিজ্ঞাপন। তন্মধ্যে ওরিয়েন্টাল ট্রাভেল সার্ভিসের প্রীতিবার্তায় উল্লিখিত রয়েছে “বাংলা দেশের নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধাদের অভিবাদন জানাই” এবং এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের নাগরিকদের বিমান ও জাহাজে ভ্রমণের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে

পেরে আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। মূলত প্রতিষ্ঠানটি পাসপোর্ট, ভিসা, পরিচয়পত্র, সরকারী অনুমতি, হেলথ সার্টিফিকেটসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছাত্র বা ইমিগ্রান্টদের বিশেষ কনসেশনের ব্যবস্থা করে দিত বলে জানা যায়। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশনা সংস্থার “বাংলাদেশ সংখ্যা” নামে একটি বিশেষ সংখ্যার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল এতে। বিজ্ঞাপনের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে “বাংলাদেশ সরকারের শুভেচ্ছাধন্য” বিজয় নিশ্চিত অথবা ন্যায্য যুদ্ধের প্রতি সম্মান জানিয়েই বাণীটি উল্লেখিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ৭১/১, কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হতে প্রকাশিত এ সংস্থার বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সত্যিকারের তথ্যনির্ভর লেখা ও ছবি প্রকাশের আগ্রহ দেখা গেছে। কলকাতার আরেকটি প্রকাশনা সংস্থা “আনন্দ” এর বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের চলমান ঘটনা নিয়ে লেখক গাজী ইবনে সিরাজের “এগিয়ে চলো” সিরিজের “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, বাংলাদেশের সংগ্রামের দলিল” শীর্ষক বইয়ের প্রচারণা রয়েছে। এ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপন নিপীড়িত মানুষের মনে মুক্তির তাড়না সৃষ্টি করেছিলো নিঃসন্দেহে। “জয়তুঃ স্বাধীন বাংলা” এ শুভেচ্ছা বার্তার পাওনিয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াকার্স প্রাঃ লিঃ নামক খেলনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন মাধ্যমে ছাপানো হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানটি ১০১/১বি কড়িয়া রোড, কলিকাতা-১৭তে অবস্থিত। জয়বাংলায় বারোতম সংখ্যা “মেঘনা বিড়ি” প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তিত শুভেচ্ছাবার্তা ‘সত্যের নাহি পরাজয়’ লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখিত কয়েকটি বইয়ের প্রচারণা দেখা যায় ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিমিটেডের বিজ্ঞাপনে। যেমন, বেদুইন প্রকাশিত ‘বাংলার রণাঙ্গনে রক্তের আল্পনা’ পরেশ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ মাঝি ও দুর্গম সুন্দর এবং লেখক মেসবাহউদ্দিনের প্রকাশিত বই ‘বাংলা দেশ-স্বদেশ আমরা’। অন্যদিকে প্রচার ও প্রকাশনা সংস্থা যা মূলত কাজ করত বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সব ধরনের বইপত্র ও পত্রিকার জন্য তাদের বিজ্ঞাপনে স্বয়ংত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা (সঠিক তারিখসহ ছবি ও কার্টুন সম্বলিত) এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি নামক দুটি বইয়ের প্রচারণা রয়েছে। Exide ব্যাটারীর একটি বিজ্ঞাপন এ সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও তাতে কোনো প্রীতিবার্তা ছিল না।

তেরোতম সংখ্যায় অন্যান্য বিজ্ঞাপনের সাথে নতুন একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় যেখানে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদের প্রকাশনা মুক্তধারার প্রকাশিত বইসমূহের প্রচারণা রয়েছে। উল্লেখ্যযোগ্য বইগুলো হলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা দেশ সহায়ক সমিতি সম্পাদিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখকদের সংকলিত প্রবন্ধ সম্বলিত রক্তাক্ত বাংলা, সত্যেন সেন রচিত প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ, আহমেদ হুফা রচিত জাহত বাংলাদেশ, আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত তিনমাসের দিনলিপি এবং মুক্তিযুদ্ধের পরিশ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট গল্পকারদের সংকলিত গল্প নিয়ে রচিত বাংলাদেশ কথা কয় সহ অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপন। অনুপ্রেরণাদায়ক এসব বইয়ের প্রচারণার সাথে সংযুক্ত ছিলো মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা অনুধাবন সহায়ক বার্তা ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে বাংলাদেশের লেখকদের বই পড়ুন’। যেহেতু তৎকালীন মানুষের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ ছিলো তাই উক্ত বইগুলো সন্দেহাতীতভাবে বাংলার মানুষের চিন্তাজগতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সুপ্রভাব ফেলেছিল বলা যায়। নিয়মিত বিজ্ঞাপনসমূহের সাথে নতুন একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায় ১৪তম সংখ্যায়। এটি ছিলো দে’জ মেডিকেলের তৈরি কেয়ো কার্পিন কেশ তৈলএর বিজ্ঞাপন। এতে তেলের উপকারিতা সম্পর্কে লেখা থাকলেও এতে কোনো প্রকার শুভেচ্ছাবার্তা ছিল না। ষোলোতম সংখ্যায় ইন্ডিয়ান

মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তা: প্রেক্ষিত সাপ্তাহিক জয়বাংলা

অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডের বইয়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় সুসাহিত্যিক হাসান মুরশিদের *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি* নামক বইটির প্রচারণা ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা গাজী-উল-হকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় লিখিত বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি প্রামাণ্য দলিল *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম* বইয়ের প্রচারণা। আঠারোতম সংখ্যায় দুটো নতুন বিজ্ঞাপন দেখা যায় তন্মধ্যে একটি ছিলো হরিপদ নন্দী এ্যাসোসিয়েটসের আসন্ন পূজা উপলক্ষে তৈরি পোষাকের বিজ্ঞাপন এবং অন্যটি ছিল গ্লুকোডেক্স লেবরেটরী প্রাইভেট লিমিটেডের ঔষধের বিজ্ঞাপন। এগুলোতে অবশ্য কোনো বার্তা ছিলোনা। উনিশতম সংখ্যায় নিয়মিত বিজ্ঞাপনগুলোর সাথে বিজ্ঞাপন বিষয়ক খুঁটিনাটি কিছু তথ্য পাওয়া যায় যা ছিল নিম্নরূপ:

বর্তমান পৃষ্ঠা সংখ্যা	১২
মোটামুটি সাইজ	১০ ^১ / _২ X ১৭ ^১ / _২
মোট কলম	৪
কলমের মাপ	২ ^১ / _২ X ১৪ ^১ / _২

বিজ্ঞাপন গ্রহণের শেষ তারিখ প্রতি মঙ্গলবার, বিজ্ঞাপনের হার প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতিবার ১৫ টাকা; এছাড়া পত্রিকার ঠিকানা সহ বিজ্ঞাপন পাঠানোর প্রেক্ষিতে কমিশন প্রদান ও এর মূল্য পরিশোধের নিয়ম স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এতে। এর পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে নতুন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। তবে ব্যতিক্রম ঘটেছে ৩১তম সংখ্যায় মেঘনা বিড়ির বিজ্ঞাপনে। এতে দেখা যায়, বিজ্ঞাপনের ভাষা বদলেছে এবং আরো সুগঠিতভাবে বিজ্ঞাপনের নকশা করা হয়েছে। যেমন, বিজ্ঞাপনের উপরের দিকে দুই কোণে জয়বাংলা লেখা রয়েছে এবং শুভেচ্ছা বার্তায় ব্যাপক পরিবর্তনসহ লিখিত আছে, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি লাভের মহান শুভলগ্নে – বাংলাদেশ সরকার এবং জনসাধারণ ও সর্বোপরি সংগ্রামী মুক্তিবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের আমি ও আমার পরিবারবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই—গণেশ চন্দ্র সাহা। উল্লেখ্য এ সংখ্যাটি ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল যার মাত্র ছয়দিন পরই বাংলাদেশ যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করে। স্পষ্টত বোঝা যায়, দেশের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী জেনেই এ শুভেচ্ছাবার্তা প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকায়। বিজ্ঞাপনের ভাষা জনগণের মস্তিষ্কে যে সুদৃঢ়প্রভাব ফেলে এই বিজ্ঞাপন তারই প্রমাণ। প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন গবেষক Rosser Reeves বলেন, Someone once defined advertising as, “The art of moving an idea from one man's head into the head of another” (Reeves 1961, 92). বিজ্ঞাপনসমূহের শুভেচ্ছা বার্তার ভাষা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশের সাধারণ জনগণের জোরালো সমর্থন ছিল। যোদ্ধাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা আর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একইসাথে অসীম আত্মবোধও প্রকাশ পেয়েছে। খুব সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছাবার্তায় দৃঢ় ও সঠিক শব্দের ব্যবহারে ফুটে উঠেছে দেশপ্রেমের গভীরতা।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির এ যাবতকালের শ্রেষ্ঠ অর্জন এবং এ অর্জনের পশ্চাতে নূন্যতম ত্যাগ স্বীকারকারী প্রত্যেকের অবদান রয়েছে। এসব ত্যাগের কল্যাণেই আজ আমরা মুক্তির আনন্দ পেয়েছি। যুদ্ধের ময়দানে লড়ে যাওয়া যোদ্ধাদের, তাঁদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উৎসাহ যোগাতে তৎকালীন সকল প্রচেষ্টার সাথে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছাবার্তাসমূহও দারুইভাবে সহযোগিতা করেছিল। প্রবন্ধে উল্লেখিত বিজ্ঞাপনের সংজ্ঞায় স্পষ্টত বলা হয়েছে কোনকিছু সম্পর্কে জনগণকে বিশেষভাবে জানানোই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। *জয়বাংলা* পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনসমূহ উল্লেখিত সূত্র ধরে বিভিন্ন পণ্যের বাজার বৃদ্ধিকরণের পাশাপাশি মুক্তিকামী জনগণের চেতনায় একটি স্বাধীন দেশের প্রয়োজনীয়তা ও এ উদ্দেশ্যে লড়াই করে যাওয়া যোদ্ধাদের পক্ষে যৌক্তিক অবস্থান তুলে ধরেছিল। পণ্যের বিবরণ ও পণ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ভাষার সারল্য লক্ষণীয়। একই সাথে প্রবন্ধে উল্লেখিত বিজ্ঞাপনসমূহে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সহজ ও সরল বক্তব্য দেখা গেছে যা মূলত তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের জন্যই বর্ণিত। উক্ত পত্রিকাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও বিজ্ঞাপনদাতা বেশকিছু সংস্থার অবস্থান ছিল যুদ্ধরত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে বিশেষ করে যেসব বিজ্ঞাপনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অবস্থান নেওয়ার উন্মুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জেনেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্দেহাতীতভাবে বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছিল। তাছাড়া কলকাতাকেন্দ্রিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিজ্ঞাপনে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছিলো যা মূলত বহির্বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় ভিত্তিপ্রদান করেছিল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ একটি অনন্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত যার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত সকল রাজনীতিবিদ, সকল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের সার্বিক সহায়তাকারীসহ বিজ্ঞাপনের মত ক্ষুদ্র অথচ কার্যকরী তথ্য সঞ্চালনকারী প্রক্রিয়া স্বমহিমায় উজ্জ্বল। বাংলাদেশ সরকারের মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক *জয়বাংলা* পত্রিকাটি দেশ ও দেশের বাইরে সাধারণ জনগণের সম্মুখে পাকিস্তানিদের বর্বরতা যেমন তুলে ধরেছিলো, তেমনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা ও প্রবল প্রতিরোধ ব্যবস্থার চিত্রও তুলে এনেছিলো। একইসাথে সরকারিভাবে রেজিস্টার্ড এ পত্রিকার বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছাবার্তাও যুদ্ধে বাঙালিদের পক্ষে পূর্ণ সমর্থন হিসেবে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছিলো বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দৃঢ় মনোবল তৈরিতে এসব শুভেচ্ছাবার্তা অসামান্য অবদান রেখেছিলো যা অনস্বীকার্য।

তথ্যপঞ্জি

- অনু ইসলাম (সম্পাদ.), *জয়বাংলা*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০৭।
- অনিল কুমার রায়চৌধুরী, প্রভাতকুমার গোস্বামী, *বিজ্ঞাপন বিদ্যা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৪।
- অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, ১৯৮৮।
- আবুল মনসুর আহমেদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫।
- জয়দীপ দে, *কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত 'একাত্তরের কার্টুন'*, জলধি, ঢাকা, ২০২০।
- দৈনিক প্রথম আলো, ২২তম বর্ষ, ১১ মার্চ, ২০২০।
- পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বিষয় বিজ্ঞাপন*, লিপিকা, কলকাতা, ১৯৯৮।
- ফারুক আজম খান, *বসন্ত ১৯৭১*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৫।
- ময়হারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, আগামী প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৪।
- মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯।
- মুনতাসির মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, অন্যান্য, ঢাকা, ২০১১।
- হাসিনা আহমেদ, *১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের পত্রপত্রিকা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১১।
- Bolen, William H., John Wiley & Sons, *Advertising*, New York, USA, 1943.
- Reeves, Rosser, *Reality in Advertising*, Alfred A. Knopf, Inc. New York, 1961.
- Sheikh Hasina, *Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol-1 (1994-1995), Hakkani Publishers, Dhaka, 2018.
- Weilbacher, William M., *Advertising*, Collier Macmillon Publishers, London, 1979.

বিজ্ঞাপিত

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে এবং বাংলাদেশের বাইরে 'জয় বাংলা' পত্রিকার জন্যে এজেন্ট আবশ্যিক। তাদের নির্দিষ্ট হারে কমিশন দেয়া হবে।

* * *

'জয় বাংলা' প্রকাশের জন্যে বাংলাদেশের বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকা, পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংসতা এবং দেশাত্মবোধক লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এব্যাপারে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

* * *

যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়ে 'জয় বাংলা' ও বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করতে চান, তাঁদেরকে আমাদের সাথে পরামর্শ বা সরাসরি যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসূচী, সাপ্তাহিক জয় বাংলা

হেড অফিস :

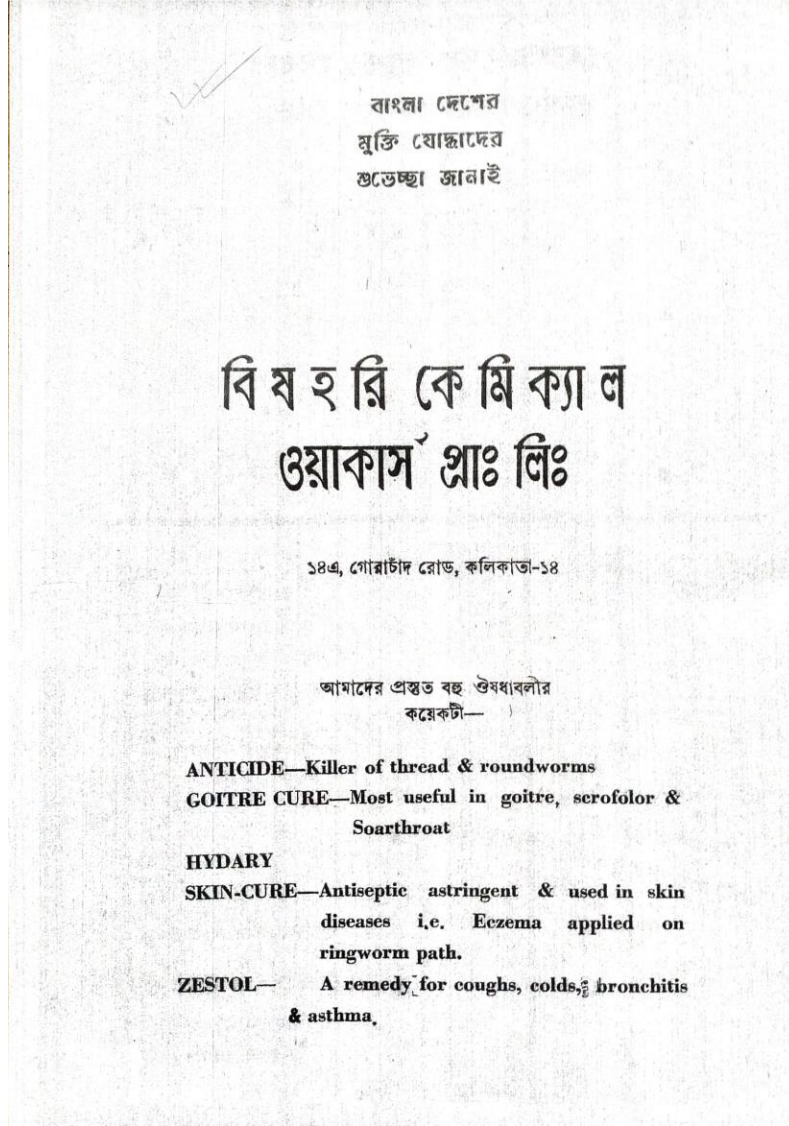
গাজিপুর নগর, বাংলাদেশ

অথবা

তথ্য, গণ-সংযোগ ও প্রচার বিভাগ

বাংলাদেশ মিশন

১, সার্কাস এডিনিউ, কলকাতা-১৭।



সূত্র: সাপ্তাহিক জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২রা জুলাই, ১৯৭১, পৃ. আট।

মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তা: প্রেক্ষিত সাপ্তাহিক জয়বাংলা

পরিশিষ্ট ৪

দেশের সেবা দেশের সেবা
দেশের সেবা দেশের সেবা

মেঘনা বিড়ি

আপনাদের সেবায়

—প্রস্তুতকারক—
গণেশ চন্দ্র সাস্ত্রা
চাঁদপুরের
বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী

বাংলা দেশের
নির্ভীক মুক্তি যোদ্ধাদের
অভিযাদন জানাই

আমরা আন্তরিকভাবে 'বাংলাদেশ' নাগরিকদের বিমান বা জাহাজে অরণের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে পেরে খুশি।
বিশেষ ভ্রমণের জন্য পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র, সরকারী অমুদ্রিত, ভিসা, হেলথ সার্টিফিকেট ইত্যাদির সব ব্যবস্থাই আমরাই করে থাকি। যাত্রায় খরচ বাবর বিদেশী মুদ্রা বা ভারতীয় মুদ্রা আমরা নিতে পারি।
বিলেত, আমেরিকা বা কানাডায় গমনকারী ছাত্রদের বা ইমিগ্র্যান্টদের বিশেষ অনুসন্ধান দেওয়া হয়।

আন্তরিকভাবে আপনাদের সেবায়
ওরিয়েন্টাল ট্র্যাভেল সার্ভিস
৯৫এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২
(মেডিক্যাল কলেজের বিপরীতে)
ফোন : ৩৪-৪৪৫১ (দিন লাইন) ক্যাবল : ORIENTOUR

কম্বুজ স্বাধীন বাংলা

পাণ্ডনিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াকার্স
প্রাঃ লিঃ
১০১১ বি কডুয়া রোড, কলিকাতা-১৭
সেরা খেলা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

গান্ধী ইবনে সিরাজের
এগিয়ে চলো
৥ বাংলা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় সেরা বই ৥ দাম : ৫০ পয়সা
প্রকাশ অপেক্ষায়

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
বাংলাদেশের সংগ্রামের দলিল
—আনন্ড প্রকাশন—

এইমাত্র প্রকাশিত হল
বাংলাদেশ সরকারের শুভেচ্ছা বার্তা

চিত্রাসুন্দা
বাংলাদেশ সংখ্যা
বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
সম্পর্কিত সত্যিকারের তথ্যনির্ভর
লেখা ও ছবিসহ সেরা প্রকাশনা
—দাম তিন টাকা—
৭২১, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

সূত্র: সাপ্তাহিক জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৯ই জুলাই, ১৯৭১, পৃ. ১১।

পরিশিষ্ট ৫



জয়ন্তঃ স্বাধীন বাংলা
পাণনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার ওয়াকার্স
প্রাঃ লিঃ

১-১১১ বি, কডেয়া রোড, কলিকাতা-১৭

সেরা বেলা প্রস্তুতকারক ও বিজ্ঞতা

আমাদের বই পেয়ে ও বিয়ে এমন তৃষ্ণাঃ
বাংলাদেশ মুক্তের বিজ্ঞিতা—প্রত্যক্ষদর্শীর বিরূপ—অভ্যন্তরীণ
ইতিহাস—সহ্যে আছে মিষ্ট নির্বাচনের বহু আলোকচিত্র

বেঙ্গলিদের **বাংলার রণাঙ্গনে** ৮-০০
রক্তের আঁচনা (উপা) ৭-০০

পূর্ণমাত্রার **মাখি** ৬-০০
অন্য **দুর্গম আন্দর** ৬-০০

বাংলা দেশের গতিবিধির বেকজ
মেনবাহ উদ্ভিদের

বাংলাদেশ স্বদেশী আমার
ইতিহাস আলোসিমেতে প্যারিসিং কোং প্রাঃ লিঃ
২৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১৭

সবেমাত্র প্রকাশিত।

স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা
হাস বৈজ টাঙ্কা
অন্য-বাংলা হাতি ও কাটুই ও
স্ট্রিক আদি।

প্রকাশের পথে—
বাংলাদেশের স্বাধীনতা
সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি
হাস বৈজ টাঙ্কা

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
সব রকম বই পর-পরিচালক জ্ঞ
প্রচার ও প্রকাশনা সংস্থা

মুম্বই-বঙ্গ, বাংলাদেশ
৭০ সি নর্থ স্ট্রিক রোড, ঢাকা-২
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৩

অন্য বাংলার বিজ্ঞাপন মানে
বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আপনার
পর্যায়বাহ প্রচার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের
গতি-প্রকৃতি বুঝতে হলে
বাংলাদেশের লেখকদের
বই পড়ুন

- **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ**
—কমিকার্স বিজ্ঞানবাংলা বাংলা-
দেশ সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি মনোবৃত্ত
- **রক্তাক্ত বাংলা**
—বাংলাদেশের স্বাধীনতা
সংগ্রামের প্রবন্ধ-সংকলন
- **প্রতিরোধ সংগ্রাম**
—বাংলাদেশ
—সংগ্রামের
- **জাগ্রত বাংলাদেশ**
—সাহিত্যিক হাফা
- **তিনমাসের দিনলিপি**
—সাহিত্যিক হাফা-সংগ্রামের
- **বাংলাদেশ তথা কল্প**
—মুক্তিযুদ্ধের গতি-প্রকৃতির
বাংলাদেশের বিজ্ঞিতা-গত-
কারকের পর-সংকলন
তা' হাফা

বাংলাদেশে প্রকাশিত
প্রোগ্রাম গ্রন্থসমূহ

স্বাধীন

স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭ বাটমি বাগান রোড, কলিকাতা-১৭
ফোনঃ ১-৩৩৩৩৩
বিক্রয়করঃ ১-৩৩৩৩৩৩
কলিকাতা-১৭
ফোনঃ ১-৩৩৩৩৩৩

সত্যের নাই পরাজয়

|||

মেঘনা বিড়ি

প্রস্তুতকারক
গণেশ চন্দ্র সাহা
চাঁদপুরের
বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী

‘বাংলাদেশের’
স্বাধীনতা সংগ্রামে
বীর মুক্তি ফৌজদের জানাই
আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি

নারায়ণগঞ্জ টানবাজারের
প্রসিদ্ধ সূতা ব্যবসায়ী—

শ্রীমাপদ সাহার প্রতিষ্ঠান
মদন মোহন ইয়ার ট্রেডিং
৩৯, মদন মোহনতলা ব্রিট, কলিকাতা-৫

সূত্র: সাপ্তাহিক জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ৬ই অগাস্ট, ১৯৭১, পৃ. ১১।

মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞাপনের শুভেচ্ছা বার্তা: প্রেক্ষিত সাপ্তাহিক জয়বাংলা

পরিশিষ্ট ৬



**সুদৃঢ় ও
নব্যায়মতঃস্বতন্ত্রতা
নিপের
ব্রহ্ম ন্যাটালী**

**'জয় বাংলা'র' বিজ্ঞাপন মাঝে
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে আপনার
পণ্যবস্তুর প্রচার**



**জানাত চান
আমার
গোপন কথা ?**
আমার এই সুন্দর ঘন চুলের
মূল কারণ
**কেসো-
কার্পিন**
কেশ তৈল
চুল চটপটে রাখে
জান্না ভাঙতে পক্ষ মাথায়
পছন্দীও সেরা
Kesho-Karpin
লেক্স মোডেলস
ভিত্তি

সর্বোচ্চ আকাশিত !
স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা
হান হেতু টাকা
অন্যায় ভবিষ্যৎ কর্তৃক ও
সঠিক থাকিবে।
আকাশের শেষে—
বাংলাদেশের স্বাধীনতা
সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি
হান হেতু টাকা
বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত
সব রকম বই পত্র-পত্রিকার অস্ত
প্রচার ও প্রকাশনা সংস্থা
মুদ্রিত, বাংলাদেশ
৩০ সি নর্থ মাইল রোড, ঢাকা-২
৭৪, মহাশা গাছী রোড, কলিকাতা-২

সত্যের নাহি পরাজয়

মে ঘ না বি ডি

প্রস্তুতকারক
গণেশ চন্দ্র সাহা
চাঁদপুরের
বিখ্যাত বিড়ি ব্যবসায়ী

**'বাংলাদেশের'
স্বাধীনতা সংগ্রামে
বীর মুক্তি ফৌজদের জানাই
আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি**

**নারায়ণগঞ্জ টানবাজারের
প্রসিদ্ধ সূতা ব্যবসায়ী—**

শ্রীমাদ সাহার প্রতিষ্ঠান
মদন মোহন ইয়ান ট্রেডিং
৩৯, মদন মোহনতলা স্ট্রিট,
কলিকাতা-৫

সূত্র: সাপ্তাহিক জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৩ই আগস্ট, ১৯৭১, পৃ. ১১।

পরিশিষ্ট ৭

আপনার সেবার সুযোগ কামনা করে—
অন্ন, নিশ্চিন্ত এবং সর্বপ্রকার উত্তর পীড়ার একমাত্র মহোদয়

গ্লুকোজাইম
* ভিটামিন
* লাইসিন
* পেপেইন
উপাদানে প্রস্তুত।

প্রস্তুত কারক : **গ্লুকো ডেক্স লেবরেটরী প্রাইভেট লিঃ**
২২/১১এ, পাইকগাড়া
রাজা মরীচ মন্ডর রোড
কলিকাতা-৩৭
ফোন নং—৪৬৪০১৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর প্রেরিত হৃদয়
গাজী উল হকের

‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রামাণ্য দলিল
• ব্রহ্মা প্রজ্ঞাপত্র,
• অটুটি স্মরণ ছবি সম্বলিত
• নির্ভরশীল ভাষ্য পূর্ণ
এবং
সুমাধিক হামান যুরিশদের
‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি’
সর্ব ভারতীয় পরিবেশক :
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
ফোন নং ৩৪২৬৪১

পূজায় আপনাদের কুশল কামনা করি—

ছোট ও বড়দের সুন্দর টেকসই গোয়াক, সব ধরনের দায়ী, সুন্দর এবং
টেকসই শাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদি বিক্রয়ের একমাত্র নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান—

হরিপদ নন্দী এ্যাসোসিয়েটেস্
পূজায় আপনার সেবার সুযোগ আয়না কামনা করি

ঠিকানা : ৩৫ নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা
ফোন নং—৪৭৬৪৭২

সূত্র: সাপ্তাহিক জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যা, ৮ই অক্টোবর, ১৯৭১, পৃ. পাঁচ।

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

ড. জিনবোধি ভিক্ষু*

প্রতিপাদ্যসার

মানুষ মাত্রই আত্মসচেতন, বিবেকবান, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ভালো-মন্দ, অনুভব ও অনুধাবন করার অন্যতম জীব। তাই কিছু কিছু শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত আছে- ‘মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব’, ‘নররূপী নারায়ন’ এবং দুর্লভ জীবন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বলে বিভাজন করার কোনো সুযোগ নেই। নারী-পুরুষ সবাই মূলত মানবসত্তান। সৃজনশীল মেধা, দূরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিতা বা উপস্থিত বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, ধৈর্য্য, ক্ষমা-চেতনা, সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞানান্বেষী মানসিকতা যাঁর মধ্যে বিরাজমান তিনি নারী হোক বা পুরুষ হোক অবশ্যই আলোকিত ও মহিমান্বিত জীবন লাভে ধন্য হন। এই বিদুষী মহিলা বেগম রোকেয়ার জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্মের অনুধ্যান ও অনুধাবন করলে স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, তাঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার স্ফূরণ ছিল অসাধারণ এবং অতুলনীয়। দূর্ভাগ্য তিনি যে সময়ে যে সমাজে জন্মেছিলেন সেই সময়ে নারীদের আধুনিক শিক্ষা লাভের তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না বললেও কম বলা হবে। তিনি তাঁর নিজস্ব মুক্ত চিন্তা-চেতনা, দৃঢ়তা, সাহসী ও জ্ঞানান্বেষী মানসিকতা দিয়ে পরিবারের আলোকিত বরণ্য সদস্যদের সাহচর্য্যে যুগোপযোগী শিক্ষা ও সৃজনশীল মেধা সঞ্চয়ের গভীর মননশীলতা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি তাঁর স্বীয় বহুমুখী প্রাজ্ঞতা গুণে তৎকালীন সময়ে পিছিয়ে পড়া নারী জাতির শিক্ষার জাগরণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা প্রতিকূল পরিবেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা অতীব বিরল। তাই তাঁকে ‘বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত’ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বায়নের যুগে যে-কোনো মানুষের কর্মপ্রতিভার মূল্যায়ন, মর্যাদা এবং স্বীকৃতি দান বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। বেগম রোকেয়া এমন একজন আলোকিত ও বিদুষী নারী যাঁর শিক্ষার উন্মেষের পাশাপাশি বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর এই অসামান্য প্রতিভা, কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন এবং প্রজন্মের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য এই নিবন্ধের প্রয়াস।

* অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

“আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে? কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে
মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন ‘মানুষ হইতেই হবে’ এই তার পণ”

‘রূপসি বাংলার কবি’ জীবনানন্দ দাসের রত্নগর্ভা মা কুসুমকুমারী দাসের লেখা ঐ অনবদ্য চরণসমূহের সার্থক প্রকাশ দেখতে পাই বাঙালি মুসলিম নারী-মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনদর্শনে। বাঙালি মুসলিম নারী প্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ ও অনবদ্য ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিশাল। ভারতের হিন্দু নারীর সামাজিক ও মানবিক অধিকার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনন্য ও নির্ভীক ঐতিহাসিক ভূমিকার সাথে তুলনীয়। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারী-মুক্তির অগ্রদূত। অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বলে যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ও নির্যাতিত পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলিম নারী সমাজকে তিনি দিয়েছিলেন আলোর সন্ধান, দেখিয়েছিলেন মুক্তির পথ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালি মুসলিম সমাজে বেগম রোকেয়া সর্বপ্রথম পুরুষের সাথে নারীর সমধিকার দাবি নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তীব্র ও সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। নারী-মুক্তি অর্জনের জন্য নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীকে অবরোধবাসিনী করে রাখার প্রথাযুগে মূলোচ্ছেদ-এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে আমরা তিনি আন্দোলন ও সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। এছাড়াও মুসলিম নারীদের একতাবদ্ধ করে সমাজে তাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে নারীদেরকে নিয়ে নারী সংগঠন স্থাপনেও তিনি অগ্রগামী ছিলেন। লেখক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী হিসেবে বেগম রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে নারীর মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে সমাজে একক ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। এটাই তাঁর মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছিল।

এ মহিয়সী নারীকে বলা যায় তীব্র গভীর নিশিতে ঘন জমাট কাদম্বিনীতে ঢাকা জমা গগনে হঠাৎ করে চন্দ্র শশির আলোয় সমগ্র ধরণী জেগে ওঠার গানে জ্যোৎস্নায় জেগে উঠে, বেগম রোকেয়া ছিলেন অন্ধকারে ঢাকা বাঙালির গভীর নিশিতে আলোসম। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। মানুষ প্রতিভা নিয়ে না জন্মালেও বহুমুখী প্রতিভা মানুষের জীবনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। নিজস্ব মনন শক্তি, জ্ঞানান্বেষী চেতনা এবং গভীর অধ্যবসায় বিদ্যমান থাকলে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সময় সাপেক্ষ জাগরণ সহজ হয়। মাতৃজাতির আলোকিত নারী বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যকর্ম এর জ্বলন্ত প্রমাণ যা প্রজন্মের চেতনাকে শাণিত করবে যুগে যুগে।

বেগম রোকেয়ার জন্ম

মানবজন্ম মাত্রই অতি দুর্লভ এবং মূল্যবান। এর চেয়ে বড় দুর্লভ মানবতা ও মনুষ্যত্ব জ্ঞান অর্জন করা। আসামের বঙ্গভূমি স্মরণাতীতকাল থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিভাত। পশ্চিমা দেশে যখন শিক্ষার আলো ছিল না তখন এ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারত ও বঙ্গদেশে বহু বিদ্যাপীঠ (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, বিক্রমশীলা, পণ্ডিত বিহার, শালবন বিহার) গড়ে উঠেছিল। বেগম রোকেয়ার জন্মকাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে। ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্যবাহী রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষানুরাগী মুসলিম জমিদার পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং জননন্দিত জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (মৃত্যু-১৯১৩) এবং মাতা পতিব্রতা, অতিথি-পরায়ণা এবং ধর্মপরায়ণা রাহাতুল্লাহ সাবেরা চৌধুরানী (মৃত্যু-১৯১২)। তাঁরা দু’ভাই এবং তিন বোন। মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

হায়দার সাবের এবং বোনদের মধ্যে করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) ও হোমায়রা চৌধুরী। করিমুন্নেসার দুই দেশবিখ্যাত পুত্র স্যার আবদুল করিম গজনভী (১৮৭২-১৯৩৯) ও স্যার আবদুল হালিম গজনভী (১৮৭৯-১৯৫৬)। বেগম রোকেয়া ভাই ও বোনদের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান। বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষগণ মোগল আমলে উচ্চ সামরিক এবং বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োজিত ছিলেন। পিতা তৎকালীন সময়ে উর্দু, ফারসি, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ভাই দু'জন বাল্যকালে পড়ালেখার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। ফলে ইংরেজি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধুনিক মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচেতা উন্নত মানসিকতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষী ও দৃঢ়চেতা বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যনুরাগী। তাঁর প্রভাব অনেকটা প্রভাবিত বেগম রোকেয়ার রক্ত ধমনীতে প্রবাহমান বলা যায়। বিদ্যোৎসাহী পিতা, ভ্রাতৃত্ব এবং অগ্রজ-বোনের বহুমুখী জ্ঞানপ্রভাব অনেকটা পারিবারিকসূত্রে প্রাপ্ত বলা যায়। এছাড়া ধর্মীয় অনুরাগ এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ রোকেয়ার জীবনে বাল্যকাল থেকে জন্মেছিল।

শিক্ষাজীবন

পিতা জহীরুদ্দিন মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু দু'ছেলেকে আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করেছেন। তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠ গ্রহণ করেন। তাদের জ্ঞান প্রতিভার স্পৃহা দেখে কলেজের অধ্যাপকগণ মুগ্ধ ছিলেন। অগ্রজ ভ্রাতৃত্বের শিক্ষার অগ্রগতি ও সৃজন মেধার পরিচয় পেয়ে বোন করিমুন্নেসার জীবনে সেই জ্ঞানের আলোকচ্ছটা অনেকটা জ্বলন্ত হয়েছিল। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পেলেও ভ্রাতৃত্বের আন্তরিক সহায়তায় তিনি বাড়িতে পড়ালেখার সুযোগ লাভ করেন। পারিবারিক শিক্ষায় অগ্রগতি কনিষ্ঠ বোন বেগম রোকেয়ার কোমল অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

দু'ভাই এবং অগ্রজ বোনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হওয়ার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর। তখন মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকাকালীন একজন মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে কিছুদিন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। শিক্ষানুরাগী বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক অধ্যবসায়, মেধা, গুরুত্ব প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও স্মরণশক্তিগুণে তিনি যা যা পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর বড় ভাই ও বোনের আন্তরিক সহযোগিতায় বেগম রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাতে তিনি উভয় ভাষায় পড়ালেখা করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

দুর্ভাগ্য যে, তৎকালীন সময়ে বেগম রোকেয়া যে সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠেন সেখানে মুসলিম মেয়েদের গৃহের অর্গলমুক্ত বা অঙ্গনমুক্ত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ ছিল না। সামান্য যে সুযোগ ছিল তাও সমাজ ও আত্মীয় স্বজনদের ঞ্কটিকির বিরূপ সমালোচনার মুখে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এমন একদিন ছিল যেদিন বাংলার মুসলিম নারীদের ঘরের চতুষ্কোণের মধ্যেই আটক থাকতে হতো। বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা ছিল নারীদের জন্যে পাপের কাজ। ১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর বিদ্যোৎসাহী স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহ ও সহযোগিতায় জ্ঞানচর্চার পরিধি আরো বহুগুণে বিস্তৃত হয়। তখন তিনি স্বামীর আন্তরিক সহায়তায় দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিতি এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। সেদিক থেকে তাঁর জ্ঞানচর্চার ও সাহিত্যচর্চার গভীর পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বলা যায় যে, তিনি পিতা ও ভাইবোনদের ন্যায় বহু ভাষায় বিশেষ

ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বলা যায়, বাল্যকাল থেকে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট পারঙ্গমতা অর্জিত হয়েছিল।

দেহের অবয়ব

মানবজীবন সকল দিক থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবন। এ মানবজীবনে নারী-পুরুষ নামে আলাদা বিভাজন থাকলেও পরস্পরের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ এতে বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। তাই নারী-পুরুষের চেয়েও আমার-আপনার বড় পরিচয় হলো আমরা মানবসন্তান। এর মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। তাই একেকজনের দেহের গঠন ও অবয়ব একেক রকম। বেগম রোকেয়া দেহের গঠন ছিল অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত, সুঠাম, সুস্বাস্থ্য, পূর্ণাঙ্গ চেহারার অধিকারী বেগম রোকেয়া আকর্ষণীয় পরীর মতো রূপলাব্যাণে ভরপুর ছিল। বলা যায়, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ একজন মানবী। এক কথায়- দেবীতুল্য চেহারা জন্ম-জন্মান্তরের অসীম পুণ্যকর্মের প্রভাবে সর্বগুণ লক্ষণসম্পন্ন মনোমুগ্ধকর নারী। মিষ্টি মুখ এবং সদা-সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ভাব খুবই কম দেখা যায়। নারী হয়েও মাতৃত্বগুণের মহিমা ছিল অপার ও অতুলনীয়। উচ্চতার দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত। ৫২ বছর বয়সেও দেখতে ভরা যৌবনের মতো মনে হয়। সার্থক ও পরিপূর্ণ নারী।

বিবাহিত জীবন

বংশমর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদাকে সম্মুখ করে রাখার জন্য নারী হোক বা পুরুষ হোক তাদেরকে বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। এখানে বিবাহিত জীবন বলতে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ জীবনকে বোঝানো হয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নিয়মানুসারে বিবাহিত জীবনের স্বীকৃতি রয়েছে। বেগম রোকেয়া মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি জীবন আধুনিক শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সৌভাগ্য যে, স্বামী তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন সৃজনশীল মেধার অধিকারী, মুক্তমনা, সমাজ সচেতনতা, ধর্মাত্মতা ও কুসংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। এককথায়, স্বামী ছিলেন অতিশয় উদার হৃদয় এবং বাস্তববাদী মানুষ।

তাই তিনি সহধর্মিণী রোকেয়াকে যুগোপযোগী বিদ্যাচর্চা কোনো রকমের বাঁধা দেননি, বরং তাঁকে বিদ্যার্জনে ও বিদ্যাচর্চায় আন্তরিক সহানুভূতি দিয়েছিলেন। এখানেই স্বামীর মহত্ত্ব ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় মেলে। বলা যায়, স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় জ্ঞানান্বেষী রোকেয়া দেশি-বিদেশি খ্যাতিমান লেখকদের শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় রচনাবলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি নিত্য-নতুন গভীর জ্ঞান সাধনার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটেছিল শিক্ষানুরাগী স্বামীর অনুপ্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতায়। তাঁদের বৈবাহিক জীবনে সংসারের সাদামাটা স্বামী-স্ত্রী গুঁধু নন তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বাব এবং কল্যাণমিত্রের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাঁদের আনন্দময় সুখের সংসারে দু'টি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল। মর্মান্তিক ও করুণ ঘটনা হলো দু'টি কন্যা সন্তানই অকালে মারা যায়। একজন চারমাস বয়সে এবং অন্যজন পাঁচ মাস বয়সে (বেগম রোকেয়া, ২০০৫, ৪৭৭)। সংসার সুখের হলেও তাঁদের সংসার জীবন অতি দুঃখ-কষ্ট ও বেদনাদায়ক ছিল।

স্বামীর মৃত্যু

নারী হোক বা পুরুষ হোক সময়সাপেক্ষে উভয়ের জীবনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু মানবজীবনে স্বাভাবিক ধর্ম। বেগম রোকেয়ার বিবাহিত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর সংসার জীবনযাপন করে দুর্ভাগ্যবশত অল্প বয়সে তিনি স্বামীহারা হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯। এ বয়সে আলোকিত, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ সরকারি পদমর্যাদাসম্পন্ন স্বামীকে হারিয়ে কত যে অসহায় জীবনযাপন করতে হয় তা বলাই বাহুল্য। শুভানুধ্যায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম রোকেয়া নিজেই কর্মজীবন বেছে নিয়েছিলেন। তখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং মুসলিম নারীদের জ্ঞানদান ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এই প্রসঙ্গে বলা যায়-

‘মৃত্যু যন্ত্রণা কত জনে করেছে পেষণ,
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত?’

(ড. কামরুল আহসান, ৪৮১)।

কর্মজীবন

মানুষের জীবনমাত্রাই কর্মময়। সৎকর্ম মানুষকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রাখে। যিনি বা যারা আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ দিয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখেন তারাই হয় গ্রহণযোগ্য এবং গর্বিত ইতিহাসের অধ্যায়। মানবপ্রেমিক ও শিক্ষানুরাগী বেগম রোকেয়া দেশ ও জাতির স্বার্থে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারী জাতিকে যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য যা অবদান রেখে গেছেন তা সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১৯০৯ : সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা, ভাগলপুর, বিহার। ১৬ই মার্চ, ১৯১১ : সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল কলকাতায় স্থানান্তরিত। ১৯১১ সালে অলিউল্লাহ লেনে, ১৯১৩ সালে ১৩ ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে, ১৯১৫ সালে স্থায়ীভাবে ৮৬/এ লোয়ার সারকুলার রোডে। ১৯১৩ সালে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি : ১ জাস্টিস সৈয়দ শরফুদ্দীন (সভাপতি) ; ২ নওয়াব সিরাজুল ইসলাম খানবাহাদুর ; ৩ জাস্টিস সৈয়দ হাসান ইমাম ; ৪ হাজী নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া (ব্যবসায়ী) ; ৫ ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ; ৬ ব্যারিস্টার সৈয়দ সুলতান আহমদ ; ৭ এ. এইচ. গজনভী (জমিদার) ; ৮ শেখ মাহবুব আলী ; ৯ মৌলভী এম. এস. আবদুর রব ; ১০ মৌলভী মুজিবুর রহমান (সম্পাদক, ‘দি মুসলমান’) ; ১১ ওসমান জামাল (ব্যবসায়ী) ; ১২ সৈয়দ আহমদ আলী (অবৈতনিক সম্পাদক)। সার্বিক ব্যবস্থাপনা : মিসেস আর. এস. হোসেন। স্কুলটি এখনো সচল। বর্তমানে কলকাতার ৯ নম্বর লর্ড সিংহ রোডে অবস্থিত। ১৯১৩ : ‘তুরস্ক সাহায্য ভাণ্ডারে’ সহায়তার উদ্দেশ্যে পর্দানশিন মহিলাদের সভায় যোগদান ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ। ১৯১৬ : ‘আনজুমনে খাওয়াতীনে ইসলাম’ নামে মুসলিম মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পাদিকা : রোকেয়া। সভাপতি : মিসেস আবদুল করিম। এই সংস্থার লক্ষ্য মুসলিম মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন। স্কুল বিষয়ে সরোজিনী নাইডুর স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহপত্র পেলেন ১৯১৭: বড়লাটপত্নী লেডী চেমসফোর্ড-এর স্কুল পরিদর্শন। স্কুল বিষয়ে রোকেয়া সহায়তা পেয়েছেন আগা খান, মওলানা মোহাম্মদ আলী (তাঁর কন্যারা এই স্কুলের ছাত্রী), নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ হাসান ইমাম, মিঃ আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহিম, স্যার এ. কে. গজনভী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখের কাছ থেকে। এপ্রিল ১৯১৭ : ‘আনজুমনে খাওয়াতীনে ইসলামে’র বার্ষিক সভা ৮৬/এ লোয়ার সারকুলার রোডে অনুষ্ঠিত। সম্পাদিকা হিসেবে রোকেয়া বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করলেন। উই এপ্রিল ১৯২০ : কলকাতার টাউন হলে ‘শিশু পালন’ প্রবন্ধ পাঠ। ১৯২৬ : *Bengal Women's Educational Conference*-এ (বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে) সভানেত্রী। তাঁর অভিভাষণ

‘সভানেত্রীর অভিভাষণ’ নামে ‘সাহিত্যিক’ (ফাল্গুন ১৩৩৩), ‘বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি’ নামে *সংগত* (চৈত্র ১৩৩৩) এবং ‘অভিভাষণ’ নামে *সবুজপত্র* (চৈত্র ১৩৩৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৮ই মার্চ ১৯৩১ : ‘ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম’ নামে তাঁর একটি অভিভাষণ রোকেয়ার স্কুল-সেক্রেটারি সৈয়দ আহমদ আলী-কর্তৃক পাঠ। পরে *মোহাম্মদী* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৯৩২ : *নারীসম্মেলনে সভানেত্রী* (সৈয়দ আবদুল মান্নান, ১৮৮৩, ৯৯-১০০)।

নারী শিক্ষা বিস্তার ও স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা

জ্ঞানশক্তি অসাধারণ শক্তি। পুরুষ হোক বা নারী হোক শিক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহার্য সম্পদ। শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনে কোনো মূল্য নেই। সভ্যতার ক্রমবিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। বেগম রোকেয়া তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। উচ্চশিক্ষিত এবং সরকারি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন আলোকিত প্রিয় স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেনের মৃত্যুর পরে নিঃসঙ্গ রোকেয়া নারী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ১ অক্টোবর ১৯০৯ সাল থেকে তাঁর জীবনে আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। প্রিয়তমা স্বামীর রেখে যাওয়া দশ হাজার টাকাকে সম্বল করে শ্বশুরালয় ভাগলপুরে স্বামীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম স্কুল- “সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল”। অভিভাবকহারা বিধবা বেগম রোকেয়ার কর্মময় জীবনে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এক অনন্য কর্ম। অতঃপর তিনি মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও দু’বছরের বেশি জ্ঞানদানের মতো পবিত্র কাজ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পারিপার্শ্বিক অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে বিশেষ করে পারিবারিক কারণে রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। কলকাতার একটি ক্ষুদ্র গলিতে তিনি ছোট একটি ঘর নিয়ে বসবাস করেন। গ্রামের মেয়ের কলকাতায় বসবাস করা সহজ ছিল না বরং কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তখনও তিনি স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকে দূরে সরে দাঁড়াননি। শিক্ষা সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মননশীল চিন্তা-ভাবনা কতটুকু গভীর এবং অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা থেকে তার প্রকাশ পাই।

“শিক্ষার অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের ‘অন্ধ-অনুকরণ’ নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ” (বেগম রোকেয়া, *স্ত্রীজাতির অবনতি*, মতিচূর, ১ম খণ্ড, ২৮-২৯)। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেছেন- “টাকা উপার্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য ইহা আমি কোনো কালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা। আবার কেবল বি.এ. এম. এ. পাস করিলেও অনেক স্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য না হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য হওয়া উচিত” (*রোকেয়া জীবনী*, ৪৬)।

কলকাতায় স্কুল প্রতিষ্ঠা

মানুষ হিসেবে মানুষের মহৎ উদ্দেশ্য অন্তরে বিদ্যমান থাকলে একদিন না একদিন তার স্বপ্ন পূরণ হবেই। বিদ্যোৎসাহী বেগম রোকেয়ার জীবনেও অনেকটা তাই হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার বুকে এসে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩ ওয়ালিউল্লাহ লেনে একটি বাড়িতে মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে তিনি নবপর্যায়ের ‘সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ঐ স্কুলের পরিচালিকা ও শিক্ষয়িত্রী। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় সবদিক দিয়েই স্কুলের উন্নতি ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বেগম রোকেয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে স্কুলটি মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে এবং ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণসহ অন্যান্য কারণে স্কুলটিতে বহুবার স্থান বদল করতে হয়েছিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রোকেয়া

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

পিছপা হননি কোনোদিন। বিভিন্ন সময় স্কুলটির অবস্থান ছিল ১৩, ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন (১৯১৩), ১৬২, লোয়ার সার্কুলার রোড (১৯৩২), ১৭, লর্ড সিনহা রোড (১৯৩৮) এবং আলীপুর হেস্টিংস হাউস (১৯৩৮)। ১৯৬৮ সালে এটি ১৭ নং লর্ড সিনহা রোডের নিজস্ব বাড়িতে স্থায়ীভাবে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়।

প্রায় দুই যুগ ধরে বেগম রোকেয়া তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন স্কুল পরিচালনায়। বিরূপ সমালোচনা ও নানাবিধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সে যুগের মুসলমান মেয়েদের শিক্ষালাভের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত করেন। এটি ছিল তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের বাস্তবায়ন। শৈশব থেকে মুসলমান নারীদের যে দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাই ছিল এই স্কুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর স্কুলে মেয়েদের পাঠাবার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন। যে যুগে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে বাঙালি মুসলমানরা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করত, সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন এবং মুসলমান মেয়েদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পথ সুগম করেন। প্রথমদিকে কেবল অবাঙালি ছাত্রীরাই পড়ত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে। বেগম রোকেয়ার অনুপ্রেরণায় ক্রমশ বাঙালি মেয়েরাও এগিয়ে আসে পড়াশোনার জন্য। ছাত্রীদের পর্দার ভিতর দিয়েই ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে আনা নেওয়া করা হতো।

সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে তফসিরসহ কুরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এইড, রান্না, সেলাই, শরীরচর্চা, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হতো। স্কুল পরিচালনা এবং পাঠদানে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বেগম রোকেয়া বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন। পর্যবেক্ষণ করতেন সেসব স্কুলের পাঠদান পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে তিনি কলকাতার শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ইংরেজ, বাঙালি, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সব শ্রেণির নারীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি নিজেই স্কুলের শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দিতেন। কলকাতায় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী না পাওয়ায় রোকেয়া মদ্রাজ, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি স্থান থেকে দক্ষ শিক্ষয়িত্রী নিয়ে আসেন। তাঁর বারংবার আবেদনের ফলেই ১৯১৯ সালে সরকার কলকাতায় ‘মুসলিম নারী ট্রেনিং স্কুল’ স্থাপন করে। স্কুলের জন্য সরকারি সাহায্য এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা আদায় ছিল বেগম রোকেয়ার জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এ কাজেও সামাজিক বিরুদ্ধতা আর কঠিন সমালোচনাকে উপেক্ষা করে তিনি সফলতা লাভ করেন। উপরোক্ত স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে গিয়ে নানাভাবে তাঁকে কষ্ট করতে ও ধৈর্য ধরতে হয়েছে; বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে সংকটে পড়তে হয়েছে তাঁর একটি লেখা চিঠি থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ‘আমার স্নেহের মনা, তোমার প্রেরিত কাসন্দ পেয়ে সুখী হয়েছি। বুয়া! তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফান্ডে পাঁচটা টাকা পাঠাতে তা’তে আমি খুশী হতুম। এক ব্যক্তি সূদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন- গত মাসে ২৭ টাকা পাঠিয়েছিলেন, এবার ৬৯ টাকা ৬ আনা পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার আপন লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে থাক। ---- এই সঙ্গে স্কুলের একখানা রিপোর্ট পাঠাই। তোমার স্নেহের আপা, রোকেয়া, (২১/০৫/১৯২৯, রোকেয়া রচনাবলী ২০০৬, ৫১২)। এই প্রসঙ্গে আরেকটি লেখা চিঠি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে করি:

স্নেহাস্পদা মরিয়ম

Sakhawat Memorial Girls' School 86-A, Lower Circular Road, 8th Sept. 1915.

তোমার ১৯শে আগস্টের প্রাণ জুড়ানো চিঠিখানা পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। আমার মত জ্বলাপোড়া মরুভূমি তোমার মধুর স্নেহের যোগ্য নহে। তাই দেখ না, তোমার সরস চিঠিখানা মরুভূমি একেবারে শুষিয়াই লইয়াছিল।

চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়ভাব। বুঝিতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট-বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া ঘোড়া, সস, কোচম্যান ইত্যাদি-ইত্যাদি সব দিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কি না তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীয়ে! এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুণী ইহার বিনিময় কি, জানিস? বিনিময় হইতেছে “ভাঁড় লিপকে হাত কালা” অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিস্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুণীর পরিবর্তে সমাজ বিক্ষারিত নেত্র আমার খুঁটিনাটি ভুল ভ্রান্তির ছিদ্র অন্ত্রেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর। কচি মেয়েরা মা-বাপের কাছে নিজেদের বুদ্ধিমত যাহা বোঝে, তাহাই বলে। তাহা নিয়া একটু রঙ্গ হয়। এইরূপ সুখে দুঃখে একরকম চলিয়াছে ভালই। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেয়ামতের পর দিন দেওয়া হইবে। এখন পড়া তৈরী করিতেছি (বেগম রোকেয়া রচনা সমগ্র, ৫৪৩)।

তোমার স্নেহের ভগিনী
রোকেয়া।

খান বাহাদুর তসদ্দক আহমেদকে লেখা চিঠি

ভাই সাহেব,

স্কুলের নানা জটিল কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকি যে, নিজের বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তির দিকে মোটেই খেয়াল করতে পারি না। ফলে আমার প্রায় দশ হাজার টাকা লোকসান হয়ে গেল। এতটা লোকসান দেওয়া আমার জন্য কতই মারাত্মক। আমার স্বাস্থ্যও দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। স্কুলের পুরো কাজ ছাড়া অন্যান্য সমিতির কিছু কিছু কাজও আমাকে করতে হয়। তাঁরা আমার কোন আপত্তি শুনবে না। আমার অসুস্থতার ওজর মানবে না। কাজেই আমার, ছাড়া পাবার উপায় নেই (৩০/০৯/১৯৩২, ভূমিকা, ড. কামরুল আহসান, ২০১৬, ৫৫৬)।

সংগঠন প্রতিষ্ঠা

তিনি স্কুল পরিচালনা করতে গিয়ে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন একক শক্তি দিয়ে বড় ধরনের কাজ করা কঠিন বিষয়। বহুজনের শক্তিকে এক করতে পারলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভালো কিছু করা সম্ভব। তিনি এ চেতনাকে সামনে রেখে ১৯১৬ সালে একটি ‘মুসলিম নারী সমিতি’ নামে একটি সংগঠন করেন। এর নাম দিয়েছিলেন-আঞ্জুমান-ই-খাওয়া-তীন-ই-ইসলাম। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি একদিকে সাহসী পদক্ষেপ অন্যদিকে নানাভাবে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে গতিশীল করে তুলেছিলেন। সাংগঠনিক নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ জাতিত্ব হলে সমাজ উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজকর্মে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অসম্ভব কিছু না। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি নারী জাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজ এবং ধর্মাত্মক প্রেক্ষাপট নারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজ সংস্কারমূলক অবদান রাখা অতি দুরূহ কাজ বললেও কম বলা হবে। তিনি বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা এবং যা করবেন বলে একবার মুখ থেকে বের করেছেন তা শেষ না করা অবধি পিছপা হতেন না। এভাবে তিনি প্রতিটি কাজে সফল হয়েছিলেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই নারী সমিতি। এ সমিতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী কর্মজীবনের কাহিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মুসলিম নারী সমিতি থেকে বহু বিধবা নারী অর্থ সাহায্য পেয়েছে, বহু দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, অসংখ্য অভাবী মেয়ে সমিতির অর্থে শিক্ষালাভ করেছে, সমাজে

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

পরিত্যক্ত, অসহায়, অনাথ শিশুরা আশ্রয় ও সাহায্য পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার মুসলমান নারী সমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই সমিতির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সমিতি মুসলমান নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করেছে। এ সমিতিতে যোগদানের জন্য রোকেয়াকে নানা অপবাদ মাথা পেতে নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করতে হয়েছে। এই সমিতি ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারেও নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে মতামত তুলে ধরে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য এই সমিতি শিল্প প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করে। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে ‘আজ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম’ সে যুগে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে যেসব নারী নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই বেগম রোকেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। বেগম রোকেয়ার জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল এই সমিতি।

নারী সম্মেলনে যোগদান

যে-কোনো মানুষের প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা গুণ বিদ্যমান থাকলে তাঁকে কোনোভাবে চেপে রাখা যায় না। এটাই বাস্তবতা। হীরকখণ্ড দুর্লভ এবং মূল্যও বেশি। কিন্তু তা গভীর গর্তে পুঁতে রাখলে এর গুণাগুণ বুঝা যায় না। বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ মানুষ তা মাটি থেকে পুনরুদ্ধার করে ঘষামাজা করলে তা থেকে দ্যুতি বের হয়। দুর্লভ হীরকখণ্ডতুল্য বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন অনেকটা তাই বলা যায়। ১৯২৬ সালের কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করার গৌরব অর্জন করেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো রকমের ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী অসাধারণ প্রতিভাগুণে মানুষ কত বড় হতে পারে তাঁর জীবনই একমাত্র অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া ‘বাংলা ভাষার’ পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো দুঃসাহসিক কাজ। জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় গর্ব করে বলতে হয়-

“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর”

-(নারী, কাজী নজরুল ইসলাম)

নারী জাগরণ

“কোনকালে একা হয়নিকো, জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে, বিজয় লক্ষ্মী নারী”।

-(নারী, কাজী নজরুল ইসলাম)

অভূতপূর্ব কাব্যিক ছন্দের এই প্রতিধ্বনি বিদুষী নারী বেগম রোকেয়া’র জীবন আদর্শে বাস্তব রূপ দেখতে পাই।

পুরুষেরা যেমন মানুষ, নারীরাও একই অর্থে মানুষ। দেহের গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারী আলাদা করা হয়েছে। কিন্তু রক্তের দিক থেকে উভয়ে এক। তাই পুরুষ ও নারী বিভাজন করার কোনো সুযোগ নেই। বরং যুগে যুগে একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক এবং অভিন্ন। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের আশা-প্রত্যাশা পূরণ কোনোভাবে হয় না।

তাই দু'জনের সমন্বয়ে নতুনত্বের সৃষ্টি। বিশ্বের কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রে নারী জাগরণ বিষয়ে কোনো বাধার কথা নেই। বলা যায়, নারীরাও সমান সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার বিষয় স্বগৌরবে উল্লেখিত আছে।

ইসলাম ধর্মে নারী সমাজের প্রতি উদারতা, ন্যায়বিচার এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীর অধিকার রক্ষা, ধর্মচর্চা ও ধর্মদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুরআনভিত্তিক সমাজে জ্ঞানার্জন নারী কিংবা পুরুষ কোনো এক সম্প্রদায়ের জন্য সীমিত থাকতে পারে না। ইসলামের শেষ পয়গম্বর প্রত্যেক নর-নারীর জন্য শিক্ষাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এদেশে এ শিক্ষার বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, গাউড়ামি, কুসংস্কার আঁপুঠে জড়িয়ে ধরেছিল মুসলমান সমাজকে। মুসলমান নারীর জীবনব্যবস্থা এমনই করুণ ও দুর্বিষহ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, তাঁরা জানতেনই না ইসলাম কত মর্যাদাময় আসনে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ নিছিন্দ্র অন্ধকারে দমবন্ধ পরিবেশে রোকেয়া এনেছিলেন খোলা হাওয়ার পরশ। কাঁপন ধরিয়েছিলেন অচলায়তনে। অচেতন নারীর মধ্যে অধিকারবোধ জাগানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাদের শিক্ষার আলোকে অবগাহন করানোর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আত্মমর্যাদা জাগরণের প্রেরণা হয়েছিলেন।

বেগম রোকেয়া বুঝেছিলেন, শতকরা ১০০ জন অশিক্ষিত মুসলিম নারীর মধ্যে জাহত ভাব আনাতে হলে এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, হযরত মোহাম্মদ (সা.) তেরশত বৎসর পূর্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কী বলেছিলেন- 'বিদ্যা শিক্ষা কর, যে বিদ্যা- শিক্ষা করে সে নির্মল চরিত্রের অধিকারী হয়, যে বিদ্যা চর্চা করে সে আমার স্তব করে, যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা করে। ... বন্ধু সভায় বিদ্যা অলংকার স্বরূপ, শত্রু সম্মুখে অস্ত্র স্বরূপ।' ... যাঁহারা মোহাম্মদের (সা.) নামে প্রাণদানে প্রস্তুত হন, তারা তাঁর সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? ... কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী 'ফরজ' অবশ্য পালনীয় কর্তব্য' বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহার কন্যারা শিক্ষায় উদাসীন?' (মতিচূর ২য় খণ্ড)। সর্বক্ষেত্রেই রোকেয়া ছিলেন বিপ্লবী ও সাহসী।

বর্তমান শতাব্দীর শেষ সীমায় আমরা নারীকে কারখানা থেকে কৃষিক্ষেত্রে পর্যন্ত কর্মরত দেখতে পাচ্ছি। রোকেয়া গুরুত্বই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় দুঃসাহসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। কোনো পারিবারিক আনুকূল্য রোকেয়া পাননি। কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রোকেয়ার হয়নি। রোকেয়া নিজেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত রোকেয়া ছিলেন একাধিক ভাষায় সুপণ্ডিত। এ যুগসন্ধিক্ষণে এক কঠিন সময়ে রোকেয়া কোনো সহযোগী ছাড়াই একা এদেশের নারী-জীবনে মুক্তির আলো আনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সমকালীন সমাজব্যবস্থা, কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা, কুটির শিল্পের দুরাবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে তিনি সূচিন্তিত ও নিপুন আলোচনা করেছেন। তিনি একজন মহান মানুষ, আপসহীন সংগ্রামী। একবিংশ শতাব্দীর গুরুত্রে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে সমাজে নারী শিক্ষার অনেকখানি প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এতে সন্তুষ্টির অবকাশ নেই। ইদানিং শিক্ষিত হলেও মুক্তবুদ্ধির চেতনা থেকে আজও আমরা বঞ্চিত।

শিক্ষিত মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভুলে যেতে বসেছে। আর যারা আজও শিক্ষা বঞ্চিত তাদের কাছে এ উন্নত মানসিকতা আশা করা যায় না। কারণ ইসলাম শিক্ষিতের ধর্ম, মূর্খ-অজ্ঞের ধর্ম নয়। আজও চতুর্দিকে দারুণ হা-হুতাশ ইসলাম ধর্মের জন্য মুসলমান নারীর জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইসলামের ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে দিয়ে বিখ্যাত হওয়া যাচ্ছে অতি সহজে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত গুণ মানুষের জানার আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়, বুদ্ধির মুক্তি ঘটায়। বেগম রোকেয়া সে দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সঙ্কটের বিচার করতে পেরেছিলেন। সৌন্দর্য ও শালীনতাবোধ এবং জ্ঞানপিপাসা ইসলাম ধর্মের অঙ্গ। অশালীন ও উশৃঙ্খল জীবনের ছাড়পত্র এখানে পাওয়া যায় না। বেগম রোকেয়া সৌন্দর্য

ও শালীনতার একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন; সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অপারিসীম সশ্রমবোধ। একটি প্রবন্ধে তিনি জোরগলায় বলতে পেরেছিলেন, “তাই সরাসরি বলতে পেরেছেন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা প্রায়ই বোরখা ছাড়তে বলেন, বলি, উন্নতি জিনিষটা কি? তা কি কেবল বোরকার বাহিরে থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝবে যে, জেলেনী, চামারনী, কি ডুমনী প্রভৃতি স্ত্রী লোকেরা আমাদের চেয়ে অধিক উন্নতি লাভ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, ‘আমরা অপ্রয়োজনীয় পর্দা রাখব?’ জীবনদর্শনের এ বলিষ্ঠ ভূমিকায় রোকেয়া ছিলেন আপোশহীন। পণ্য নয়, নারীকে বলিষ্ঠ মানুষের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর সাধনা। কিন্তু অবরোধবন্দি নারী বন্দি জীবনের মুক্ত প্রাঙ্গণে কি প্রকৃত অর্থে মুক্তি পেয়েছে সে প্রশ্ন রয়েছে।

বেগম রোকেয়া পর্দাপ্রথার বিরোধী ছিলেন না- তবে গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন। তিনি উগ্র নারীবাদীদের মতো বোরখা ছিঁড়ে ফেলে দেননি বরং তিনি সমাজের কথা চিন্তা করে বোরখা প্রথা মেনে চলতেন। কেননা তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে জাগিয়ে তোলা। তিনি ‘সওগাত’ সম্পাদককে লেখা চিঠিতে বলেছেন, ‘আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবরোধবাসিনী হয়েছি তার কারণ আছে। আমার স্কুলটা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি সমাজের অযৌক্তিক নিয়ম-কানুনগুলোও মেনে চলছি। অবস্থা এরূপ এখন যে আমি পর্দার আড়ালে থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, এটাও হয়তো দোষণীয় হয়ে পড়ছে। আমি বাড়িতে বাড়িতে ক্যানভাস করে মেয়ে আনতে যাই, কিন্তু অভিভাবকরা আমাকে আগেই জিজ্ঞেস করেন, পর্দাপালন করা হয় কি না? অতটুকু ছোট মেয়ের বেলায়ও এ প্রশ্ন। এখন বুঝুন, কী পরিস্থিতির মাঝে স্কুল চালাচ্ছি, আর ব্যক্তিগতভাবে আমার অবস্থাই বা কীরূপ?’

প্রত্যেকটি স্কুলের জন্য আমি সমাজের সকল অবিচার, অত্যাচার সহ্য করেছি। পর্দা প্রথা সম্বন্ধে ‘বোরকা’ প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া লিখেছেন ‘আমরা পর্দার অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুষ্ঠনসহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই’। রোকেয়া কথাগুলো যে যুগে দাঁড়িয়ে বলেছেন সে যুগে নারীরা, বিশেষত মুসলিম নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী, অসূর্যস্পর্শা। শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং ঘরের অভ্যন্তরীণ কাজ চালানোই ছিল তাদের কাজ। কোনও, অভিযোগ কিংবা আকাজ্ঞা ব্যক্ত করার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না তারা। তার ওপর ছিল যখন তখন ‘তালাক’-এর নির্মম আঘাত। এ তালাক প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনের শেষ প্রবন্ধ ‘নারীর অধিকার’ নিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের উত্তরবঙ্গে দেখেছি গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোনও ত্রুটি হলেই স্বামী দম্ব করে প্রচার করে “আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব”। এ রকম ঘটনা সব সময়ই ঘটত।

এক সময়ে পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধ হয় নতুন পত্নী লাভ হবে তাই এ আনন্দ। যুগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রোকেয়ার চিন্তাধারা কত আধুনিক ছিল তার প্রমাণ মেলে নারী সমাজের শৃঙ্খলিত হওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি লিখেছেন, ‘আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজে বন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোনো অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করতে লাগল, অপর অংশ (নারী) তার সঙ্গে সঙ্গে সরূপ উন্নতি করতে পারল না বলে পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হয়ে দাসি হয়ে পড়ল। আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলংকারগুলো এগুলো দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মতে অলংকার দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ।

তাই দেখা যায়, কারাগারে বন্দীগণ পায়ে লৌহ নির্মিত বেড়ি পরে, আমরাও স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ মল পরি। উহাদের হাতঘড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতঘড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি। ... আমরা দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করেও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি- গর্বে ক্ষিতা হই’ (মতিচূর-১)। এ প্রসঙ্গে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, ‘ব্যাপারটা অর্থাৎ নারীর শৃঙ্খলিত হওয়ার ঘটনা একদিনে ঘটেনি। উৎপাদন পদ্ধতি পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ চাষবাসের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য এসে গেল, এবং মেয়েদের সন্তান ধারণ করতে হয় বলে এ নতুন পরিস্থিতিতে তারা পিছিয়ে পড়ল। ঘোষণা করল এবং নিজেদের আধিপত্য মেয়েদের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরুষ শাসিত সমাজের স্বার্থের অনুকূলে তাদের মানাবার জন্য নীতি-আদর্শ অনেক কিছুই আসতে থাকল এবং ধীরে ধীরে পুরুষ শাসিত সমাজের নীতি আদর্শ ইত্যাদিতে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। কালক্রমে মেয়েরাও পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। তারপর একদিন এমন অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল যে, আমরা দেখতে পাই মেয়েরা নিজেরাই স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলছে।’

প্রায় সব রচনাতেই রোকেয়া প্রকাশ করেছেন ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহারের কথা, সে যুগের নারীদের শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবরুদ্ধতার কথা। কোনো কোনো রচনায় প্রকাশিত হয়েছে সমাজ উন্নয়নে নারী ও পুরুষের যৌথ অবদানের গুরুত্ব। এমনকি কিছু রচনায় নারী ও পুরুষের সম্পর্ক ও তার বিভিন্ন মাত্রিকতার বিশ্লেষণে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সংস্কারমুক্ত আধুনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়। মুক্তচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাগিত লেখনীর মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ শতকের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে যুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরোজিনী নাইডু, তদানীন্তন বড়োলাট পত্নী লেডী চেমসফোর্ড, লেডী কারমাইকেল, ভূপালের বেগম সুলতান জাহান প্রমুখ নারী বেগম রোকেয়ার সাহিত্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর কাজের প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্বাভাবিক ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণে তিনিই প্রধান নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের ঘোর অন্ধকার যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া ভূমিকা ছিল ব্যতিক্রমী এবং অনন্য সাধারণ। অবরোধ প্রথার শেকল ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসেন অসামান্য সাহস, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বেগম রোকেয়াই প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। কর্তব্যকর্ম হিসেবে নারীশিক্ষা বিস্তারে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন:

—“শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন” (বেগম রোকেয়া, ৬১)।

— অন্যত্র তিনি বলেছেন: “আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই”। (বেগম রোকেয়া, ৪৩-৪৪)। সাহিত্যচর্চা, সংগঠন পরিচালনা ও শিক্ষাবিস্তার এই ত্রিমাত্রিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বেগম রোকেয়া সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন এবং স্থাপন করেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথার অবসান। শিক্ষা ব্যতীত নারীজাতির অগ্রগতি ও মুক্তি সম্ভব নয়, এ সত্য অনুধাবন

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

করেই তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের কাজে ব্রতী হন। নারীদের তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মানুষ হিসেবে এবং সমাজের অর্ধেক হিসেবে। নারীর মর্যাদার স্বীকৃতির লক্ষ্যেই পরিচালিত হয় তাঁর সমগ্র প্রয়াস। তাঁর মধ্যে ছিল একজন যোগ্য শিক্ষকের প্রজ্ঞা, সমাজ সংস্কারকের অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবতাবাদীর নির্মল চেতনা। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার অবদান চিরঅম্লান।

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শান্তি ও মানবতার ধর্ম। মানবসেবা ও মানবকল্যাণ ইসলামের বিধান, ত্যাগ ও উদারতার ধর্ম। বেগম রোকেয়া তাঁর সংবেদনশীল মন ও জীবনবোধকে আশ্রয় করে তৎকালীন কিছু কিছু ধর্মাত্মক মুসলিম ও নারী সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাস্তবতার সঙ্গে জীবনের মিল খুঁজে না পেয়ে দেখেছেন- ধর্মাত্মতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দেশাচারের দাস, ক্রোদাজ, গতিহীন, শক্তিহীন, নিথর এক সমাজব্যবস্থাকে। উপলব্ধি করেছেন সার্বিক অধঃপতনের হাত থেকে নারী জাতিকে রক্ষা করে তুলতে হলে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জ্ঞানালোকের পথে অগ্রসর হতে হলে তার নিথর সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের চেতনা দিয়ে উজ্জীবিত করতে হবে। বস্তুর শিক্ষার আলোয় আলোকিত সমাজ গঠনের মানসে আধুনিক শিক্ষার গতির সঞ্চারণ এবং স্বাধীন নারী হিসেবে সাহস ও ঘর থেকে বের হওয়ার জ্ঞানশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি জানান, জন্মগত ধর্মাত্মতা ও সংকীর্ণতা এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদাভেদের বাঁধ ভেঙে নারীদেরকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন- পুরুষশাসিত সমাজ থেকে নারীদেরকে বের করে আনতে না পারলে নারীরা যুগে যুগে পিছিয়ে ছিলেন এখনও পিছিয়ে থাকতে হবে সন্দেহ নেই। এমন কি আধুনিক শিক্ষার পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অশিক্ষক, অর্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষার আলো বঞ্চিত নারী সমাজকে বিমুক্ত করে পঠন-পাঠন অপরিহার্য। কারণ তাদের মনে পরিশুদ্ধ, সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিবাদী চেতনা জাগাতে হবে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা

বেগম রোকেয়া একজন নারী হয়েও তাঁর চিন্তা-চেতনা সামাজিক, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং ক্ষুরধার লেখনীর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মনোভাব ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আপন সমাজকে তাঁর বিশেষ কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেও এবং বাংলার মুসলমান নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও তাদের দুর্দশা-মোচনের প্রচেষ্টায় আজীবন ভারতীয় নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের দূরবস্থার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। ‘পদ্মরাগ’ উপন্যাসে সিদ্দিকা ও সৌদামিনীর নিগ্রহের কাহিনি তিনি সমান দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কল্পিত ‘তারিনী-ভবনে শুধু যে নানা জাতি, নানা ধর্ম এবং নানা শ্রেণীর লোক আছে (বেগম রোকেয়া, রো,র, ৪১১)। তাই নয়, সেখানে- কি সুন্দর সাম্য।- মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলেমিশিয়া কার্য করিতেছে। (ঐ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, রো,র, ৩২৯)। একজন নারী হয়ে বেগম রোকেয়া সার্বজনীন দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে অসাম্প্রদায়িক কার্যক্রমে যে অবদান রেখে গেছেন বিশ্বায়নের যুগে এসে আমরা যদি তাঁর আদর্শের উত্তরসূরী হয়ে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একে অপরকে অভিন্ন চেতনা গ্রহণ তৈরি করতে পারি তাহলে বেগম রোকেয়ার আদর্শের উত্তরসূরি বিনির্মাণে আর কোনো বাধা থাকবে না। তখনই সাম্প্রদায়িক বিষবাপ্প আর কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

সাহিত্যচর্চা

ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান না থাকলে সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। বেগম রোকেয়ার মধ্যে বাল্যকাল থেকে সেই ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল। বাড়িতে বসে বসে সেই জ্ঞানসাধনা অর্জনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য পড়ে তিনি ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *নবপ্রভা* পত্রিকায় ছাপা হয় ‘পিপাসা’। বিভিন্ন সময়ে তার রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা *সুলতানাজ ড্রিম বা ‘সুলতানার স্বপ্ন’* মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। সবাই তার রচনা পছন্দ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটে স্বামীর অনুপ্রেরণায়। ১৯০২ সালে পিপাসা নামে একটি বাংলা গল্প লিখে সাহিত্যজগতে তাঁর অবদান রাখা শুরু হয়। এরপর একে একে লিখেন *মতিচূর-এর প্রবন্ধগুলো* এবং *সুলতানার স্বপ্ন-এর মতো নারীবাদী বিজ্ঞান কল্পকাহিনি*।

সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। যে যুগে তিনি সৃজনশীল লেখনী ধারণ করেছিলেন সে যুগে একজন নারীর কাছ থেকে তা আশা করা কঠিন ছিল। এ পরিস্থিতিতে একজন আলোকিত নাকি রক্ষণশীল পরিবারের মেধাবী নারী হিসেবে ক্ষুরধার লেখনী প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর লেখাগুলো- *নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, নারী, ভারত নারী, আল এসলাম, নওরোজ, মাহে নও, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে *নবনূর পত্রিকায়*। মতান্তরে, তাঁর প্রথম লেখা ‘পিপাসা’ (মহরম) প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯০২ সালে, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩০৮-১৩০৯ (যুগ্মসংখ্যা) *নবপ্রভা পত্রিকায়*। সমকালীন সাময়িকপত্রে মিসেস আর.এস হোসেন নামে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতো।

বেগম রোকেয়ার সমগ্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার কুফল, নারী শিক্ষার পক্ষে তাঁর নিজস্ব মতামত, নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা এবং নারীর অধিকার ও নারী জাগরণ সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক ধ্যানধারণা। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তাঁর লেখনী ছিল সোচ্চার। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুরবস্থা এবং দৈহিক ও মানসিক জড়ত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় যে শিক্ষা এ ধারণাই রোকেয়া তুলে ধরেন তীক্ষ্ণ ভাষায় ও তীর্থক ভঙ্গিতে। এক প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনের দুর্দশার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তাঁর বহু প্রবন্ধ ও নকশাজাতীয় রচনায়।

ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও শ্লেষাত্মক রচনায় বেগম রোকেয়ার শৈলী ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উদ্ভাবনা, যুক্তিবাদিতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর রচনার সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়। সমকালীন যুগের বিদ্যানুরাগী সমাজহিতৈষী পুরুষ এবং নারীদের নিকট থেকে বেগম রোকেয়া নানাভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁকে উৎসাহিত করেন স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য। *সওগাতের* সঙ্গে বেগম রোকেয়ার সম্পৃক্ততা ছিল নিবিড়। এ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার (অগ্রহায়ণ ১৩২৫) প্রথম পৃষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার ‘সওগাত’ কবিতাটি ছাপা হয়। এছাড়া তাঁর বহু প্রবন্ধ ও কবিতা *সওগাত* এ প্রকাশিত হয়।

বেগম রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য রচনার *Sultana's Dream* (নকশাধর্মী রচনা, ১৯০৮), *পদ্মরাগ* (১৯২৪), *অবরোধবাসিনী* (নকশাধর্মী গদ্যগ্রন্থ, ১৯৩১) প্রভৃতি। এছাড়া আছে অসংখ্য প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা, ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও অনুবাদ। *Sultana's Dream* গ্রন্থটি রোকেয়া নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেন *সুলতানার স্বপ্ন* নামে। এটি একটি প্রতীকী

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

রচনা এবং এতে বর্ণিত Lady Land বা নারীস্থান মূলত বেগম রোকেয়ারই স্বপ্নকল্পনার প্রতীক। মতিচূর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতি গ্রন্থে বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক স্বপ্নই এক অভিনব রূপ পেয়েছে। মতিচূর ২য় খণ্ডে আছে ‘সৌরজগৎ’, ‘ডেলিসিয়া হত্যা’ (মেরী করেলী রচিত The Mussalman, Indian Ladies Magazine ১৮৯৬ উপন্যাসের গল্পাংশের অনুবাদ), ‘জ্ঞান ও ফল’, ‘নারী ও সৃষ্টি’, ‘নার্স নেলী’, ‘মুক্তি ও ফল’ প্রভৃতি গল্প ও রূপকথা।

বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। সে যুগের অভিজাত শ্রেণির মুসলমানদের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু রোকেয়া উপলব্ধি করেন যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের ভাষা বাংলা। তাই বাংলা ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করে এই ভাষাকেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে বেগম রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

বিদুষী নারী বেগম রোকেয়া এক অনন্য প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। সাহিত্যচর্চা, শিক্ষাবিস্তার ও প্রথম মুসলিম নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা- এই তিন ধারায় তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। শত বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়েছেন। হতভাগ্য মুসলমান সমাজে বেগম রোকেয়া এক বিরল প্রতিভা। এই প্রসঙ্গে মো. আবদুল হাই বলেন, রবীন্দ্রযুগে যে কয়জন মুসলিম মহিলা বাংলা সাহিত্যে সাধনা করেন, বেগম রোকেয়া তাদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ।

বেগম রোকেয়ার অসামান্য উক্তি

প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতা পুরুষ-নারী সবাইকে আলোকিত ও দীপ্তিমান করে না শুধু; শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগে যুগে মানুষকে জাগিয়ে তোলার পথ দেখায় মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া তাঁর সৃজনশীল মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নারী জাতির জাগরণের ক্ষেত্রে শুধু নয় পুরুষদের নীতি- নৈতিকতার উন্মোখে তাঁর বাণী আদর্শ স্থানীয় তাঁর এ অমূল্য বাণী সকলের জ্ঞাতার্থে প্রণীধানযোগ্য।

১। সর্ব অঙ্গেই ব্যাথা, ওষুধ দিব কোথা।

২। শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে তখনই মাতা বলেন, ঘুমা শিগগির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু! ঘুম না পাইলেও শিশু অন্তত চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখন উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে, ঘুমাও ঘুমাও! ওই দেখ নরক! মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্তত আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।

৩। বাস্তবিক অলংকার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলংকারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য বর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কী কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে?

৪। আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপ? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্য তাহাই।

৫। দেহের দুটি চক্ষুস্বরূপ, মানুষের সব রকমের কাজ কর্মের প্রয়োজনে দু’টি চক্ষুর গুরুত্ব সমান।

শিক্ষা লাভ করা সব নর নারীর অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের সমাজ সর্বদা তাহা অমান্য করেছে।

৬। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অলস বদনে ক্ষমা করিয়া থাকে। কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির দোষ ঐ শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে স্ত্রী শিক্ষাকে নমস্কার!

৭। আমরা উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকর্মে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?

৮। কার্যক্ষেত্রে পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সন্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ টাকা বেতন পায় ঠিক সেই কাজ স্ত্রীলোকে করিলে ১ টাকা পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ টাকা আর চাকরানীর খোরাকী ৩ টাকা।

৯। ভগিনীরা! চুল রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বলো মা! আমরা পশু নই; বলো ভগিনী! আমরা আসবাব নই! বলো কন্যে আমরা জড়োয়া অলংকার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো আমরা মানুষ। না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগিবে না।

১০। আমরা পুরুষের ন্যায় সম্যক সুবিধা না পাইয়া পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

১১। কন্যারা জাতিত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব।

বেগম রোকেয়ার প্রতিটি বাণী মানব জীবনদর্শন ও জীবনমুক্তির পথের সন্ধান দেয়। বিশেষ করে নারীদেরকে পিছিয়ে রাখার যে প্রবণতা তার থেকে বের হয়ে আসা এবং ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী বাণী বললেও অতুষ্টি হবে না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

যে-কোনো মানুষ মহৎ ও মহান হয় স্বীয় চারিত্রিক গুণে। জীবনের অনেক কিছু স্নান হয় কিন্তু নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মানবিক গুণে যিনি দীপ্তিমান সেই জীবন হয় নন্দিত, বরণ্য ও প্রাতিস্মরণীয়। বেগম রোকেয়া সেই আদর্শের অনন্য প্রতিভা ছিলেন। নম্রতা, ক্ষমাগুণ, অপারিসীম ধৈর্য, অতিথিপরায়ণ, প্রতিব্রতা, পিতৃসেবা এবং নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্যকর্মে তিনি ছিলেন আন্তরিক। এসব মানবীয় গুণে গুণান্বিত বেগম রোকেয়া সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে আদর্শ মা অন্যদিকে মানবপ্রেমী ও নারীবাদী চেতনাকে আমৃত্যু লালন ও ধারণ করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি মুখে যা বলেন তা তিনি আদায় করে ছাড়তেন। কষ্ট হয়েছে কিন্তু বিফল হন নি। তাঁর চাহিদা ছিল না বরং তিনি ত্যাগী ছিলেন। নির্লোভ ও নির্মোহ চেতনা তাঁকে অনেক বড় এবং গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে। এগুলোই হলো মানুষের মানবিক গুণাবলি। এখানে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য চরিত্রের নারী এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর এ মহান জীবনচরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মানব জীবন দুর্লভ। এর চেয়েও দুর্লভ হচ্ছে কৃতজ্ঞ এবং কল্যাণমিত্র মানুষ পাওয়া। জীবনের সর্বক্ষেত্রে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া জীবনের সফলতা পাওয়া যায় না। যাঁদের কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে এতটুকু দীপ্তিমান ও সফলতা অর্জিত হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিবেকবান মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। অকৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমাজ ও দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বিদুষী নারী বেগম রোকেয়া যাঁদের সহায়তায় জ্ঞানালোক প্রাপ্তি হয়েছেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক কর্মকাণ্ডে সহায়ক হিসেবে যাঁদের পেয়েছেন তাঁদের প্রতি তিনি

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

আমৃত্যু কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করেছেন বিশেষ করে বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বোন করিমুন্নেসার প্রতি। এমনকি স্বামীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

ক) দাদা! আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না, পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়, আমি কেবল তোমাকেই জানি: (বেগম রোকেয়া, রো. র, ঐ, ৩১৯)।

খ) আপাজান! আমি শৈশব তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ-পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিল। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব (বেগম রোকেয়া, উৎসর্গপত্র, মতিচূর (২য় খণ্ড), রো. র, ঐ, ৭৬)।

গ) আমাকে সাহিত্যচর্চায় তিনিই (করিমুন্নেসা) উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না। (লুকানো রতন, ঐ, ২৮৮)।

মৃত্যু

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে অপরূপ একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম এবং ১৯৩২ সালে ৯ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু দিন। যুগে যুগে কিছু কিছু জ্ঞানতাপস, আত্মত্যাগী পুণ্যপুরুষ, সাধকশ্রেষ্ঠ ও মহামানবদের জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সার্বজন্যতাই অনেক আশ্চর্যজনক ও গভীর ভাবনার বিষয় নয় কি? মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার জীবন ইতিহাসেও জন্ম-মৃত্যুর তারিখটাও একই তারিখে। সেসময় তিনি ‘নারীর অধিকার’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন। তাঁর উত্তর পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অমলেন্দু দে আবিষ্কার করেন। বলা যায়, বহু কীর্তিমান মনীষীদের অমর স্মৃতি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে এটাই যে-কোনো জাতির জন্য দুঃসংবাদ। বেগম রোকেয়া নশ্বর দেহ ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর অসাধারণ নারী জাগরণের অবদান ও বহুমুখী কীর্তিকাহিনি বাংলার উর্বর ভূমিতে যুগে যুগে অম্লান হয়ে আছে এবং থাকবে অমর স্মৃতি হয়ে। এর পেছনে যিনি কাজ করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দূরদৃষ্টি ও বদান্যতায় বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে নারীদের ক্ষমতায়ন ও সুযোগ্য সুবিধা প্রদানে বিশ্বের ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্বরূপ। বঙ্গবন্ধু যেমন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্বাধীন বাংলাদেশে এনে ‘জাতীয় কবির’ মর্যাদাসহ যাবতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি বিদুষী নারী বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দিতে গিয়ে দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম রোকেয়ার নীতি-আদর্শকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ ‘রোকেয়া পুরস্কার’ প্রবর্তন করে নারী জাতির জাগরণের পথকে উন্মুক্ত করে আরেকটি নব ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই অপরূপ একটি মর্মবাণী সকলের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা সমীচীন মনে করি-

(প্রকৃতিরে) সুধাইনু “কি হল তোমার
সেই সৌন্দর্য আর সেই (বসন্ত) যৌবন?”
সহাস্যে উত্তর দিল সে, “ও প্রিয়তম!
আমি না ছিলাম, ছিল মহিমা স্রষ্টার।

(ড. কামরুল আহসান, ৪৮১)

তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে পরবর্তী সময়ে যেভাবে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে সেই বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরা সমীচীন মনে করি-

৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২। কলকাতার অদূরে সোদপুরে সমাধিস্থ। দৈনিক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় মৃত্যুসংবাদ। বাংলার গভর্নরের শোকবাণী প্রেরণ। অ্যালবার্ট হলে সভা। সভার উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি এবং আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম সভা। সভানেত্রী : লেডী আবদুর রহিম। মোহাম্মদী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। ১৯৩৭ : বেগম রোকেয়া সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো- শামসুননাহার মাহমুদের “রোকেয়া জীবনী”। ১৯৮০ : বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বেগম রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। বেগম রোকেয়ার নামে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ। ১৯৯৩ : ‘বেগম রোকেয়া মৃত্যুবার্ষিকী সম্মিলিত উদযাপন কমিটি ১৯৯৩’ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণভাবে রোকেয়ার মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন (সৈয়দ আবদুল মান্নান, ১০০)।

এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়াকে বাংলার মাটিতে চিরঞ্জীব করার ক্ষেত্রে যা যা কীর্তিকর্ম সৃষ্টি করেছেন তা সকলের জ্ঞাতার্থে প্রণিধানযোগ্য:

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

সমাজ ও জাতির উন্নয়নে যিনি বা যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের কীর্তিময় আনন্দের বার্তা কোনোভাবে ভোলা যায় না। রোকেয়া একজন নারী হয়ে শিক্ষা ও সাহিত্যজগতে ভূমিকার বিষয় সর্বজন স্বীকৃত। তাছাড়াও সমাজ সংস্কার এবং ধর্মোন্মত্ততা থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল প্রতিবাদী কণ্ঠ। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে বাংলাদেশ সরকার একটি গণউন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে পৈতৃক ভিটায় ৩ দশমিক ১৫ একর ভূমির উপর নির্মিত হয়েছে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র। এতে অফিস ভবন, সর্বাধুনিক গেস্ট হাউজ, ৪ তলা ডরমেটরি ভবন, গবেষণা কক্ষ, লাইব্রেরি ইত্যাদি রয়েছে। স্মৃতিকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের শিশু ও নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের শুভ উদ্বোধন করেন ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

বেগম রোকেয়ার বিশাল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি

৭ম বিভাগ হিসেবে রংপুর বিভাগের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ‘রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়’ ৮ অক্টোবর ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে ‘নারী জাগরণের অগ্রদূত’ হিসেবে তাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়টির বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করেন। উল্লেখ্য, নারীর নামে বাংলাদেশে প্রথম কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এটি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২টি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। ৩০ জন শিক্ষার্থী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাসিনুর রশীদ এবং আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। ৭৫ একর জমি নিয়ে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রথম উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান।

বেগম রোকেয়ার নামে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০-এর দশকে ছাত্রীনিবাস ‘রোকেয়া হল’ খোলা হয় যার নাম আগে ছিল ‘উইমেন্স হল’; তবে ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৮ সালে ‘চামেলি হাউজ’ নামে প্রথমে হলটি চালু হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ‘রোকেয়া হল’ নামে একটি হল স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যতদিন

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

বিদ্যমান থাকবে ততদিন মহীয়সী নারী রোকেয়ার নাম চির অমর হয়ে থাকবে। মহীয়সী বাঙালি নারী হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসনের জন্য আবাসিক হল *রোকেয়া হল* নামকরণ করা হয়। প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিনে বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা হয় এবং নারী উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট নারীদেরকে ‘বেগম রোকেয়া পদক’ প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে বেগম রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা একটি ‘শ্রোতা জরিপ’ এর আয়োজন করে। বিষয়টি ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? তিরিশ দিনের ওপর চালানো জরিপে শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০জনের জীবন নিয়ে বিবিসি বাংলায় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ২০০৪ এর ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত। বিবিসি বাংলার সেই জরিপে শ্রোতাদের মনোনীত ‘শীর্ষ বিশজন বাঙালির তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে আসেন বেগম রোকেয়া’। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদমাধ্যম বিবিসি কর্তৃক বিদূষী মহিলা বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণের বিশাল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বিশজনের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে নির্বাচিত করে বিরল সম্মানে সম্মানিত করেছেন। যা বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনে অতীব আত্মশ্রদ্ধার বিষয়।

বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম একজন পথিকৃৎ।

উপসংহার

নারী জাগরণের অগ্রদূত প্রবাদপ্রতীম বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম আজও বিশ্বের নারী জীবনে এক কিংবদন্তীতুল্য, অনুসরণীয়, অনুসরণযোগ্য এবং প্রেরণাদায়ী সত্তা। তাঁর সমাজসেবা, নারী শিক্ষার প্রসার, সাহিত্য-সাধনার ত্রিবিধ আয়োজনের সমন্বয় হয়েছে তাঁর মধ্যে। ধর্মে অনুমোদিত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। পুরুষের কাছে দয়া বা অনুগ্রহ শিক্ষা নয়, পুরুষের আধিপত্য ও দুঃশাসনের প্রতিবাদ করে অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনাবলিতে। স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি নির্দেশ করেন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বিচিত্র ঘটনাবল্ল জীবনে রোকেয়া নিরন্তর যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন। সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও বিপর্যয়কে যেমন তিনি মেনে নিয়েছেন, তেমনি বিজয় ও সফলতাও অর্জন করেছেন। মূলত তিনি একজন নারী হয়েও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ না করেও ঘরে বসে বসে পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে পিতা ও অগ্রজ ভাইবোনদের সাহচর্যে কঠোর অধ্যবসায়, গভীর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, প্রচেষ্টা জ্ঞানান্বেষী চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে সাধ্যমতো যা অর্জন করেছেন তা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। তাঁর অধীত বিদ্যা তৎকালীন পিছিয়ে থাকা নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে এনে সকলের অন্তরে জ্ঞানালোকে আলোকিত করে তুলেছিলেন বলে তিনি আজ নারী সমাজের পথ প্রদর্শক ও মাতৃতুল্য অভিভাবক। কথায় বলে:

“মা নাই গৃহে যার, সংসার অরণ্য তাঁর।

দেখলে মায়ের মুখ ঘুছে যায় সব দুঃখ”।

নারীপ্রেমী রোকেয়া আদর্শ মায়ের মর্যাদা লাভে ধন্য। সংক্ষেপে বলা যায়। তাঁর জীবনদর্শনে কোনো মোড়ক ছিল না, ছিল না কোনো লোক প্রদর্শনকারী উপাধি। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল একান্ত সহজাত, আন্তরিক। কথায় ও কাজে তাঁর

কোনো ফারাক ছিল না। তাঁর চিন্তা, মন ও জীবনযাপন ছিল একসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ। বাঙালি নারী জাতির অপ্রমেয় কল্যাণমিত্র রোকেয়ার মতো জীবন বড় দুর্লভ। অহংকার করে বলতে পারি, জীবিত বেগম রোকেয়া থেকে মৃত রোকেয়া অনেক বড়। সেজন্যই বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শন সর্বকালে বরণ্য-কালোত্তীর্ণ এবং সর্বকালে প্রাসঙ্গিক। নিম্নোক্ত কাব্যিক ছন্দটির মধ্যে তাঁর জীবন দর্শনের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়-

“স্বমস্ত জাতির জীবনে জাগানো বসন্তের শিহরণ
সমাজকল্যাণে স্বার্থ বলি দিয়ে রাখিয়াছে অবদান
কত ভ্রান্ত জনে সুপথে ফিরাল মানবতার অভিযানে
জীবন তাদের করিল ধন্য অসীম শান্তি নিকেতনে”
(বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন)।

“জয়তু নারী জাগরণের অগ্রদূত”

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
সুফী মোতাহের হোসেন, *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০১।
তাহমিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।
রোকেয়া রচনাবলী, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
মো: শামসুল আলম, *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা।
মোহাম্মদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।
বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত সভানেত্রীর অভিভাষণ, অগ্রস্থিত প্রবন্ধ।
সুবেহ সাদেক, অগ্রস্থিত প্রবন্ধ।

Edited by Patricia Waugh, *Literary Theory and Criticism*, Oxford University Press, first Indian edition, New Delhi, 2006.

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

ড. এফ, এম, এনায়েত হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার

অন্যান্য প্রাচ্যের জাতির ন্যায় বাঙালি জাতিরও রয়েছে দর্শন চিন্তার এক গৌরবময় ইতিহাস। বাঙালির রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাস যেমন যুগে যুগে বিদেশি শাসক দ্বারা পরিচালিত ও কলুষিত হয়েছে, তেমনি বাঙালির সমাজ ব্যবস্থা স্বাধীন বিকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে বার বার হেঁচট খেয়েছে, যার ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রথমে আর্য প্রভাব এবং পরবর্তীকালে তুর্কী-পাঠান-মোগলদের প্রভাব এবং পরাধীনতার শেষ সময়ে পাকিস্তানীদের কবলে পড়ে বাঙালি জাতির মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহ বিপর্যয় কাটিয়ে কখনও স্বাধীনভাবে, আবার কখনো মুক্ত মনে বিকশিত হয়েছে। বিদেশি ভাবদর্শ গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে কখনো কখনো বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা উজ্জীবিত হয়েছে; আবার নিজ ভাবধারার সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাঙালির মনুষ্যত্ব যুগে যুগে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়েছে। এভাবে, বাঙালি তার নিজ সত্তাকে অক্ষুণ্ন রেখে রচনা করেছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি মনন চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস। সমাজের এই যে বহুমাত্রিক দর্শন তা কেবলমাত্র বাঙালিদের মধ্যেই লক্ষণীয়। বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা, সমাজ-সভ্যতা-শিক্ষাভাবনা, মনন-সংস্কৃতি, এমনকি দার্শনিক ভাবনা অন্যান্য জাতির চিন্তা-চেতনার তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রমধর্মী। যেহেতু, বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে নানান জাতির রক্ত ও বর্ণের সংমিশ্রণে, সেহেতু বাঙালির দর্শন ভাবনায়ও নানান জাতি-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যা ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে। উল্লেখ্য, বাঙালি জাতির এ বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে তাদের উদ্ভাবিত ও বিকশিত স্বকীয় দর্শন তথা বাঙালির দর্শনে।

*অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১.১. ভূমিকা

মূলত বাঙালি জাতি গড়ে তোলে বাঙালি সমাজ। আর বাঙালি জাতি বলতে সেই জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বা ঘরোয়া ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। আদিকাল থেকেই বাঙালি জাতি ও বাঙালি সমাজের মধ্যে দার্শনিক জিজ্ঞাসা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতি যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবন ও জগতের আদি ইতিহাস জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছে, যা ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। যুক্তিপ্ৰবণ বাঙালি জাতি কোনো ধারণা বা বিশ্বাসকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে বরং মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার আলোকে সেই ধারণা বা বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালায়। যথার্থ দর্শনের লক্ষ্য হলো বোধ বা উপলব্ধিকে প্রমাণযোগ্য করা এবং যুক্তিপ্ৰসূত সত্যকে প্রচারযোগ্য ও বিনিময়ক্ষম করা। এ অর্থে প্রকৃত দর্শনমাত্রই যুক্তির আলোকে দেখা বা কোনো ধারণা বা বিশ্বাসকে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে তা খতিয়ে দেখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। প্রকৃতিগত দিক থেকে বাঙালির দর্শনের বৈশিষ্ট্যও এর ব্যতিক্রম নয়। কাজেই, বাঙালির দর্শনচর্চার ধারা অনুসন্ধানের জন্য এর আদি ইতিহাস জানার ও দার্শনিক ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন যা এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতি হিসেবে বাঙালি যেহেতু শংকর সেহেতু এ জাতির দার্শনিক পরিচয় জানা আমাদের একান্ত কর্তব্য। পৃথিবীর সকল যুগেই দার্শনিকগণ জীবন ও জগতের রহস্য উদ্ভাবনে ছিলেন তৎপর। দার্শনিকগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় অপরাপর নির্দেশ বা উপদেশের ওপর নির্ভর না করে নিজের বিবেক ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে যে কোনো প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধানে ব্রতী থাকেন। দর্শনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দার্শনিকরা তাঁদের জগৎ ও জীবন বিষয়ক মতবাদের জন্য যতটুকু শ্রদ্ধা ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তার চেয়ে বেশি করেছেন সমস্যাবলির স্বাধীন বিশ্লেষণ ও তার সমাধান কৌশল উদ্ভাবনের জন্য। বাঙালির দর্শন বাঙালির চিন্তন, মনন, আচার-আচরণ, লৌকিকনীতি বা নৈতিকতা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আবেগ, অভিজ্ঞতা তথা বাঙালির বহুমাত্রিক চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করে এবং এ সব আলোচনার মাধ্যমেই বাঙালি তার আসল রূপ পরিগ্রহ করে যা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত পরিচয়ে এ সত্যতার প্রমাণ মেলে। অনুসন্ধানে দেখা যায় আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, নিগ্রোটো, অস্ট্রিক, আলপাইনীয়, হাবসি, মঙ্গোলীয়, পর্তুগিজ, আরাকানি, মোগল, পার্সিয়, ব্রিটিশ, এশীয়, ইউরোপীয় নানান জাতির বণিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়সহ বহু জাতির রক্তের ধারা বাঙালির রক্তে সংমিশ্রিত হয়েছে। এসব শংকর জাতিগোষ্ঠী কীভাবে বাঙালি জাতি ও বাঙালির দর্শনে বহুমাত্রিকতা এনে দিয়েছে তা উদ্ঘাটন বর্তমান প্রজন্মসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালির দর্শন বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় কাটিয়ে কখনো ক্ষীণভাবে আবার কখনো বিস্তৃত পথ ধরে বিকশিত হচ্ছে। বৈদেশিক ভাবধারা গ্রহণ করে, বিদেশিদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভাবধারার সাথে বৈদেশিক ভাবধারার সংশ্লেষণ ঘটিয়ে বাঙালির মনুষ্যত্ব সাধনার ধারা যুগে যুগে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হচ্ছে,

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

যার অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী। মধ্যযুগে আর্য ভাবধারার প্রভাবে ও আরব-ইরান থেকে আগত ইসলামের প্রভাবে বাঙালির মনোজগত ও দর্শন সমৃদ্ধ হয়েছে, যা গবেষণার দাবী রাখে। তাছাড়া আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের বিশেষ অংশ হিসেবে বাঙালির দর্শনের গুরুত্ব মূল্যায়নেরও প্রয়াস রয়েছে এ প্রবন্ধে।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (synthetic method), বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (analytical method) ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বই, পুস্তক, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, বাঙালির দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণী পদ্ধতির (analytical method) সাহায্যে বিশ্লেষণ করে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রবন্ধটিতে গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) উভয় ধরনের পদ্ধতিই অনুসরণের প্রয়াস রয়েছে।

১.৪. বাঙালির দর্শনের ঐতিহাসিক বিবর্তন

একথা অনস্বীকার্য যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে দর্শন চর্চা হয়ে আসছে এবং বলা যায় গ্রীক দর্শনের ন্যায় এ দর্শনের ইতিহাসও বেশ পুরোনো। বাংলাদেশে প্রবর্তিত লোকায়ত, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ ও আর্য-অনার্য দর্শন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেদ, প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে চার্বাক লোকায়তের কথা উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে লোকায়ত দর্শন চর্চা আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে তা সাধারণ মানুষের মাঝে পরিব্যপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল গঙ্গাপথে; প্রথমে উত্তরবঙ্গে এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই, বাঙালির জাতিসত্তা নিরূপণে বৌদ্ধ চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির একটি প্রভাব রয়েছে। সাম্যবাদিতা ও জীবনমুখীতার জন্য বৌদ্ধ দর্শন বাংলায় বেশ জনপ্রিয়। একথা অনস্বীকার্য যে, আর্যদের দ্বারা এ দেশে ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিকাশ ঘটে। এই অধ্যাত্মবাদ আবার চার্বাকদের দ্বারা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। তাছাড়াও এ অঞ্চলে বিভিন্ন অধ্যাত্মবাদী দর্শন তার শাখা-প্রশাখাকে প্রসারিত করে বাংলাদেশ দর্শনের গুরুত্বকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম কখন মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল তা বলা বেশ মুশকিল। তবে আদিযুগে প্রস্তর নির্মিত যেসব অস্ত্র ব্যবহৃত হত সেগুলোই আদি যুগের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রাচীনযুগে মানুষ যেসব অস্ত্র ব্যবহার করত পরবর্তীকালে এসব অস্ত্র পালিশ ও সুসংগঠিত করে মানুষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করছে। ইতিহাসে এ যুগকে বলা হয় যথাক্রমে

প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগ। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর যুগের এমনকি তাম্রযুগেরও অস্ত্রসস্ত্র পাওয়া গেছে।^১ বাংলার বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীর দেহের গঠন, বিশেষ করে কেশ, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ব্যাখ্যা করে বলা যায় এ অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তবে এটা সত্য যে, সকল জাতিগোষ্ঠীর দেহের অবয়ব ও মানদণ্ড সমানভাবে গৃহীত হয়নি। ফলে, বাঙালির জাতিগত দার্শনিক অনুসন্ধানে বাঙালি জাতিকে মোটামুটি তিনটি যুগে বিন্যস্ত করা যায়। যথা

১. প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন যুগ;
২. বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন ও
৩. আধুনিক যুগ।

১. প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন যুগ

খ্রিস্টপূর্ব যুগে প্রতীচ্যে মানবকেন্দ্রিক দর্শনের প্রথম শুভসূচনা ঘটে সোফিস্টদের চিন্তাধারায়।^২ দার্শনিক আলোচনাকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর করে তুলতে সোফিস্টরাই প্রথম মানবকেন্দ্রিক দর্শন রচনার ভিত মজবুত করেন। সোফিস্টরাই বলেন, মানুষই সকল কর্মকাণ্ডের পরিমাপক (Man is the measure of all things)। মানুষের রয়েছে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের ক্ষমতা। কোনো বিশ্বাস জোরপূর্বক মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয় বলে তাঁরা মনে করেন। গুপ্তযুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস তেমন একটা পাওয়া যায় না। ভারতীয় ও বিদেশী সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত উক্তি হতে এ সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা মেলে বটে, তবে এর কোনো সুনির্দিষ্ট দিন, তারিখের উল্লেখ নেই।^৩ তবে মহাভারতে বঙ্গদেশের কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের যেসব ভূখণ্ড বিংশ শতকের পূর্বে বঙ্গদেশ বলে পরিচিত ছিল প্রাচীন হিন্দুযুগে এর কোনো নাম ছিল না। উল্লেখ্য, এর বিভিন্ন অংশের নাম ছিল এবং তা ছিল অধিকাংশই বিভিন্ন যুগের রাজ্যের নাম অনুসারে। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে সেকালের বঙ্গ দেশ একটি রোগাক্রান্ত রাজ্য ছিল যা সমসাময়িক বিভিন্ন গ্রিক লেখকদের বর্ণনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। যুগে যুগে এর সীমা ও আয়তন পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে।^৪ গ্রীকরা ‘গঙ্গরিডাই’ বা ‘গঙ্গরিডাই’ নামে যে এক পরাস্ত জাতির উল্লেখ করেছেন তারা যে আদি বঙ্গদেশের অধিবাসী এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। গঙ্গা নদীর যে দুটি শ্রোত এখন ভাগিরথী এবং পদ্মা বলে পরিচিত তার উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

গঙ্গরিডই জাতির বাসস্থান ছিল।^৫ প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন লেখায় উল্লেখ আছে যে, পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোনো রাজা বাঙালি ছিলেন কি-না তা নিশ্চিত নয়, তবে এ সময়ে বাঙালি রাজারাই যে অধিক শক্তিশালী ছিলেন এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১.১. মৌর্য সাম্রাজ্য: ইতিহাসে প্রমাণ মেলে বাংলা নামক ভূখণ্ডটি মৌর্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্য বংশের পতনের পর হতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (আনুমানিক ১৮৫ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ হতে ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত পাঁচশত বছরের মধ্যে পূর্ব ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কোনো ঐতিহাসিক দলিলের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে এ যুগে গ্রীক ও রোমান লেখকরা গঙ্গরিডই সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায়, এটি একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এ যুগেই গ্রীক সভ্যতা, দর্শন ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রাচীনযুগে দর্শনের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আবির্ভূত হন দার্শনিক প্লটিনাস। তিনি বলেন, এক পরিপূর্ণ শক্তি সমগ্র সৃষ্টি লীলার ভিত্তিমূলে কাজ করে চলছে।^৬ প্লটিনাসের এ দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি দর্শনের পরলোক বা মরমীবাদী চিন্তাধারা প্রবর্তনে সহায়তা করেছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ হলো ঈশ্বরের অনুধ্যান এবং ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা স্থাপন। প্রাচীনযুগের প্লটিনাসের এ ভাবনা বাঙালির দর্শনকে প্রভাবিত করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১.২. গুপ্তযুগ: খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত বংশের রাজারা ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ দিকপাল চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ও পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিভিন্ন রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র রচনা করেন। এ বংশের শাসকগণ প্রায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ বাঙালির দর্শনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। পাল ও চন্দ্ররাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমতট অঞ্চলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুর ও মহাস্থানে এবং দক্ষিণ বিহারের উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধ দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। গুপ্তভোরকালে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষের কিছু অংশে রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলায় দুটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। প্রথমটি প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। এটিই প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য নামে পরিচিত ছিল।^৭ দ্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য ছিল পশ্চিম ও উত্তর বাংলাব্যাপী যা সাধারণভাবে গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত। আদি বাংলার এসব অঞ্চলে খণ্ডিত আকারে হলেও বাঙালির দর্শন চর্চা শুরু হয় এবং ক্রমাগত তা এগোতে থাকে।

১.৩. স্বাধীন বঙ্গরাজ্য: ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে সমগ্র উত্তর ভারতে যশোধারবর্মন তাঁর রাজ্য ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটাতে প্রয়াসী হন। তিনি পূর্ব দিকের ব্রহ্মপুত্র নদ হতে পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত রাজ্যের সীমা বিস্তৃতি ঘটান। ইতিহাসে প্রমাণ মেলে, যশোধারবর্মনের শাসনকাল খুব বেশি স্থায়ী না হলেও এ সময়েই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য হতে থাকে। এ সময়ে এ উপমহাদেশে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার নামক তিন রাজার তাম্র শাসনের উল্লেখ আছে। এ সময়ের বিভিন্ন তাম্রলিপি হতে পাওয়া তথ্যাদি বাঙালির দর্শনের গোড়াপত্তনের মূল রহস্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করে।

১.৪. স্বাধীন গৌড় রাজ্য: গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ‘পরবর্তীতে গুপ্তবংশ’ বলে পরিচিত গুপ্ত উত্তরাধিকারী রাজাগণ উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশে ও মগধে রাজ্য বিস্তার করেছিল। এদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন তৎকালীন বাঙালির জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ অঞ্চল গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। গৌড় বলতে অনেক সময় বাংলাভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বোঝানো হতো এবং এঁদের দার্শনিক জিজ্ঞাসা বাংলার মানুষকে আপ্ত করেছিল ব্যাপকভাবে। আদি গৌড় অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণই (শশাঙ্ক থেকে পালযুগ পর্যন্ত) এর ব্যাপকতার প্রধান কারণ।^৮ অবশেষে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে শশাঙ্ক স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই বলা যায়, সে সময়কার বিভিন্ন শিলালিপি বাঙালির দার্শনিক পরিচিতি উদ্ঘাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১.৫. শশাঙ্ক: বাঙালি রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই ছিলেন প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি শুধু গৌড়ের সার্বভৌম ক্ষমতারই অধিকারী ছিলেন না বরং গৌড় রাজ্যের সীমা মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি করে সে সময়কার দর্শনের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এমনকি উত্তর ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি অঙ্গনে হস্তক্ষেপ করার মতো প্রচুর শক্তিও তিনি অর্জন করেন। তাঁর নেতৃত্বেই সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ‘বাংলাদেশ’ নামক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং বীজ বপন করা হয় বাঙালির দর্শনের।^৯ কাজেই, শশাঙ্ককে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ নরপতি বলা হয়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যে সব পাল রাজা এ অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁরা হলেন, গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, শূরপাল, বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল, মহেন্দ্র পাল, রাজ্যপাল প্রমুখ। পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় বিভিন্ন রাজবংশ তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচার করেন বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের। এঁদের মধ্যে চন্দ্রবংশ ও ধর্মরাজবংশ বিশেষভাবে

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

উল্লেখযোগ্য। পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে ভারতীয় উপমহাদেশে সেন রাজারা তাঁদের ক্ষমতার ভিতকে শক্ত করেন। এ বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন, কেশব সেন প্রমুখ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রমপুর অঞ্চলে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেব রাজবংশের উত্থান ঘটে।^{১০} দেব রাজবংশই এ অঞ্চলের শেষ হিন্দু রাজবংশ। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই এ অঞ্চলে মুসলমান শাসকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; উত্থান ঘটে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের। সুলতানী আমলে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবনে বতুতা। তিনি ১৩৩৩ সনে এ অঞ্চলে আগমন করে দীর্ঘ নয় বছর অবস্থান করেন। এ সময়েই এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেতে থাকে এবং বাঙালিরা বিভিন্ন দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগে নিজ দর্শন প্রচারেরও সুযোগ পান।^{১১}

২. বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী। এ সময়ে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের পাশাপাশি বহু জায়গায় মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ প্রভৃতি তৈরি করা হয়। বখতিয়ার খিলজীর শাসনের পর এ অঞ্চলে তুর্কি শাসন, বলবনী শাসন, স্বাধীন সুলতানী আমল, ইলিয়াস শাহী শাসন, হাপসী শাসন, আফগান শাসন এবং সবশেষে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর কালক্রমে বাংলায় শাসন করেন সুবেদার শায়েস্তাখান, সুবেদার ইব্রাহীম খান, মুর্শিদকুলী খান, নবাব সুজাউদ্দিন খান, সরফরাজ খান, নবাব আলীবর্দী খান ও সবশেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলেই বাংলায় পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর বাংলা পুরোপুরি চলে যায় ইংরেজদের দখলে এবং তারা প্রায় দু'শত বছর ধরে এ অঞ্চল রাজত্ব করতে থাকে।^{১২} এ সময়ে পাশ্চাত্যের বহু দার্শনিক তত্ত্বধারা বাংলায় অনুপ্রবেশ করে, ফলে এ অঞ্চলে নিজস্ব দর্শন সৌধ গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, বাঙালিরা পাশ্চাত্য থেকে আসা তত্ত্বধারাসমূহ যেমন উপযোগবাদ, মানবতাবাদ, মার্কসবাদ, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ পুরোপুরি বর্জন করেনি, বরং এসব ধারা আধুনিকযুগে হলেও বাঙালির দর্শন বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, দার্শনিক সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এক্ষেত্রে উঁচু শ্রেণির মুসলমানরা নেতৃত্ব দান করেন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশদের সহযোগিতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা লাভ ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলার মুসলমানরা বাংলাভাষী শিক্ষা

গ্রহণ ও তা প্রসারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, প্রভৃতিতে বিরাট সাফল্য অর্জন করে রচনা করে বাঙালির দর্শন।^{১৩}

৩. আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থা এ দেশের সকল শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করতে না পারলেও অনেক হিন্দু জমিদার তাদের সাথে আঁতাত করে, ফলে এ অঞ্চলে হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন চর্চা প্রভৃতিতে এগিয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং এ অঞ্চলের মানুষকে নানাবিধ উৎকোচ দিয়ে তারা তাদের সুযোগ সুবিধা আদায় করতে থাকে। ১৮৭০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ অঞ্চলের অফিস-আদালতসহ সর্বত্র নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে এবং এ দেশীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে একপেশে করার চক্রান্ত করে।

৩.১. ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন: পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গদেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।^{১৪} তাছাড়া, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে প্রথম থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছিল বিভিন্ন সংস্কারবাদী আন্দোলন। এগুলোর মধ্যে উত্তর বঙ্গের ফকির সন্যাসী-বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, বালকী শাহের বিদ্রোহ, আগা মোহাম্মদ রেজার বিদ্রোহ, পাগলপত্নী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় আগমন ঘটে দু'জন যুগান্তকারী মনীষীর; এঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় ও হাজী শরীয়তুল্লাহ। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে 'এক ঈশ্বরবাদী' দর্শন রচনা করতে প্রচেষ্টা চালান। অন্যদিকে, হাজী শরীয়তুল্লাহ ইসলামের আদি নির্যাস (essence) গ্রহণ করে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুসংস্কারসমূহ দূর করতে ছিলেন সদা সচেষ্ট।

৩.২. জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বাঙালির মুক্তির দর্শন: বাংলায় জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্ভব ঘটে ঊনবিংশ শতকে। এ সময়েই বঙ্গদেশ পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, কলাকৌশল, আচারনিষ্ঠা প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে। ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের শুভ সূচনা হয় তা পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ফল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, এ সময়েই বাঙালির মনে তথা সমগ্র বাংলায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। পরিবর্তিত হতে থাকে শুধুমাত্র ধর্মাশ্রিত মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার; গতানুগতিক রীতি-নীতির

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

পরিবর্তে দেখা দেয় যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির। এ ধারাবাহিকতায় ক্রমাগত আন্দোলন ও বাঙালির দাবীর মুখে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৭ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং সবশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।^{১৫} স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছে এ জাতির নিজস্ব দর্শন তথা বাঙালির দর্শনের।

১.৫. বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক ও ভাষাগত পরিচয়:

১.৫.১. বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, বেঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব। বাঙালি জাতির উপর আর্যদের প্রভাব ছিল নগণ্য, কারণ আর্যরা তৎকালীন বাংলায় খুব বেশি-দিন বসবাস করেনি। রিজলীর মতে, বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতি থেকে প্রাপ্ত, যা ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে। কাজেই বলা যায়, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীন ভারতীয় জাতির উদ্ভব। বাঙালির পূর্ব পুরুষেরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করে তখন বৈদিক আর্যগণ পূর্বদিকে গঙ্গানদীর উপত্যকায় অনেক দূরে এগিয়ে ছিলেন। কাজেই, বাঙালির পূর্বপুরুষগণ মধ্যভারতের সমভূমি (Table Land) পার হয়ে বঙ্গদেশে আসেন।^{১৬} এভাবেই, বাঙালি তাঁদের পূর্বসূরীদের দার্শনিক ভাবনা এদেশে প্রচার ও প্রসার ঘটান।

ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, বাঙালি শব্দের জাতি বলে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বহুমাত্রিক। এ অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবয়বগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নৃ-বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন যে, নিগ্রোইডো, আদি-অস্ট্রেলীয় ও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অধিক প্রভাব পড়ে বাঙালির জাতিসত্তায়। কোল, নিষাদ, সাঁওতাল, শরব, পুলিঙ্গ, মালপাহাড়, প্রভৃতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ আদি অস্ট্রেলীয়। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগামিজো, কুকি, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প সংখ্যক মঙ্গোলীয়। এছাড়াও, কালের প্রবাহে গৌড়, হুণ, কুলিক, কর্ণাট, শক, ইরানী, হাবসী, গ্রীক, তুর্কী, মুঘল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, প্রভৃতি রক্তের মিশ্রণ রয়েছে বাঙালির জাতিসত্তায়।^{১৭} প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদি অবস্থা থেকে শুরু করে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অদ্যাবধি বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন বিকশিত হচ্ছে; পরিবর্তন ঘটছে বাঙালির ভাষার, চলন-বলন এবং কর্মের।

আধুনিক ভারতীয় বহু পণ্ডিত বাঙালি জাতির নৃ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, ঐতিহাসিককালে মোটামুটি চার শ্রেণির নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাঙালি জাতির উদ্ভব। এদের মধ্যে প্রথমটি হলো উঁচু দেহ ও উঁচু মাথা বিশিষ্ট উত্তর ভারতীয় জাতি, যাদেরকে ভারতবর্ষে আগত আর্যদের আদি বংশধর বলে গণ্য করা হয়। উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। দ্বিতীয় নরগোষ্ঠীকে দ্রাবিড় মুণ্ডগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। বাংলায় তথাকথিত নীচু শ্রেণীর মধ্যে এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর প্রমাণ মেলে। গোল মাথাওয়ালা জাতি হলো তৃতীয় শ্রেণির নরগোষ্ঠী। এদের অন্য নাম হলো আলপাইনীয় নরগোষ্ঠী। এ জাতীয় নরগোষ্ঠী বাংলায় শিক্ষিত, ভদ্র সমাজে বেশি পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু, গুজরাট, মধ্যভারত, কর্ণাটক এবং অন্ধ্র প্রদেশে এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর প্রমাণ মেলে। চতুর্থ হলো মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী। এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত লেপচা, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজং, মুরং, খাশিয়া, মগ, ত্রিপুরা মিজো, প্রভৃতি নামে পরিচিতি লাভ করে।^{১৮} সাধারণত এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর সংখ্যাই এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। গুপ্তযুগে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, আর্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি এ সময়ে বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া, দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের পর থেকে কিছু সংখ্যক তুর্কী আরব পাঠান ও মুঘলদের সাথে বাঙালিদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এভাবেই মগ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতির রক্ত সঞ্চারণিত হয়েছে বাঙালির রক্তে। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু নরগোষ্ঠী ও জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। এসব জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকের কম-বেশি মিশ্রণ রয়েছে বাঙালির জাতিসত্তায়।^{১৯} বঙ্গদেশে প্রথম কখন মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে তা বলা মুশকিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদি যুগের মানব প্রস্তর নির্মিত যেসব অস্ত্র ব্যবহৃত হতো সেসবই আদি যুগের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। প্রাচীনযুগের মানুষ যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে তা গঠনে তেমন কোনো নতুনত্ব ছিল না বটে কিন্তু পরবর্তীতে এসব অস্ত্র পালিস ও সুগঠিত করে ব্যবহার করার প্রমাণ মেলে। এ যুগে বাংলার বাকুয়া, বর্ধমান, মেদেনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের তৈরি বিভিন্ন পুরোনো হাতিয়ার পাওয়া যায়, যা থেকে বাঙালির আদি নৃ-গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে।^{২০}

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, আদি অস্ট্রিকরাই এ দেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা; এরা মূলত ভূ-মধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী। এরা জলপথে বাংলায় প্রবেশ করে অথবা স্থলপথে দক্ষিণ উপকূল হয়ে বাংলার উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরে আধিপত্য বিস্তার করে এবং পরবর্তীতে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এঁরাই দ্রাবিড় নামে পরিচিত। এঁদের কিছু অংশ অস্ট্রিকদের সাথে

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

বসবাস করে। সময়ের পথ পরিক্রমায় পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উভয়ের রক্তের মিশ্রণ বাঙালির জাতি সত্তায় অনুপ্রবেশ করেছে।^{২১}

১.৫.২. প্রত্যেক জাতির রয়েছে নিজস্ব ভাষা। বাঙালিদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বাংলার প্রান্তিক ভাষা এবং এ ভাষা প্রাচীন ও মধ্যভাগ অতিক্রম করে বঙ্গ দেশে এসে মিশেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যস্তর থেকে ক্রমশ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আজ তার নিজস্ব রূপ ফিরে পেয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও এ উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় এ ভাষা দৈনন্দিন কাজ-কর্মে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালিরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন; শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মায়ের ভাষা বাংলাকে। এভাবে আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালি জাতি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে, রচনা করেছে নিজ ভাষায় তাদের নিজস্ব দর্শন।

এটা স্পষ্ট যে, কালের ধারাবাহিকতায় বাঙালির জাতিগত পরিচয় ক্রমশ বিবর্তিত হচ্ছে; বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর অন্তরভাব ও বহিরঙ্গ-অবয়বে এসেছে পরিবর্তন। বাংলা ভাষাকে তার কাল অনুসারে চার^{২২} ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- i. নব্যযুগ (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত);
- ii. মধ্যযুগ (১৩৫০ হতে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত);
- iii. সন্ধিযুগ (১২০০ হতে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত); এবং
- iv. প্রাচীনযুগ (৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত)।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কিংবা আদিম প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় গৌড়, অপভ্রংশ, মগধী প্রভৃতি ভাষা এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এসব ভাষা হতে মোটামুটি তিনটি ভাষা বহুল প্রচলিত দেখা যায়। যথা-১. পাশ্চাত্য বা ইরানিক ভাষা ২. মধ্যবর্তী বা দারদিক ভাষা এবং ৩. প্রাচ্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। ইরানিক হতে আবেস্তিক, প্রাচীন পারসিক, আধুনিক পারসি, পশতু প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়। দারদিক ভাষা হতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের যাবতীয় ভাষার উদ্ভব। এছাড়াও, আর্য ভাষার পূর্বে এ অঞ্চলে ছিল শতম ভাষা। এ ভাষা হতে আর্য ভাষা তিনটি ধারায় প্রবাহিত। যথা ১. বাল্টো স্লাভিক ২. আলবানিক ও ৩. আরমানিক। পরবর্তীতে বাল্টো স্লাভিক ভাষা প্রসারিত হয়ে বাল্টিক ও স্লাভেনিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। বাল্টিক ভাষা হতে প্রাচীন প্রুসীয়, লিমুয়ানীয় ও লেট ভাষার উদ্ভব হয় এবং স্লাভেনিক ভাষা হতে রুশ,

বুলগার, পোল, সাধ, ক্রোয়াট প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়।^{২৩} উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এসব ভাষার অস্তিত্ব তেমন একটা দেখা যায় না, যদিও এসব ভাষা ছিল বাংলার প্রাচীনতম ভাষার অন্তর্গত।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, বাংলা ভাষায় কমপক্ষে আড়াই হাজারের বেশি ফারাসি শব্দের মিশ্রণ রয়েছে। পারসিক, গ্রীক, তুর্কী, ফারাসি, আরবি ছাড়াও বাংলা ভাষায় একাধিক অনার্য ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বনিকদের প্রভাবে পর্তুগীজ শব্দ বাংলায় স্থান করে নেয়। এছাড়াও, ফারাসি ও ওলন্দাজদের প্রভাবে কিছু পাশ্চাত্য শব্দ বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে পশ্চিমাদের ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষাই মূলত বাঙালি ও বাংলা ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে বেশি। এর কারণ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাঙালি জাতি আধুনিক বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে সহজভাবে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন অনুশীলনে ইংরেজি ভাষা বাঙালির প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যার ধারা এখনো অব্যাহত আছে। ফলে, বহু ইংরেজি শব্দ বাংলার লিখিত এবং কথ্য ভাষায় স্থান করে নিয়েছে এগুলোর মধ্যে চর্চাগীতিকাগুলো অন্যতম।^{২৪} চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ মধ্য বাংলার পরবর্তীরূপের সুস্পষ্ট আদিস্তর নির্দেশ করে।

প্রাচীন বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দের প্রভাব প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, সংস্কৃত ভাষা ছিল প্রায় সমগ্র ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রধান বাহন। এ যুগে বাংলাভাষা অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করতেন। ফলে, প্রাচীনকাল থেকেই তৎসম ও অন্যান্য শব্দের প্রভাব বাংলা ভাষায় কম-বেশি দেখা যায়। এছাড়াও, ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের পর থেকে আরবি-ফারাসি ও তুর্কি ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষায় পড়েছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে মুসলিম শাসনামলে ফারাসি ভাষা রাজভাষা হওয়ায় এ ভাষার প্রভাবও বাংলার উপর পড়েছে বিস্তার। এ সময়ে মুসলমান শাসকদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তৎকালীন পণ্ডিতদের কথিত ‘গৌড় ভাষা’র শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, এবং এ সময়েই বাংলায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে যায়। মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফার্সির প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।^{২৫}

সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বাংলায় প্রথমবারের মতো গদ্যভাষার কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ শাসনামলে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার প্রভাব বাংলা

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

ভাষায় যুক্ত হতে থাকে। ১৮০১ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর বিভাগের প্রধান উইলিয়াম কেরী ও তাঁর সহযোগী বাঙালি পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা শুরু হয়।^{২৬} এছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্মের মূলতত্ত্বকে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে প্রাকৃত ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীতে উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা তার গতি সঞ্চর করে। তৎসম, তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে এ ভাষা হয়ে ওঠে সাহিত্য পাঠের যথার্থ বাহন হিসেবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিংশ শতকে কথ্য ভাষা লেখ্য ভাষায় উন্নীত হয় মূলত প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও অনেক প্রতিভাবান বাঙালিদের হাত ধরে।

আধুনিককালে বাংলা ভাষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে গদ্য ভাষার লিখন, প্রসার, উন্নয়ন ও এসবের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। উনিশ শতকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে বাংলা ভাষার (গদ্য ও পদ্য) উল্লেখযোগ্য মানোন্নয়ন ঘটে। সবশেষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) বাংলার চারটি প্রধান উপ-ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন, যথা রাঢ়, বঙ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্র। পরবর্তী সময়ে সুকুমার সেন (১৯৩৯) আরও একটু পরিবর্তন করে বলেন, রাঢ়, বাঙালি, কামরূপী, বরেন্দ্রী ও ঝাড়খণ্ড ভাষা বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানব ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী আবির্ভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।^{২৭}

১.৬. বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় দর্শন:

বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সাথে ধর্মবোধের রয়েছে এক গভীর সম্পর্ক। বাঙালি জাতির ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস ও নীতিবোধ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। এ জাতি সব সময়ই স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে, যা তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় স্বীকৃত। তাছাড়াও জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, মায়াবাদ, মোক্ষচিন্তা ও প্রেমতত্ত্ব বাঙালির মনে প্রভাব বিস্তার করেছে সবসময়। এসব ধর্মবোধ ও কর্মসাধনা বাঙালির জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাংখ্য, যোগ এবং তন্ত্র এই তিনটি দর্শন স্বতন্ত্রভাবে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাঙালির শিব ও ধর্ম ঠাকুর মূলত বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। শিবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাঙালি সমাজে একদিকে যেমন বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথপন্থী, বৌদ্ধ সহজিয়াসহ বিভিন্ন মতবাদের বিকাশ ঘটেছে, তেমনি সুফি মতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এ অঞ্চলে বিভিন্ন তাসাউফপন্থী দর্শনের বিকাশ

ঘটেছে বহুল পরিমাণে।^{২৮} বৌদ্ধ সহজিয়ার দোহা ও চর্যাপদ, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়া পদ, বাউল দর্শনের বাউল গীতি (অচিন পাখি), ধর্ম মঙ্গল, গোরক্ষ বিজয়, মনসা মঙ্গল, নূর নামা, তামিল নামা, যোগচিন্তামনি ইত্যাদি রচনাবলী এ অঞ্চলের বাঙালির ভাব দর্শনের সাক্ষ্য বহন করে। কেবলমাত্র প্রাচীন বা মধ্যযুগই নয় বরং আধুনিকযুগেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত বাঙালির মানস গঠনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এ ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন বাঙালির ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং আধুনিক বাঙালির ঐতিহ্য। বাঙালির এসব প্রাচীন ধর্মমত ও সংস্কৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণই বাঙালির দর্শনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালির জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতি একে অন্যের পরিপূরক। সাংখ্য, যোগতন্ত্র ও দেহতত্ত্ব, নারী দেবতা, পশু-পাখির পূজা, বৃক্ষ দেবতা ও জন্মান্তরবাদের ধ্যান-ধারণা থেকে বাঙালির হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে পুরোপুরিভাবে মুক্ত রাখা যায়নি। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম, হিন্দু, প্রভৃতি ধর্মমত গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বাঙালি কখনই বর্জন করতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না। এটাই বাঙালির বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সুর, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সংহতির মূর্ত প্রকাশ। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, এর মধ্যে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে খুঁজে বের করতে হবে বর্তমান প্রজন্মকে।^{২৯}

বাঙালির প্রাচীনযুগের ইতিহাস রচিত হয় জনপদভিত্তিক, মধ্যযুগের হয় অঞ্চলভিত্তিক, আর আধুনিকযুগের ইতিহাস হবে বাঙালির জাতিসত্তার চেতনা ও পরিচিতি ভিত্তিক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজবে জীবিকা পদ্ধতিতে এবং সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র দর্শনে; মধ্যযুগে খুঁজবে জীবন জীবিকার অরি মিত্রদের কল্পনায় ও বিদেশি প্রভাবে এবং আধুনিকযুগের ইতিহাসে সন্ধান করব ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতার নিরিখে। আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করলে, সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করলে বাঙালি জাতি উন্নতি করবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মপ্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ত্যাগ করে আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদের আদি উৎসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তাহলে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।^{৩০} কেননা, বাঙালি সংস্কৃতির আদি উৎস নানাবিধ মাহাত্ম্যে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। যে মানবতাবোধের উপর বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত তার যথাযথ লালন ও অনুশীলনের মধ্যেই বাঙালির সার্থকতা নিহিত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

১.৭. বাঙালির মনন বৈশিষ্ট্য ও দার্শনিক ক্রমবিকাশ:

সংস্কৃত ও পালি ভাষায় বাঙালির দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনচর্চার পরবর্তী সময়ে বাঙালির মনন সাধনার প্রথম প্রমাণ মেলে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ‘চর্যাগীতি’তে। এ গানের সুরের মধ্যে প্রাচীন বাঙালির সে সময়কার সমাজ ও জীবন জিজ্ঞাসার বাস্তব প্রতিফলন প্রস্ফুটিত। এ সময়ে বাঙালিরা শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর, শ্যালক-শ্যালিকা, বধু-সন্তান নিয়ে যৌথ পরিবারে একত্রে বসবাস করে যা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে বা অন্য কোনো সমাজে তেমনটা দেখা যায় না। অর্থাৎ, তখনকার সময় তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল দু’মুঠো মোটা চালের ভাত খেয়ে বাঁচা। এছাড়াও চর্যাগীতে উল্লেখ আছে, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিতি আবেশী।^{১১} দুঃখের এ হাহাকার অভাবগ্রস্ত বাঙালির এক মর্মস্পর্শী দিক। চর্যাগানে আরো উল্লেখ আছে, অভাবগ্রস্ত নারী চায় ভালো স্বামী, চায় ভালো সন্তান। সে চিন্তা করে সন্তান যেন বেঁচে থাকে অর্থ-বৈভবে; দুখে-ভাতে। অথচ, সে যা চায় তা সে পায় না। স্বামী হয় বেকার না হয় উদাসীন, সন্তান হয় বাউল। তৎকালীন গ্রাম বাংলার সামাজিক চিত্র এভাবে চর্যাগীতে বর্ণিত আছে; এভাবে প্রমাণ মেলে তৎকালীন গ্রাম বাংলার প্রাচীনতম দর্শনের। বাঙালিরা বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে বটে তবে তা নির্বিচারে নয় বরং জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম এমনকি ইসলাম ধর্মকেও তারা নিজ নিজ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছে।

বাঙালির মনন সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি ঐহিক জীবন প্রণালীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। বাঙালি মাত্রই যেন ঐহিক জীবন সন্ধানী। বাঙালিরা পাশ্চাত্য ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও তারা কোনো কিছুকেই অবিকৃত রাখেনি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও উপাসনাকে তারা তাদের নিজস্ব রুচি ও পছন্দানুযায়ী রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে।^{১২} এ যেন বাঙালির মনন সাধনার এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। নৈরাশ্রবাদী, ঈশ্বরবিমুখ বৌদ্ধধর্ম বাঙালি মানসে মন্ত্রযান-কালচক্রযান-বক্রযান-সহজযানে রূপ নিয়েছে। এভাবে, অন্যান্য পরধর্ম ও পরসংস্কৃতি বাঙালিরা তাদের মননে নতুন রূপে গ্রোথিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় বাঙালিরা স্বরূপ জীবনবাদী। জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ সব সময়ই বাঙালিরা কামনা করে আসছে।

এটা স্পষ্ট যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সমাজ বিজাতি ও বিদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হলেও নিজস্ব মনন সাধনার ব্যাপারে তারা সব সময়ই ছিল স্বতন্ত্র। জীবন ও জগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতি ধর্ম ও দর্শনচর্চা বিষয়ে বাঙালি বাইরের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও নিজ জাতিসত্তা এমনকি নিজ সংস্কৃতিকে পুরোপুরি বিকিয়েও দেয়নি। বাইরের সংস্কৃতির ভালো দিক গ্রহণ করে তার সাথে নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণসর চিন্তা-চেতনার সম্মিলন ঘটিয়ে সে উন্নততর কিছু রচনা করতে

চায়; চায় নতুন কিছু আবিষ্কার করতে। বলা প্রয়োজন যে, বাঙালির এ প্রাচুর্য চিন্তা ও চেতনা এবং ধর্ম ও মনন সাধনায় বুদ্ধিদীপ্ত মানব সমাজ সবসময়ই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। অর্থাৎ, মানুষকে যন্ত্র হিসেবে নয় বরং মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা বাঙালির মনন সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।^{৩৩} এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বাঙালি ইতিহাসের সকল যুগেই বিদ্যমান রয়েছে।

১.৮. বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্য:

একথা বললে অত্যাুক্তি হবে না যে, বাঙালির রয়েছে এক গৌরব উজ্জ্বল দর্শন; রয়েছে এ দর্শনের তথ্যসমৃদ্ধ এক ইতিহাস। বাঙালির আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক মানসিকতা দেখে অনেকেই এ জাতির দর্শন বিশ্লেষণে আগ্রহ হারান, দুঃখ ও আক্ষেপ করে থাকেন বাঙালির আবেগাতিশয্য ও দার্শনিক দারিদ্র্যতা নিয়ে। বাঙালি মাত্রই জীবনবিমুখ, কর্মকুণ্ঠ ও পরলোকমুখী; এ কারণে পাশ্চাত্য দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বাঙালির দর্শনে খুব একটা দেখা যায় না। তবে তাই বলে এ জাতির দর্শনে তত্ত্বচিন্তা একেবারেই থাকবে না তা ভাবা অমূলক।^{৩৪} বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এ বিশ্লেষণ প্রবণতা কখনো একটা স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিতে পারেনি, বরং শেষ পর্যন্ত মোক্ষতত্ত্বের পাদটীকা হিসেবেই কাজ করেছে। বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে ছোট ছোট বিভিন্ন তত্ত্বধারা আলোচিত হলেও সে আলোচনা কখনোই শুদ্ধ জ্ঞানের খাতিরে করা হয়নি বরং শেষ পর্যন্ত তা নির্বাণ লাভের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। বেদকে একবার অপৌরুষেয় প্রামাণ্য হিসেবে মনে করলে বেদের গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করা ছাড়া দার্শনিকদের পক্ষে বিশেষ কিছু করার থাকে না। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা কোনো কিছুকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ না করে বরং খোলা মন নিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন আবিষ্কারে মনযোগী থেকেছেন-সবকিছুতেই প্রশ্ন করতে পেরেছেন স্বাধীনভাবে। তীব্র কৌতূহল নিয়ে জগৎ ও জীবনের জটিলতর বিভিন্ন সমস্যা উদঘাটনে সচেষ্ট থেকেছেন, সফলও হয়েছেন। তাইতো বলা যায়, আজ আমরা একটি পরিপূর্ণ জীবনবাদী দর্শন আবিষ্কার করতে পেরেছি। নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত রয়েছে নতুন নতুন প্রশ্ন আবিষ্কার করা ও সেসবের উত্তর খোঁজার।^{৩৫}

বাঙালি শব্দের জাতি বলে এ জাতির মনে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির পরিবর্তে আবেগ খানিকটা বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে বৈকি। কিন্তু তাই বলে, বাঙালির সাহিত্য-দর্শনে বিচারশীল মনোবৃত্তির উপস্থিতি একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যেমন-ষোলো শতকে এ অঞ্চলে চৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তিবাদ ছিল প্রবল। তাছাড়া, এর পাশাপাশি ছিল রঘুনাথের নব্যস্মৃতি, রঘুনাথের নব্যন্যায়, কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশের তন্ত্রগ্রন্থ। এসব গ্রন্থে প্রেম-প্রীতি, আবেগের পাশাপাশি রয়েছে যুক্তিশীল, বিচারশীল

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

দর্শনতত্ত্বের যা বাঙালির দর্শন রচনার মূল তত্ত্ব বলে বিবেচিত।^{৩৬} বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মভিত্তিক ঐতিহ্যে ধর্মপ্রবণতা, আধ্যাত্মিকতা ও পারলৌকিক মানসিকতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে উপস্থিত দেখা যায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী ও ঐহিক ধারার। ফলে, বেশিরভাগ বাঙালি যথার্থ জীবন বলতে পারলৌকিক জীবনকে বুঝলেও আবার অনেকে বুঝেছেন দেহধারস্থিত সেই চেতনাকে যাকে বস্তুবাদী দর্শনে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

১.৯. বাঙালির চিন্তায় যুক্তি ও ভাবাবেগ:

মানুষের নৈতিক জীবনকে পরিপূর্ণ করে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করার জন্য দর্শন চর্চা অপরিহার্য। তাছাড়া, যুক্তির আলোকে জীবন ও জগতকে বিশ্লেষণ তথা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চিন্তার ব্যাপকতা বাঙালির দর্শন চিন্তার একটি অন্যতম দিক। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালি সাহিত্যে যুক্তির চেয়ে অনুভূতির, বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে হৃদয়বেগের প্রবণতাই ছিল বেশি। যেকোনো কারণেই হোক না কেন, বাঙালির মনে হৃদয়বেগ একটু বেশি ভর করে আছে। ষোলো শতকে এ অঞ্চলে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিবাদ ছিল প্রবল। তবে, এ অঞ্চলে চর্চিত ধর্মগ্রন্থে শুধুমাত্র রসাত্মক ভক্তিবাদেরই নিদর্শন পাওয়া যায় না, বরং পরিচয় মেলে বাঙালির মনন ও সংস্কৃতি বিকাশের তথা আবেগের পাশাপাশি যুক্তি ও বিচার পদ্ধতির।^{৩৭} বাঙালির ইতিহাসে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ কিংবা সুফিতত্ত্ব যেমন আলোচনার বিষয়বস্তু, তেমনি লক্ষণীয় নব্যন্যায়ের বুদ্ধিবাদী আলোচনাও। অর্থাৎ, শুধু ভাবাবেগই নয় বরং ‘আবেগ’ ও ‘বুদ্ধি’ জ্ঞানের এ দুটি উপাদান অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে বাঙালির জাতিসত্তায়।

বাঙালির চিন্তা ও সাহিত্যে যুক্তি-তর্কের চেয়ে ধর্ম প্রবণতার প্রভাবই বেশি দেখা যায়। একথা স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র বাঙালিরাই নয় বরং এ প্রবণতা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে শুরু করে যুক্তিবাদী দর্শনের ক্ষেত্রভূমি বলে বিবেচিত ইউরোপেও তা দৃশ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে দর্শনের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রাচ্যের আন্তিক দার্শনিকদের কেউ কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও তাঁদের কেউই বৈদিক ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেননি। অন্যদিকে, নাস্তিক দার্শনিকদের কেউ কেউ বেদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মমতের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। একথা স্পষ্ট যে, যুক্তি এবং বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করে অগ্রসর হলে কেবল ব্যক্তিই নয়, গোটা সমাজব্যবস্থাই বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে যুক্তির পরিবর্তে ধর্মযাজক তথা ধর্মগুরু মতকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। তবে, দর্শনের ইতিহাসে ধর্মাচ্ছন্ন এ যুগের উপস্থিতি যে কেবলমাত্র ভারতীয়

উপমহাদেশেই ছিল তাই নয় বরং সুদূর ইউরোপের দর্শনও ছিল খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। তখনকার সময়ে দর্শনের কাজ ছিল ধর্মীয় চিন্তাধারার মূল্যায়ন বা খণ্ডন করা নয় বরং নির্বিচারে দার্শনিক মত গ্রহণ করা।^{৩৮} ধর্ম বিশ্বাসই তখন নির্দেশ করছে দার্শনিক জ্ঞানের স্বরূপ, সীমা ও লক্ষ্যকে। পৃথিবীকে তখন দেখা হতো নীচের একটি কক্ষ হিসেবে যার উপরে রয়েছে বিরাজমান ঈশ্বরের কৃপার রাজত্ব। উল্লেখ্য, বুদ্ধি এবং যুক্তিকে তখন ব্যবহার করা হতো বিশ্বাসকে মজবুত করার কাজে।

একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিককালের বুদ্ধিবাদী ও বিচারবাদী দার্শনিকরাও ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। যেমন দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ, কান্ট, হেগেল প্রমুখ আধুনিককালের দার্শনিকগণ তাঁদের দার্শনিক যুক্তির অন্তরালে সত্ত্বানে লালন করছেন হৃদয়াবেগ, নীতিবোধ ও ধর্মানুগত্যকে। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে দার্শনিক যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয়েই রচনা করেছেন পরবর্তী গ্রন্থ *Critique of Practical Reason* এবং এ গ্রন্থে তিনি পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বেছে নিয়েছেন নীতিবোধ ও নৈতিক নিয়মকে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল কান্টের পূর্বসংস্কার। আর সেই সংস্কারকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন নৈতিক নিয়ম ও নীতিবোধের দোহাই দিয়ে। কান্টের এই মনোবৃত্তির সহজ, সরল, অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় এ উপমহাদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির ভক্তিবাদী উক্তিতে। এটা স্পষ্ট যে, শুধু বাঙালির মননেই নয় বরং পৃথিবীর সব মানুষের মনেই আবেগ ও যুক্তি; বিশ্বাস ও বিচার এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, এদের একটিকে অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় না। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে আমরা নির্ধারণ করি নৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে; আবার জ্ঞানবুদ্ধির আলোকেই এদের একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করি। এভাবে আবেগ ও বিশ্বাসের সাথে বুদ্ধি ও জ্ঞানের যদি সম্মিলন না ঘটত, তাহলে অনুভূতি থেকে যেত অন্ধকারে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, নন্দনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব তখন অবনত হয়ে পরিণত হতো প্রকৃতির সেবাদাসে। নৈতিক, নান্দনিক কিংবা ধর্মীয় অনুভূতি থেকে যে হৃদয়াবেগের উদ্ভব হয়, তাকেও সংযত ও পরিস্ফুটিত করতে হয় দার্শনিক যুক্তিবিচার দ্বারা। এভাবে আবেগ ও বুদ্ধি; ভক্তি ও যুক্তির সমন্বয়ে যে তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে তাকেই দর্শনের ইতিহাসে বলা হয় ধর্ম দর্শন যা বাঙালির হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে বারবার।

১.১০. উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালির দর্শন চর্চার ইতিহাস বেশ পুরোনো। বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে যুগ-যুগান্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ দর্শন ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, যা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাঙালির চিন্তা, সংস্কৃতি ও দর্শনে যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

বাঙালির গৌরব উজ্জ্বল দর্শনের ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মননের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে স্বকীয় ও গৌরবময় বৈশিষ্ট্য, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় দর্শনেও। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র এমনকি রক্তের ভিন্নতা সত্ত্বেও বাঙালিদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির এক নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছে। এ রকম প্রাণবন্ত সামাজিক বন্ধনের উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তেমনটি দেখা যায় না। ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজ-সভ্যতা-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিচারে বাঙালির নানা মাত্রিক দর্শন বৈচিত্র্যময় যা আমাদের দার্শনিক দরিদ্র অনেকখানি ঘুঁচিয়েছে। কাজেই, এ দর্শনের জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বজাত্যবোধকে উজ্জীবিত করে জাতি গঠনের কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে, জাতিকে দিতে হবে দর্শনের আলোকবর্তিকার সঠিক দিশা। এভাবে বাঙালি জাতি মানবিকতার মহান আদর্শকে ধারণ করে নিজস্ব দর্শন নিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

তথ্যনির্দেশ:

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদি পর্ব, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩৫৯, পৃ. ২৩-৩৮।
২. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন*: মানুষ ও সমাজ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ১২৪-১২৭।
৩. সত্যনারায়ণ দাশ, *বাঙালির মনন সাধনা*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪, পৃ. ২১-২৯।
৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীনযুগ, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স লি., ২০০৫, পৃ. ৩-৭।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৯।
৬. F. Thilly, *A History of Philosophy*, Allahabad: Central Book Depo., 1958, পৃ. ১৫০-১৫৩।
৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীনযুগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৫৪।
৮. শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাঙলা ও বাঙালি*, কলিকাতা: আনন্দ বুক ডিপো, ১৯৯০, পৃ. ৬৯-৭০।
৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০৭।
১০. আনন্দ মোহন বসু, *বাংলা ভাষার ইতিহাস*, কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং, ১৯৭৬, পৃ. ৩-১৭।
১১. সত্যনারায়ণ দাস, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৮, পৃ. ২৯-৩৬।
১২. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, কলিকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি: ১৯৯৭, পৃ. ৯৯-১০৪।
১৩. সত্যনারায়ণ দাস, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৯।
১৪. পরিতোষ কুমার কুণ্ডু, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পাবনা: অর্ণব প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ভূমিকা অংশ ও ৫৭-৬৭।
১৫. আবদুল করিম, *বাঙালির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭; আরো দেখুন, মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৮, পৃ. ১৬৯-১৮৯।
১৬. আহমদ শরীফ, *বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৯-৩৭।
১৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম পর্ব, কলকাতা: আনন্দ বুক ডিপো, ১৯৯০, পৃ. ৭-২১।
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৬৭।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

১৯. অজয় রায়, *আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৯-২৯।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৫১।
২১. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-৩১।
২২. সুশীলা মন্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, কলিকাতা: প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩, পৃ. ৮৭-৮৮।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২৭।
২৪. অরুণ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা: শ্রীমতি ছায়া চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫৬।
২৬. সুশীলা মন্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০৭।
২৭. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
২৮. সুনীথানন্দ ভিক্ষু, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ২১-২৬।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬৭।
৩০. অন্নদাশংকর রায়, *আধুনিকতা*, কলিকাতা: ডি.এস. লাইব্রেরী, ১৯৫৩, পৃ. ২৬।
৩১. বিনোদবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান*, কলিকাতা: কে.পি.জে. পাবলিশার্স, ১৯৫৯, পৃ. ৬৯।
৩২. শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাঙলা ও বাঙালি*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩-১৯।
৩৩. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬৮।
৩৪. সুনীল কুমার দাশ, *প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকদর্শন*, কলিকাতা: আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ১৩৮১, পৃ. ৯৯-১০৪।
৩৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৪৩।
৩৬. প্রিয়নাথ জানা, *বঙ্গীয় জীবনী কোষ*, কলিকাতা: মাতৃভাষা পরিষদ, ১৯৭৫, পৃ. ৪৮।
৩৭. সত্যনারায়ণ দাস, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, প্রাগুক্ত, ১৯৭৪, পৃ. ৯-১৮।
৩৮. অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলিকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃ. ৭৭-৮৩।

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের বিধান: একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন নূরী*

প্রতিপাদ্যসার

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বকাল প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যুগে যুগে নবী-রাসূল ও ইসলামের খালীফাগণ এর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর নীতিমালা এবং অন্যান্য ইসলামী আইনবিদগণের মতামত ও দিকনির্দেশনা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র যদি কেবলমাত্র পর্যটন বা বাণিজ্যিকভাবে চিন্তা করে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সংরক্ষণ করে কিংবা যথাযথ মর্যাদায় বহাল রাখতে চায় তবে এতে সাধারণভাবে কোনো অসুবিধা হবে না। তবে কুরআন ও সুন্নাহর আদলে এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে যদি ইসলামী শরীআতের কোনো বিধান নষ্ট হয় তাহলে এ থেকে বিরত থাকা উচিত। এই প্রবন্ধে পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের আলোকে স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ কেন্দ্রিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নীতি, নিদর্শনাবলির প্রতি গুরুত্বারোপ করার ইতিহাস, স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের কারণসমূহ, ইসলামী আইনে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান ও পরিণতি এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে কিছু প্রস্তাবনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শন করা একটি প্রাচীন সংস্কৃতি। যা একেক জাতি একেক ভাবে করত। আর পরবর্তী যুগে অনেক রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাদের ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলি পুনরুজ্জীবিত করার প্রদেক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আবার জাতীয় অনেক সংস্থা এসব নিদর্শন রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তৎপর হয়ে উঠে এবং রাষ্ট্রসমূহকে এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের জন্য আহ্বান করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মানের কী নীতি ছিল এবং ‘উমর (রা.) ও অন্যান্য ইসলামী ব্যক্তিবর্গ জনগণকে এ বিষয়ে কি

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রকম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তা অত্র প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। স্মৃতিবিজড়িত স্থানের পরিচয়, এ প্রথা ছড়িয়ে পড়ার কারণসমূহ, এর পরিণতি, ইসলামী আইনে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শার'ঈ বিধান পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং ফিক্‌হের আলোকে আলোচনা করাই হলো অত্র প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

স্মৃতিবিজড়িত শব্দের ইংরেজি প্রতি শব্দ হলো, vestige, ancient monument, antique, antiquities, relic, imprint, ruins, remnant, remains, trace, এথেকে উৎপত্তি হলো, archeology বা প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যা।^১ পূর্ববর্তী জাতির বা নবী-রাসূলদের কিংবা আওলিয়ায়ে কিরামের যে কোনো স্মৃতিবিজড়িত বিষয়কে নিদর্শন বলে। কেউ কেউ বলেন, নিদর্শন বলতে, علم الوثائق والمخلفات القديمة “প্রামাণ্য চিত্র ও প্রবীণ স্মৃতিসমূহের জ্ঞান।”^২

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ কেন্দ্রিক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নীতি

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অবস্থান কেমন ছিল তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

এক. নুবুওয়াতের পূর্বে ও পরে রাসূল ﷺ যেসব স্থান পরিদর্শন করেছেন, এগুলোর ব্যাপারে কোথাও সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি এগুলো যিয়ারত করতে বলেছেন কিংবা এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নুবুওয়াত লাভের পর পূর্বে হেরা গুহায় কিংবা অন্যান্য স্থানে যেভাবে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এরূপ কোনো কিছু করেননি। নুবুওয়াতের পর তিনি ১৩ বছরের মত মক্কায় অবস্থান করেন। আর হিজরতের পরও ‘উমরাতু কাদা, ‘উমরাতুল জি‘রানাহ্ ও মক্কা বিজয় উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময় মক্কায় এসেছিলেন। কিন্তু হেরা গুহায় আর কখনো যাননি। তাঁর সাহাবীগণও অনুরূপ কিছু করেননি।^৩ তিনি আরো বলেন, হজ্জের নিদর্শনাবলি তথা আরাফাত, মিনা ও মুয়দালিফা ব্যতীত অন্যান্য স্থান ও পর্বতমালা যেমন হেরা পর্বত, মিনার পার্শ্ববর্তী পর্বত ইত্যাদি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাতের আওতাভুক্ত নয়।^৪

দুই. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের পর যখন পবিত্র কা‘বা তাওয়াফ করলেন তখন কা‘বার পার্শ্ববর্তী সকল মূর্তিকে ভেঙ্গে দিলেন। ‘আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَخَوَّلَ الْبَيْتَ سِتُونَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ نَضْبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ،

وَيَقُولُ: "جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا"، ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾

“মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন কা‘বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে তিনি এগুলোকে ঠোকা দিতে লাগলেন এবং বলছিলেন, “সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।”^৫ “বল, সত্য এসেছে আর অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে এবং না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।”^৬ এইসব মূর্তি ছিল

তৎকালীন যুগের অন্যতম নিদর্শন যেগুলোর প্রতি কাফিররা খুবই যত্ন নিত। সেজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলোর প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা পাই করেননি। কিংবা এগুলো কোনো যাদুঘর ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করেননি। সাহাবায়ে কিরাম আজীবন এই নীতির উপর চলেছেন। তারা আল্লাহর রাসূলের কথা ও কাজ তথা হাদীছের উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন। যার জন্যই মাইলের পর মাইল সফর করতেন। হাদীছের প্রতি তারা এতবেশি গুরুত্ব দিতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈবাহিক কর্মকাণ্ড, অযু, গোসল, পানাহার, নিদ্রা-জাগ্রত হওয়া প্রভৃতির আদব-কায়েদা পর্যন্ত বর্ণনা করতেন। কিন্তু তারা স্থান সম্পর্কিত কোনো নিদর্শনের প্রতি কখনো গুরুত্বারোপ করেননি কিংবা এর উপর পাকা ঘর নির্মাণ করেননি।

শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায (র.) বলেন, “এটা সবার জানা বিষয় যে, নবী কারীম ﷺ-এর সাহাবীগণ আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিক প্রিয়ভাজন ছিলেন। তারা এইসব নিদর্শনাবলিকে পুনরুজ্জীবিত করেননি এবং সম্মানও প্রদর্শন করেননি। যদি এগুলো পুনরুজ্জীবিত করা বা এগুলো পরিদর্শন করা সাওয়াবের কাজ হত তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় কিংবা হিজরতের পর এইসব কাজ করতেন এবং অন্যকেও করার নির্দেশ প্রদান করতেন এবং পরবর্তীতে সাহাবায়ে কিরামও এইসব কাজ করতেন ও এগুলোর প্রতি মানুষকে পথ দেখাতেন।”^৮

এই যুক্তির পক্ষে দলীল নিম্নরূপ

১. মক্কা, মদীনা ও বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে তাদের অবস্থান

এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামের কেউ এগুলো পরিদর্শন করেছেন অথবা এগুলো অনুসরণ করেছেন কিংবা এগুলো সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তারা এগুলোর পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। মুসলমানরা যখন ‘তুসতার’ বিজয় করেছিলেন, তখন সেখানে একজন মৃতব্যক্তির একটি খাট পেয়েছিল। বলা হয়ে থাকে এটা ‘দানিয়াল’-এর খাট এবং তারা সেখানে একটি পুস্তক পেয়েছিল, যেখানে বিভিন্ন ঘটনা পরিক্রমার আলোচনা ছিল। আর সেই এলাকার লোকজন এটার ওয়াসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। আবু মূসা আশ‘আরী (রা.) এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে উমর (রা.)-এর নিকট চিঠি লিখলেন। অতঃপর উমর (রা.) উত্তরে লিখলেন, “দিনের বেলায় তেরটি কবর কুড়বে, এরপর রাতের বেলায় কোনো একটি কবরে সেটা দাফন করে সকল কবরের চিহ্ন মুছে দিবে। যেন মানুষ এটাকে কেন্দ্র করে ফিতনায় পতিত না হয়।”^৯

এজন্য শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মানুষ ফিতনায় পড়ে যাওয়ার ভয়ে নবীগণের কোনো কবরের চিহ্নও রাখেননি কিংবা এগুলোকে কেন্দ্র করে কোনো সফরও করেননি। বরং আমাদের নবীর কবরকেও তারা কক্ষের মধ্যে বেষ্টিত করে রেখেছিলেন। আর মানুষকে যথাসম্ভব এখান থেকে বারণ করে রেখেছিলেন। আর অন্যান্য কবরগুলো যথাসম্ভব মুছে দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে। আর যদি ফিতনার আশঙ্কা না থাকে তাহলে কবরের চিহ্ন থাকাতে কোনো অসুবিধা নেই।^{১০}

আর কখনো কখনো এসব নিদর্শনাবলি পরিদর্শনের উপলক্ষ আসলেও তারা তখনও এগুলো পরিদর্শন করতেন না। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) ও তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ্—এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। যখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাস যিয়ারাত করতে এসেছিলেন, তখন তারা সেখানকার ঐতিহাসিক পাথর কিংবা অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেননি।^{১১} বরং ফিতনার আশঙ্কা থাকলে তারা এগুলো নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ প্রদান করতেন। যেমন উমর (রা.) যে গাছের নিচে ‘বাই’ আতুর রিদওয়ান’ (হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে যে বাই’ আত গ্রহণ করেছিলেন তাই বাই’ আতুর রিদওয়ান) সংঘটিত হয়েছিল, সেই গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন।^{১২}

২. মিশরের পিরামিড প্রসঙ্গ

ইতিহাসের কোথাও উল্লেখ নেই যে, ‘আমর ইবনুল আস (রা.)-এর নেতৃত্বে মিশর বিজয়ের বিজয়ী কোনো সাহাবী মিশরের পিরামিড দেখতে গেছেন; এগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ তো দূরের কথা; অথচ এই পিরামিডগুলো পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি। ইলমুদ দ্বীন অর্জনের জন্য বহু আলিম মিশরে গেছেন; কিন্তু তাঁরা এই সব নিদর্শন পরিদর্শনে গেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি; এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা তো দূরের কথা। যেমন ইমাম শাফি’ঈ (র.), ইয়য ইবন আদিস সালাম (র.), ইবন খুযায়মা (র.) এবং আবু হাতিম (র.) প্রমুখ। ইমাম যারকালী (র.)-কে মিশরের পিরামিড ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, “সাহাবীগণ যারা মিশরে প্রবেশ করেছিল তারা কি এগুলো দেখতে গেছেন? তিনি বলেন, এগুলো তৎকালে বালুছাপা ছিল। আর এইসব স্থাপনার অধিকাংশই পরবর্তীতে আবিস্কার হয়েছে।^{১৩} যা প্রমাণ বহন করে যে, এগুলো ছিল মূল্যহীন বস্তু। এভাবে সকল স্থাপনা ও নিদর্শনাবলির ব্যাপারে একই হুকুম। ইবন খালদুন (র.) বলেন, বাদশাহ হারুনুর রাশীদ (র.) কিসরার সেই ঐতিহ্যবাহি রাজ প্রসাদও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন। যাতে পরবর্তীতে এদের বংশধর এ নিয়ে গর্ভবোধ না করে বা পূজার স্থান বানিয়ে না ফেলে।^{১৪}

নিদর্শনাবলির প্রতি গুরুত্বারোপ করার ইতিহাস

এটা জানা বিষয় যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলোই মুসলিম বিশ্বে তাদের অসংখ্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এসব নিদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপের প্রতি উৎসাহিত করে। যেমন ‘জুব’^{১৫} স্পষ্টভাবেই বলেছেন, মুসলিম বিশ্বের অমুসলিমদের অন্যতম লক্ষ হচ্ছে, সেখানকার প্রাচীন সভ্যতাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা। আর এ জাতীয় গুরুত্বারোপের দৃশ্য আমরা দেখতে পাই তুরস্ক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক ও পারস্যে।^{১৬}

এই সকল স্বীকারোক্তিটা এটাই প্রমাণ করে যে, পাশ্চাত্যেরা মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রতিটির দিকে জবরদখলের মনোভাব নিয়ে কাজ করে। তারা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ছাড়া বিভিন্ন স্থানীয় উৎসবের সৃষ্টি করা। যেগুলো পালন করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। তাদের জন্য বিশেষ পোশাকের

ব্যবস্থা করা হয়। আর মুসলমানরা যে একভাষা এক দ্বীনের উপর অটল ছিলেন তাতে তারা বিভিন্নভাবে ফাটল ধরাতে অনেকটা সক্ষম হয়েছে। আর এটা করেছে তারা ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও মিশরে; যা তাদের প্রাচীন সভ্যতা ও জাতীয়তাবাদকে উষ্ণ দেয়।

এই ব্যাপারে শায়খ সালিহ ফাওয়ান (র.) বলেন, “প্রাচীন স্মৃতিবিজড়িত স্থানের পুনরুজ্জীবিত করা এগুলো মূলত শত্রুদের চক্রান্ত, যাতে মুসলমানরা এগুলোর পিছনে পড়ে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইসলামী সভ্যতাকে ভুলে যায়। না হয়, মুসলমানগণ প্রয়োজনীয় সৃজনশীল কাজ বাদ দিয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এসব রীতি-নীতি, খেলা-ধূলা ও ঘর-বাড়ীর পিছনে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করার কী অর্থ থাকতে পারে? শত্রুরা মুসলমানদেরকে চতুর্দিক হতে এইসব কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের উচিত তাদের দ্বীনের দিকে ফিরে যাওয়া ও নবীর সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং সালফে সালিহীনের সীরাত, নীতি, আদর্শ ও ঐতিহ্যকে আকড়ে ধরা এবং এগুলো নিয়ে গবেষণা করা।”^{১৭} মূলত এসমস্ত নিদর্শনের পিছনে গবেষণা করার মধ্যে কোনো লাভ নেই। বরং এতে করে সময় ও সম্পদের অপব্যবহার এবং ফলাফল ছাড়া বিনিয়োগ করার নামান্তর। বরং অনেক সময় এগুলো মূর্তিপূজা ও জাহিলী কুসংস্কারের দিকে নিয়ে যাওয়ার সমূহসম্ভাবনা বেশি।

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সম্মান প্রদর্শনের কারণসমূহ

আল্লাহ তা‘আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কিতাবাদিও তাদের উপর নাযিল করেছেন। সেই মহান উদ্দেশ্যেটা হলো, একত্ববাদের আদেশ ও শিরক থেকে নিষেধ। কিন্তু উম্মতের সাথে নুবুওয়াতী যুগের দূরত্ব যতটা বাড়তে লাগল ততই তাদের মধ্যে শিরকী কর্মকাণ্ড, বিদ‘আত ও কুসংস্কার বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিষয়টা যখন এরূপ অবস্থায় দাঁড়াল তখন এর কারণসমূহ নির্ণয় করা আবশ্যিক হয়ে পড়ল। যেহেতু রুগের কারণ নির্ণয় করা গেলেই এর সুচিকিৎসা করা সম্ভব। নিম্নে মৌলিক কারণসমূহ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো।

১. সম্মান প্রদর্শনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি

সম্মান প্রদর্শনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা এই ফিতনা প্রসারের অন্যতম কারণ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনেক জায়গায় আকীদা ও ‘ইবাদত উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এই মাহামারী থেকে সতর্ক করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ “হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোনো কথা বলো না।”^{১৮} তিনি আরও বলেন, ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا﴾ “বলুন, হে আহলে কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির

অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে”।^{১৯}

এই দুই আয়াতে যদিও আহলে কিতাবে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু হুকুমের দিক দিয়ে উম্মাতে মুহাম্মাদীও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ, অত্র আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আহলে কিতাবের পথ ও পন্থাকে অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।^{২০}

ফাদাল ইবন ‘আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, فَإِنَّمَا بَلَّغْتُكُمْ وَالْغُلُوفُ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا “দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা বিরত থাকবে।

কারণ, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়ে গেছে।”^{২১}

ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, দুটি কারণে মানুষের মধ্যে শিরক ছড়িয়ে পড়েছে।

এক. নেককার লোকদের কবরের প্রতি অতি ভক্তি করার কারণে,

দুই. বরকত নেয়ার দোহাই দিয়ে তাদের কবরের উপর মাযার নির্মাণের কারণে।^{২২}

এই দুইটি ফিতনার প্রতি ইঙ্গিত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَةَ رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّورِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ."

“উম্মে সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর হাবশায় দেখা ‘মারিয়া’ নামক একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরা এমন সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে কোনো সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোনো সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐ সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। এরা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।”^{২৩} এটিই ছিল মূলত ‘লাত’ নামক মূর্তিকে পূজার মূল কারণ।

ইবন ‘আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) অত্র আয়াত ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ “তোমরা কি ভেবে দেখেছো ‘লাত’ ও ‘উয্যা’ সম্বন্ধে”^{২৪} -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘লাত’ একজন সৎলোক ছিল। হজের মৌসুমে সে হাজীদেরকে পানির সাথে ছাতু মিশিয়ে পান করাতো। তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কবরের খিদমত করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার ‘ইবাদতের প্রচলন শুরু হয়।^{২৫} ইবন কাছীর (র.) বলেন, ‘লাত’ ছিল একটি সাদা পাথর যা অংকিত ও নক্সাকৃত ছিল। এর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। এর উপর তারা গেলাফ উঠিয়েছিল। এর জন্যে তারা খাদেম, রক্ষক, ও ঝাডুদার নিযুক্ত করেছিল। এর আশে পাশের জায়গাগুলোকে তারা হারাম শরীফের মত মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতো। এটা ছিল তায়েফবাসীদের মূর্তির ঘর বা মন্দির। আর ‘উয্যা’ হলো, মক্কা ও মদীনার

মধ্যস্থলে অবস্থিত ‘নাখলা’ নামক স্থানে একটি বৃক্ষের নাম। এর উপর গম্বুজ নির্মিত ছিল। ওটাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করা হতো। কুরায়েশরা ওর খুবই সম্মান করতো ও পূজা করতো।^{২৬}

সর্বপ্রথম পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে শিরকের প্রবর্তন শুরু হয়েছে হযরত নূহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে।^{২৭} ইবন ‘আব্বাস (রা.) বলেন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، "صَارَتِ الْأَوْتَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدَ أَمَّا وَدَّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدُومَةِ الْجَنْدَلِ، وَأَمَّا سَوَاعٌ كَانَتْ لِهَذِيلٍ، وَأَمَّا يَغُوثٌ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لَبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ، عِنْدَ سَبَا، وَأَمَّا يَغُوثٌ فَكَانَتْ لِهَنْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحُمَيْرٍ لَّالِ ذِي الْكَلَّاعِ، أَسْمَاءُ رَجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أُوحِيَ الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسُمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَوْلَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ".

হযরত নূহ (আ.)-এর যুগের প্রতিমাগুলোকে আরবের কাফিররা গ্রহণ করেছে। দুমাতুল জানদালে কালব গোত্র ‘ওয়াদ’ প্রতিমার পূজা করতো। হযায়েল গোত্র পূজা করতো ‘সুওয়া’ নামক প্রতিমার। মুরাদ গোত্র এবং সাবা শহরের নিকটবর্তী জারফ নামক স্থানের অদিবাসী বানু গাতীফ গোত্র ‘ইয়াগুছ’ নামক প্রতিমার উপাসনা করতো। হামাদান গোত্র ‘ইয়াউক’ নামক প্রতিমার পূজারী ছিল এবং যীলকালো গোত্র হুমাইর ‘নাসার’ নামক প্রতিমার পূজা করতো। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের সৎ লোকদের নাম ছিল। তাঁদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ যুগের লোকদের মনে এই খেয়াল জাগিয়ে তুললো যে, ঐ সৎ লোকদের উপাসনালয়ে তাঁদের স্মারক হিসেবে কোনো নিদর্শন স্থাপন করা উচিত। তাই তারা তথায় কয়েকটি নিশান স্থাপন করে প্রত্যেকের নামে নামে ওগুলোকে প্রসিদ্ধ করে। তারা জীবিত থাকা পর্যন্ত ঐ সৎলোকদের পূজা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর ও ইলম উঠে যাওয়ার পর যে লোকগুলোর আগমন ঘটে তারা অজ্ঞতা বশতঃ ঐ জায়গাগুলোর ও ঐ নামগুলোর নিদর্শনসমূহের পূজা শুরু করে দেয়।^{২৮} সুস্পষ্ট হলো, মূর্তিপূজার মূল কারণ হলো, পুণ্যবান লোকদের সম্মান প্রদর্শনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা।

২. সম্পদ উপার্জন ও মানুষের মধ্যে নিজেদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা

আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং পুণ্যবানদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, সম্পদ উপার্জন ও মানুষের মধ্যে নিজেদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। যেমন আব্দুল কুদ্দুস আনসারী (র.) বলেন, মসজিদে বনী জাফরে নবী কারীম ﷺ যেই পাথরে বসতেন বলে লোকমুখে কথিত আছে, তিনি সেই পাথরকে মিশরের ‘দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে’ সুউচ্চ কাঁচের কোষাগারে সংরক্ষিত অবস্থায় দেখতে পান। তথাকার প্রধান পরিচালককে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, “মদীনার এক লোক এই পাথরটি মিশরে নিয়ে এসে নবী ﷺ এই পাথরে বসতেন বলে প্রচার করে মোটা অংকের টাকা দিয়ে বিক্রি করছে।”^{২৯} অনেক সময় দেখা যায় যে, চক্রান্তকারীদের একদল কবরের পার্শ্বে বসে থাকেন এবং মানুষের মধ্যে এই

মৃতব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মিথ্যা কারামাতের কথা প্রচার করে, যেন তারা এই কবরের জন্যে মান্নাত করে, টাকা খরচ করে এবং গরু-ছাগল কুরবানী করে। উদ্দেশ্য হলো এরই মাধ্যমে মানুষের নিকট থেকে সম্পদ উপার্জন করা ইত্যাদি। তারা এই কবরকে ঘিরে অনেক ভুল তথ্য মানুষকে দেয়, যেন কবরের প্রতি তাদের ভক্তি বেড়ে যায়। কবরে বিভিন্ন ধরনের খুশবো, আগরবাতি, মশাল প্রজ্জ্বলিত করে রাখে এবং ভক্তদের জমানোর জন্য কবর কেন্দ্রিক বার্ষিক ওরস ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করে। সেই সময় সাধারণ মানুষ দেখতে পায় যে, কবরে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে, কবরের পাথরকে স্পর্শ করে বরকত নিচ্ছে। কবরে শায়িত ব্যক্তির নিকট সাহায্য ও প্রার্থনা করছে এবং তার নামে কোরবানী করছে। ফলে সাধারণ মানুষও এদিকে ধাবিত হচ্ছে এবং কবরের নামে বিভিন্ন প্রকার খরচ করছে ও পূজা করা আরম্ভ করছে।

৩. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা

নুবুওয়াতের পূর্বে মানুষ ছিল দ্বীন সম্পর্কে অন্ধ। মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জীত ছিল। এক সময় তাদের কাছে শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ আসলেন, তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিলেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসলেন। তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করলেন। এই কথাই আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ “আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্ত্ত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।”^{৩০}

এভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের নিকট দ্বীনের বার্তাটি পূর্ণরূপে ও সঠিকভাবে পৌঁছে দিলেন এবং তাদেরকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর রেখে গেলেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম এই দ্বীনের প্রচারের কাজ করে গেছেন। অতঃপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই কাজটি করে আসতে লাগলেন। কিন্তু সময় যতই সামনের দিকে আসতে লাগল ততই মানুষের মাঝে আবার দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই কথাটিরই সত্যায়ন করেছেন, “يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيُظْهَرُ”

“ইলম তুলে নেওয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফিতনার প্রসার ঘটবে।”^{৩১} আর বাস্তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তাই ঘটেছে। আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁরই প্রেরিত রাসূল ও তাদের মিশন সম্পর্কে যখন মানুষ অজ্ঞতায় পড়ে রয়েছে, তখনই শয়তান তাদেরকে ফিতনার প্রতি আহ্বান করা আরম্ভ করলো। অথচ তাদের নিকট ঐ পরিমাণ জ্ঞান নেই, যার মাধ্যমে তার দাওয়াতকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ফলে অজ্ঞতা পরিমাণ তার আহ্বানে ছাড়া দিয়েছে এবং তাদের নিকট বিদ্যমান জ্ঞান অনুযায়ী তার ধোঁকা থেকে বেঁচে রয়েছে।^{৩২}

ইবনুল কায়্যিম (র.) বলেন, “অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করায় ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অধিকাংশ লোকদের উপর শিরক প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছে। ফলে তাদের নিকট ভাল বিষয় খারাপ বিষয়ে

পরিণত হলো এবং খারাপ বিষয় ভাল মনে হতে লাগল। সুন্নাতকে বিদ'আত এবং বিদ'আতকে সুন্নাত মনে করতে লাগল। এমনকি জ্ঞানী ব্যক্তিদের লোপ পেতে লাগল, অজ্ঞলোক বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ইসলাম অপরিচিত হয়ে রইলো। এ ধারণার উপরই ছোটরা বড় হতে লাগল এবং বড়রা বার্ষ্যকে পৌঁছতে রইলো।”^{৩৩}

ইবনুল জাওয়াযী (র.) বলেন, “শয়তান মানুষের কাছে প্রবেশ করার সবচেয়ে বড় দরজা হলো অজ্ঞতা। সে এই দরজা দিয়ে জাহিলদের নিকট খুবই নিরাপদে প্রবেশ করে। কিন্তু জ্ঞানীর নিকট সে চুরি করেই প্রবেশ করে।”^{৩৪} কারাফী (র.) বলেন, দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত ফসাদের মূল হলো, অজ্ঞতা। তা সাধ্যমত নিজ থেকে দূরীভূত করার চেষ্টা কর। আর ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যাণের মূল হলো জ্ঞান। সুতরাং শক্তি সাধ্যমতে তা অর্জন করার চেষ্টা করতে থাক।^{৩৫}

মূলত এই অজ্ঞতা সৃষ্টি হয় দুটি বিষয় থেকে,

এক. কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান থেকে বিরত থাকা এবং উভয়ের উপর চিন্তা না করা। যে ব্যক্তি সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে সেতো বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে যাবে। মূলত যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলার কালাম শ্রবণ করবে এবং এর উপর চিন্তা-গবেষণা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শয়তানের কুমন্ত্রণতা তথা ‘ইবাদত বিমুখতা ও নিফাকী থেকে রক্ষা করবে। এভাবে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছের পূর্ণ অনুসরণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিদ'আত ও মনগড়া মতবাদ থেকে হিফায়ত করবে।^{৩৬}

দুই. কুরআন ও সুন্নাহর অপব্যখ্যা করা। অর্থাৎ এটা মনে করা যে, কুরআন ও সুন্নাহতে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এগুলো পূর্ববর্তীদের জন্য নির্দিষ্ট। বর্তমানকার লোকদের সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। ‘উমর (রা.) বলেন, *إِنَّمَا تَنْقُضُ عَرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةَ إِذَا نَشَأَ فِي* “নিশ্চয় ইসলামের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে চলবে, যখন ইসলামে এমন লোকের জন্ম হবে যারা অজ্ঞতাকে বুঝতে পারে না।”^{৩৭}

আব্দুল লাতীফ ইবন্ আব্দির রহমান ইবন্ হাসান আল-শায়খ (র.) বলেন, আল্লাহর কিতাবের সঠিক অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা হলো, তারা ধারণা করেছে যে, মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যা বলেছেন এবং তাদের যেসব স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন, তা তৎকালীন মুশরিকদের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোর সাথে বর্তমান মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। কখনো কখনো তাফসীরবিশারদগণের কথা, এই আয়াতটি অমুখ মূর্তিপূজারীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে বা এটি খ্রিস্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, অথবা এটি ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে ইত্যাদি এইসব কথাগুলোকে তারা কেবল তৎকালীন মানুষদের সাথেই সম্পৃক্ত এবং এর হুকুম সবার জন্যে ব্যাপক নয় বলেই মনে করেছে। এ রকম অপব্যখ্যা মানুষের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে বড় একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।^{৩৮}

৪. ভ্রাতৃ ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফিতনা প্রসারিত হওয়ার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে ওতপ্রোতভাবে মুসলমানদের মিশে যাওয়া। কারণ কবরপূজার প্রচলন ছিল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মাঝে। খ্রিস্টানদের মাঝে এর প্রবণতাই একটু বেশি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, **"لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحْذِرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا."** "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এই বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করতো তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন।"^{৩৯}

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের বসবাস ছিল বেশি। এজন্য তাদের দ্বারা প্রভাবিতও বেশি হয়েছেন। শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, অনেক অজ্ঞ মুসলিম খ্রিস্টানদের নিকট সম্মানিত স্থানসমূহের উদ্দেশ্যে মান্নত করে। অনেকে খ্রিস্টানদের গীর্জা যিয়ারত করতে যায় এবং তাদের পাদ্রীদের কাছ থেকে বরকত গ্রহণ করে।^{৪০} যদি আমরা কবর পূজারীদের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখি, তাহলে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এটি ইসলাম পূর্ব আরবে যে মূর্তিপূজার প্রবণতা ছিল তারই প্রভাবিত প্রতিফলন। সর্বপ্রথম আওলিয়ার কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শুরু করেছে মিশরের অধিবাসীরা। কবরের উপর ইটের ঘর নির্মাণ করে মাজার তৈরির চিন্তাধারাটা চলে এসেছে ফিরাউনের যুগ থেকে। যার কোনো প্রমাণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছে নেই। যা খ্রিস্টানরাও তাদের পুণ্যবানদের কবরের উপর মাজার/ মজসিদ নির্মাণ করে পূজা করতো।^{৪১}

আবুল হাসান আন-নদবী (র.) বলেন, বর্তমান আওলিয়া ও মাশায়খদের কবরে যা চলছে, তা মূলত অমুসলিমরা তাদের 'ইবাদত খানায় এবং তাদের পুণ্যবানদের কবরে যা করে, তাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাদের নিকট সাহায্য চায় এবং নিজের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা কবর-মাজারের নিকট আবেদন করে ইত্যাদির আদলেই হচ্ছে।^{৪২}

মোটকথা মুসলমানগণ অমুসলিমদের সাথে অধিক মেলামেশার কারণে অমুসলিমরা মুসলমানদের এলাকায় বসবাস করায় এবং অনেক অমুসলিম তাদের অপসংস্কৃতিসহ ইসলাম কবুল করায় নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

৫. পথভ্রষ্ট আলিমগণ

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হলো পথভ্রষ্ট আলিমগণ। তাদের কারণেই মুসলিম জাতি বড় বিপদে পতিত হয়েছে। ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, "এই সকল পথভ্রষ্ট আলিম রাজা-বাদশা ও সম্পদশালীদের মনজয়ের জন্যই লেখালেখি করতো এবং তাদের চাহিদা মোতাবিক গ্রন্থ রচনা করে তাদের নৈকট্য অর্জন করতো।"^{৪৩}

রাফেদীদের শায়খ ইবনু নু'মান যিনি তাদের কাছে “আল-মুফীদ” নামে প্রসিদ্ধ, তিনি “মানাসিকুল মুশাহিদ” নামক একটি বই লিখেছেন যেখানে তিনি সৃষ্টিকুলের কবর যিয়ারতকে হজ্জের সাথে তুলনা করেছেন, তিনি বলেন, “পুণ্যবানদের কবরসমূহে হজ্জ করা হবে যেভাবে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা হয়। অথচ কা'বাই প্রথম ঘর যেটা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর তাওয়াফ করা যাবে না। সেদিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে নামায পড়া যাবে না। আর এটা ছাড়া অন্য কোথাও হজ্জের নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা দেননি।”^{৪৪} মূলত এইসব বই লেখার পেছনে তাদের হীন উদ্দেশ্য রয়েছে, তা হলো, রাজা-মন্ত্রীদের নৈকট্য অর্জন করা আর উম্মতকে পথভ্রষ্ট করা।

ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, “মূলত এ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচলন করেছে এক শ্রেণির মুনাফিক ও কুফরী সম্প্রদায়। যাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে আল্লাহর সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ও ইসলামকে ধ্বংস করা এবং দ্বীনের মধ্যে শিরক প্রবেশ করানো। তারা কিন্তু মসজিদকে বাদ দিয়ে কবর, মাযার, স্মৃতিবিজড়িত স্থান ইত্যাদির প্রতি বেশি সম্মান ও ভক্তি দেখায়। এ ব্যাপারে ভক্তদের নিমিত্তে অসংখ্য অকল্পনীয় ও মিথ্যা কথা রটিয়ে দেয়। এরই মাধ্যমে মানুষকে শিরকী কর্মে লিপ্ত করে দেয়। অথচ এগুলো আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিধানবহির্ভূত কর্মকাণ্ড।”^{৪৫}

৬. পথভ্রষ্ট নেতাগণ

পথভ্রষ্ট নেতাগণের ভয়াবহতা সম্পর্কে কোনো সচেতন ব্যক্তি অনবগত নয়। যেমন বলা হয়, “প্রজারা তাদের রাজার স্বভাবের উপর হয়ে থাকে।”^{৪৬} রাসূলুল্লাহ সমগ্র উম্মতকে এদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। ছাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, *إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي* “নিশ্চয় আমি ভয় করছি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারে।”^{৪৭}

যিয়াদ ইবন হুদায়র (র.) বলেন, *قَالَ: «هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُتَنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَيْمَةِ الْمُضِلِّينَ»* “আমাকে উমর (রা.) বলেছেন, তুমি কি জান ইসলামকে কে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, আলিমের পদস্থলন, কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন।”^{৪৮} যেমন সাহাবায়ে কিরামের যুগে বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের উপর গম্বুজ নির্মিত করা হয়নি। ইবন তায়মিয়া (র.) বলেন, বরং এটি ছিল উন্মুক্ত অবস্থায়। পরবর্তীতে আব্দুল মালিক ইবন মরওয়ান যখন শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন তিনি সেই পাথরের ওপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন এবং শীত-গ্রীষ্মে এর ওপর পর্দা পরিবেশন। যাতে করে মানুষ বায়তুল মুকাদ্দাসের যিয়ারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।^{৪৯}

অন্য স্থানে তিনি বলেন, সেই সময় থেকে সেই পাথর ও বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্মান প্রদর্শন শুরু হলো। অথচ ইতিপূর্বে মুসলমানরা এ ধরনের সম্মান প্রদর্শনের কথা জানতেনও না। এতে কোনো সন্দেহ নেই খুলাফায়ে রাশিদীন সেই পাথরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেননি এবং সাহাবায়ে কিরামও এর সম্মান প্রদর্শন করেননি এবং এর নিকট নামায পড়াকে বরকতও মনে করতেন না।^{৫০}

শায়খ 'আহমদ 'আব্বাসী (র.) বলেন, ৬৭৮ হিজরিতে বাদশাহ নাসির মুহাম্মদ ইবন কালাবুন-এর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজরা মুবারকের উপর সবুজ গম্বুজ নির্মিত হয়। ইতিপূর্বে এই গম্বুজ নির্মাণ করা হয়নি। বরং মসজিদের ছাদ ও হজরা মুবারকের ছাদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে কেবল হজরা মুবারককে কেন্দ্র করে বরাবর উপরে ছাদের উপর তিন ফুট উঁচু একটি প্রাচীরের বেষ্টিত নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই যুগে এই গম্বুজ ছিল না।^{৫১}

ইসলামী আইনে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান ও পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার যমীনে ভ্রমণ করতে বলেছেন। তাঁর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলেছেন।^{৫২} এ থেকে এটা উদ্দেশ্যে নয় যে, আমরা এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবো বরং আমরা যখন এগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবো, তখন দ্রুত অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, এগুলো অভিশপ্ত এলাকা, যদি এগুলোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকত তাহলে অবশ্যই এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের কথা কুরআন ও হাদীছে বলা হত। কিন্তু এখন তার উল্টোটাই বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা 'আদ সম্প্রদায় যে বড় বড় সুউচ্চ ঘর নির্মাণ করতো তারই প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ “তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছো নিরর্থক? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছো। এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে।”^{৫৩}

ইবন কাছীর (র.) বলেন, 'আদ সম্প্রদায় তাদের শক্তি ও ধনৈশ্বর্যের নিদর্শন রূপে উঁচু উঁচু প্রসিদ্ধ পাহাড়ের উপর উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। হযরত হুদ (আ.) তাদেরকে এভাবে মাল অপচয় করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, ওটা শুধু মাল অপচয় করা, সময় নষ্ট করা এবং কষ্ট উঠানো ছাড়া কিছুই ছিল না। এতে না ছিল দ্বীনের কোনো উপকার এবং না ছিল কোনো উপকার দুনিয়ার। মনে রেখ দুনিয়া তোমাদেরকে আখিরাতে কথ্য ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমাদের এ মনোবাসনা নিরর্থক।^{৫৪} উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে এরকম ভৎসনা! তাহলে পুণ্যবানদের নিদর্শনাবলির গুরুত্বদান ও পূজা করা কিংবা কবরের উপর মসজিদ কিংবা মাজার নির্মাণ করার উপর তিনি কতইনা অসুস্থ হবেন!? চিন্তা করা দরকার।

নিম্নে ইসলামী আইনে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান এবং এর পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুল্লাতকে ধ্বংস করা হয়

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্বারোপের আরেকটি ধ্বংসাত্মক দিক হলো, সুল্লাতের আদর্শকে বিসর্জন দেয়া। আর এটা হলো বিদ'আতের একটি বৈশিষ্ট্য। কারণ মানুষের অন্তর যখন বিদ'আতে

ভরপুর হয়ে যায় তখন তা সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে যায়।^{৫৫} হাস্সান ইবন আতিয়া (র.) বলেন, "مَنْ" "কোনো জাতি যখন তাদের ধর্মে বিদ'আত সৃষ্টি করবে, তখনই আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ পরিমাণ সুন্নাতকে তাদের থেকে উঠিয়ে নেন।"^{৫৬} আর নিঃসন্দেহে যখন সুন্নাতের মৃত্যু ঘটে তখন বিদ'আত নতুন জীবন লাভ করে। যখনই মিথ্যার উপর আমল করা হয় তখন সত্যের উপর আমল পরিত্যাগ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অনুরূপ তার বিপরীত ব্যাপারও ঘটে থাকে। কারণ দুটি বিপরীত জিনিস এক স্থানে অবস্থান করতে পারে না।^{৫৭} নিম্নে নিদর্শনগত কিছু বিদ'আতের বিবরণ তুলে ধরা হলো যেগুলোর কারণে সুন্নাত ও ওয়াজিবসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়।

এক. কবরের আশেপাশে বসে যা করা হয় তা এবং এই জাতীয় বিদ'আত মানুষকে সুন্নাত, ওয়াজিব এমনকি ফরয থেকেও বিরত রাখে। বরং অনেকে অতিরঞ্জন করে বলে যে, কবরের উপর নিদর্শনাবলির যিয়ারত করা কা'বা শরীফের হজ্জ করার চেয়েও উত্তম। (না'উযুবিল্লাহ) তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, নবী করীম ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বাইতুল্লাহর হজের চেয়ে উত্তম।^{৫৮}

দুই. মর্যাদাপূর্ণ তিন মসজিদ অর্থাৎ মসজিদুল হারাম, মসজিদুন নবী ও মসজিদুল আক্সাকে বাদ দিয়ে মক্কা, মদীনা ও সিরিয়ার অন্যান্য কিছু পাহাড়, স্থান ও নবী এবং পুণ্যবানদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে নামায, দু'আ ইত্যাদি ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা। এরই মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদসমূহে ফরজ ও মাসনুন ইবাদত আদায় করার হক নষ্ট হয়ে যায়।

বিদ'আতে নিপতিত করে

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা, এগুলোর পুনরুজ্জীবিত করা ধর্মের মধ্যে বিদ'আত ছাড়া আর কিছু নয়। কুরআন ও সুন্নাহতে এগুলোর স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই। সালফে-সালিহীনও এইসব কাজ করেননি। যদি এগুলো পুণ্যের কাজ হত তাহলে তারাইতো এতে অগ্রগামী হত। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ" "যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এমন বিষয় উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা পরিত্যাজ্য।"^{৫৯} অন্য বর্ণনায় এসেছে, "مَنْ" "যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করলো যা আমাদের নীতি ধর্মে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"^{৬০}

জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমু'আর ভাষণে বলেন, "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ" "নিশ্চয় উত্তম বাণী হলো كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ" "আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মদ ﷺ-এর হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হলো বিদ'আত-(নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ)। সকল বিদ'আতই হলো পথভ্রষ্টতা।"^{৬১}

যদি গারে হিরা', গারে ছাওর, নবী কারীম ﷺ-এর জন্মস্থান, দারুল আরকাম এবং বায়'আতুর রিদওয়ানের স্থানকে ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়্যতে যিয়ারত করা হয়, তাহলে তা হবে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, **أَمْ هُمْ** "তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"^{৬২} উমর (রা.) আখিয়ারে কিরামের নিদর্শনাবলি অন্বেষণ করতে নিষেধ করেন এবং জনগণকে শিরক ও বিদ'আত থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে হৃদয়বিয়ার সন্ধি যে বৃক্ষের নীচে হয়েছিল তা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন তাঁকে বলা হলো, মানুষ এর যিয়ারত ও সম্মান করে চলছে।^{৬৩}

বিভিন্ন ধরনের মিথ্যার মধ্যে নিপতিত করে

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে এর অনুসারীরা বিভিন্ন ধরনের মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব ঘৃণিত মিথ্যাগুলি নিম্নরূপ:

১ম. আল্লাহ তা'আলা কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে মিথ্যা বলা এটি জঘন্যতম মিথ্যাসমূহের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ﷺ এধরনের মিথ্যাচার থেকে উম্মতকে সতর্ক করে বলেন, **مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ** "যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।"^{৬৪}

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীর ব্যাপারে মিথ্যা বলার কয়েকটি স্বরূপ নিম্নে প্রদান করা হলো।

এক. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর যিয়ারতের ব্যাপারে জালহাদীছসমূহ।

দুই. বায়তুল মাক্দিসের পাথরের ব্যাপারে মিথ্যা হাদীছসমূহ।

তিন. দামেস্কের উমায়ী জামে মসজিদের ব্যাপারে জালহাদীছসমূহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিদর্শনের ব্যাপারে মিথ্যা বলার উদাহরণ হলো, বর্তমান যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাল মুবারক তথা চুল এখনো সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে বলে দাবী করা অথবা কিছু পাথরের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পা মুবারকের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে বলে দাবী করা।

২য়. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী বা তাবি'ঈন কিংবা অন্যান্য পুণ্যবানদের ব্যাপারে মিথ্যাচার। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারটা কখনো কথার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন, বিভিন্ন স্থানের ফযীলত সম্বলিত বর্ণনাসমূহ তাদের নামে চালিয়ে দেয়া অথবা কর্মের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, ইমাম শাফি'ঈ (র.) কোনো বিপদে পতিত হলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর কবরের পাশে বসে দু'আ করতেন। অতঃপর তার দু'আ কবুল করা হত।

৩য়. নিদর্শনের স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে মিথ্যাচার। এটা বিশেষ করে কিছু সাহাবীর কবর, মসজিদ ও জন্মস্থান নির্ধারণের ব্যাপারে হয়ে থাকে। যেমন, মসজিদুল কু'। বলা হয়ে থাকে যে, এটাকে

মসজিদুল কু' এজন্য বলা হয়, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জাতির নির্যাতন থেকে কিছুটা বিশ্রাম লাভের জন্য এখানে তার কু' তথা কুনই মুবারক রেখেছিলেন।^{৬৫} আর মসজিদুর রায়াহ্: বলা হয়ে থাকে, যেই জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর পতাকা গড়েছিলেন।^{৬৬} অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মস্থান নির্ধারণের ব্যাপারটাও একই।^{৬৭}

৪র্থ: শার'ঈ দলীল ছাড়া কোনো স্থান হতে বরকত লাভের দাবি করা।

এর উদাহরণ হলো, কারো কারো ধারণা যে উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা.)-এর ঘর মক্কায়ে মসজিদুল হারামের পর অন্যান্য ঘর হতে উত্তম। আর এখানে দু'আ কবুল হয়। অনুরূপ কিছু কবর, পাহাড় ও নির্দিষ্ট মসজিদের পাশে দু'আ কবুল হওয়ার দাবী করা। অথচ এরই স্বপক্ষে কোনো দলীল নেই।

কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ হয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ." যে কোনো জাতির সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।^{৬৮}

মূলত মুসলমানগণ অতীতে এই সব স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিদর্শনাবলির দিকে ভ্রমক্ষেপ করেননি। এই ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো ভাবও উদয় হয়নি। কিন্তু একসময় পাশ্চাত্যরা এই সব বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু করল এবং স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ হলো। আর এগুলো হলো অমুসলিমদের স্বভাব ও কাজ। আমাদেরকে মুশরিকদের বিরোধিতা করতে বলা হয়েছে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ না করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। শায়খ আব্দুল আযীয ইবন বায (র.) বলেন, এগুলো ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কাজ। আল্লাহ তা'আলা এগুলো থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।^{৬৯}

গোনাহ ও অবাধ্যতায় জড়িয়ে পড়া

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের আরেকটি নেতিবাচক দিক হলো, গোনাহ ও গর্হিত কাজে নিমগ্ন হওয়া। যেমন,

এক. গম্বুজ, মাজার ইত্যাদি নির্মাণে এবং এগুলোকে উত্তম কাপড়ের গেলাফ পরিধান করা ও আলোক সজ্জায় ঢাকা-পয়সা অপচয় করা।

দুই. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থানের ফলে অনেক ফিতনার জন্ম নেয়।

তিন. কবর ও মাজারের পাশে পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতার সয়লাব বৃদ্ধি পায়।

চার. কবরের পার্শ্বে ঢুল-তবলা বাজিয়ে ভাব গানের আসর তৈরি হয়।

পাঁচ. গাঁজা, মদের আসর তৈরি হয়।

শিরকের দিকে নিয়ে যায়

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের করুণ পরিণতির অন্যতম হলো, এটি মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। অথচ শিরক আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ। তিনি বলেন, **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** “নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন।”^{৭০}

এটা শিরকের দিকে দুই অবস্থায় নিয়ে যায়,

প্রথম অবস্থা: এই সমস্ত স্মৃতিবিজড়িত স্থানের পাশে নামায পড়া, এগুলোকে স্পর্শ করে এদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা, এটাকে বরকত ও আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম এবং সুপারিশকার বিশ্বাস করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিরক করা হয়। শায়খ আব্দুল আজীজ ইবন বায (র.) বলেন, উল্লিখিত পন্থায় এইসব নিদর্শনাবলিকে গুরুত্ব দেওয়া আল্লাহ তাআলার সাথে শিরকের নামান্তর।^{৭১}

দ্বিতীয় অবস্থা: নবী-রাসূল ও পুণ্যবানদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। মূলত পৃথিবীতে শিরকের সূচনা হয়েছে এবং মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটেছে মৃত পুণ্যবান ব্যক্তিদের অতি সম্মান করতে গিয়ে।

ইবন জারীর তাবারী (র.) পবিত্র কুরআনের এই আয়াত **وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا** “তারা বলছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসারকে। অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে”^{৭২}—এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বড় বড় মুফাস্সিরদের উক্তি বর্ণনা করে বলেন, “আয়াতে উল্লেখিত ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসার এরা সবাই পুণ্যবান, দ্বীনদার লোক ছিলেন। তাদের কিছু একনিষ্ট অনুসারী ছিল। যখন তাঁরা মারা গেলেন, তখন তাঁদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি করলো, ‘যদি আমরা এঁদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে নিই তবে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে আমাদের ভাল মন বসবে এবং এঁদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং তারা তাই করলো। অতঃপর যখন এ লোকগুলোও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটলো তখন শয়তান তাদের কাছে এসে বললো, তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো ঐ বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের পূজা করতো এবং তাদের নিকট বৃষ্টি ইত্যাদির জন্যে প্রার্থনা করতো। সুতরাং তোমরাও তাই করো! তারা তখন আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে নিয়মিতভাবে ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিলো। এভাবে স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিদর্শনাবলির মাধ্যমে শয়তান একসময় তাদের মাঝে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়।”^{৭৩}

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে কিছু প্রস্তাবনা

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহের ব্যাপারে পস্তাবনা নিম্নে আলোচনা হলো:

জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটানো

জ্ঞানার্জনের মাহাত্ম্য ও আলিমের মর্যাদা সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। আর এখানে জ্ঞান থেকে উদ্দেশ্য ধর্মীয় জ্ঞান। যে জ্ঞান অর্জন করলে একজন মুসলিম তাঁর ধর্মীয় সকল বিষয়, মু'আমালাত, 'ইবাদত ও সর্বোপরি আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।^{৭৪}

আর জ্ঞানার্জনের একটি অবিচ্ছেদ্য দিক হলো, বৃহতাকারে এই জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া, তাদেরকে শিক্ষা দান করা। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ." "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।"^{৭৫} অনুরূপ তিনি বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেন, "لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ." "উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার বাণী পৌছিয়ে দেয়।"^{৭৬} সুতরাং আলিমদের উচিত ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে জ্ঞান বিস্তারের কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং জ্ঞানকে গোপন না করা। বিশেষ করে সমাজে যখন অজ্ঞতা ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়ে। যেন মানুষ সত্য-মিথ্যা বুঝতে পারে এবং সঠিকভাবে তাদের প্রভুর 'ইবাদাত করতে পারে। জ্ঞানের জগতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান হলো, ইলমুল আকীদা। কারণ এই জ্ঞান মানুষকে সঠিক আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দেয়। যে আকীদা-বিশ্বাস সাহাবায়ে কিরাম ও সালাফে সালাহীন পোষণ করতেন। আর এটা জানা বিষয় যে, নিদর্শনাবলির উপর গুরুত্বারোপ এক ধরনের বিদ'আত। সঠিক জ্ঞান প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে এই ধরনের বিদ'আত দূরীভূত হয়ে যাবে ইন্শা'আল্লাহ।

হক ও সঠিক পদ্ধতির প্রতি আহবান করা

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি গুরুত্বারোপ করার নীতি থেকে সরে আসার অন্যতম মৌলিক মাধ্যম হলো, হক ও সঠিক পদ্ধতির প্রতি আহবান করা। এই আহবানের মূলনীতি হলো সংকাজের প্রতি আদেশ ও অসংকাজ থেকে নিষেধ করা। এই জন্য নিম্নের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা যায়।

১. মানুষকে সেই পথের দিশা দেওয়া যার উপর সালাফে-সালাহীন ছিলেন। তাদেরকে বিদ'আত ও কুসংস্কার থেকে বিরত রাখা।

২. দা'ঈগণের উচিত এইসব নিদর্শনাবলি পুনরুজ্জীবিতকরণ ও এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপের যত দাবী আছে সবগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর অকাটি দালীল-প্রমাণের মাধ্যমে খণ্ডন করা এবং ভয়াবহ পরিণতির বিশদ বর্ণনা দেওয়া।

৩. আলিমগণের উচিত সেইসব সন্দেহ-সংশয়কে খণ্ডন করা যেগুলোর উপর ভিত্তি করে এইসব নিদর্শনাবলির সমর্থনকারীরা এগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করে।

৪. যেইসব এলাকায় এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে সেখানে সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ আলিম কিংবা ছাত্রদেরকে গাইডলাইন বা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া। যাতে সাধারণ মানুষদেরকে সর্বাবস্থায় সচেতন করতে পারে।

৫. সুন্দর উপযুক্ত উপদেশমূলক বিলবোর্ড ছেপে কবরস্থান, দর্শনীয় জায়গা, পাহাড় ও মসজিদের পাশে লাগিয়ে দেওয়া যেখানে বিদ্‌আতী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়।

৬. এই বিষয়ে সমসাময়িক বিজ্ঞ আলিমদের ফাতাওয়া বই আকারে প্রকাশ করা। আর পত্রিকার লেখকদের নিকট এই বিষয়ে লেখালেখি করার আহবান জানানো।

৭. যিয়ারতকারীদের সাথে কিংবা হাজীদের সাথে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যারা তাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শনাবলি স্থানসমূহে নিয়ে যায় তাদেরকে এই বিষয়ে ফাতওয়া জানিয়ে দেয়া এবং তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৮. আর এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানী ও কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসরণকারী হওয়া শর্ত আরোপ করা।

স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহকে চিহ্নিত করে দেওয়া

স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের মোকাবেলা করার বাস্তবসম্মত উপকারী অন্যতম মাধ্যম হলো, আশিয়া ও সালিহীনদেরকে কেন্দ্র করে যেসব স্থানে বিদ্‌আতী কর্মকাণ্ড হয় সেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ." "তোমাদের কেউ যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়।" ৭৭ অর্থাৎ হাতের শক্তি প্রয়োগ করে গর্হিত কাজের মোকাবেলা করা ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সক্ষম থাকা সত্ত্বেও এই কাজ না করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে বানু ছাকীফের সেই প্রতিনিধি দলের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। যারা ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে আবেদন করেছিলেন যে, "লাত মূর্তিকে তিন বছর পর্যন্ত অক্ষত রাখার অনুমতি দিতে, যাতে তাদের পরিবার-পরিজন তাদের বিরুদ্ধে না যায় এবং তারাও পর্যায়ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। এরপর একবছর চেয়েছেন তাও অনুমতি

দেননি। এমনকি একমাস চেয়েছেন তাও দেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুগীরা ইবন শু'বা (রা.) এবং আবু সুফিয়ান (রা.)-কে সেই মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন।”^{৭৮}

চিন্তা করে দেখুন বানু ছাকীফ চেয়েছিলেন, তারা যেহেতু নতুন মুসলিম, তারা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াকে ভয় করেছিলেন এবং মূর্তিটি ভেঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকতে চেয়েছিলেন। যাতে ধীরে ধীরে তাদেরকেও দাওয়াত দিয়ে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাল মনে করলেন, শিরকের মূল উৎপাতন করা হোক এবং তিনি তাদের তথাকথিত স্বার্থের প্রতি দ্রুত দৃষ্টিপাত করেননি। ইবনুল কায়্যিম (র.) ছাকীফ গোত্রের ঘটনার উপকারিতা বলতে গিয়ে বলেন, সক্ষম থাকা সত্ত্বেও শিরক ও কুফরের চিহ্ন অবশিষ্ট রাখা বৈধ নয়। যেহেতু এটি নিকৃষ্ট অপকর্ম। সুতরাং পূর্ণশক্তি থাকলে শিরক ও কুফরের নিদর্শন রাখা সম্পূর্ণ হারাম।^{৭৯}

উপসংহার

উল্লেখিত আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান করতে গিয়ে আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যুগে যুগে নবী-রাসূল ও ইসলামের খালীফাগণ এর বিধান সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর জাতির মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছেন, তিনি বলেছিলেন, ﴿وَاللّٰهُ لَا يَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ “আল্লাহর কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব”।^{৮০} ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطَفُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ “অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে ঢুকল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না কেন? তোমাদের কি হলো যে, কথা বলছ না? অতঃপর সে প্রবল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল”।^{৮১} হযরত মূসা (আ.) গোবৎসকে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, যেটাকে তাঁর উম্মতের লোকেরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত পূজা করত। তিনি বলেন, ﴿وَانْظُرْ إِلَىٰ إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾ “তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ কর, যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওটিকে জ্বালিয়ে দিবই, অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই”।^{৮২}

আর মাক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরে থাকা মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।^{৮৩} আর মদীনার ‘মসজিদুদ দিরার’-কে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।^{৮৪} কোনো কোনো খালীফা মদের স্থানসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বাজারের নকল দ্রব্য ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আর উমর

(রা.) হুদায়বিয়ায় যে গাছের নীচে ‘বায়’ আতুর রিদওয়ান’ সংঘটিত হয়েছিল তা কেটে ফেলেছিলেন শিরকের আশঙ্কায়। এভাবে আরো অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

সুস্পষ্ট হলো, স্মৃতিবিজড়িত স্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে যদি ইসলামী শরীআতের কোন বিধান নষ্ট হয় তাহলে এ থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে রাষ্ট্র যদি কেবলমাত্র পর্যটন বা বাণিজ্যিকভাবে চিন্তা করে স্মৃতিবিজড়িত স্থানের সংরক্ষণ করে কিংবা যথাযথ মর্যাদায় বহাল রাখতে চায় তবে এতে সাধারণভাবে কোনো অসুবিধা হবে না।

তথ্যপঞ্জি:

১. আল-বা‘আলাবাকী, ড. রুহী, *আল-মাওরিদ*, (বৈরুত: দারুল ‘ইলম লিলমাল্লা’ঈন, ৬ষ্ঠ সং, ২০০২ খ্রি), পৃ. ৩৪; Elias A. Elias & Ed. Elias, *ELIAS MODERN DICTIONARY* (Bairut: Darul jail, 1st edition, 1984), p.20।
২. মাজমূ‘উল লুগাতিল ‘আরাবিয়াহ, ‘আল-মু‘জামুল ওয়াসীত, খ. ১ (ভারত-দেওবন্দ: হুসায়নিয়া কুতুবখানা, ৭ম সং, ১৯৯৬ খ্রি), পৃ. ৫।
৩. ইবন তায়মিয়া, ‘আহমদ ইবন ‘আদিল হালীম, *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া*, তাহ: ‘আনওয়ারুল বায, আমিরুল জায্যার, খ. ১৮ (সৌদিআরব: দারুল ওয়াফা, ৩য় সং, ১৪৩৬ হি), পৃ. ১১।
৪. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া*, খ. ২৬, পৃ. ১৪৪।
৫. আল-কুরআন, সূরাতুল ‘ইসরা’, ১৭ : ৮১।
৬. সূরাতুল সাবা’, ৩৪ : ৪৯।
৭. আল-বুখারী, মুহাম্মদ, *আস-সহীহ*, তাহ: ড. মুস্তাফা দিব বুঘা, খ. ৪ (বৈরুত: দারুল ইবন্ কাছীর, ৩য় সং, ১৪০৭ হি/ ১৯৮৭ খ্রি), কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু কাওলিহি, ওয়া কুল জা‘আল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল, হা নং ৪৪৩৪, পৃ. ১৭৪৯।
৮. ইবন বায, ‘আব্দুল ‘আযীয, *মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ইবন বায*, ইশরাফ: মুহাম্মদ ইবন সা‘দ শুওয়াই‘আর, খ. ৩ (আর-রিয়াদ: আর-রি‘আসাতুল ‘আম্মা লিলবাহ্ছিল ‘ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতা, তাবি), পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।
৯. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া*, খ. ২৭, পৃ. ১৭০-১৭১।
১০. প্রাগুক্ত, খ. ২৭, পৃ. ১৭১।
১১. ইবন তায়মিয়া, ‘আহমদ, *ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম*, তাহ: নাসির আব্দুল কারীম আকল, খ. ২৩ (বৈরুত: দারুল ‘আলামিল কুতুব, ৭ম সং, ১৪১৯ হি/ ১৯৯৯ খ্রি), পৃ. ২।
১২. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ‘উল ফাতাওয়া*, খ. ২৭, পৃ. ১৭১; ইবন বায, *মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ইবন বায*, খ. ১, পৃ. ৪০৪।
১৩. মাহমুদ শাকির, *শিবহ জাযীরাতিল ‘আরব*, খ. ৪ (বৈরুত: দারুল সাদির, ১ম সং, ১৩০৫ হি), পৃ. ১১৮৮।
১৪. ইবন খালদুন, ‘আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ, *তারিখু ইবন খালদুন*, তাহ: খালীল শাহ্হাদা, খ. ১ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২য় সং, ১৪০৮ হি/ ১৯৮৮ খ্রি), পৃ. ৪৩১-৪৩২।

১৫. ইনি একজন ওরিয়েন্টলিস্ট পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মহানায়ক।
১৬. জারীশা, 'আলী মুহাম্মদ, 'আসালীবুল গায়বিল ফিকরী, খ. ১ (বৈরুত: দারুল তুরাখিল 'আরবী, তাবি), পৃ. ৭৮।
১৭. মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহাব, আল-খুতাবুল মিসরিয়া, তাহ: সালিহ আল-আতরাম, খ. ৩ (রিয়াদ: মাতাবি'উর রিয়াদ, তাবি), পৃ. ৮৫-৮৬।
১৮. সূরাতুন নিসা', ৪ : ১৭১।
১৯. সূরাতুল মায়িদাহ, ৫ : ৭৭।
২০. ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে নিম্ন নামে পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন "দ্বীনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন, তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া, বাড়াবাড়ি করা এবং বিদা'আত অপছন্দনীয়" কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে কিতাবীরা! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলো না (সূরাতুন নিসা, ৪ : ১৭১)। ইমাম বুখারীর দলীলকৃত আয়াতে 'আহলে কিতাব' শব্দটি ব্যাপক। যাতে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ব্যতীত অন্যরাও অন্তর্ভুক্ত। দ্র. 'আশূর, মুহাম্মদ আত-তাহির, মাকাসিদুশ শারী' আহ আল-ইসলামিয়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪০৫ হি), পৃ. ৬০।
২১. আন-নাসা'ঈ, 'আহমদ, আস-সুনানুস সুগরা, তাহ: ড. 'আবদুল ফাত্তাহ, খ. ৫ (হালব: মাকতাবাতুল মাতবু'আতুল 'ইসলামিয়াহ, ২য় সং, ১৪০৬ হি/ ১৯৮৬ খ্রি), কিতাবু মানাসিকিল হজ্জ, বাবু ইলতিকাতিল হাসা, হা নং ৩০৫৭, পৃ. ২৬৮; আল-হাকিম, মুহাম্মদ, আল-মুস্তাদরাক 'আলাস-সহীহায়ন, তাহ: মুস্তাফা 'আতা, খ. ১ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪১১ হি/ ১৯৯০ খ্রি), হা নং ১৭১১, পৃ. ৬৩৭; ইবন হিব্বান, মুহাম্মদ, সহীহ 'ইবন হিব্বান, তাহ: শু'আয়ব আরনাউত, খ. ৯ (বৈরুত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সং, ১৪১৪ হি/ ১৯৯৩ খ্রি), হা নং ৩৮৭১, পৃ. ১৮৩।
২২. ইবন তায়মিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া, খ. ১৭, পৃ. ৪৬০-৪৬১; ইবন তায়মিয়া, আর-রাঈ আললাল মুনতিকীন, খ. ১ (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ২৮৫।
২৩. আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাতি ফিল বি'আতি, হা নং ৪২৪, পৃ. ১৬৭; মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াদি'ইত সালাত, বাবুন নাহই 'আন বিনাই মাসাজিদি ফিল কুবুর, হা নং ৫২৮, পৃ. ৩৭৫।
২৪. সূরাতুন নাজম, ৫৩ : ১৯।
২৫. আত-তাবারী, মুহাম্মদ, জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঈল কুরআন, তাহ: 'আহমদ মুহাম্মদ শাকির, খ. ২২ (বৈরুত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২০ হি/ ২০০০ খ্রি), পৃ. ৫২৩।
২৬. ইবন কাছীর, 'ইসমা'ঈল, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, খ. ৪ (কায়রো: 'আল-মাকতাবুস সাকাফী, ১ম সং, ২০০১ খ্রি), পৃ. ২৫৩।
২৭. ইবন তায়মিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া, খ. ১৭, পৃ. ৪৬০-৪৬১।
২৮. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, খ. ৪, পৃ. ৪২৭; আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, কিতাবু তাফসীরিল কুরআন, বাবু ওয়াদদান ওয়া লা সুওয়া'আন ওয়া লা ইয়াগুছা ওয়া ইয়া'উকা, হা নং ৪৬৩৬, পৃ. ১৮৭৩।
২৯. আল-আনসারী, আব্দুল কুদ্দুস, 'আছারুল মাদীনাতিল মুনাওয়ারা (আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারা: আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়াহ, ৪র্থ সং, ১৪০৬ হি), পৃ. ১৩১।

৩০. সূরাতু আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪।
৩১. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মান আজাবাল ফুতইয়া বিইশারাতিল ইয়াদি, হা নং ৮৫, পৃ. ৪৪।
৩২. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওয়ীয়াহ্, মুহাম্মদ ইবন আবী বকর, *ইগাছাতুল লাহফান*, তাহ: মুহাম্মদ হামিদ ফাকী, খ. ১ (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ২য় সং, ১৩৯৫ হি/ ১৯৭৫ খ্রি), পৃ. ২১৪-২১৫।
৩৩. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওয়ীয়াহ্, মুহাম্মদ, *যাদুল ম'আদ ফী হাদই খাইরিল* 'ইবাদ, খ. ৩ (বৈরুত: মু'আস-সাসাতুর রিসালাহ্, ২য় সং, ১৪১৫ হি/ ১৯৯৪ খ্রি), পৃ. ৫০৭।
৩৪. ইবনুল জাওয়ী, 'আব্দুর রহমান ইবন 'আলী, *তালবীসু ইবলীস*, খ. ১ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১ম সং, ১৪২১ হি/ ২০০১ খ্রি), পৃ. ১২১।
৩৫. আল-কারাফী, 'আহমদ ইবন ইদরীস, *আল-ফুরক*, তাহ: খালীল আল-মানসূর, খ. ৪ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ্, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৮ খ্রি), পৃ. ৪৪৯।
৩৬. ইবনুল কায়্যিম আল-জাওয়ীয়াহ্, *ইগাছাতুল লাহফান*, খ. ১, পৃ. ২১৪।
৩৭. আন-নাজদী, মুহাম্মদ ইবন আব্দিল ওয়াহ্‌হাব, *মুখ্তাসারু সীরাতির রাসূল* (সৌদি 'আরব: ওয়াযারাতুশ শুউনুল ইসলামিয়াহ্, ১ম সং, ১৪১৮ হি), পৃ. ৭; আত-তামীমী, মুহাম্মদ ইবন খালীফা, *হাক্কুন নাবী 'আলা উম্মাতিহি ফী দাউইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্*, খ. ১ (রিয়াদ: আদওয়াউস সালাফ, ১ম সং, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৭ খ্রি), পৃ. ৪৮।
৩৮. আলুশ-শায়খ, 'আব্দুল লাতিফ ইবন 'আব্দির রহমান, *তুহফাতুল তালিব ওয়াল জালীস*, খ. ১ (তাবি), পৃ. ৪৫।
৩৯. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়া মাওয়াযিদ ইত সালাত, বাবুন নাহই 'আন বিনাই মাসাজিদ ফিল কুবুর, হা নং ৫৩১, পৃ. ৩৭৭।
৪০. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২৭, পৃ. ৪৬১।
৪১. আস-সায়্যিদ 'আহমদ রিফ'আত, *আত-তুরকুস সুফিয়াহ্ বাইনাস সাসা ওয়াস সিয়াসাহ্*, (তাবি), পৃ. ১২৮।
৪২. আন-নদবী, আবুল হাসান আলী আল-হাসান, *আল-কাশফ আন হাকীকাতিস সুফিয়াহ্*, (তাবি), পৃ. ৭৮০।
৪৩. ইবন তায়মিয়া, 'আহমদ, *আল-ইস্তিকামাহ্*, তাহ: ড. মুহাম্মদ রশাদ সালিম, খ. ১ (আল-মাদীনাতুর মুনাওয়ারাহ্: জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মদ ইবন সাউদ, ১ম সং, ১৪০৩ হি), পৃ. ৪৩।
৪৪. ইবন তায়মিয়া, 'আহমদ, *মিনহাজুস সুন্নাহ্ আন-নাবাবীয়াহ্*, তাহ: ড. মুহাম্মদ রশাদ সালিম, খ. ১ (মিসর: মু'আসসাসাতু কুরতুবা, ১ম সং, তাবি), পৃ. ৩৪১।
৪৫. ইবন তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ৪, পৃ. ৫১৭-৫১৮।
৪৬. ইবন হাজার, 'আহমদ, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*, খ. ৭ (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি), পৃ. ১৫১; আল-খুলতী, 'ইসমা'ঈল হাক্কী ইবন মুস্তাফা, *রুহুল বায়ান*, খ. ৩ (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি), পৃ. ৪৩৯।
৪৭. আত-তিরমিযী, মুহাম্মদ, *আস-সুনান*, তাহ: 'ইবরাহীম 'আতুয়া, খ. ৪ (মিসর: মাকতাবাতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালবী, ২য় সং, ১৩৯৫ হি/ ১৯৭৫ খ্রি), আবওয়াবুল ফিতান, বাবু মা জা'আ ফীল আইম্মাতিল মুদিল্লীন, হা নং ২২২৯, পৃ. ৫০৪; আবু দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, তাহ: শু'আয়ব আরনাউত, খ. ৬ (বৈরুত: দারুল রিসালাহ্ আল-'আলামিয়াহ্, ১ম সং, ১৪৩০ হি/ ২০০৯ খ্রি), কিতাবুল ফিতান, যিকরুল ফিতানি ওয়া

- দালাইলিহা, হা নং ৪২৫২, পৃ. ৩০৬; আশ-শায়বানী, 'আহমদ, মুসনাদু 'আহমদ, তাহ: শু'আয়ব 'আরনাউত, খ. ৩৭ (বৈরুত: মু'আস-সাসাতুর রিসালাহ, ১ম সং, ১৪২১ হি/ ২০০১ খ্রি), হা নং ২২৩৯৩, পৃ. ৭৭।
৪৮. আদ-দারামী, 'আব্দুল্লাহ, সুন্নাহুদ দারামী, তাহ: হুসায়ন সালীম 'আসাদ, খ. ১ (সৌদি 'আরব: দারুল মুগনী, ১ম সং, ১৪১২ হি/ ২০০০ খ্রি), মুকাদ্দামা, বাবুন ফী কারাহিয়াতি আখ্বির রাই, হা নং ২২০, পৃ. ২৯৫।
৪৯. ইবন তায়মিয়া, মাজমু'উল ফাতাওয়া, খ. ২৭, পৃ. ১২।
৫০. ইবন তায়মিয়া, 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, খ. ২, পৃ. ৩৪৮।
৫১. আল-'আব্বাসী, 'আহমদ ইবন 'আব্দিল হামীদ, 'উমদাতুল 'আখ্বার ফী মাদীনাতিল মুখতার (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪০২ হি), পৃ. ১২৪।
৫২. সূরাতুল 'আ'আম, ৬ : ১১; সূরাতুন নাম্বল, ২৭ : ৬৯; সূরাতুর রুত, ৩০ : ৪২।
৫৩. সূরাতুশ শু'আরা, ২৬ : ১২৮-১২৯।
৫৪. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮।
৫৫. ইবন তায়মিয়া, 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, খ. ১, পৃ. ৩৮৩।
৫৬. আদ-দারামী, সুন্নাহুদ দারামী, খ. ১, মুকাদ্দামা, বাবু ইত্তিহাইস সুন্নাহ, হা নং ৯৯, পৃ. ২৩১।
৫৭. আস-সিকাক, 'আলাবী ইবন আব্দির কাদির, মুখতাসারু কিতাবিল 'ই'তিসাম, খ. ১ (রিয়াদ: দারুল হিজরাহ, ১ম সং, ১৪১৮ হি/ ১৯৯৭ খ্রি), পৃ. ৩৩।
৫৮. ইবন তায়মিয়া, 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, খ. ১, পৃ. ৩৮২।
৫৯. আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, কিতাবুস সুলাহি, বাবু ইয়াস তালাহ 'আলা জুরিন, হা নং ২৫৫০, পৃ. ৯৫৯; মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নাকদিল আহকামিল বাতিলাহ, হা নং ১৭১৮, পৃ. ১৩৪৩।
৬০. মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, কিতাবুল আকদিয়া, বাবু নাকদিল আহকামিল বাতিলাহ, হা নং ১৭১৮, পৃ. ১৩৪৩।
৬১. মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২, কিতাবুল জুযু'আতি, বাবু তাখফীফিস সালাতি ওয়াল খুতবাতি, হা নং ৮৬৭, পৃ. ৫৯২।
৬২. সূরাতুশ শুরা. ৪২ : ২১।
৬৩. আল-জুদা'ই, ড. নাসির, আত-তাবাররুক 'আনওয়াউহ ও 'আহকামুহ (রিয়াদ: দারুল 'আতা, ১ম সং, ১৪২২ হি), পৃ. ৪৯০-৪৯২।
৬৪. আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, কিতাবুল জানাইযি, বাবু মা ইয়ুকরাহ মিনান নিয়াহাতি, হা নং ১২২৯, পৃ. ৪৩৪; মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, মুকাদ্দামাতুল মুসলিম, বাবু ফীত তাহযীরি মিনাল কাযিবি আলা রাসূলিল্লাহ, হা নং ৩, পৃ. ১০।
৬৫. বাদীন, ড. মুহাম্মদ আহমদ, দিরাসাত ফী আছারিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ আস-সা'উদিয়্যাহ (রিয়াদ: দারুল ওয়াফা, ১ম সং, ১৪০১ হি), পৃ. ১০১।
৬৬. বাদীন, দিরাসাত ফী আছারিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ, পৃ. ৯২।
৬৭. বাদীন, দিরাসাত ফী আছারিল মামলাকাতিল আরাবিয়্যাহ, পৃ. ৯৫।
৬৮. আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ১, কিতাবুল লিবাস, বাবুন ফী লিবাসিশ শুহরাতি, হা নং ৪০৩১, পৃ. ১৪৪; আল-আযদী, মু'আম্মার ইবন আবী 'আমর রাশিদ, জার্মি' মু'আম্মার ইবন রাশিদ, তাহ: হাবীবুর রহমান আল-'আ'জামী, খ. ১১ (পাকিস্তান: আল-মাজলিসুল 'ইলমী, ২য় সং, ১৪০৩ হি), হা নং ২০৯৮৬, পৃ. ৪৫৩; ইবন

- আবী শায়বা, 'আব্দুল্লাহ, আল-মুসান্নিফ ফীল 'আহাদীছি ওয়াল 'আছার, তাহ: কামাল ইউসুফ আল-হুত, খ. ৬ (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম সং, ১৪০৯ হি), হা নং ৩৩০১৬, পৃ. ৪৭১।
৬৯. ইবন বায, মাজমু'উ ফাতাওয়া ইবন বায, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮।
৭০. সূরাতুন নিসা', ৪ : ৪৮, ১১৬।
৭১. ইবন বায, মাজমু'উ ফাতাওয়া ইবন বায, খ. ৩, পৃ. ৩৩৬।
৭২. সূরাতু নূহ, ৭১ : ২৩-২৪।
৭৩. আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঙ্গিল কুরআন, খ. ২৩, পৃ. ৬৩৯।
৭৪. ইবন হাজার, ফাতহুল বারী শারহ সাহীহিল বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৪১।
৭৫. আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৪, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু খাইরু'কুম মান তা'আল্লামাল কুরআনা ওয়া 'আল্লামাহ, হা নং ৪৭৩৯, পৃ. ১৯১৯।
৭৬. আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, কিতাবুল 'ইল্ম, বাবু কাওলিন নাবী, রুব্বা মুবাল্লাগিন আও'আ মিন সামি'ইন, হা নং ৬৭, পৃ. ৩৭।
৭৭. মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, কিতাবুল 'ঈমান, বাবু বায়ানি কাওলিন নাহই আনিল মুনকারি মিনাল 'ঈমান, হা নং ৪৯, পৃ. ৬৯।
৭৮. ইবন সা'আদ, মুহাম্মদ, আত-তাবকাতুল কুবরা, তাহ: ইহ্সান 'আব্বাস, খ. ৫ (বৈরুত: দারু সাদির, ১ম সং, ১৯৬৮ খ্রি), পৃ. ৫৫; আত-তাবারী, মুহাম্মদ ইবন জারীর, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ. ২ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১ম সং, ১৪০৭ হি), পৃ. ১৮০।
৭৯. ইবন কায়্যিম আল-জাওযীয়াহ, যাদুল ম'আদ ফী হাদই খায়রিল 'ইবাদ, খ. ৩, পৃ. ৫০৬।
৮০. সূরাতুল আশিয়া, ২১ : ৫৭।
৮১. সূরাতুস সাফ্যাত, ৩৭ : ৯১-৯৩।
৮২. সূরাতু তোয়াহা, ২০ : ৯৭।
৮৩. আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, কিতাবুল মাজালিম, বাবু হাল তু'কসারুদ দিনানুল্লাতী ফীহাল খাম্বুর, হা নং ২৩৪৬, পৃ. ৮৭৬; মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়াহ, বাবু 'ইযালাতিল 'আস্‌নাম মিন হাওলিল কা'বা, হা নং ১৭৮১, পৃ. ১৪০৮।
৮৪. আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান 'আন তা'বীলি আ'ঙ্গিল কুরআন, খ. ১৪, পৃ. ৪৬৮; ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম, খ. ২, পৃ. ৩৮৮।

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ

ড. সুদীপ্তা বড়ুয়া*

প্রতিপাদ্যসার

মানব সভ্যতার প্রারম্ভকাল থেকে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি? উত্তর পেয়েছে যে, মৃত্যুর পর সব শেষ হয়ে যায় না, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে। তখন জানতে চাওয়া হলো, কী বা কে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে? উত্তর হলো ‘আত্মা’। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রে আত্মার স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কারো মতে, জগৎ ও আত্মা শ্বশত; কারো মতে, আত্মা আংশিক স্থায়ী ও আংশিক অস্থায়ী। কারো মতে, আত্মার অন্ত আছে, কারো মতে আত্মা অনন্ত। কারো মতে, আত্মা ও জগৎ অকারণ সম্বৃত; কারো মতে মৃত্যুর পর জীব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। আবার কারো মতে, আত্মা বলতে কিছুই নেই, মৃত্যুর পর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। যখন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র এসব বিভিন্ন মতবাদে পরিপূর্ণ হয়েছিল, ভারতের সেই যুগসন্ধিক্ষণে তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি ভারতীয় দার্শনিক ভাব ধারায় সম্পূর্ণ নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি ভারতীয় ধর্মদর্শনের চিরাচরিত বহু মতবাদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে নতুন মত প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে আত্মবাদ অন্যতম। গৌতম বুদ্ধ আত্মা সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বললেন, জগতে আত্মা নামক কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই। এই আত্মবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধের যে মতবাদ এটিকে বলা হয় ‘অনাত্মবাদ’। আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তথ্য উপাত্তগুলোতে প্রাথমিক উৎস এবং দ্বিতীয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তগুলো পালিভাষায় লেখা, তবে সব গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয়িক উৎস হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শন আত্মাকে স্বীকার করে না। ভারতীয় সবকটি দর্শন আত্মাকে স্বীকার করে এবং জীবের মৃত্যুর পর অশরীরী আত্মা কর্মানুযায়ী পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। বৌদ্ধদর্শন এ মত সমর্থন করে না। তথাগত বুদ্ধ কেন বহুকালের

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচলিত বিশ্বাসকে পুরোপুরি অস্বীকার করে ‘অনাত্মবাদ’ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ওপর তথ্যনির্ভর আলোচনা করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ অনাত্মবাদের সপক্ষে যারা যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ভদন্ত নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্ডের কথোপকথন, আচার্য নাগার্জুন, আচার্য অসঙ্গ, আচার্য বসুন্ধু, আচার্য ধর্মকীর্তি, Ven.Walola Rahula, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনে ‘আত্মবাদ’ ও ‘অনাত্মবাদ’ দার্শনিক সিদ্ধান্তে ভিন্নতর মতবাদ লক্ষ করা যায়। শ্বাশত আত্মায় বিশ্বাসী দর্শনই হচ্ছে আত্মবাদী দর্শন। আর শ্বাশত আত্মায় বিশ্বাসহীন দর্শনকে অনাত্মদর্শন বলে। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধদর্শনই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না; তাই এটিকে অনাত্মবাদী দর্শন বলা হয়। বলা যায়, আত্মাবাদের বিপরীত মতবাদই হলো অনাত্মবাদ। ভারতীয় সবকয়টি দর্শনই আত্মবাদে বিশ্বাসী; যদিও বিভিন্ন দর্শন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম আত্মার অস্তিত্বকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন। বস্তুত ধর্মসমূহে আত্মা এক কল্পনা বিশেষ। তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, “ভিক্ষুগণ! এই ধর্ম (বস্তু) ই আত্মা। ভিক্ষু! আমার সেই আত্মা অক্ষব, অন-আশ্বাসিক, বিপরিনামী (বিকার) এখানে সংস্কার (কৃত বস্তু ঘটনা) সমূহেই সত্ত্বের কল্পনা বুঝতে হবে। জগতে ব্যবহারের সুবিধার্থে এরূপ করা হয়। বস্তুত সত্ত্ব বা আত্মা নামের কোনো বস্তু কিছু নেই (সাংকৃত্যায়ন ২০১২, ৮৮)।

ভারতীয় দর্শনে আত্মা

মানব সভ্যতার উষালগ্ন হতে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করেছে যে মৃত্যুর পরে মানুষের কোনো অস্তিত্ব থাকে কিনা। ভারতীয় সবকয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন যে, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম আছে এবং পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ‘আত্মা’। মানুষের দেহ পঞ্চস্কন্ধের তথা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টিমাত্র, যাকে নাম-রূপ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধের একমাত্র পরিচালক হচ্ছে আত্মা। গীতায় আত্মাকে অবিনশ্বর, অক্ষয়, অব্যয় ও নিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। মানব জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করার ন্যায় মৃত্যুর পর দেহকে ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। এই দেহীকে বলা হয়েছে আত্মা - যা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, নিত্য, সর্বগামী, স্থিরস্বভাব, অচল এবং সনাতন।^১

বৌদ্ধ দর্শন ব্যতীত ভারতীয় অপরাপর দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত। এ মতের ভিত্তি হলো উপনিষদ বা বেদান্ত। চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শন বেদ বিরোধী বিধায় এ দুইটিকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়। কিন্তু চার্বাক দর্শন দেহাতিরিক্ত সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। চার্বাক মতে আত্মা চৈতন্যময় ও অসংখ্য। মানবদেহ ছাড়াও প্রতিটি জীবদেহে, গাছপালায় এমন কি ধূলিকণাতেও আত্মা বিদ্যমান বলে চার্বাকবাদীদের অভিমত। তাঁদের মতে, দেহ উৎপত্তি, বিনাশশীল ও জড়। আত্মাও উৎপত্তি-বিনাশশীল ও জড়। কারণ দেহই আত্মা (সেন ১৯৮৫, ১০৪)। তবে চার্বাকরা দেহাতিরিক্ত কোনো সত্তা আছে বলে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে দেহ ও আত্মা অভিন্ন; দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ হয়। জৈন দর্শনও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। জৈনদের মতে আত্মা অসংখ্য। তাঁরা বলেন, যদি একাধিক আত্মা না থাকতো, যদি একই আত্মা সর্বভূতে বিরাজ করতো তাহলে এক জীব হতে অন্য জীব আলাদা করার উপায় থাকতো না। জীবের কর্মফলও বিভিন্ন হতো না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কিংবা পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এসবের ভেদাভেদও থাকতো না। পাপ-পুণ্যের ফলাফলেও ভেদাভেদ থাকতো না (সান্যাল ২০০২, ৯৪)। সাংখ্য ও যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনও দেহ ও মন থেকে পৃথক অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সাংখ্য ও যোগ

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ

দার্শনিকরা যেখানে আত্মাকে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ মনে করেন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে চৈতন্য আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। দেহের সংস্পর্শে এলেই শুধুমাত্র আত্মা চৈতন্যময় হয় (চাকমা ১৯৯০, ৬৭)। সাংখ্য দর্শন মতে, পুরুষ বা আত্মা দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়, ইন্দ্রিয়ও নয়। আত্মা এসব থেকে পৃথক। দেহের মধ্যে যিনি বাস করেন তিনিই আত্মা বা পুরুষ। পুরুষ হচ্ছে এক স্বতন্ত্র সত্তা, যা সবসময়ই জ্ঞাত কিন্তু কখনো জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় নয়। আত্মা হলো ‘চৈতন্যস্বরূপ’। বিশুদ্ধ চেতনাই আত্মা (সান্যাল ২০০২, ২৬৭-২৬৮)। যোগ দর্শনেও আত্মার ধারণা সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ। যোগদর্শন মতে আত্মা দেহ, মন ও বুদ্ধির এক অতিরিক্ত, এক বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আধ্যাত্মিক সত্তা। সাংখ্য দর্শনের সাথে যোগদর্শনের আত্মবাদে মিল লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণায় সামঞ্জস্য রয়েছে। নৈয়ায়িকদের মতে, আত্মা হলো অচেতন দ্রব্য, এই দ্রব্যকে আশ্রয় করেই চেতনা অবস্থান করে। তাঁদের মতে চৈতন্য আত্মার স্বাভাবিক গুণ নয় কিংবা অপরিহার্য বা অবিচ্ছেদ্য গুণও নয়। আত্মা সাধারণত অচেতন ও নিষ্ক্রিয়। আত্মা যখন মনের সঙ্গে, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় তখন আত্মায় চেতনা বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। বুদ্ধি, সুখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি মানসিক অবস্থাগুলো হলো কতকগুলো গুণ। এই গুণগুলো কোনো দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকবে এবং এই দ্রব্যই হলো আত্মা (সেনগুপ্ত ১৯৯৯, ২৪৮)। নৈয়ায়িকরা হলেন বস্তুবাদী। তাঁরা বলেন, আত্মা অতিভৌতিক দ্রব্য। এক একটি বিশেষ আত্মা এক একটি দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। আত্মা হলো শাস্বত এবং সর্বদ্রব্যাপী। আত্মাকে দেহ ও কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। বৈশেষিকরা বলেন, আত্মা হলো এক শাস্বত এবং সর্বদ্রব্যাপী দ্রব্য এবং জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়। আত্মা দু’প্রকার; জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। পরমাত্মা হচ্ছেন ঈশ্বর। পরমাত্মা জীবাত্মা থেকে স্বতন্ত্র এবং এই আত্মা বিশ্বস্বরূপ ও শুদ্ধাত্মা। পরমাত্মাই জগতের সৃষ্টি-ধ্বংসকর্তা। তিনি রূপহীন, প্রত্যক্ষের বিষয় নন। তাঁর অস্তিত্ব অনুমান ও শব্দ প্রমাণগম্য। প্রত্যেক জীবে রয়েছে একটি করে আত্মার অধিষ্ঠান।

সুতরাং আত্মা বিদ্যুৎ হলেও শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। আত্মা নিত্য, শাস্বত, বিনাশহীন। জীবের দেহের যখন বিনাশ হয় তখন আত্মা অন্য দেহ ধারণ করে (সেনগুপ্ত ১৯৯৯, ২১০-২১১)। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন মতে আত্মা বহু। জীবের মধ্যে বৈষম্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই উভয় দর্শন মতে আত্মা স্বরূপতঃ অচেতন, দেহের সংস্পর্শে এসে আত্মা চেতনা লাভ করে।

ভারতীয় দর্শনে আত্মার স্বরূপ সংক্ষেপে মূল্যায়ন করেছেন প্রফেসর নীরু কুমার চাকমা। তিনি বলেন, সাংখ্য ও যোগ, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকরাও দেহ ও মন থেকে স্বতন্ত্র অসংখ্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে সাংখ্য ও যোগ দার্শনিকরা যেখানে আত্মাকে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলে মনে করেন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদের মতে চৈতন্য আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ নয়। দেহের সংস্পর্শে এলেই শুধু মাত্র আত্মা চৈতন্যময় হয়। মীমাংসা আত্মাকে একটি সর্বদ্রব্যাপী, নিত্য ও অবিনশ্বর সত্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন। বেদান্ত দর্শনে আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অমর, অনন্ত ও অনাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্তে আত্মা বলতে ব্রহ্মকে বোঝানো হয়েছে; অপরদিকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয় বলে বলা হয়েছে। অন্যকথায়, অদ্বৈত বেদান্তিকদের মতে ব্রহ্ম ও আত্মার সম্পর্ক হল অভেদের; বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের মতে আত্মা ও ব্রহ্মের সম্পর্ক হল ভেদ ও অভেদের (১৯৯০, ৬৭)।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় উক্ত দার্শনিকসম্প্রদায় সমূহের মধ্যে আত্মা সম্পর্কে মত পার্থক্য তেমন খুব একটা নেই। তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, আত্মা হলো দেহাতিরিক্ত চৈতন্যময় এক শাস্বত সত্তা। আত্মা সম্পর্কিত উক্ত মতবাদের ব্যতিক্রম হলো চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চার্বাক দর্শন

দেহাতিরিক্ত কোনো সত্তায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে, দেহ ও আত্মা অভিন্ন, দেহ বিনাশ হলে আত্মারও বিনাশ ঘটে। অপরদিকে বৌদ্ধ দর্শন আত্মা স্বীকারই করেন না।

বৌদ্ধ দর্শনে আত্মার স্বরূপ

বুদ্ধ ছিলেন নৈরাশ্রবাদী, বুদ্ধ কোনো শাস্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেননা বুদ্ধের মতে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। বুদ্ধের যুক্তি হলো যেসব উপাদানের সমন্বয়ে মানবদেহ গঠিত তার প্রত্যেকটি অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধকে পুঞ্জানুপুঞ্জ ভাবে বিশ্লেষণ করলে কোনো শাস্ত্র আত্মার অস্তিত্ব খোঁজে পাওয়া যায় না। মানবের রূপ বা দেহ নিত্য নহে; যা নিত্য নহে তা অবিনশ্বর বা অনিত্য। যা অনিত্য তা দুঃখপ্রদ। যা অনিত্য ও দুঃখপ্রদ এবং পরিবর্তনশীল তাকে শাস্ত্র ‘আত্মা’ বলা যায় না। ক্ষুদ্রবেদন সূত্রে বুদ্ধ আত্মবাদ সম্পর্কে বলেন,

আত্মা রূপবান, আত্মায় রূপ, রূপে আত্মা, আত্মা বেদনাবান, আত্মায় বেদনা, বেদনায় আত্মা, আত্মা সংজ্ঞাবান, আত্মায় সংজ্ঞা, সংজ্ঞায় আত্মা, আত্মা সংস্কারবান, আত্মায় সংস্কার, সংস্কারে আত্মা, আত্মা বিজ্ঞানবান, আত্মায় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে আত্মা। এভাবে পঞ্চস্কন্ধের প্রত্যেকটিতে অথবা সবকয়টিতে যে চিন্তা ও বিশ্বাস তাকে সৎকায় দৃষ্টি বা আত্মবাদ বলে (সাধন কমল চৌধুরী ১৪১৫, ১৮৩)।

বুদ্ধ অলগর্দোপম সূত্রে বলেছেন,

এই রূপ আমার, আমিই রূপ, এটাই আমার আত্মা। এই বেদনা আমার, আমি বেদনা, এটাই আমার আত্মা। এই সংজ্ঞা আমার, আমি সংজ্ঞা, এটাই আমার আত্মা। এই সংস্কার আমার, আমি সংস্কার, এটাই আমার আত্মা। যা কিছু দৃষ্টি, শ্রুত, মত (অনুমতি), বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, অশ্বেষিত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তাও আমার, আমি তাই, তা-ই আমার আত্মা। এই যে দৃষ্টিস্থান-সে-ই লোক বা জগৎ, সে-ই নিজস্ব আত্মা (নিজস্ব বস্তু), সে-ই আমি পরে হব, নিত্য, ধ্রুব, শাস্ত্রত, অবিপরিণামী, আমি চিরকাল একইরূপ থাকব, তা-ও আমার, আমি তা, তা-ই আমার আত্মা। এরূপ বিশ্বাসই আত্মবাদ (বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০, ১৪৯-১৫০)।

পঞ্চান্তরে অনাত্মবাদ বা অনাত্মদৃষ্টি সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন,

এই রূপ আমার নয়, আমি রূপ নই, রূপ আমার আত্মা নয়। এই বেদনা আমার নয়, আমি বেদনা নই, বেদনা আমার আত্মা নয়। এই সংজ্ঞা আমার নয়, আমি সংজ্ঞা নই, সংজ্ঞা আমার আত্মা নয়। এই সংস্কার আমার নয়, আমি সংস্কার নই, সংস্কার আমার আত্মা নয়। যা কিছু দৃষ্টি, শ্রুত, মত, বিজ্ঞাত, প্রাপ্ত, মনের দ্বারা অনুবিচারিত তা-ও আমার নয়, আমি তা নই, তা আমার আত্মা নয়। এই যে দৃষ্টিস্থান সেই লোক, সেই আত্মা, সেই আমি পরে হব, নিত্য, ধ্রুব, শাস্ত্রত অবিপরিণামী আমি চিরকাল একই রূপে থাকব, তা-ও আমার নয়, আমি তা নই, তা আমার আত্মা নয়। – এরূপ বিশ্বাসই অনাত্মবাদ বা অনাত্মদৃষ্টি (বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০, ১৪৯-১৫০)।

কোনো কোনো গবেষক ‘আত্মা’ সম্পর্কে বৌদ্ধ মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে বুদ্ধ পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে, আত্মা নিত্য, নির্বিকার ও সুখস্বরূপ (রহমান ২০১৩, ২১৬-২৩৬)। কিন্তু পিটক গ্রন্থের কোথাও আত্মার নিত্যতা স্বীকার করতে দেখা যায় না। তিনি ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ দেশনা

করার এক সপ্তাহের মধ্যেই ‘অনাত্ম লক্ষণ সূত্র’ দেশনা করেছিলেন। কারণ অনাত্ম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন না হলে ‘আমিত্ব’ ‘মমত্ব’ বা ‘নিত্যতা’ ইত্যাদি ধারণা দূরীভূত হয় না এবং এসব ভ্রান্ত ধারণা দূর না হলে চিন্তা আসবমুক্ত হতে পারে না। চিন্তা আসবমুক্ত না হলে দুঃখমুক্তি বা নির্বাণ লাভও সম্ভব নয় (সুকোমল চৌধুরী ১৯৯৭, ৭০)। এ প্রসঙ্গে ড. মল্লসেখর বলেন,

বুদ্ধ ধর্মচক্র সূত্রে চতুরার্যসত্য এবং অন্তিম সত্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করার পরও অনাত্মলক্ষণ সূত্র দেশনার মাধ্যমে অনাত্মদর্শন সম্বন্ধে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের সম্যক অবহিত করেছিলেন যে, চিরস্থায়ী আত্মা

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ

বলতে কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ ‘অনাত্ম’ বিষয়ে জ্ঞান লাভ ব্যতীত চতুরার্য সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় (১৯৮৭, ২৭)।

বুদ্ধ ‘অনাত্মলক্ষণ সূত্রে’ (সংযুক্ত নিকাযো ২০১৩, ৪৭) স্পষ্ট করে বলেছেন, পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়েই জীবদেহ গঠিত। পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ আত্মা নহে। রূপ যদি আত্মা হতো তাহলে এটা দুঃখের অধীন হতো না। দেহী বলতে পারতেন, ‘আমার দেহ এরূপ হোক, আমার দেহ এরূপ না হোক’। কিন্তু এরূপ তো হয় না। দেহ প্রতিমূহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন দুঃখ নিপীড়নের সম্মুখীন হচ্ছে। অতএব দেহ বা রূপ আত্মা হতে পারে না। অনুরূপভাবে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানও নিয়ত পরিবর্তনশীল। যা পরিবর্তনশীল তা নিত্য নয় এবং যা অনিত্য তার নিত্য বা শাস্বত আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

বুদ্ধের মতে, জীব মাত্রই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি ব্যতীত কিছু নয়। এই পঞ্চস্কন্ধকে অন্যভাবে ‘নামরূপ’ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। রূপ বলতে মাটি, জল, তেজ ও বায়ুর সমন্বয়ে গড়া জড়দেহকে বোঝায়। নাম বলতে বোঝায় বেদনা অর্থাৎ অনুভব (feeling), সংজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ (perception), সংস্কার অর্থাৎ মানসিক প্রবণতা (mental dis-position) এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ সংবেদনা (self consciousness)। নিম্নে নাম-রূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

নাম চার প্রকার:

১. বেদনা: দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয় ও মনেন্দ্রিয় - এই ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের রসানুভূতিই বেদনা। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা, সৌমনস্য ও দৌর্মনস্য ভেদে বেদনা পাঁচ প্রকার।
২. সংজ্ঞা: সংজ্ঞা বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয় দ্বারে পতিত হওয়ার সাথে সাথে বিষয় সম্বন্ধে প্রথম প্রতীতিকে বোঝায়। এতে গোচরীভূত বিষয়ের সাথে পরিচয় হয় মাত্র এবং বিষয়ান্তরের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। সংজ্ঞার বিশেষ লক্ষণ হলো কোনো বিষয়কে তার চিহ্ন দ্বারা জানা, যেমন লাল-নীল ইত্যাদি।
৩. সংস্কার: মনোবৃত্তিসমূহই সংস্কার স্কন্ধ। সংস্কার প্রত্যয়জাত, সমবাসে উৎপন্ন। বিশ্বের জড়-চেতন সমস্ত উপকরণ যাতে কার্যকারণ প্রবাহ অটুট থাকে তা-ই সংস্কার।
৪. বিজ্ঞান: দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম বা মনোবিজ্ঞান ভেদে ষড়বিধ বিজ্ঞান স্কন্ধ। মনোবিজ্ঞানের সাথে অন্য সব বিজ্ঞানের একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান।

রূপ চার প্রকার :

১. ক্ষিতি: ক্ষিতি বলতে পৃথিবী ধাতুকে বোঝায়। দৈহিক বা বাহ্য সকল কঠিন বস্তুই ক্ষিতি বা পৃথিবী ধাতু। এটির দু’টি প্রধান লক্ষণ কোমলতা ও কঠিনতা।
২. অপ্: দৈহিক বা বাহ্য সকল বস্তুই অপ্ ধাতু। এটি এমন একটি ধাতু যা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কণাকে সংযোজন করে ‘দেহ’ ধারণা এনে দেয়। তরলতা এবং সংকোচন এই ধাতুর প্রধান ধর্ম।
৩. তেজ: দৈহিক বা বাহ্যিক সকল উষ্ণতা বিধায়ক বস্তুই তেজ ধাতু। সজীবতা এবং পরিপক্বতা এ ধাতুর উপস্থিতিতেই হয়ে থাকে। শীতলতা এবং উষ্ণতা উভয়ই তেজ ধাতুর ধর্ম।
৪. বায়ু: দৈহিক বা বাহ্য সকল গতিশীল বস্তুই বায়ু ধাতু। এর প্রধান গুণ গতিশীলতা। গমন, স্পন্দন, দোলন এবং চাপ দান এ ধাতুর লক্ষণ।

উপর্যুক্ত নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়ে জীবদেহ গঠিত। এই নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধ সম্মিলিতভাবে কিংবা পৃথকভাবে কোনোটিই শাস্বত আত্মা নয়। এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধ বলেন,

যেহেতু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান - এই পঞ্চস্কন্ধ কোনোটিই নিত্য বা শাস্তত নয় এবং যা নিত্য নয় তা দুঃখময়। অতএব, হে ভিক্ষুগণ! যা কিছু রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার অথবা বিজ্ঞান অতীত, অনাগত অথবা বর্তমান, আধ্যাত্মে অথবা বাইরে, স্থূল বা সূক্ষ্ম, হীন বা উৎকৃষ্ট, দূরে অথবা নিকটে, সব রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান আমার নহে, আমি তা নই, তা আমার আত্মা নহে (বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯৪০, ১৪৭)।

উপর্যুক্ত পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি বা যে- কোনো একটি স্কন্ধকে ‘আত্মা’ হিসেবে মেনে নেওয়া নিছক ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়। কারণ যে সকল উপাদানের দ্বারা মানব দেহ গঠিত তার প্রত্যেকটি (পঞ্চস্কন্ধ) অনুপুঞ্জ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার কোনোটির মধ্যে আত্মা নামক বস্তুর অস্তিত্ব নেই এবং কোনোটির সঙ্গে আত্মার তুলনা চলে না। কারণ এগুলোর মধ্যে আত্মার লক্ষণ নেই। যা অনিত্য, দুঃখপ্রদ এবং পরিবর্তনশীল তাকে এটা আমার, এটা আমি, এটা আমার আত্মা বলা যাবে না (মহাথের ২০০০, ২১)। মোটকথা পঞ্চস্কন্ধের প্রতিটি স্কন্ধ নিত্য পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এখানে শাস্তত ‘আত্মার’ কল্পনার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ পণ্ডিত জ্ঞানতিলক খের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন:

The anatta doctrine teaches that neither within the bodily and mental phenomena of existence, nor outside of them, can be found anything that in the ultimate sense could be regarded as a self-existing real Ego-entity, soul or any other abiding substance. This is the central doctrine of Buddhism without understanding of which a real knowledge of Buddhism is altogether impossible. It is the only really specific Buddhist doctrine, with which the entire structure of the Buddhist teachings stands or falls. All the remaining Buddhist doctrines may, more or less, be found in other philosophic systems and religions, but the Anatta Doctrine has been clearly and unreservedly taught only by the Buddha, (1980, 33-34).

- অনাত্ম দর্শন হচ্ছে - শরীরে বা চিন্তে বা এদের বাইরে এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই যাকে পরমার্থিক দৃষ্টিতে স্বয়ং উৎপন্ন আত্মা বলা যেতে পারে। এটাই হচ্ছে বুদ্ধের মূল উপদেশ, যার অনোপলব্ধিতে বুদ্ধের অনাত্মদর্শন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ অসম্ভব। ‘সর্বধর্ম অনাত্মা’- এ বিষয়টি যার পক্ষে জানা সম্ভব হয় না তিনি জানতে পারেন না যে, প্রকৃত পক্ষে কায় ও চিত্ত ধারার অবিরাম উৎপত্তি ও বিলয় ছাড়া অন্য কিছুর কল্পনা করা বৃথা। এই সন্ততির বাইরে বা অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র কোনো নিত্য সত্তা নেই- এটা না বুঝলে বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনকে জানা যাবে না।

অনাত্ম দর্শন মতে, নিজের আত্মসত্তার স্থায়ীত্বের ভ্রান্তবোধ থেকেই আত্মা ভিন্ন স্থায়ী বহির্দ্রব্যের ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এর ফলে লোভ, দ্বেষ, প্রেম, ভালো, মন্দ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের ভরা সংসারের সৃষ্টি হয়। আত্মার স্থায়ী সত্তা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করার ফলে সকল কুপ্রবৃত্তি ও কামনা বাসনার বিকাশ ঘটে। আত্মসত্তার স্থায়ীত্বের ভ্রান্ত ধারণাই সকল দুঃখের মূল। অনিত্যতা সম্পর্কে যতদিন ভ্রান্ত ধারণা থাকবে ততদিন মানুষ স্থায়ী বা অবিনশ্বর আত্মায় বিশ্বাস করবে। আত্মাই সুখ দুঃখ অনুভব করে, আত্মাই কুশলাকুশল কর্ম সম্পাদন করে, আত্মাই কর্মানুসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে ইত্যাদি ধারণা পোষণকারী ব্যক্তির পক্ষে দুঃখ বিমুক্তি অসম্ভব (জিতেন্দ্র বড়ুয়া ২০০০, ৫৫)।

বৌদ্ধ ধর্ম দুঃখ মুক্তির ধর্ম। দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জগতের নিত্যতা-অনিত্যতার কিংবা আত্মার বিদ্যমানতা: অবিদ্যমানতার সমাধান খোঁজা নিরর্থক। তাই তথাগত বুদ্ধ এ জাতীয় প্রশ্নে নীরব ছিলেন। বুদ্ধ চুলমালুঙ্ক্য সূত্রে (মহাস্থবির ১৯৫৬, ৭৪-৮৩) মালঙ্ক্যপুত্র কর্তৃক এ রকম দশটি প্রশ্নকে অব্যাকৃত তথা

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ

অনর্থকর বলে বর্জন করেছেন। এ দশটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথম চারটি জগৎ সম্পর্কিত এবং বাকীগুলো হলো আত্মা ও দেহ বিষয়ক। এ প্রশ্নে তথাগত বুদ্ধ বললেন, মালক্য পুত্র, জগৎ শাস্ত কী অশাস্ত ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান হোক বা না হোক তাতে কী কোনো ব্যক্তির দুঃখ মুক্তি নির্ভর করে? তিনি আরো বললেন, মালক্য পুত্র, জগৎ শাস্ত হোক বা অশাস্ত হোক মানব মাত্রই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখের অধীন। এই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখ থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় তার উপায় আমি প্রচার করেছি। তুমি যে সকল প্রশ্ন করেছ, তার সমাধান আমি দিই নি। কারণ এর দ্বারা কোনো উপকার হয় না। এর দ্বারা লোভ-দেষ-মোহ দূর হয় না; সম্যক জ্ঞানও লাভ হয় না; নির্বাণেও উপনীত হওয়া যায় না (মহাস্থবির ১৯৫৬, ৭৫-৭৮)।

বুদ্ধ এটাই বারবার বলেছেন যে, জগতে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয় বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, ইঙ্গিত বস্তু অপ্রাপ্তি এবং সংক্ষেপে পঞ্চোপাদানে দুঃখ বিদ্যমান। জন্মের কারণে এসব দুঃখ নিরন্তর ভোগ করতে হয়। তবে এ জন্মের আদি-অন্ত অনুসন্ধান করাই বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধ যাবতীয় দুঃখকে দেখেছেন যা চির বিদ্যমান; যাকে দুঃখ সত্য বা প্রথম আর্যসত্য বলা হয়। দুঃখের কারণ রয়েছে, যা অবিদ্যা এবং তৃষ্ণা থেকে উৎপত্তি হয়, এটিকে বলা হয় দুঃখ সমুদয় বা দ্বিতীয় আর্যসত্য। দুঃখের কারণ অবিদ্যা-তৃষ্ণার নিরোধ করা সম্ভব, যাকে বলা দুঃখ নিরোধ বা তৃতীয় আর্যসত্য। দুঃখ নিরোধের যে উপায় তাকে বলা হয় দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদ বা চতুর্থ আর্যসত্য। দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদ বা দুঃখ থেকে বিমুক্তির উপায়কে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে - যা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই মার্গ সম্যক অনুশীলনের মাধ্যমেই বিমুক্তি লাভ সম্ভব, অর্থাৎ জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ইত্যাদি দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এক কথায় জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়ে যায়।

বুদ্ধ পরবর্তী দার্শনিকদের মতে আত্মার স্বরূপ

বুদ্ধের মূল ধর্মদর্শনের ইতিহাস আড়াই হাজার বছরের অধিক প্রাচীন। এ দর্শনের ওপর পরবর্তীকালে বহু দার্শনিক আলোচনা করেছেন এবং বুদ্ধের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের স্ব স্ব মতবাদ প্রয়োগ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তাঁদের এসব মতবাদকে বুদ্ধদর্শনের সম্পূরক অংশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে; কোনোভাবেই বিরুদ্ধ মতবাদ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। স্মর্তব্য যে সুদীর্ঘকালের পথ পরিক্রমায় বুদ্ধের মূল দার্শনিক ভিত্তি অবিকৃত থাকলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বিভিন্নভাবে বুদ্ধের দর্শনকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধ পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বিশেষ করে ভদন্ত নাগসেন (খ্রিষ্টীয় ১ম শতক), আচার্য নাগার্জুন (খ্রিষ্টীয় ২য় শতক), আচার্য অসঙ্গ (খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতক), আচার্য বসুবন্ধু (৪র্থ শতক), আচার্য ধর্মকীর্তি (খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক) প্রমুখ দার্শনিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। উক্ত দার্শনিকগণ বুদ্ধের অনাত্মবাদ তত্ত্বটিকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছেন। নিম্নে তাঁদের অভিমত আলোচনা করা হলো।

গ্রীকরাজ মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের কথোপকথন

রাজা মিলিন্দ জিজ্ঞেস করেন, ভণ্ডে, আপনি কিরূপে জ্ঞাত হয়ে থাকেন? আপনার নাম কী?
উত্তরে নাগসেন বলেন, মহারাজা! আমাকে নাগসেন বলে সম্বোধন করে। এই নাগসেন কিন্তু সংজ্ঞা প্রকাশ ব্যবহার ও নাম মাত্র, এখানে কোনো ব্যক্তি বা অবয়বী উপলব্ধি হয় না।
রাজা মিলিন্দ বলেন, যদি ব্যক্তি না থাকে তবে কে আপনাকে চীবরাদি চতুর্ভুজ্য প্রদান করে, কে উপভোগ করে, কে ভাবনা করে, কে মার্গফল প্রত্যক্ষ করে, কে প্রাণিহত্যাদি পাপকর্ম সম্পাদন করে? তাহলে কুশলাকুশল নেই, কুশলাকুশলের কর্তা নেই, ভোক্তা নেই, সুকৃত-দুষ্কৃত কর্মের ফলও নেই। আপনি যে

বলেন লোকে আপনাকে ‘নাগসেন’ বলে সম্বোধন করে, এখানে নাগসেন কে ? আপনার কেশ, লোম, নখ, দাঁত, ত্বক, মাংস নাগসেন কি ? অথবা আপনার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান কি নাগসেন ? কিংবা এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিই কি নাগসেন ?

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন বলেন, না, মহারাজ ।

অতঃপর ভদন্ত নাগসেন রাজা মিলিন্দকে জিজ্ঞেস করেন, মহারাজ! আপনি পদব্রজে নাকি রথে আরোহণ করে এখানে এসেছেন ?

রাজা বললেন, রথে আরোহণ করে ।

নাগসেন এবার জিজ্ঞেস করেন, মহারাজ আপনি যে রথে আরোহণ করে এসেছেন, সেই রথ কী ? ঈষা কী রথ ? অক্ষ কী রথ ? অথবা রথচক্র, পঞ্জর, রথদণ্ড, যুগ, রথচালন - যষ্টি, রজ্জু, চাবুক কী রথ ?

রাজা প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, না, ভণ্ডে । ঈষা, অক্ষ, চক্র ইত্যাদির সমবায়ে সুসংবদ্ধতা হেতু রথ । এটা সংজ্ঞা মাত্র, ব্যবহারিক নাম মাত্র ।

নাগসেন বলেন, উত্তম মহারাজ । রথ কী আপনি তা ভালোভাবেই জানেন । ঠিক অনুরূপ মহারাজ কেশ লোমাদি রূপ এবং বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান- এই পঞ্চস্কন্ধের সুসংবদ্ধতা হেতুই নাগসেন । এগুলোকে আশ্রয় করেই নাগসেন সংজ্ঞা, ব্যবহার, প্রকাশ ও নাম মাত্র প্রবর্তিত হচ্ছে । পরমার্থত এখানে পৃথক কোনো ব্যক্তি বা আত্মার অস্তিত্ব নেই (ভট্টাচার্য্য ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ৪৫-৫১) ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, আত্মার বস্তুগত কোনো সত্তা নেই । আত্মা একটি মানসিক প্রতীক মাত্র । দেহ-মন, বস্তু সব কিছুই জটিল এবং ক্ষণস্থায়ী । রথের ঈষা, অক্ষ, চক্র, যুগ, রজ্জু, দণ্ড ইত্যাদি সমস্ত অংশ বাদ দিলে রথ বলতে কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না, তেমনি পঞ্চস্কন্ধকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করলে কোনো ব্যক্তি বা আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় না । নামটি একটি সংজ্ঞামাত্র । পঞ্চস্কন্ধের সমন্বয়েই দেহ ও মন । পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে কোনোটিই আত্মা নয় কিংবা সমন্বিত পঞ্চস্কন্ধও আত্মা নয় । ভিক্ষুণী বজিরা সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে:

যথাহি অঙ্গ সম্ভারা হোতি সন্দো রথো ইতি,

এবং খন্ডেসু সন্তেসু হোতি সত্তো’তি সম্মুত্তী’তি (মিলিন্দ পঞাঞো (পালি) ২০১৩, ২১) ।

-বিভিন্ন উপকরণ সহযোগে যেমন ‘রথ’ তেমনি স্কন্ধসমূহের সহযোগে ব্যবহারিক ‘সত্তা’ ।

রাজা মিলিন্দ পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, ভদন্ত নাগসেন, জ্ঞাতা বা আত্মার (বেত্তা) কি উপলব্ধি হয় ? তিনি বললেন, এই অভ্যন্তরে যে জীব (আত্মা) চোখ দিয়ে রূপ দর্শন করে, শ্রোত্র দিয়ে শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণের দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করে, কায়ের দ্বারা স্পর্শনীয় বস্তু স্পর্শ করে, মনের দ্বারা ধর্মকে বিশেষভাবে জানে ।^২

উত্তরে ভদন্ত নাগসেন বলেন, বেদণ্ড বা বেত্তা বলতে কোনো তত্ত্ব নেই । চক্ষু-রূপ আলোক ও মনস্কার হেতু চক্ষু বিজ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, তৎ সহজাত স্পর্শ-বেদনা-সংজ্ঞা-চেতনা-একাগ্রতা-মনস্কার-জীবিতেন্দ্রিয় ইত্যাদি চৈতসিকও ৩ উৎপন্ন হয় । এগুলো এক সাথে উৎপন্ন হয়, একই সাথে বিলয় হয় । এই চিত্ত-চৈতসিক আবার একই আলম্বনকে আশ্রয় করে । তথা শ্রোত্র-শব্দ-ঈশ্বর-মনস্কার হেতু শ্রোত্রবিজ্ঞান এবং সহজাত স্পর্শ বেদনাদি চৈতসিকগুলোও একই সাথে বিলোপ সাধিত হয় । অনুরূপ ঘ্রাণ-জিহ্বাদি সম্বন্ধেও একই রকম । এখানে শাস্ত্র আত্মার বা বেত্তার কোনো উপলব্ধি হয় না । চৈতসিক বেদনাই বেত্তা, সংজ্ঞা জ্ঞাতা, চেতনা চেততা, জীবিতেন্দ্রিয় জীবিতা, বিজ্ঞান বিজ্ঞাতা, মনস্কার নিবেশেতা, একাগ্রতা ধারেতা ।

অতএব, পঞ্চস্কন্ধের কোনোটিই আত্মা নয়, পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টিও আত্মা নয় । এটি একটি সত্তা মাত্র । এই উৎপন্ন হয়, এই লয় হয় । নাগসেন বলেন,

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ

এবমেব খো মহারাজ, ধম্ম সত্ততি সন্দহতি;
অএংএগা উপ্পজ্জতি, অএংএগা নিরুজ্জতি,
অপুৰ্বং অচরিমং বিয় সন্দহতি তেন
ন চ সো, ন চ অএংএগা পচ্ছিম
বিএংএগান সংগহং গচ্ছতীতি (ভট্টাচার্য্য ১৩১৫, ৮০)।

আচার্য্য নাগার্জুন (১৭৫ খ্রিঃ)

আচার্য্য নাগার্জুন মাধ্যমিক শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ হতেই শূন্যবাদের প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, বিশ্ব এবং এর সকল জড়-অজড় পদার্থ পরস্পর কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত। এগুলো কোনো প্রকার স্থির, শাস্ত্র, নিত্য (ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি) হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বা শূন্য। নাগার্জুনের মতে, আত্মার সাথে পঞ্চস্কন্ধের সাদৃশ্য বা পার্থক্যের প্রশ্নই আসে না। কারণ পঞ্চস্কন্ধ যদি আত্মা হয় তাহলে আত্মা উৎপত্তি ও বিলয়ধর্মী হতো, আবার আত্মা যদি পঞ্চস্কন্ধ হতে ভিন্ন হতো তাহলে এর মধ্যে পঞ্চস্কন্ধের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান থাকতো না। সুতরাং আত্মার মধ্যেও পঞ্চস্কন্ধ নেই, পঞ্চস্কন্ধের মধ্যেও আত্মা নেই।^৪ অথচ জীবদেহ অনুপুঞ্জ বিশ্লেষণ করলে পঞ্চস্কন্ধ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না। অতএব যেখানে আত্মার কোনো অস্তিত্বই নেই সেখানে পঞ্চস্কন্ধের সাথে আত্মার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আত্মা হচ্ছে শুধু ব্যবহারিক বাক্য মাত্র, সংজ্ঞা, নাম এবং প্রজ্ঞাপ্তি মাত্র-আর কিছু নয়। (দীঘ নিকায় ১ম খণ্ড, ২০২) নাগার্জুনের মতে, পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে অবাস্তব, অন্তঃসার রহিত, অশাস্ত্র, অনাত্ম, অনাত্মনীয়, অনিত্য, শূন্য এবং বিপরিণামধর্মী। জগতের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ধর্মসমূহ অনিত্য, শূন্য এবং অসার; কারণ এগুলো কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। যা কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ তা স্ব-ভাববিহীন অর্থাৎ এতে নিত্য বা শাস্ত্র আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই।

আচার্য্য অসঙ্গ (৩৫০ খ্রিঃ)

উপনিষদীয় আত্মবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে আচার্য্য অসঙ্গ বলেন, যে দর্শন করে সে আত্মা এটাও যুক্তিযুক্ত নহে। আত্মার ধারণা যেমন প্রত্যক্ষ পদার্থে হয় না, তেমন অনুমানগম্য পদার্থেও নহে। যদি প্রচেষ্টা (শরীর ক্রিয়া) বুদ্ধি হেতুক বলা যায়, তবে ‘আত্মা চেষ্টা করছে’ – এটা বলাও ঠিক নহে। নিত্য আত্মা চেষ্টা করতে অক্ষম। নিত্য আত্মা সুখ কিংবা দুঃখে লিপ্ত হতে পারে না, বস্তুতপক্ষে ধর্মসমূহে আত্মা এক কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। বিশ্বের সকল ধর্ম (বস্তু) অনিত্য, অধ্বংস, অন্-আস্থাসিক, বিকারী, জন্ম-জরা-ব্যাধির অধীন। দুঃখই এদের যথার্থ স্বরূপ। ব্যবহারের সুবিধার্থেই আত্মার কল্পনা করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ আত্মা নামের কোনো নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নেই (সাংকৃত্যায়ন ২০১২, ৮৮)।

আচার্য্য বসুবন্ধু (৬০০ খ্রিঃ)

আচার্য্য অসংগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম। তিনিও শাস্ত্র আত্মাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন এরূপ অজ (জন্মহীন) নিত্য, শাস্ত্র এবং অপরিবর্তনীয় আত্মার কোনো অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব নেই। এটা একটি প্রথাগত ব্যবহার বা নাম মাত্র। কোনো ব্যক্তি একক সত্তা নয়; সে কতকগুলো ক্ষণিক শক্তির অথবা প্রবণতার নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা মাত্র; যাকে সাধারণ লোকেরা একটি সত্তা বলে বিশ্বাস করে, একটি নির্দিষ্ট নামে অভিহিত করে। বসুবন্ধু মনে করেন, কোনো এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বর্ণনামূলক অথবা অনুমানমূলক, প্রত্যক্ষলব্ধ নয়। বুদ্ধি, স্মৃতি, কল্পনা, ইচ্ছা ইত্যাদি সবই ক্ষণিক কর্মের একটি বর্ণনামূলক পরিচয় হলো ব্যক্তি। কখনো একজন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে জানি না, কখনোই ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধি দ্বারা তাকে ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি না। বর্ণনামূলক জ্ঞানের মাধ্যমে এবং সদৃশ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে ব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয় মাত্র। ‘আত্মা’ কিংবা

‘জীব’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু আসলে তা একগুচ্ছ নিয়ত পরিবর্তনশীল উপাদান ছাড়া কিছুই নয় (ঘোষ ১৯৮৩, ১৩৫-১৩৬)।

আচার্য ধর্মকীর্তি (৬০০ খ্রি.)

আচার্য ধর্মকীর্তি ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী বৌদ্ধ দার্শনিক। তিনি তাঁর প্রখ্যাত প্রমাণ বার্তিক গ্রন্থে আত্মবাদ খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি সুখী হই, কিংবা দুঃখী না হই- এই তৃষ্ণা বা ইচ্ছা পোষণকারীর যে ‘আমি’ এই ধারণা জন্মে, এটাই ‘আত্মবাদ’। ‘আমি’ এই ধারণা ছাড়া কেউ আত্মার প্রতি স্নেহ উৎপাদন করতে পারে না; আর আত্মার প্রতি এরূপ স্নেহ ছাড়া সুখের কামনা পোষণ করে কারো পক্ষে পরবর্তী জন্মে বা গর্ভাভিমুখে ধাবিত হওয়া অসম্ভব (প্রমাণ বার্তিক, ২। ২০১-২)। ‘আত্মার ধারণা কেবল মোহ, আর ওটাই যাবতীয় অনর্থের মূল বা দোষের আকার (প্রমাণ বার্তিক, ২। ১৯৫)।

ধর্মকীর্তি বলেন, যিনি আত্মা স্বীকার করেন তাঁর ‘আমি’ এ প্রকারের স্নেহ জাহত থাকে, স্নেহ হতে সুখের তৃষ্ণা জন্মে আর তৃষ্ণা দোষ রাশিকে আচ্ছাদন করে। দোষ আচ্ছাদিত হলে সেখানে তিনি গুণরাশি দেখেন, তার গুণদর্শী তৃষ্ণার্ত হয়ে ‘আমার সুখ’ প্রার্থনা করে, সুখ প্রাপ্তির জন্য উপায়সমূহ অর্থাৎ পুনর্জন্মাদি গ্রহণ করে থাকে। এই সৎকায় দৃষ্টি বশতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মার ধারণা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সংসারে বিদ্যমান থাকেন। ... যিনি রীতিমত আত্মার প্রতি স্নেহ উৎপাদন করেন তিনি আত্মীয় (সুখ-সাধন) হতে রাগ মুক্ত হতে পারেন না। আত্মার ধারণা সর্বদা নিজ স্নেহকে দৃঢ় করে। ... বস্তুত আত্মা নহে-নৈরাত্ম্যই বিদ্যমান, কিন্তু নৈরাত্ম্যতে যখন আত্মা স্নেহ জাগে তখন ওটা হতে যত লাভ হয়, তদনুসারে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। - এই প্রকারে নিত্য আত্মা যুক্তিসিদ্ধ হতে পারে না এবং ধর্ম পরলোক ও মুক্তিতে ওটার অঙ্গীকার দ্বারা বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে (সাংস্কৃত্যায়ন ২০১২, ১১৭-১১৮)।

আধুনিক দার্শনিকদের আত্মা সম্পর্কে অভিমত

বিংশ শতকের শুরুতে দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (William James) বলেন, আমরা যাকে আত্মা নামে অভিহিত করি সেটি চিন্তার প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। চিন্তা এবং চিন্তার কর্তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তিনি এরূপ যুক্তির মাধ্যমে দেকার্তের আত্মতত্ত্ববাদকে খণ্ডন করেন। উইলিয়াম জেমসের মতে, প্রত্যেকটি মুহূর্তের স্পন্দন ব্যতীত কর্তা বলতে কিছু নেই। চৈতন্যকে একটি প্রবাহরূপে চিহ্নিত করা চলে। যেসব বস্তুকে আমরা জানি তা এই প্রবাহেরই কতগুলো স্পন্দন হিসেবে জ্ঞাত হয়। অপরিবর্তনীয় কোনো শাস্ত্র সত্তার অস্তিত্ব নেই। কর্তা মাত্রই ক্ষণস্থায়ী একটি বিষয়ীর স্থলে আর একটি বিষয়ী সাথে সাথে স্থান দখল করে নেয়। এই স্থান পরিবর্তন অতি দ্রুত সম্পন্ন হয় বলে বাহ্যতঃ একটি একতার আভাস প্রকাশ পায়। আমিত্বের প্রত্যেকটির অবস্থাই এক একটি নতুন সমবায় (ঘোষ ১৯৮৩, ১৩৮)। জেমস আত্মাকে অলংকার মূলক শব্দ মনে করেন এবং আত্মার অনুরূপ কোনো বাস্তব সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

প্রখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত Ven.Walola Rahula আত্মার অনস্তিত্ব সম্পর্কে বলেন,

It must be repeated here that according to Buddhist philosophy there is no permanent, unchanging spirit which can be considered ‘Self’, or ‘Soul’, or ‘Ego’, as

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ

opposed to matter, and that consciousness (vinnana) should not be taken as 'spirit' in opposition to matter. This point has to be particularly emphasized, because a wrong notion that consciousness is a sort of Self or Soul that continues as a permanent substance through life, has persisted from the earliest time to the present day. (1978, 23-24)

বট্টাণ্ড রাসেলও (Bertrand Russell) (ঘোষ ১৯৮৩, ১৩৯, আহমদ, সম্পাদিত রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৯৭৩, ৬৩) মনে করেন যে, ব্যক্তির কোনো পরাতাত্ত্বিক এবং অনভিজ্ঞাত একক ও অতুলনীয় সত্তা নেই। অভিজ্ঞতার পারস্পর্য নিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তথা ব্যক্তির আত্মা। অনুভূতি, চিন্তা, আবেগ, কল্পনা, স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা মানুষের বিশেষ বস্তু কিংবা আত্মার জ্ঞান জন্মায়। এই জ্ঞান হচ্ছে অনুমান ভিত্তিক। অনুমানের পেছনে বস্তু কিংবা আত্মা বলে কিছু আছে কিনা তা প্রতিপাদনযোগ্য জ্ঞান সম্ভব নয়। সম্ভবত আত্মা একটি নাম মাত্র। তাঁর মতে, আত্মা কিংবা দেহ সুবিধাজনক নাম মাত্র। অষ্টাদশ শতকের দার্শনিক ডেভিড হিউমও (David Hume) শাস্বত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁর অভিমতও ভদন্ত নাগসেনের অভিমতের মধ্যে এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। হিউম বলেন, যখন আমি যাকে 'আমি' বলে নিবিষ্টভাবে জানার জন্য অনুপ্রবেশ করি, তখন আমি যার নাগাল পাই তা হলো উষ্ণ বা শীতল, আলো বা ছায়া, প্রেম বা ঘৃণা, সুখ বা দুঃখের সংবেদন মাত্র (সান্যাল ২০০২, ১০০)। হিউম এসব সংবেদনের অতিরিক্ত মন বা আত্মা বলে কোনো স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি। নাগসেন ও হিউম উভয়ের দর্শনের মূল ভিত্তি মূলত এক রকম এবং সিদ্ধান্তও এক প্রকারের। কল্যাণ-অকল্যাণ, দ্রব্য-গুণ, দেশ-কাল প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচনার পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভিত্তিক, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক এবং অবভাসবাদভিত্তিক।

বৌদ্ধ দর্শনের নৈরাত্মবাদ সম্পর্কে আত্মবাদীরা দু'টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রথমটি হলো- আত্মা যদি কোনো চিরন্তন সত্তা না হয়ে কেবল মানসিক প্রক্রিয়ার ধারা বা প্রবাহ হয় তাহলে ব্যক্তি অভিন্নতাকে (Personal identity) কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? একই ব্যক্তির বয়সানুক্রমে যে বিভিন্ন অবস্থা, এই বিভিন্ন অবস্থার ধারাবাহিকতার মধ্যেও যে এক অভিন্ন ব্যক্তি বিরাজ করে, তা কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে?

উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, মানুষের মধ্যে কোনো অপরিবর্তনীয় সত্তার অস্তিত্ব নেই সত্য, তবে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রতিটি অবস্থা একদিকে যেমন অন্য অবস্থা থেকে উদ্ভূত ঠিক তেমনি

ভাবেই পরবর্তী অবস্থাটি সৃষ্টি করে চলেছে। সুতরাং জীবনের ধারাবাহিকতার মূলে একটা কার্যকারণ সম্বন্ধের যোগসূত্র রয়েছে। বিষয়টি নাগসেন একটি চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। সারারাত একটি প্রদীপ জ্বলছে। যদিও প্রতিমুহূর্তে আমরা একটিমাত্র প্রদীপ শিখাই দেখি, আসলে যে কোনো মুহূর্তের প্রদীপ শিখা একও নহে, ভিন্নও নহে। ঠিক তেমনি একই ধর্ম সন্ততি বা চিন্ত সন্ততি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের রূপ পরিগ্রহ করে। আবার এটাই একই নিয়মে জীবনের অবসানে অন্য রূপ পরিগ্রহ করে (সুকোমল চৌধুরী ১৯৯৭, ৭৮)।

অপর প্রশ্নটি হচ্ছে যদি সনাতন আত্মা অস্বীকার করা হয় তাহলে জন্মান্তর কিভাবে সম্ভব?

এ প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, জন্মান্তর বলতে কোনো চিরন্তন আত্মার নতুন দেহ পরিগ্রহণ নয়। জন্মান্তর বলতে বর্তমান জীবন থেকে পরবর্তী জীবনের উদ্ভব বোঝায়। যেমন একটি প্রদীপ শিখা থেকে আর একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা যায়। প্রদীপ শিখা কিন্তু ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। অনুরূপভাবে জীবের কর্মবীজ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত (সকল প্রকার আসব-ক্লেশ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত) মৃত্যুর পর কর্মের শক্তি অনুযায়ী অপর জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এটিকে বলা হয় ‘সত্ততি’ বা ‘প্রবাহ’, এখানে তথাকথিত শাশ্বত আত্মার জন্মান্তর বোঝায় না।

উপসংহার

আত্মার ধারণা কল্পনা প্রসূত। নিত্যবাদী বা শাশ্বতবাদীরা আত্মাকে অজয়, অমর, অব্যয় চিরস্থায়ী বলে ধারণা পোষণ করেন। ভারতীয় দর্শনে একমাত্র গৌতম বুদ্ধই আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। একটি জীবন থেকে অন্য কোনো জীবনে আত্মার প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কেবল ঘটনা পরম্পরায় নতুন জীবনের উদ্ভব ঘটে। কোনো এক মুহূর্তে আমাদের মধ্যে যেসব মানসিক প্রক্রিয়াগুলো দেখা যায়, সেই মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর ধারা বা প্রবাহই হলো আত্মা। চিন্তা, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির প্রত্যেকটি ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী। এই প্রবাহের অন্তরালে কোনো শাশ্বত বা চিরন্তন সত্তার অস্তিত্ব নেই। এই মতবাদই নৈরাশ্র্যবাদ বা অনাত্মবাদ নামে পরিচিত।

বুদ্ধ অনাত্মা বলতে কোনো আত্মার বিপরীত কোনো অভাবাত্মক বস্তু বোঝাতে চাননি। বৈদিক উপনিষদে আত্মাকেই নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বতসত্য বলে মান্য করা হয়েছে। আত্মার অর্থ যদি নিত্য হয় তাহলে অনাত্মা মানে অ-নিত্য। বুদ্ধ মধ্যম নিকায়ের চুল সচ্চক সুত্তে বলেছেন, রূপ অনাত্মা, বেদনা অনাত্মা, সংজ্ঞা অনাত্মা, সংস্কার অনাত্মা, বিজ্ঞান অনাত্মা, সমগ্র ধর্মই অনাত্মা।

অনাত্মবাদ মতে স্থায়ী আত্মায় বিশ্বাস করা এক প্রকার মহাভ্রম। বুদ্ধ শাশ্বত আত্মাকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন। বুদ্ধের মতে, জগতের সকল বস্তুই অনিত্য। অনিত্য বস্তুতে আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কাজেই নিত্য আত্মার ভ্রমধারণা পরিত্যাগ করা উচিত।

বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ: স্বরূপ বিশ্লেষণ

টীকা

- ১। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি,
তথা শবীরাণি বিহায় জীর্ণান্যান্যানি সংযাতি নবানি দেহী।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ,
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ,
নিত্য সর্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ।
২. যো ভন্তে অবভন্তরে জীবো চক্খুনা রূপং পসসতি, সোতেন সদ্দং সুণাতি ঘাণেন গন্ধং ঘায়তি, জিব্হায় রসং
সাসতি, কায়েন ফোট্ঠব্বং ফুসতি, মনসা, ধম্মং বিজানতি।
৩. চৈতসিক – চিত্তের আলম্বনকে চৈতসিক বলে। চিত্ত ৮৯ প্রকার এবং চৈতসিক ৫২ প্রকার। তন্মধ্যে সর্বচিত্ত
সাধারণ চৈতসিক ৭ প্রকার, প্রকীর্ণ চৈতসিক ৬ প্রকার, অকুশল চৈতসিক ১৪ প্রকার, শোভন চৈতসিক ১৯
প্রকার, বিরতি চৈতসিক ৩ প্রকার, অপ্রমেয় চৈতসিক ২ প্রকার এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক ১ প্রকার।
- ৪। আত্মা স্কায়া যদি ভবেদায়ব্যয় ভাগ ভবেৎ।
সন্ধেভ্যো হন্যো যদি ভবেদ্ ভবেদ স্কা লক্ষণং মাঃ বৃঃ (৩৪০)।

প্রাথমিক উৎস

করণাবংশ ভিক্ষু, (সম্পাদনায়) *সংযুক্ত নিকাযো*, ৩য় খণ্ড, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ, ২০১৩।
করণাবংশ ভিক্ষু, (সম্পাদনায়) *মিলিন্দ পঞ্ণেয়া*, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ, ২০১৩।
ধর্মাধার মহাস্থবির, *মধ্যম নিকায়* (অনুবাদ, দ্বিতীয় ভাগ), বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৫৬।
বেণীমাধব বড়ুয়া, *মধ্যম নিকায়* (অনুবাদ) কলিকাতা, ১৯৪০।
ভিক্ষু জে. প্রজ্ঞাবংশ মহাথের, (অনুদিত) *মহাবর্গ পরিক্রমা*, চট্টগ্রাম, ২০০০।
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য, *মিলিন্দ পঞ্ণেয়া* (অনুবাদ) প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, ১৩১৫
বঙ্গাব্দ।
সাধন কমল চৌধুরী, *বিগুপ্ত মজ্জিম নিকায়* (অনুদিত), করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪১৫।

দ্বৈতীয়ক উৎস

এম. মতিউর রহমান, *বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্ব ও যুক্তি* (সম্পাদিত), প্রবন্ধ-গৌতমের ধর্মে আত্মার স্থান, জাতীয়
সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।
জগদীশ্বর সান্যাল, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা, সপ্তম সংস্করণ ২০০২।
জিতেন্দ্রি লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ ধর্মে কর্মবাদ বনাম সৃষ্টি রহস্য*, ঢাকা, ২০০০।
দেবব্রত সেন, *ভারতীয় দর্শন* (২য় সংস্করণ), কলিকাতা ১৯৮৫।
নীলকুমার চাকমা, *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ১৯৯০।
প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ভারতীয় দর্শন*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, (৪র্থ সংস্করণ) ১৯৯৯।
মফিজ উদ্দীন আহমদ, সম্পাদিত *ব্রট্রাভ রাসেল*, প্রবন্ধ- রাসেলের নৈতিক দর্শনের ভিত্তি, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ ;
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩।
রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বৌদ্ধ দর্শন (অনুবাদ ধর্মধার মহাশ্চবির), বৌদ্ধধম্মাক্কুর সভা, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ,
২০১২।

সুকোমল চৌধুরী, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৭।

Malalasekhera, G.P ; *The Truth of Anatta* , 1986 .

Mahathera, Nyanatiloka; *Buddhist Dictionary Manual of Buddhist Terms and Doctrines*, (Forth Edition) Buddhist Publication Society, 1980.

Ven Rahula, Walpola ; *What the Buddha Taught*, The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation, Taiwan, 1978.

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা

ড. রওশন আরা আফরোজ*

প্রতিপাদ্যসার

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠে। বিশ শতকের শুরুতে পূর্ববাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দেয়। উল্লেখ্য যে, এই প্রদেশে মুসলমানগণ ছিল সংখ্যায় বেশি। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে তারা বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদ লাভ করতে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষিত মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শহর-নগরে ক্রমশ তাদের বসতি বৃদ্ধি পায়। গ্রামকেন্দ্রিক জীবন যেমন গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব রেখে থাকে তেমনি শহর ও নগরকেন্দ্রিক জীবনও আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে নাগরিক জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ ও এ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে মুসলিম সমাজের আগ্রহের ফলে শহর-নগরে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কারণ, শহর-নগরই ছিল উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ তাদের সন্তানদের শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরণ করে। নতুন প্রদেশের শহর-নগরগুলো শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলিম সমাজের জন্য জীবিকার নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নতুন শিল্প-কলকারখানা নির্মাণ, বিনোদনের নানা ব্যবস্থা, নাগরিক সুবিধা (বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, ড্রেনেজ ব্যবস্থা) গ্রামের মানুষকে নগরের দিকে টানতে থাকে। নগর ও নাগরিক জীবন নিয়ে ইতিপূর্বে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা হলেও পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পৃথকভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। প্রবন্ধে মুসলিম সমাজের নগর জীবন, নগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মুসলিম সমাজের উপর কতটা প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থের সাহায্যে নাগরিক জীবন ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এক

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই শহর-নগরে মুসলমান চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেসময় স্কুল কলেজে ছাত্রদের পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা না থাকায় তাদেরকে লজিং বা জায়গীর থাকতে হয়। তখন মুসলিম সমাজের যারা পরিবার নিয়ে শহরে পূর্ব থেকেই বাস করতেন তাঁরা জায়গীর রাখতেন। এর দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। এক, লজিং-এ থাকা ছাত্রটির মাধ্যমে নিজ সম্ভানের লেখাপড়া করানো এবং দুই, সে সময়ের সামাজিক নিয়মানুযায়ী প্রেসটিজ রক্ষা করা (করিম ২০১৪, ৫৭)। এভাবে গ্রামের ছাত্র শহরে জায়গীর জুটিয়ে সেই বাড়িতেই গৃহশিক্ষক হিসেবে থাকাটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। সেসময় সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বেতন দিতে হতো না। তাই বৃত্তির টাকা থেকেই তাদের বই-পুস্তক, পেন্সিল ও খাতা পত্রের খরচ চলে যেত (হোসেন ১৯৮৬, ২৬৪-২৬৫)। হাবিবুর রহমান ১৯৩০ সালে রাজশাহী শহরে দশম শ্রেণিতে পড়তেন জায়গীর থেকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

গ্রাম হইতে যেসব মুসলমান ছেলে রাজশাহীতে স্কুল কলেজে পড়িতে আসে তাহারা বেশির ভাগই গরীব এবং হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করার আর্থিক সামর্থ্য তাহাদের অনেকেরই থাকিত না। এই ছেলেরা জায়গীর থাকিয়া পড়াশুনা করিত। জায়গীরদাররা সাধারণত রাজশাহী শহরের এবং শহরতলীর গরীব বাসিন্দা এবং বস্তির বাসিন্দাই বলা চলে। গরীব হইলেও তাহারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে নজর রাখিত। বিশেষ করিয়া মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে সবিশেষ নজর রাখিত এবং গৃহশিক্ষক হিসেবে স্কুল কলেজের ছেলেদের জায়গীর রাখিত (৪৮)।

এভাবে জায়গীর বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থেকে ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা চালানোর চেষ্টা চলত। কারণ, গ্রামে ইংরেজি স্কুল বেশি ছিল না। তাছাড়া শহরে থেকে ইংরেজি স্কুলে পড়ার সামর্থ্য গ্রামের সকল ছাত্রের ছিল না। তাই এন্ট্রান্স বা ম্যাট্রিক পাশ করাটাই ছিল অধিকাংশ মুসলিম ছাত্রের লক্ষ্য। সকলের পক্ষে ঐ সীমা পর্যন্ত পৌছানোও সম্ভব হতো না। ম্যাট্রিক পাশ করা তরুণেরা কেরানির চাকুরির জন্য চলে যেত কলকাতায়। আগেই যাদের পড়াশোনা বন্ধ হতো তারা অনেকেই সাগর পাড়ি দিয়ে রেঙ্গুন(মিয়ানমার) চলে যেত, কলকাতায়ও যেত অনেকে। তারা কলকাতা-রেঙ্গুনের ইউরোপীয় সাহেবদের বয়, বাবুর্চি, মশালচি, খানসামা এবং বড় বড় হোটেলের ওয়েটার, বাটলার প্রভৃতি কাজ করত, কেউ কেউ সাহেব লোকদের ড্রাইভার হতো (শামসুদ্দীন, ২০০৫ : ৬৫)। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে পাটের দাম বৃদ্ধি পায়। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে অনেক মুসলমান ছাত্রও স্কুল-কলেজের জায়গীর থাকার পরিবর্তে হোস্টেলে থেকে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেন,

১৯১৯ সালে আই. এ. পাশ করিয়া আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। বিশ্বযুদ্ধের দরুন পাটের দাম কিছুটা বাড়িয়া যাওয়ায় সব পাট চাষীর মতোই আমার বাপের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। এই সুযোগে আমি এস. এম. হোস্টেলে উঠি (১২১-১২৪)।

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা

পূর্ব বাংলার প্রধান শহর ঢাকা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হলেও বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ছিল শান্তি প্রিয়। চাকরি করে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনবার আশা তারা সকলেই পোষণ করত। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর ধীরে ধীরে স্বাধিকার স্পৃহা জেগে উঠে। এ অবস্থা নাগরিক জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে (ইব্রাহিম ২০০৩, ৪৩০)। দেশভাগের পর ঢাকা শহরে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল; অনেক শিক্ষক ঢাকা ত্যাগ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষ অনেক যোগ্য মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ দেন। মুহম্মদ আব্দুল হাই কর্তৃপক্ষের উৎসাহে ১৯৪৯ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন (মনসুর মুসা ১৯৮৮, ২০)। পূর্ব বাংলা থেকে আই. এ. পাশ করে অনেকেই যেত কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর জন্য তৈরি ভবনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। ঐ ভবনগুলোর কয়েকটি পূর্ববাংলা সরকারের কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। দেশভাগের পর সরকারি কর্মচারীদের অপশনের সুযোগ দেওয়া হয়, অর্থাৎ তারা পাকিস্তানে চাকরি করবে, নাকি ভারতে। সেই হিসেবে মুসলিম কর্মচারীদের প্রায় সকলে পাকিস্তানে চলে আসে। কলকাতার এবং পশ্চিম বাংলায় কর্মরত চাকুরিজীবীরা তাঁদের পরিবার পরিজনসহ ঢাকায় আসতে থাকে। তাই সরকারি অফিস পরিচালনার জন্য এবং সরকারি চাকুরিজীবীদের আবাসন সমস্যা দেখা দেয়। সরকারি চাকুরিজীবী ছাড়াও পশ্চিম বাংলার অনেক মুসলমানও পরিবার নিয়ে পূর্ব বাংলায় পাড়ি দেয়। বাংলার বাইরের অন্যান্য এলাকার অবাঙালি এবং উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে। তারা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে সুযোগ-সুবিধামত আশ্রয় নেয়। তখন শিল্প ও কলকারখানা তেমন ছিল না, সুতরাং তারা শহরে-বন্দরে ব্যবসার আড়ত বা ছোট ছোট শিল্পে নিযুক্ত হতে থাকে। পরে শিল্প ও কলকারখানা (যেমন: আদমজী, বাওয়ানী, কর্ণফুলী কাগজের মিল ইত্যাদি) স্থাপিত হলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তবে তাদের একটা বড় আশ্রয়স্থল ছিল রেলওয়েতে। সেখানে প্রচুর বিহারি লোক নিয়োগ লাভ করে। এই কারণে রেলওয়ের বিভিন্ন স্থাপনা (যেমন: চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, ঈশ্বরদী ইত্যাদি) এলাকায় তারা দলে দলে যায় এবং কাজে যোগদান করে সেখানে তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় (আবদুল করিম ২০১৪, ১৬৭-১৬৮)। এছাড়া গ্রামের নিকটবর্তী নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠায় কারখানায় চাকরি, কারখানা মালিকদের নিকট জমি বিক্রয় এবং শহরের অভিবাসীদের জন্য বাড়ি ভাড়া গ্রামের জন্য নতুন নতুন সুযোগ খুলে দেয়। এই সব উপায়ে অধিক উপার্জনের ফলে গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে এবং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামোয় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটে। বলা যায়, গ্রামের ব্যক্তির পুলিশ, আর্মি, বস্ত্র-কারখানায় চাকুরি পেতে থাকে। অল্প শিক্ষিত বা শিক্ষিত ব্যক্তির যখন শহরে চাকরির সুযোগ পায় তখন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের তারা শিক্ষা প্রদানে আগ্রহী হয় (Rao 1970, 45)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল, কারণ মুসলমানেরা তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার জেলাগুলোতে অবস্থানরত উচ্চশিক্ষা লাভে উৎসাহী ছাত্রদের পক্ষে কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করা কঠিন ছিল। ১৯০৫ সালে ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ প্রদেশ গঠিত হলে পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং পূর্ব বাংলা যেহেতু মুসলিম প্রধান তাই এর সুফলভোগীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এই সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলায় নানা অবকাঠামো সৃষ্টি হয়, স্কুল কলেজের সংখ্যা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, আবাসিক হোস্টেলের সংখ্যা, টেকনিক্যাল শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায় (আবদুল করিম ২০১৪,

১৭৪)। শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ মুসলমানগণ নিজ সমাজের অগ্রগতির জন্য চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এই জন্য তাঁরা মুসলমান ছেলেদের শহরে থাকার এবং উচ্চ শিক্ষালাভে সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টায় লিপ্ত হন। খান বাহাদুর আবদুল আযীয চট্টগ্রাম বিভাগে সহকারী বিভাগীয় ইন্সপেক্টর থাকাকালে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষালাভের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে সেখানে 'ভিক্টোরিয়া ইসলামিয়া হোস্টেল' নামে একটি বিরাট দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির কার্যক্রম ছিল গরীব মুসলিম মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষালাভে সহায়তা করা এবং ইসলামিয়া হোস্টেলকে মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেল রূপে গড়ে তোলেন (আবদুর রহমান ১৯৭২, ১৬-১৭)। এ কাজের পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর উপাধি দেন। পরবর্তিতে এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ায় আশির দশকে ভিক্টোরিয়া ইসলামিয়া হোস্টেল ভেঙে ফেলা হয় (শামসুল হক ২০০৭, ১১৭)।

দুই

শহরে বিভিন্ন আধুনিক সুযোগের বন্দোবস্ত থাকায় বিভিন্ন রকম লোকের সমাবেশ ঘটে। যাদের মধ্যে ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, বিদ্যা-বুদ্ধির আদান-প্রদান হয়। ফলে নিত্য নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হয়ে উঠে শহর। ভূমিহীন এবং উদ্বৃত্ত মজুরেরা নতুন শিল্প এলাকায় ভিড় করে। গ্রাম থেকে আসা শ্রমিকরা শুধু কলকারখানায় নয়, নতুন শহরগুলোতে বিভিন্ন কাজের সুযোগ পায়। শহর-নগরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সমবায় ভিত্তিক লেনদেন এবং ধর্মঘট করার অধিকার নব্য শহরবাসীর সামনে অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ফলে অদক্ষ লোকও শহর এলাকায় কাজে নিযুক্ত হতে থাকে। শহরাঞ্চলের উপার্জিত অর্থ গ্রামে তাদের পরিবারের নিকট পাঠানোর ফলে গ্রামীণ সমাজেও উদ্ভব হয় একটি নতুন মানের জীবনযাত্রা। কলকারখানার আয় জমির চেয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়ায় অনেকেই তাদের পরিবার নিয়ে শহরে চলে যায়। ফলে শহর ও শিল্প এলাকাগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। নতুন নতুন রাস্তা তৈরি, পুরাতন রাস্তা মেরামত ও প্রশস্তকরণের ফলে প্রত্যেক জেলা সদরের সাথে রাজধানীর সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং পূর্ব বাংলার নগরগুলোতে অধিক ঘরবাড়ি তৈরি হয়। বন্দরগুলোতেও উত্তরোত্তর উন্নতি ও কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় (আবুল মনসুর আহমদ ২০১৪, ১৩৯-১৪০)। মফস্বল শহরগুলোতেও সুদৃশ্য দালান ও পরিষ্কার পীচের রাস্তা দেখা যায় (আবু রুশদ ১৯৯৮, ২৪)। তবে সেসময় গ্রাম থেকে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল ছিল না। শামসুল হক ১৯৪১ সালে রংপুর থেকে ভোলা আসার বর্ণনায় বলেন, রংপুর থেকে ট্রেনে শিয়ালদা স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে কুষ্টিয়া (নদীয়া জেলা) ও যশোর জেলা পেরিয়ে খুলনায়, সেখান থেকে স্টীমারে করে চাঁদপুর নৌবন্দর হয়ে ভোলা যান। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ অবস্থার জন্য এক প্রদেশের মধ্যেও মনে হতো নির্বাসনে যাওয়া (শামসুল হক ২০০৭, ৬৮)। এ বি এম হোসেন কুমিল্লা শহরের সাথে তাঁদের বাড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেন,

বাড়ি থেকে জেলা শহরের দূরত্ব ১৫ মাইলের মত হলেও রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের অসুবিধায় তা অনেক বেশি বলে মনে হতো। বড় চাচা ও আক্কা জুরী বোর্ডের সদস্য হওয়ায় দেখেছি শেষ রাতে তারা কুমিল্লার পথে বাড়ি থেকে হেঁটে বা নৌকায় রওয়ানা হতেন, ফিরতেন গভীর রাতে (৭১)।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরের সাথে বিশেষ করে রেল যোগাযোগের স্টেশন বা জংশন রয়েছে যেসব শহরে, সেগুলোর সাথে কলকাতার খুব ভাল সংযোগ ছিল। দার্জিলিং মেল পাড়ি দিত কুষ্টিয়া শহর হয়ে, কিংবা রংপুর হয়ে রেল চলে যেত আসাম। তখন অবহেলিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হতো পদ্মাপাড়ের পূর্বদিক বা মূল পূর্ব বাংলা। ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলা শহরগুলোর যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, উপায়ও

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা

ছিল দুর্বল। দেশভাগের ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগসূত্র হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত (মফিদুল হক ২০১২, ৫৯)। গ্রাম থেকে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হলেও শহর-নগরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ভাল ছিল। তবে তা পশ্চিম বাংলার শহরগুলোর তুলনায় ভাল ছিল না। ১৯৪৭-এর পূর্ব থেকেই যখন কলকাতার শহরের রাস্তায় ট্রাক, বাস, মোটর গাড়ি ও মানুষ টানা রিক্শা চলত তখন ঢাকায় গরু ও ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া কিছু মোটর গাড়ি চলাচল করত (শাহানার হোসেন ২০১৮, ৯২)। এই ছিল মফস্বল বা গ্রাম থেকে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা। গ্রাম থেকে শহরের চাকুরিজীবীদের এভাবেই নিত্য প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা পাড়ি দিতে হতো।

বিশ শতক থেকে পূর্ব বাংলার শহরগুলো আধুনিক নগর উপাদানে সমৃদ্ধ হতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যেই পূর্ব বাংলার বেশ কিছু শহর-নগরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানির কল চালু হয়। ঢাকায় পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা চালু হয় ১৯২৩ সালে। লেট্রিন তখনও এ ব্যবস্থায় যুক্ত হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগ (১৮৫৬) পর্যন্ত লন্ডন শহরেও কলেরাসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। সেখানে এ ব্যবস্থা তৈরি হয় ১৮৫৬ সালে। এরও প্রায় পৌণে একশত বছর পরে পূর্ববাংলার প্রধান শহর ঢাকায় এ ব্যবস্থা চালু হয় (মোহাম্মদ শাহ আলম ২০১৮, ৮৪)। অন্যান্য ছোট শহরের কথা সহজেই অনুমেয়। ঢাকা শহরে ১৮৭৭ সালে কেরোসিন বাতির প্রচলন হলেও ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিদ্যুৎ চালু হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য কোন ট্যাক্স নেয়া হতো না। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ আলোর জন্য বার্ষিক ৩ টাকা ও কেরোসিন বাতির জন্য শতকরা ১ টাকা নাগরিক কর ধার্য করা হয়। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর ঢাকার রমনা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ঢাকা শহরে ১,৩৭০টি বিদ্যুৎ বাতি ও ১,০৭০টি কেরোসিন ল্যাম্প ছিল (ঢাকা প্রকাশ ১৯১৩, ৩)। এ সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার অনেক শহরেই বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হয়। ১৯৪৩ সালে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নুরুল ইসলাম তাঁর দেখা প্রথম চট্টগ্রাম শহরের বর্ণনায় বলেন,

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে যখন পৌছি তখন সন্ধ্যা সাতটা। প্রথমেই চোখে পড়ল চারিদিকে বিজলীবাতি। অন্ধকার রাতের যেন অস্তিত্ব নেই। এত দিনের কল্লনার শহর আর গ্রামের ব্যবধান এখানেই, আলো আর অন্ধকার। শহরে তখন যানবাহন বলতে একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি ছিল। রিক্শা আর বাস কিছুই ছিল না (৩১)।

১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে এ ধরনের নাগরিক সুবিধা বেড়ে যায়। এ সময়ের খুলনা শহরের বর্ণনায় আনিসুজ্জামান বলেন,

খুলনা শহর তখন ছবির মত ঝকঝকে তকতকে। তিন-চারটি প্রধান রাস্তা তেমন চওড়া নয়, তবে মসৃণ পিচ দিয়ে ঢাকা আর খুব পরিচ্ছন্ন। তার উপর দিয়ে অত্যন্ত সস্তা ভাড়া সাইকেল-রিক্সা চলে।----- রাস্তায় বিদ্যুতের বাতি আছে- গ্যাসের আলোয়। কিন্তু বিদ্যুতের সরবরাহ তেমন সম্প্রসারিত নয়। নানা জায়গায় পানির কল বসানো আছে (১১৫)।

তিন

শহরের বিনোদন ব্যবস্থাও ছিল আকর্ষণীয়। ১৯১১ সালের আগে বঙ্গদেশে ফুটবলের প্রবর্তন হয়েছে। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গণে বাঙালিরা সত্যিকারের মর্যাদা পায় ১৯১১ সালে। ১৯১১-১৯৩৪ এই পঁচিশ বৎসরে কলকাতা ও মফস্বল শহরে কয়েকটি প্রথম শ্রেণির খেলোয়াড় দল গড়ে উঠে। এ সময়ের কয়েকটি উচ্চমানের ক্লাবের মধ্যে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল, ন্যাশনাল হাইয়ার স্পোর্টিং, মোহামেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও এরিয়াস উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল ও মোহামেডান স্পোর্টিং ছিল মুসলমান

খেলোয়াড়দের দল (আল্-এসলাম ১৩২৭, ৬২)। অভিজাত পরিবারের লোকজন এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া পূর্ববাংলার অনেক শহরে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু এসব শহরে মুসলমান শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিমণ্ডিত ব্যক্তির উপস্থিতিও ছিল। ১৯৩১ সালে খুলনা শহরের কেরানির চাকুরি করা কালে আবু জাফর শামসুদ্দীন খুলনা শহরের বর্ণনায় বলেন, খুলনা ছোট শহর, তখন বোধ করি লোকসংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ হাজারের বেশি নয়। তিনি আরো বলেন,

পূর্ববাংলা আইন পরিষদের স্পিকার আবদুল হাকিম তখন খুলনার উদীয়মান আইনজীবী। যশোর রোডের উপর ছিল তার দোতলা বাড়ি। তার শ্বশুরও ছিলেন খুলনা বারের খ্যাতনামা উকিল। গুঁরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। হাকিম সাহেবের অন্য প্রতিবেশী ছিলেন পরবর্তীকালে রাজনীতিক এবং তখন খুলনার বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় আবদুস সবুর খানদের পরিবার। এই ৩টি পরিবার ছিল তৎকালীন খুলনা শহরের এলিট (১২৭)।

এখনকার মত তখন টেলিভিশন ছিল না, রেডিও থাকলেও তা ছিল জনসাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই শহরে সিনেমা হলগুলো ছিল সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম স্থান (শামসুল হক ২০০৭, ১০১)। যেখানে শহর-নগরের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল। তবে অনেক উৎসাহী ব্যক্তিও এতে যোগ দিতেন। জসীম উদ্দীন তাঁর আর্থিক দীনতার মধ্যেও ফরিদপুর শহরে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা তাঁর জীবন কথা নামক আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

পরলোকগত কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদারের সময় হইতে আমাদের ফরিদপুর শহরে প্রতি বছর একটি কৃষি শিল্প প্রদর্শনী বসিত। এই উপলক্ষ্যে সেখানে নানা রকম গান-বাজনা হইত। একবার সেখানে বিল্ব-মঙ্গল অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। এই আমার প্রথম থিয়েটার দেখা (১৩৪)।

নগরে আধুনিক বিনোদনের ব্যবস্থা যে ছিল তা বলা যায়। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ঢাকা শহরে অবস্থাপন্ন বা স্বচ্ছল লোকেরা পরিবারসহ নাটক, সিনেমা, থিয়েটার দেখত। গুলশানের ‘মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট’, বংশালের ‘নিশাত’, রায় বাজারের নিকট ‘আযাদ’ সিনেমা হলে ছিল এ ধরনের বিনোদন ব্যবস্থা (মোহাম্মদ শাহ আলম ২০১৮, ৮৫)। ঢাকার গুলিস্তান এলাকার আন্ডারপাসের উল্টো দিকে স্টেডিয়ামের কোণায় ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজের অফিস বিল্ডিংয়ে ‘ব্রিটানিয়া’ (Britania) নামে একটি ছোট সিনেমা হল ছিল। এটি দেশভাগের আগে থেকেই ছিল (বদরুদ্দীন উমর ২০০৪, ২২৩)। এছাড়া সরকারি চাকুরিজীবীরা বিকালে ক্লাবে যেতেন, ক্লাবের লনে টেনিস খেলতেন (মিসবাহ উদ্দীন খান ২০০৯, ১৬)। তবে ভ্রমণে বা ছুটি কাটাতে অথবা অবকাশ যাপনের জন্য বর্তমানের মতো খুব একটা যেত না পূর্ববাংলার মানুষ। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন,

ছুটিছাড়া হলে বেড়াতে যাওয়া, এটা এখানে নেই। এখানে কোথায় যাবে মানুষ? কোন ব্যবস্থাও তো নেই। আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের কিছু জায়গা, কক্সবাজার অথবা সিলেটের চা বাগান। এসব জায়গায় তো গরীবদের কোন প্রশ্নই নেই। সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্যও কোন ব্যবস্থা নেই। বড় লোক যারা তাদের জন্য সামান্য ব্যবস্থা আছে। মধ্যবিত্ত লোকজন যে বেড়াতে যেতে পারে সে ধারণাটাই এখানে দেখি না (৩০)।

চার

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে মুসলমানরা পূর্ব বাংলার নাগরিক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও আধিপত্যকারী শ্রেণিতে পরিণত হয়। সে সময়ের বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক বা রেলকেন্দ্রিক শহরগুলো যে উন্নত নাগরিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মন্সস্তরের সময়ে কিছু অরাজকতা লক্ষ করা যায়। ৪৩ এর দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন,

দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়ার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মনের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করেছে। এমন দিন নাই রাত্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না (১৭)।

অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে শহরাঞ্চলের বিকাশ ঘটছে, অন্যদিকে গ্রামে বিচ্ছিন্নতার অবসান হয়েছে। একজন শহুরে চাকুরের নাগরিক জীবনে সুখ থাকলেও স্বচ্ছন্দ যে খুব একটা ছিল না তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সা'দত আলি আখন্দ পুলিশের চাকুরি করা কালের ঘটনার বর্ণনায় বলেন,

ছোট তিনটা ভাই স্কুলে পড়ে। আবার বিয়েও করে ফেলেছি চাকুরির আগেই। মাস ঘুরলেই অনেকগুলো নগদ টাকার দরকার। অনেকগুলো চোখ আমার মাইনে পাওয়ার পয়লা তারিখের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকে যে (৩৫৭)।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ হতেই মুসলিম সমাজ চাকুরি, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশার সন্ধানে শহরে যেতে থাকে। নতুন প্রদেশ সৃষ্টির পর এ কাজটি আরও গতিশীল হয়। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানরা তখনও খুব একটা আগ্রহী ছিল না। এ প্রসঙ্গে ছোলতান পত্রিকায় বলা হয়,

চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলার মোছলমানদিগকে বাদ দিলে সমস্ত বাঙ্গালার মোছলমান সমাজই ব্যবসা বাণিজ্যে উদাসীন। মাড়োয়ারীরা বিগত ৩০/৪০ বৎসরের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালা ও আসামে যে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব উন্নতি করিয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয় (২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)।

শহুরে-ভাব, সচেতনতা ও আধুনিক চিন্তার বিকাশ শহরের চাকুরিজীবী পরিবারে ছিল। গ্রামে সে অভ্যাস তখন ছিল না। আজও যে গ্রামে এ অভ্যাসটি খুব একটা তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণভাবে তা বলা যায় না। এভাবে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষগুলো এসেই শহরের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তখন চেনা গ্রামও তার কাছে অচেনা আর নিরানন্দময় মনে হয়। ডা: আবদুল বাসেত বলেন,

বরিশাল, ঢাকা এবং কলিকাতা দেখিয়া আসিয়া, আমার চক্ষু খুলিল। একের পর এক পরিবর্তন দেখিতে লাগিলাম। শহরগুলো দেখিয়া যখন গ্রামে আসিলাম মনে হইল পূর্বের মত আর মনে আনন্দ পাই না কেন? তাহা নিজেও বুঝিতে পারিলাম না। যে দিকে তাকাই সে দিকেই কেমন যেন একটা অভাবের ভাব। আমরা কোথায় আর এরা কোথায় (৩৬)।

শহর ও গ্রামের পরিবেশগত পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়। আবদুর রহমান শহর-নগরে আভিজাত্যের উল্লেখ করে বলেন, “সিলেটের বহু লোক জাহাজের খালাসী, সুকানী ও মিস্ত্রীর কাজ নিয়ে বিদেশ যেত, অনেকে বিলাত

যেত। যা চট্টগ্রামেও লক্ষণীয় ছিল। তবে এখানকার অনেকে বার্মা যেত। চট্টগ্রামের সঙ্গে আরও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল- সেখানেও শহরে ও গ্রামে লম্বা-নলযুক্ত ফরসী-হুকো এবং কাঠ বা কঞ্চির নলওয়ালা পিতলের বা মাটির হুকোর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। শহরের প্রত্যেকটা ভদ্র পরিবারের বৈঠকখানায় ফরসী হুকো দেখা যেত (৩৮৫)। গ্রামের সাথে শহরের খাদ্যাভাসেও ছিল অনেক পার্থক্য। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সকালে পান্তা-মরিচ-লবন বা বাসি তরকারি খেয়ে থাকে। পিঠা-পুলি গ্রামে ঘরে-ঘরে তৈরি হলেও শহরে এগুলো দুর্লভ। এ প্রসঙ্গে শামসুল হক ঢাকায় প্রথম এসে যে খাদ্যাভাস দেখেন সেটি সম্পর্কে বলেন, ‘দুপুরের আহারে গোস্তের সাথে ছিল নানা শাক সবজি, ছোট ছোট মাছ’ (৫৫)। শহরের সকলের যে সমান অবস্থা ছিল তা নয়। আস্‌হাব উদ্দীন আহমদ বলেন, “আমাদের যা বাইরের ঠাঁট তার থেকে কার ভেতরের আসল অবস্থা যে কি, তা কি বোঝার যো আছে? ঘরে চাল না থাকতে পারে কিন্তু হালচালের মধ্যে নিত্য নতুন চালের অভাব তো নেই’ (১৩)। ড. মোহাম্মদ শাহ আলম ঢাকা শহরে আসার পরের বর্ণনায় বলেন,

এখন যে নূতন মজায় মজে গেছি- রাস্তায় হাবিবের মুদির দোকানের মুরালি, এক পয়সার চেপটা সন্দেশ, এক পয়সার ডিমের বাতাসা বা মেরিং (Meringue)। আইসক্রিম ওয়ালার এক পয়সা দুপয়সার বিভিন্ন রং এর আইসক্রিম, কুলফি মালাই। হাওয়াই মিঠাই ওয়ালার বারান্দায় বসে বানিয়ে দেয়া লাল গোল তুলার মত মিঠাই। উড়িষ্যার টিকিওয়ালা লোকটির মোটা লাঠিতে পেঁচানো গোলাপী মিঠাই যা বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে বানিয়ে দেয়া হতো। ফেরিওয়ালার ঝালমুড়ি, চানাচুর, বাকরখানি, বিভিন্ন রকমের আচার, কটকটি মিঠাই। রাস্তার পাশে মাখনা, পানি ফল, তালের কচি বিঁচি, তালের রসের জেলি। আরও কতকিছু যা গ্রামে দেখিনি (৭৩)।

গ্রামের মানুষ শহরে পেশাজীবী হওয়ার পর অনেকেই শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তা সত্ত্বেও গ্রামের সাথে তাদের থাকত গভীর যোগাযোগ। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু, যারা দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত ছিল প্রভাবশালী স্বচ্ছল সংখ্যালঘু। উঁচু শ্রেণির যারা এদেশে থাকাটা বেছে নিলেন তাদের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মফস্বল কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন। ঢাকায় এসময় হিন্দুদের বাড়িগুলোই আগত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য দখল করা হতো। সেগুলোই ছিল সবচেয়ে বড় ও সুবিধা সমন্বিত বাড়ি। আর সেগুলোর মালিকদের তা রক্ষা বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তখন ছিল না (স্টক ২০১১, ৮৯)। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আক্রান্ত জেলাগুলোর কিছু বাড়ি সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ ফেরদাউস খান বলেছেন,

আমাদের পাঠানটুলীর পৈত্রিক দ্বিতল বাড়িটি সরকার রিকুইজিশন করে নিয়েছিলেন সেনা অফিসারদের সাময়িক বসবাসের জন্য। চট্টগ্রামের সাথে রেঙ্গুন ও আকিয়ারে যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন পূর্ববাংলার চাকুরিজীবী ও বণিকগণ সেখান থেকে নিজ এলাকায় চলে আসেন (৫৩)।

পাঁচ

ইংরেজদের নিকট এদেশের মুসলিম রাজক্ষমতা হারাতে বাধ্য হলে শুরু হয় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির যুগ (গোপাল হালদার ২০১৩, ১৬)। ব্রিটিশ শাসনের দু’টি উপাদান সামাজিক পট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। প্রথমত, পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (কলকারখানা) এবং দ্বিতীয়ত, সরকারের সামাজিক (শিক্ষা ব্যবস্থা) পরিকল্পনা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র পরিবার গড়ে উঠেছে, নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে যা আমাদের সামগ্রিক সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা

(Afsaruddin 1983, 16)। সেসময় শহরের সরকারি পদগুলি সম্মানিত পরিবারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। সমাজে শিল্পায়ন ও নগরায়ন যতই ঘটছে ততই একক পরিবারগুলো যৌথ পরিবারের স্থান দখল করে নিচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খুব দ্রুতই দেশের লোকেরা শহরমুখী হয়ে পড়ছে। দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলার শহরগুলোতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন প্রদেশ গঠন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে মুসলিম সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদেও পরিবর্তন আসে। গ্রামে ধীরে হলেও শহর-নগরে এ পরিবর্তনটি দ্রুতই ঘটতে থাকে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই লুঙ্গী পরতো। মুসলমানরা পরতো একরঙ্গা লুঙ্গি, হিন্দুরা পরতো চেককাটা লুঙ্গি। বড় শহরে চাকরিজীবীরা প্যান্ট ও শার্ট পড়লেও মফস্বল শহরে হিন্দু-মুসলিম সবাই সাদা শার্ট ও ধুতি পড়তেন (আনিসুজ্জামান ২০১৫, ৭০-৭২)। ১৯৩৮ সালে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় বর্ণনাতে মিসবাহউদ্দিন খান বলেছেন,

বরিশাল খুব পরিচ্ছন্ন ছিমছাম শহর ছিল। ঘন হিন্দু বসতিপূর্ণ শহর জীবনে ছিল কংগ্রেস আধিপত্য। আমরা ছাড়া সবাই কি হিন্দু কি মুসলমান ধুতি পড়তেন। আমরা হাফপ্যান্ট বা পায়জামা শার্ট পড়তাম। শীতের দিনে শার্টের উপর কোট পড়তাম। হিন্দু ছেলেরা আমাদের পায়জামা পরিহিত দেখলে বলত- দোনালা পরে এসেছে (২০)।

এভাবে মুসলমান সমাজ আলাদা পোশাক পরলে তখন হিন্দু সমাজ উপহাস করে কথা বলত। স্কুলের পোশাক (১৯৪৪) সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর বলেন, ‘আমরা তখনকার দিনে স্কুলে যেতাম হাফ পায়জামা ও শার্ট পরে’ (৩২)। পোশাক সম্পর্কে ছোলতান প্রতিকায় বলা হয়,

নব্য শিক্ষিতগণ টুপির জানি দুশমন হইয়া পড়িয়াছে। যে পূর্ববঙ্গে জাতীয় পোশাক, বিশেষতঃ টুপির একসময় অত্যন্ত প্রচলন ছিল, সেই পূর্ববঙ্গেও আজকাল নব্য দলের মধ্যে অমোছলমানী পোশাক পরিচ্ছদের পূর্ণ প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। আচকান, পায়জামা, লুঙ্গি, তহবান ও টুপির পরিবর্তে সর্বত্র ধুতির প্রচলন হইয়াছে। আর টুপির দুর্ভাগ্যের এ কথাই নাই। টুপির সহিত নব্য মোছলমানের যেন ঘোর শত্রুতা সাধিত হইয়াছে (৪ এপ্রিল, ১৯২৪)।

এতে নগর সংস্কৃতির রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা করা যায়, পাকিস্তান আন্দোলন অধিকতর জোরদার হওয়ার পর পাঞ্জাবি-পাজামা পরার রেওয়াজ অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ধুতির ব্যবহার একেবারে উঠে যায়। পাজামা-পাঞ্জাবি, শার্ট, লুঙ্গি হয় নিত্যদিনের পোশাক (শামসুল হক ২০০৭, ১৯)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আত্মপরিচয় গোপনে উৎসুক হিন্দু-মুসলমান অধিকাংশ লোকই প্যান্ট-শার্ট এর ন্যায় পোশাকের আড়ালে সম্প্রদায়গত পরিচয় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করত (মো: আবদুল মোহাইমেন ১৯৮৬, ৬৩)। ১৯৪৭-এর পরে অনেকে টাই, স্যুট পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। এ ধরনের পোশাক পরে তখন প্রফেসর ছাড়া আর কেউ সচরাচর যেত না। প্রায় সবাই ট্রাউজার, শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন (মিসবাহউদ্দিন খান ২০০৯, ৬৬)। সুফিয়া কামাল শহরের নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বলেন,

কাপড়-চোপড়ে ঢাকাই শাড়ী থানের উপর চিকনের কাজ করা আবেরওয়াঁ আর আসল মসলিন না হলেও নামে মসলিনের উপর চিকনের কাজ করানো কাপড়ের ব্যবহার ছিল। পুরুষদের কুরতা, বেনিয়ান, শেরওয়ানী তাই দিয়ে তৈরি হতো। বিয়ে-সাদীতে সাচ্চা কাজ করা সিল্কের কাপড়ে

পেশোয়াজ, ওড়না, পাজামা এবং জোড়া বদলাইয়ের জন্য বেনারসী শাড়ীর প্রচলন ছিল। তারপর এল বোম্বাই শাড়ী (৫৬১)।

হাবিবুর রহমান শহরের স্কুলে ভর্তি হয়ে দেখলেন যে হিন্দু ছেলেরা ধোপার ধোয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধুতি চাদর জুতা মোজা পরিধান করত। কথাও বলত মার্জিত ভাষায়। অল্প সময়ের মধ্যে এই স্কুলের আদব কায়দা তিনিও রপ্ত করলেন। যে হিন্দু ছেলেরা তাকে টিটকারী করত তারাই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে (২১-২২)। সে সময় অনেকের বাড়ি ছিল পূর্ববাংলায়, কিন্তু চাকুরি সূত্রে অন্যত্র (বেশির ভাগই পশ্চিম বাংলায়) থাকতেন (শাহানারা হোসেন ২০১৮, ৫২-৬১)। প্রয়োজনের জন্য বাস করলেও বৈবাহিক সম্পর্ক খুব একটা হতো না। সেকালে বড় পরিবার বিশেষ করে সৈয়দ পরিবারের বিয়ে সাদী নিজেদের পরিবারের মধ্যে হওয়াই প্রথা ছিল। এতে সম্পত্তিও বাইরে যেত না, আরও থাকত বংশগত সৌন্দর্য ও আদব কায়দা রক্ষার ব্যবস্থাও। শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ আলাদা হলেও শহরের মুসলিম সমাজ থেকে কিছু গাঁড়ামী একেবারে ছিল না তা বলা যায় না। মিসবাহউদ্দিন খান তাঁর শিক্ষিত চাকুরিজীবী পিতা সম্পর্কে বলেন, তিনি খুব শিক্ষিত পুত্রবধু চান না। অথচ তিনিই হলেন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেয়ার পক্ষপাতী। বিশ শতকেও মনে করা হতো বেশি পড়ালেখা জানা মেয়ে অব্যাহত হয় (৭৩-৭৪)। মোট শিক্ষিতের মধ্যে সেসময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম। আর নারীরা ছিল আরো কম। তখনকার দিনে চৌদ্দ বছর বয়স হলেই মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য মা-বাবারা চিন্তিত হয়ে থাকতেন। সম্ভ্রান্ত কি সাধারণ পরিবার, সামাজিক অবস্থাটাই ছিল এ রকম। বিশ শতকের মধ্যভাগ জুড়েই দেখা যায় নারী শিক্ষায় অনেকেই এগিয়ে আসেন। স্কুল-কলেজে নারীর অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বাড়লেও সামাজিক কিছু প্রচলিত নিয়ম রীতির উর্ধ্বে সমাজ যেতে পারেনি। প্রতিভাবান কোন নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষিত ও অভিজাত ঘরের মেয়েকেও অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি তারা বজায় রাখতেন। নবাব পরিবার, জমিদার পরিবার, কিছু সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও শিক্ষিত মুসলিম পরিবার থেকেই এ রকম কিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে (জওশন আরা রহমান ২০১০, ৪৪)।

তাছাড়া শহরে মুসলিম নারী সমাজের জন্য তখনও পর্দা রক্ষা করে চলার প্রথা ছিল। ডাঃ আবদুল বাসেত বলেন, “ঢাকার স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে ভীষণ পর্দা ছিল। ঘোড়ার গাড়ীতে পর্যন্ত পর্দা লাগাইয়া চলিত। মটর গাড়ীতেও পর্দা লাগাইতে দেখিয়াছি। বোরখা ছাড়া মেয়েরা কোথাও বাহির হইত না” (৪২)। গ্রামীণ সমাজে কিছু রীতি-নীতি ধর্মীয় জীবনের অংশ হলেও বিজ্ঞান প্রভাবিত শহরের জীবনে তা হয়ে পড়ে কুসংস্কার (আবুল মনসুর আহমদ ১৯৯৫, ১৪)। সে সময়ে শহরেও কিছু গ্রামীণ নিয়ম চালু ছিল। সন্তান জন্মাবার সময় গ্রাম ও শহরে আজকের দিনের মত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সচেতনতার বালাই ছিল না। এর বর্ণনায় বদরুদ্দীন উমর বলেন,

আগেকার দিনে অনেক বাড়িতে আঁতুড় ঘর করত একটা অস্বাস্থ্যকর জায়গায়। আমাদের আঁতুড় ঘর ছিল অন্য রকম। আমাদের পরিবারের মেয়েরা সন্তান জন্মের আগে সবাই বর্ধমানের বাড়িতে

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা

আসতেন। আজকালকের মত তখন হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল না। মনে হয় সেজন্যই ছিল এই ব্যবস্থা (১৩)।

এ প্রসঙ্গে বিচিত্রা পত্রিকায় বলা হয়, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া মহকুমা শহরে একটি দাতব্য নারী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ হতে গৌহাটি পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে প্রায় দুই শতাব্দিক মাইলের মধ্যে এটিই একমাত্র স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্র চিকিৎসালয়। সেখানকার সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্র দাস আই. সি. এস এর চেষ্টায় এটি স্থাপিত হয় (১৩৪৪, ৭০৬)। গ্রামের তুলনায় ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকায় শহর-নগর অনেকের প্রধান আকর্ষণ ছিল।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় মুসলিমদের সাংবাদিকতায় গোড়াপত্তন হয়। এরা পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল বাংলার মুসলমানদের জন্য ধর্মগত ও সমাজগত দিক দিয়ে আত্মচেতনা ও নবজাগরণের আন্দোলন। যার ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ থেকে অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, কুসংস্কার প্রভৃতি দূর হতে থাকে। আর ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। এই শিক্ষিত শ্রেণি ক্রমেই রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। উনিশ শতকের শেষদিকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট দশটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এসময় অধিকাংশ পত্রিকা পরিচালিত হতো হিন্দু মালিকানায। শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজ ক্রমে শিক্ষিত হয়ে ধীরে ধীরে সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় জাগরণ ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক তৎপরতার বছরগুলোতে পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্র শিল্প বিকাশের ভিত্তি প্রস্তুত হয়। এসময়ে বাংলা থেকে প্রকাশিত ১৭৩টি সংবাদপত্রের মধ্যে আনুমানিক ৬৫টি পূর্ববঙ্গ থেকে মুদ্রিত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত আট বছরে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা ২৫৯ থেকে ১৬০-এ হ্রাস পায় (বাংলাপিডিয়া ২০১১, ১৬৮)। এ সমস্ত পত্রিকার প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতা ও জমিদার শ্রেণি। এদের মধ্যে করটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পল্লী, ওয়াজেদ আলী খান পল্লী, দেলদুয়ারের করিমুল্লাহ চৌধুরাণী, আবদুল হালিম গজনবী, ধনবাড়ির সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, পশ্চিমগাঁওয়ের নওয়াব ফয়জুল্লাহ চৌধুরাণী, ঢাকার নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ২০০১, ১০)। বাসনা নামক পত্রিকাটি শেখ ফজলুল করিম কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রত্যন্ত রংপুর জেলার কাকিনা ‘শাহাবিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস’ থেকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০৮খ্রি.) প্রথম প্রকাশিত হয়। বাসনা পত্রিকায় মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্পর্কে সাহিত্যিকদের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে (কাজী আবদুল মান্নান ১৯৯০, ৩৭৭)। ১৯৪৭ সালে কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সম্পর্ক যেমন ছিল সহজ তেমনি ছিল ঘনিষ্ঠ। দেশভাগের পর নতুন প্রদেশ (পাকিস্তানের) পূর্ব বাংলার সঙ্গে কলকাতার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক স্বাভাবিক কারণে ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্মের মত প্রকাশনা শিল্পেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এর কারণ এ অঞ্চলের মানুষের বই মুদ্রণের অভিজ্ঞতা, মেশিনপত্র, প্রয়োজনীয় হরফের অভাবসহ প্রেস চালাবার মত আর্থিক সঙ্গতিও খুব একটা ছিল না। তখন মফস্বল শহরগুলো স্বল্প পুঁজি ও

ছোট খাট প্রিন্টিং মেশিনে মুদ্রণ কাজ চালাত (শামসুল হক ২০০৭, ৫০)। অবশ্য ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রসংগঠনগুলো নানা রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাচ্ছিল। তখন পূর্ববাংলার প্রেস ব্যবসা তুঙ্গে উঠে। শহরের মুদ্রণ শিল্পে যা ছাপা হতো তা বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরিত হতো। এ সম্পর্কে মো: আবদুল মোহাইমেন দুই দশকের স্মৃতি-তে উল্লেখ করেছেন,

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসাম্য, অবিচার মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুললে আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই সরকার বিরোধী পত্র-পত্রিকা ও কাগজপত্র ছাপার ব্যাপারে আমাদের প্রেস একটা কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় (৭)।

উপরিউক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে বলা যায় যে, সামাজিকতা পল্লী জীবনের বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গ্রাম। শহরে সামাজিক জীবনের অভাব থাকায় নিবিড় প্রতিবেশিত্ব গড়ে উঠে না। এছাড়া শহর-নগর শিল্প-কারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবেশিত্ব গড়ে উঠার সময় থাকে না। যেটুকু গড়ে উঠে তা হলো বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সংগঠনে যোগদান করার মাধ্যমে। যা মূলত প্রতিবেশিত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের অংশ নয়। তাই শহর ও গ্রামের চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র এক হতে পারে না। গ্রামে বর্তমানে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত ও আধুনিক আবাসন ব্যবস্থাসহ অনেক আধুনিক উপকরণ আছে যা তখন ছিল না। তাই শহরে জীবন যাপন করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এগুলো ছাড়াও উচ্চ শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের জীবিকার নিমিত্তে নগরজীবন আজও মানুষের প্রধান আকর্ষণ। গ্রামে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির চর্চা ও এর প্রকাশ ঘটে। কিন্তু শহরে একটি শিক্ষিত পেশাজীবী অভিজাত এলাকায় বিভিন্ন জেলার মানুষেরা বাস করে। এখানে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়। এক নতুন উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠে। উৎসব, বিনোদন, পোশাক, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রেই নাগরিক জীবনে উন্নত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা

সূত্র নির্দেশ

- আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫।
- আবদুর রহমান, *যতটুকু মনে পড়ে*, প্রথম প্রকাশ, চট্টগ্রাম, রহমান সঙ্গ পাবলিকেশন্স, ১৯৭২।
- আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, হাসি প্রকাশনী, ২০১৪।
- আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, অখণ্ড সংস্করণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।
- আবু রুশদ, *আত্মজীবনী: জীবন ক্রমশ-ঠিকানা পশ্চিম-এখন বর্তমান (১৯১৯-১৯৮৮)*, ঢাকা-চট্টগ্রাম, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১৯৯৮।
- আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫।
- আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৪।
- আসহাব উদ্দীন আহমদ, *আমার সাহিত্য জীবন*, ঢাকা, ১৯৮০।
- এ বি এম হোসেন, *পড়ন্ত বেলার গল্প*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৫।
- কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-রাজশাহী-যশোর-রংপুর : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ১৯৯০।
- কাজী মোতাহার হোসেন, 'কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা', আবদুল হক সম্পাদিত, *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬।
- কামরুদ্দীন আহমদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪।
- গোপাল হালদার, *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৪-১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৫১-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, মুক্তধারা, ২০১৩।
- জওশন আরা রহমান, *স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০।
- জসীম উদ্দীন, *জীবন কথা*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪।
- ড. মোহাম্মদ শাহ আলম, *আমার আর্থিক আত্মজীবনী*, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮।
- ডা: আবদুল বাসেত, *হৃদয় আমার কাঁদে*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭৬।
- ডা: নুরুল ইসলাম, *জীবনশ্রোতে*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, আনোয়ারা-নূর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯৯১।
- নীলিমা ইব্রাহিম, 'বিন্দু বিসর্গ', রফিকুল ইসলাম, সেলিনা হোসেন, রহীম খান, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মঞ্জুরা কবীর সম্পাদিত, *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, নীলিমা ইব্রাহিম বাংলাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩।
- বদরুদ্দীন উমর, *আমার জীবন*, ১ম খণ্ড (১৯৩১-১৯৫০), ঢাকা, সাহিত্যিকা, ২০০৪।
- মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *মুহম্মদ আব্দুল হাই- জীবনী গ্রন্থমালা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, অমর একুশে বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।
- মফিদুল হক, *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২।
- মিসবাহউদ্দিন খান, *আত্মস্মৃতি*, বাংলাদেশ চর্চা-১৭, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০০৯।
- মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০)*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১।
- মো: আবদুল মোহাইমেন, *দুই দশকের স্মৃতি*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬।
- মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, *জীবনের ঘাটে ঘাটে*, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, আহছানিয়া বুকস, ২০০২।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

- শামসুল হক, *একান্ত কথা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, গ্রীণ পাবলিশার্স, ২০০৭।
- শাহানারা হোসেন, *বেলা শেষের পাঁচালি*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৮।
- শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৫।
- সা'দত আলি আখন্দ, 'অন্য জীবন', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *সা'দত আলি আখন্দ রচনাবলী*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৯।
- সুফিয়া কামাল, *একালে আমাদের কাল* (আত্মজীবনী), সাজেদ কামাল সম্পাদিত, *সুফিয়া কামাল রচনা সমগ্র*। প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০২।
- স্টক, এ. জি. (মোবাস্বেরা খানম অনুদিত), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি (১৯৪৭-১৯৫১)*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, সুবর্ণ প্রকাশন, ২০১১।
- হাবিবুর রহমান, *আমার জীবন*, প্রথম প্রকাশ, চট্টগ্রাম, ১৩৯৫।
- আল-এসলাম*, ১ম সংখ্যা, ৬ষ্ঠ ভাগ, বৈশাখ, ১৩২৭।
- ছোলতান*, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০; ৮ম বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা, ২২ চৈত্র, ১৩৩০, ৪ এপ্রিল ১৯২৪।
- ঢাকা প্রকাশ*, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩।
- বাংলাপিডিয়া* খ-১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১।
- বিচিত্রা*, একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪।
- Mohammad Afsaruddin. 'Some aspects of social change in Bangladesh in the post-liberation period', *Bangladesh Journal of Sociology*. Vol. I, No. I, 1983.
- Rao, M. S. A. *Urbanization and Social Changes: A Study Of A Rural Community On A Metropolitan Fringe*. New Delhi, Orient Longmans Ltd., 1970.

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক*

প্রতিপাদ্যসার

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের প্রচার-প্রসারে আওলিয়া-এ-কেরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমার প্রভৃতি দেশে মানুষের দোরগোড়ায় ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য অলী, দরবেশ, আলিম, ফকীহ ও মুহাদ্দিস পূণ্যাত্মাআবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের বাবুল ইসলাম তথা ইসলামের প্রবেশদ্বার খ্যাত বৃহত্তর চট্টগ্রামে যারা দ্বীনের আলো প্রজ্জ্বলিত করে চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইসলামী শিক্ষার সম্প্রসারণে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, হিফজখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি মাদরাসায় শিক্ষাদানের সাথে সাথে খানেকার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষাও প্রদান করেন। ফলে তিনি জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় শিক্ষার সমন্বয়ে সৎ ও যোগ্য মানুষ গঠনের সুব্যবস্থা করেছেন। তাঁর গৃহীত কার্যক্রম দ্বারা দেশ ও জাতি যথেষ্টভাবে উপকৃত হয়েছে।

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মানবতার মুক্তির সনদ হিসেবে বিশ্ববাসির উদ্দেশ্যে আরাফাত প্রান্তরে এক ঐতিহাসিক ভাষণপ্রদান করেছিলেন। যা বিদায় হজ্জের ভাষণ হিসেবে সমধিক পরিচিত। (Haykal, Muhammad Husayn, *The Life of Muhammad*, New Delhi-110002: Farid Exports, 1st Edition-2012, P. 486-87)। এতে মানুষের জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তাসহ জাতি ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকারের বিষয় উচ্চারিত হয়েছে। সাথে সাথে এ সুমহান দ্বীনের অমীয় বাণী অনাগত মানব সমাজের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে (*Ibid*, P. 488)। দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার দাবি পূরণে সাহাবীগণ ছড়িয়ে পড়েন পৃথিবীর দিক দিগন্তে (হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*,

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা: আদিল ১৯৪৮, পৃ. ১০১)। যুগ পরিক্রমায় আল্লাহর সন্তোষকামী মুখলিস বান্দাগণ ইসলামের মর্মবাণী যথার্থভাবে পৌঁছে দেন মানুষের হৃদয় কন্দরে। পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ তথা মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, চীন ও আরকানে ইসলাম প্রচারের জন্য সমুদ্র পথই ছিল একমাত্র অবলম্বন। ভৌগোলিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দরের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চল আরবীয় বণিক ও মুবাশ্শিগদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে (চৌধুরী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন, *আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, ঢাকা: ই.ফা.বা. ১৯৯৫, পৃ. ৪১)। তাই এখানকার অধিবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা তাদের অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়। এ উদ্দেশ্য সফল করার মানসে বহু আরবীয় বণিক ও ইসলাম প্রচারক এখানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসতি স্থাপন করে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (করিম, আব্দুল, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০, পৃ. ০১)। তাঁদের সংস্পর্শে এসে মনোমুগ্ধকর আচার-আচরণে আকৃষ্ট হয়ে ইসলামের প্রতি বুকে পড়েন এখানকার অধিবাসীরা। ফলে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। ইসলামের প্রতি মুসলমানদের অনুরাগ আরবীয় দা'য়ীদের বিশেষভাবে হাতছানি দেয় ইসলাম প্রচারের উর্বর ভূমি হিসেবে। এ কারণে অসংখ্য ইসলাম প্রচারকের আগমন ঘটে এ দেশে (চৌধুরী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২)। তারই ধারাবাহিকতায় মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী হামিদীর (রহ.) পূর্ব পুরুষগণ সুদূর আরব হতে চট্টগ্রামে আগমন করেন। পূর্ব পুরুষদের ধারাবাহিকতায় তিনিও ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে দ্বীন শিক্ষার সু-ব্যবস্থা করেন। সাথে সাথে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। সেই সাথে ইসলাম বিনষ্টকারী শিরক, বিদ'আত, কুফর ও নাস্তিকতা এবং শরী'আত বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। এভাবে তিনি বিশ্বনবির (সা.) সুযোগ্য উত্তরসূরীরূপে নিজেকে গড়ে তোলেন। আমরা নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও চিন্তাধারা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

জন্ম ও বংশ পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী হামিদী (রহ.) ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ ১৩১৯ হিজরী সনে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার গারাংগিয়াস্থ নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে তাঁর পূর্বপুরুষগণ চট্টগ্রামের 'দেয়াং পাহাড়' এলাকায় সর্বপ্রথম বসতি স্থাপন করেন (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *কুতবুল আলম সুলতানুল আওলিয়া হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)*, চট্টগ্রাম: জাহানারা কালার প্রিন্টার্স ২০০৩, পৃ. ১৬)। তাঁর দাদা সূফী আমীন উদ্দীন সিদ্দিকী ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ উঁচু মাপের বুজুর্গ। তাঁরই সুযোগ্য সন্তান ছিলেন শাহ সূফী আলাউদ্দীন সিদ্দিকী মিয়াজি। যিনি মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী হামিদী (রহ.)-এর সুযোগ্য পিতা। যার বংশ পরম্পরা ইসলামের প্রথম খলীফা ও রাসুলের (সা.) একান্ত সহচর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর মাতা মুহাম্মৎ রাহাত জান বিনতে আলী মিয়াজির বংশ পরম্পরা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর সাথে সংযুক্ত (কুদ্দুস, মুহাম্মদ আব্দুল, *আসারারে আওলিয়া*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস ১৩৯৭ হিজরী, পৃ. ১৯৯)। তাঁর পিতামহের মৃত্যুর পর পিতা সূফী আলাউদ্দীন সিদ্দিকী মিয়াজি (রহ.) বর্তমান গারাংগিয়া মাদরাসার অদূরে ডুলু

নদীর পশ্চিম তীরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন (রহমান, ড. মুহাম্মদ বদিউর, *মুজাদ্দের জামান ইমামুত তরীকত হযরত শাহ মাওলানা আব্দুর রশিদ ছিদ্দিকী হামেদী (রহ.) জীবনী ও চিন্তাধারা*, চট্টগ্রাম: মনোরমা আর্ট প্রেস ২০০১, পৃ. ১৮)।

শিক্ষা জীবন

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) দ্বীনি পরিবারে জন্ম লাভের ফলে নিজ পিতার নিকট কুরআন মজীদ শিক্ষা লাভ করেন। তদানীন্তনযুগে সেখানে কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠান না থাকায় স্থানীয় বিজ্ঞ আলিমদের কাছ থেকে তিনি দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। এরপর বারদোনা গ্রামের একটি মাদরাসায় কিছুদিন অধ্যয়ন শেষে শ্রদ্ধেয় অগ্রজ বড় ভাই হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর সাথে চট্টগ্রাম শহরের ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম মাদরাসায় এসে ভর্তি হন এবং এখানে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, নাহ্-সরফ ও ইলমে মানতিকে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। এখানে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সম্পন্ন করে অবশেষে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ মতিউর রহমান, মাওলানা আলহাজ্জ খান বাহাদুর মুহাম্মদ হাসান, মাওলানা নাজীর আহমদ, মাওলানা খলীলুর রহমান, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল, মাওলানা ফয়জুল করীম, মাওলানা এফাজুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল হামীদ (ফখরে বাংলা) ও মাওলানা মুহাম্মদ (রহ.) (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৪)।

কর্ম জীবন

প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা শেষ হওয়ায় দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারের অভিপ্রায়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। ইতোমধ্যে তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.) এলাকাবাসীকে দ্বীনি শিক্ষায় আলোকিত করার মানসে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে গারাংগিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৩৮)। মহৎ এ কাজে সহযোগিতা করার জন্য তাঁর স্নেহের ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদীকে (রহ.) শিক্ষক হিসেবে যোগদানের নির্দেশ দিলে তিনি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষকতায় যোগদান করেন এবং মৃত্যু অবধি এ প্রতিষ্ঠানে খিদমত করে যান (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৪)। গারাংগিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা হিসেবে ফাযিল শ্রেণিতে সব বিষয়ে তিনি পাঠদানে পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে দেশ-বিদেশে এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার ছাত্র এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ২৫)। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আব্দুল মজীদ (রহ.) অবসরে গেলে তিনি সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োজিত হন। ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাইয়ের ইত্তিকালের পর তিনি মাদরাসার নাজেমে আ'লা বা মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (*প্রাণ্ডক্ত*)।

ছাত্রবৃন্দ

তাঁর ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন: মাওলানা মুফতি সুলতান আহমদ (মির্জাখীল), মাওলানা মাকছুদুর রহমান (মির্জাখীল), মাওলানা ছুফী আব্দুল জব্বার (পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ) মাওলানা মীর গোলাম মুস্তফা (সাতকানিয়া), মাওলানা মুহাম্মদ আমীন (শায়খুল হাদীস, গারাংগিয়া আলিয়া), মাওলানা আব্দুর রশীদ (মুহাদ্দিস, চুনতী), মাওলানা আবুল হাশেম, মাওলানা আব্দুল গনী বুখারী (রাজঘাটা), মাওলানা আবুল খায়ের (সাতকানিয়া), মাওলানা সালেহ আহমদ, মাওলানা আহমদ কবীর (আমিরাবাদ), মাওলানা মুহাম্মদ আমীর, মাওলানা মুবারক আহমদ (বারদোনা), মাওলানা আবুল হাসনাত (পদুয়া), মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (গারাংগিয়া), মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দীকী (বাজালিয়া), মাওলানা ছিদ্দীক আহমদ আজাদ (পদুয়া), মাওলানা আবুল মুস্তাফিজ (লোহাগাড়া), মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস আল কাদেরী, মাওলানা এনামুল হক (খাগরিয়া), মাওলানা কামালুদ্দীন মজীদী (সাতবাড়িয়া), মাওলানা আব্দুর রশীদ (ডুলাহাজারা), মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন (অধ্যক্ষ, সোবহানিয়া আলিয়া) ও মাওলানা আব্দুর রউফ চৌধুরী (রহ.) (অধ্যক্ষ, সাতকানিয়া কলেজ), (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩)।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জন

মাদরাসার জাহেরি শিক্ষা সমাপ্তির পর আধ্যাত্মিক শিক্ষা অর্জনের জন্য মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামেদী (রহ.) ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ইতোমধ্যে ভারতের প্রখ্যাত পীর হযরত হামেদ হাসান আলাভী আযমগড়ি (রহ.) চুনতি আগমন করলে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাছ থেকে তরীকতের ওয়ীফা গ্রহণ করেন এবং ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরই হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আত গ্রহণের পর কঠোর রিয়াজত, মুরাকাবা, মুশাহাদা, তাসবীহ ও যিকির নিয়মিত পালন করতে থাকেন। সাথে সাথে হযরত আযমগড়ি (রহ.)-এর কাছ থেকে তরীকতের সবক নিতে থাকেন (কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩)। এক পর্যায়ে তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে পৌঁছে যান। এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) বলেন,

طریقت میں داخل ہونے کے بعد جس قدر ریاضت و مشاہدہ و مراقبہ میں ہمہ تن مصروف تھے اسکی مثال کمیاب ہیں۔ آپ بھی اس قسم کے سن رسیدہ ہونے کے باوجود بھی رات میں تھوڑی نیند جانے کے بعد ساری رات ریاضت میں گزارتے ہیں۔

“তরীকতে দাখিল হওয়ার পর থেকে তিনি কঠোর সাধনা, ধ্যান ও আত্মপর্যবেক্ষণে এমনভাবে নিমগ্ন থাকতেন, যার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি এত বার্ষিক্যে উপনীত হওয়ার পরেও অল্পক্ষণ নিদ্রা সেরে সারা রাত কঠোর সাধনায় কাটাতেন” (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬)।

খেলাফত লাভ

মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামেদী (রহ.) বায়'আত গ্রহণ করার পর কঠোর রিয়াজত করতে থাকেন। ফলে তিনি তরীকতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তাঁর উন্নতির বিষয়ে তাঁর পীর হযরত আযমগড়ি (রহ.) বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত থাকায় তিনি চট্টগ্রামে আসার সাথে সাথে তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে চিঠি দিয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, মাকতুবাতে হামেদী-মজীদী, চট্টগ্রাম, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ৭২)। তিনি সাক্ষাৎ করলে তাঁকে ১৬ রজব, ১৩৭২ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে মুজাদ্দিদিয়া তরীকতের খেলাফত দান করেন

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

(কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩)। খেলাফত নামাটিও “আসরারে আওলিয়া” কিতাবের গ্রন্থকার মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) তাঁর গ্রন্থে ২৮৪ ও ২৮৫ পৃষ্ঠার মধ্যখানে সংযোজিত করেছেন। পরবর্তীতে হযরত আযমগড়ি (রহ.) তাঁকে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, করনিয়া ও শায়ালিয়া তরীকতের খেলাফত দান করেন। (রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭৩) এ সিলসিলার প্রধান কর্ণধার প্রখ্যাত অলী কুতবুল আকতাব আলহাজ্ব হাফেয হামেদ হাসান আলাভি আযমগড়ি (রহ.)-এর খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ সিলসিলার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস (রহ.) বলেন,

حضرت اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں یہ ایک حضرت بھی انکے محبوب خلیفہ ہیں۔ حضرت اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خطوط میں جو پیر صاحب قبلہ کے پاس بھیجے گئے ہیں سب میں "اول صاحب" یعنی چھوٹے حضور کا ذکر ہیں۔ انکو سلام اور دعائے دلی سے یاد فرمائے ہیں۔ ۱۳۷۴ھ کو حضرت اعظم گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے انکو خلافت ملی ہے، بہت سے لوگ انکے دست پاک پر بیعت ہیں۔

“হযরত আযমগড়ি (রহ.)-এর খলীফাগণের মধ্যে তিনি খুবই প্রিয় খলীফা ছিলেন। হযরত আযমগড়ি (রহ.) যে সব চিঠি হযরত পীর সাহেব (হযরত আব্দুল মজিদ (রহ.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন তাঁর সবকটিতেই ‘আওয়াল সাহেব’ তথা হযরত ছোট হুজুর (রহ.)-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাঁকে সালাম ও আন্তরিক দু’আ জানিয়ে স্বরণ করেন। ১৩৭৪ হিজরী সনে হযরত আযমগড়ি (রহ.)-এর কাছ থেকে তিনি খেলাফত লাভ করেন এবং অসংখ্য মানুষ তাঁর মুবারক হাতে বায়’আত গ্রহণ করেন” (কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩)।

আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান

হযরত হাফেজ হামেদ হাসান আলাভি আযমগড়ি [মৃ. ১৯৫৯] (রহ.)-এর কাছ থেকে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) খেলাফত লাভের পর থেকে তরীকতের শিক্ষাদান শুরু করেন। বিশেষকরে তাঁর শ্রদ্ধেয় বড় ভাই হযরত শাহ্ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর ইত্তিকালের পর ব্যাপকভাবে তিনি সফর শুরু করেন এবং মানুষের মাঝে তরীকতের তা’লীম দেন। ফলে অসংখ্য নারী-পুরুষ, আলিম-ওলামা তাঁর হাতে বায়’আত গ্রহণ করে আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টির সরল-সঠিক রাস্তার সন্ধান লাভ করেন। তন্মধ্যে যারা তাঁর তা’লীম যথার্থভাবে চর্চা ও অনুশীলন করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, তাদের মধ্যে শতাধিক অনুসারীকে তরীকতের শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে খেলাফত দানে ভূষিত করেন (রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১)।

তাঁর রচনাবলি

ক. ছরফুল মুবতাদী

মাদরাসা ছাত্রদের নাহ-ছরফের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকায় তিনি ছাত্রদের এ সমস্যা সমাধানের জন্য ‘ছরফুল মুবতাদী’ নামে একটি কিতাব রচনা করেন। এটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য শাখা। যা ছরফ বা

শব্দ রূপান্তর বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। এতে ‘ছরফ’ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াদি যা আরবী পড়ুয়া ছাত্রদের জানা অপরিহার্য সে সব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এটি ইসলামিয়া লিখো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস চন্দনপুরা চট্টগ্রাম হতে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এটি মাদরাসায় পাঠ্য পুস্তক হিসেবে পড়ানো হয়।

খ. হিব্বুল বাহর

তিনি সাধারণ মুসলমানদের জন্য দু‘আ, নামায, দুর্রুদ শরীফ ও তরীকায়ে আলীয়া মুহাম্মদিয়ার অযীফাসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দু‘আ বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও এতে আল্লাহ ও রাসূল (সা.)-এর গুণবাচক নামসমূহের পাশাপাশি ঈমানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এটি ইসলামিয়া অফসেট প্রেস চন্দনপুরা চট্টগ্রাম হতে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় (হামেদী, মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, হিব্বুল বাহর, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, পৃ. ১-৪০)।

গ. ক্বাসিদাহ ওয়াসফিয়াহ

এটি তাঁর আরবী ভাষায় রচিত উন্নত মানের একটি বর্ণনামূলক সুদীর্ঘ কবিতা। এতে তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অন্যতম দিকপাল হযরত শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে-সানীসহ বিভিন্ন তরীকতের আওলিয়া-এ-কেরামের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যেমন:

بتجديد المجدد ألف ثاني	*	طريق لا مثيل ولا بثاني
في الطريقة كالسيول	*	ومن سلك على سنن الرسول
فقد فاز به دينا ومجدا	*	ومن جهد بهذا النور جهدا
فقد لعن من الباري لعنا	*	ومن طعن بهذا النور طعنا
هو قطب العالم قطب ساري	*	مرشدي هو عبد باري
شريف جامع الأوصاف قطبا	*	ولي سيد السادات نسبا
يتابع في الشريعة ألف ثاني	*	مجدد للطريقة في الزمان

* “মুজাদ্দিদে আলফে-সানী (রহ.) কর্তৃক সংস্কারকৃত তরীকার কোনো দৃষ্টান্ত নেই এবং এটি অদ্বিতীয়।

* যে ব্যক্তি প্রিয় রাসূলের (সা.) আদর্শের উপর চলবে, মা‘রিফাতের পথে সে শ্রোতের মতো চলতে থাকবে।

* যে এই ‘আলো’ সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে, সে দ্বীন ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সফল হবে।

* যে এই ‘আলো’ সম্পর্কে সমালোচনায় ব্যস্ত থাকবে, সে আল্লাহর পক্ষ হতে মারাত্মকভাবে অভিশপ্ত হবে”।

* আমার মুর্শিদ হযরত আযমগড়ীর (রহ.) মুর্শিদ হলেন ইমামুত তরীকত হযরত শাহ সাইয়িদ আব্দুল বারী (রহ.)। যিনি কুতবুল আলম এবং বর্তমানেও বিরাজমান কুত্ব।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

* তিনি অলী আবার বংশ পরম্পরায় সর্বশ্রেষ্ঠ সাইয়িদ। পাশাপাশি তিনি শরীফ-ভদ্দ ও সকলগুণের অধিকারী একজন কুতব।

* তিনি একজন যুগের তরীকতের মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক। যিনি শরী‘আত পরিপালনে মুজাদ্দিদে আলফে সানীর (রহ.) একান্ত অনুসারী” (খতীবী, মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক, *একটি আদর্শ জীবন*, চট্টগ্রাম: মুহাম্মদী আর্ট প্রেস, ১৯৮৫, পৃ. ৬৫)। এই মূল্যবান কবিতাটি আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এটি তিনি রচনা করেন ১৩৮৫ হিজরী সন মোতাবেক ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। এটি মাওলা আব্দুল কুদ্দুস বিরচিত *আসরাফুল আওলিয়া* নামক গ্রন্থে চট্টগ্রাম ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস হতে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

ঘ. তালীমাত

এটি একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বলিত বিষয়াবলির সংকলন। এতে তাঁর পীর হযরত মাওলা হাফেজ হামেদ হাসান আলাভী (রহ.)-এর নির্দেশিত শিক্ষাসমূহ তথা বিভিন্ন ‘লাতীফাহ ও দায়েরাহ’ এর সবকসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এতে মুজাদ্দিদিয়া, কাদেরিয়া, চিশ্টিয়া, নক্শবন্দিয়া, করনিয়া, শাযালিয়া ইত্যাদি তরীকার অযীফাসমূহ, সবক ও যিকিরের বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। এটি চট্টগ্রাম ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস হতে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩৯৩ হিজরী সনে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

ঙ. শজরা শরীফ

এটি তাঁর পীর হযরত হামেদ হাসান আলাভী (রহ.) নামে প্রতিষ্ঠিত সিলসিলায়ে হামেদিয়ার পীর ও খলীফাগণের নামের ধারাবাহিক বর্ণনা সম্বলিত একটি পুস্তিকা। যাতে মুজাদ্দিদিয়া, কাদেরিয়া, চিশ্টিয়া, নক্শবন্দিয়া, শাযালিয়া ও করনিয়া তরীকার পীর-মুর্শিদদের ধারাবাহিক নামের বর্ণনা রয়েছে। যার ধারাবাহিকতা মহানবী (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেই সাথে তাঁর পীর হযরত আযমগড়ী (রহ.)-এর অমূল্য উপদেশমালা এবং তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ বড় ভাই শাহ্ মাওলা আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর পবিত্র অসিয়তনামা এবং তাঁর অগ্রজ কুতবুল আকতাব হযরত শাহ্ মাওলা আব্দুস সালাম আরকানী (রহ.)-এর মূল্যবান অসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে হযরত শাহ্ সৈয়দ আব্দুল বারী (রহ.)-এর মুরীদগণের তালিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে আরো রয়েছে হামেদিয়া সিলসিলার খলীফাগণ ও তাঁদের তরীকার বর্ণনা। এটি আধ্যাত্মিক শিক্ষা অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পুস্তিকা। এটি চট্টগ্রাম খাজা ইলেকট্রিক প্রেস থেকে জানুয়ারি ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

চ. আল ইসলাম (সাময়িকী)

এটি একটি ত্রৈমাসিক বাংলা সাময়িকী। যা ‘জম‘ঈয়তে ইত্তিহাদুল উলামা ওয়াল মুসলিমীন’ এর মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। এটি ১৪০২ হিজরিতে (মুহাররম-সফর-রবিউল আউয়াল) ১ম সংখ্যা ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস হতে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এর *পেশ কালাম* নামে যে ভূমিকা রয়েছে তা তিনি রচনা করেন, যাতে এটি প্রকাশের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর কাব্য প্রতিভা

অন্যান্য বিষয়ের মতো আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অতুলনীয়। আরবী ভাষায় বক্তৃতা, পাঠদান ও লেখনীতে ছিলেন তিনি অত্যন্ত পটু। তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তাঁর শিক্ষকতার মানকে বর্ধিত করেছিল বহুগুণে। আরবী ভাষা চর্চার প্রতি তিনি ছাত্রদের বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করতেন। আরবী ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্যের কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে গারাংগিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় ‘বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড’-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব বাকী বিল্লাহ সাহেবের শুভাগমন উপলক্ষে তাঁর রচিত একটি কাব্যিক মানপত্র ও অভিনন্দন বার্তা রচনায়। এতে তিনি কবিতার পোশাকে সজ্জিত করে তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনার মনোভাব তুলে ধরেন। কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তি নিম্নরূপ-

* زارت تعدل فوق أفنان وأغصان	أرى الريحان من ورود شم ريحان
* فنور فوق النور بين حفلات وبنیان	وبدر ضاء فينا بل علينا الشمس قد طلعت
* همام ثم همام عظيم القوم ذوشأن	أتانا بغنة ضيف كريم سيد عال
* ورحبنا لمقدمه بجيران وخلان	فقلنا بجمعة أهلا وسهلا إذ رأيناه
* فهيم الدين والدنيا بتحقيق وإتقان	هو النحرير علام الزمان الباقي بالله
* فيجتهد لترقية المدارس منذ زمان	رئيس حاذق فهامة في لجنة التعليم
* وفي خطباته الفصحى نراه مثل صهبان	ففي المنقول بحر ثم في المعقول كالديم

* “আমি তো দেখতে পাচ্ছি এমন কুসুমবাগ- যা এমন মনোমুগ্ধকর সুস্রাণ মাখা গোলাপসমূহের- যেগুলো অনেক গাছ-গাছালি, ডাল-পালা অতিক্রম করে আমাদের পানে এসেছে।

* এক আলো প্রকাশিত আমাদের মধ্যে, রবং আমাদের মাঝে উদিত হয়েছে সূর্য। সুতরাং আমাদের মাহফিলে, দালান-কোঠা সর্বত্র আলো-ই-আলো।

* হঠাৎ আমাদের কাছে এলেন এক মহান নেতা, প্রিয় মেহমান যিনি সাহসিকতার প্রতীক, বীর ও জাতির এক মহান পথ নির্দেশক।

* যখনই আমরা তাঁকে দেখলাম তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ‘আহলান ওয়া সাহলান’ বলে বরণ করে নিলাম। বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিয়ে শুভেচ্ছা জানালাম তাঁর শুভাগমনে।

* তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ আলিম, যাঁর নাম হযরত মাওলানা বাকী বিল্লাহ। তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার একজন মহাচিন্তাবিদ।

* তিনি শিক্ষাবোর্ডের একজন বিচক্ষণ চেয়ারম্যান। মাদরাসা শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ও তাঁর চিন্তাধারা

* হাদীস শাস্ত্রে তিনি এক সমুদ্র। যুক্তিবিদ্যাও তিনি অবিরাম বর্ষণের ন্যায়। তিনি তাঁর মূল্যবান ভাষণে ছাহবান ইবনু ওয়ায়েলের সদৃশ” (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫০-৫২)।

ইতিকাল

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) পরিণত বয়সে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর ১৪১৫ হিজরির ২৯ জুমাদাল-উলা জুমাবার সকাল ৭ ঘটিকার সময় গারাংগিয়াস্থ নিজ বাড়িতে ইতিকাল করেন। দীর্ঘদিন উঠা-বসা করতে না পারলেও ইতিকালের সময় সজোরে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে উঠে বসার চেষ্টা করেন এবং আবার উচ্চ স্বরে ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে শোয়ে পড়েন। অতঃপর উচ্চ স্বরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১০১)। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে ঐ দিন আসরের পর তাঁর জানাযার নামাজ শেষে গারাংগিয়া মাদরাসা মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে হযরত শাহ্ মাওলানা আব্দুল মজীদ (রহ.)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয় (প্রাণ্ডক্ত)।

তাঁর চিন্তাধারা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছিলেন একজন প্রতিভাধর যুগ সচেতন আলিমে দ্বীন ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত কামিল অলী। তাঁর পুরো জীবন ছিল মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহের আলোতে উদ্ভাসিত। তিনি দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার মানসে সর্বদা ব্যস্ত সময় পার করতেন। মাদরাসায় ছাত্রদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে এবং খানেকায় মুরীদদেরকে বাতিনী শিক্ষাদানে মশগুল থাকতেন। পাশাপাশি দেশ ও জাতির বিভিন্ন সমস্যা ও যুগের বিভিন্ন ফিতনা মোকাবিলা ও তার সুন্দর সমাধানের চিন্তায় গভীর নিমগ্ন থাকতেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে যুগ সমস্যার সমাধান বের করার আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে তিনি একজন সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন। সাধারণ মানুষ, ছাত্র-শিক্ষক ও তরীকত অনুসারীদের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, কাসীদাহ্ রচনা ও প্রকাশ করে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসীহত ও রচনাবলিতে যে চিন্তাধারা ফুটে উঠেছে আমরা নিম্নে তা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

১. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব

তিনি তাঁর পুরো জীবদ্দশায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কাজ করেছেন। তিনি নিজের আদর্শের উপর অবিচল থেকে ভিন্ন মতাদর্শের ধর্মীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে পরস্পর সু-সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ইসলামের সু-মহান আদর্শ ও সৌন্দর্যকে ধারণ করে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, উগ্রতা ও অনৈক্যের সুর ও স্লোগান ভুলে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় সকল আদর্শের আলিমদেরকে এক মঞ্চে সমবেত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশ ও জাতিকে ইসলাম থেকে দূরে সরাতে দলাদলি ও মতানৈক্যই বেশি ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তিনি ইসলামের বৃহৎ স্বার্থে হকপন্থী বিভিন্ন ঘরনার শীর্ষ স্থানীয় আলিমদের নিয়ে উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৯)।

২. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী একজন বুয়ুর্গ। তিনি পরিচিত অপরিচিত সকলের প্রতি সমানভাবে সদাচরণ করতেন। তিনি দুস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণে আজীবন কাজ করে গেছেন। অসুস্থদের জন্য করেছেন চিকিৎসার ব্যবস্থা। তিনি নিজ পরিবারের সদস্যদের সাথে যেরূপ আচরণ করতেন, তেমনি সাধারণ মানুষের প্রতিও সদয় থাকতেন সবসময়। মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে তিনি রাসূলের (সা.) আদর্শের বিমূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাই তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতেন।

৩. সমাজ সেবা

মানুষ সামাজিক জীব। ধনী-গরীব, বড়-ছোট, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সমাজের একটি অংশ। এতে কোনো শ্রেণিকে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সকলের সুখম উন্নয়নে সভ্য ও আদর্শবান সমাজের যাত্রা সূচিত হয়। তিনি অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করা একান্ত অপরিহার্য- এ চিন্তাধারা পোষণ করতেন। তাই তিনি সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ইউপি সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন (রহমান, ৩৩)। এ ছাড়াও তিনি এলাকায় টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পুকুর খনন, রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, জনগণের জন্য বাজার স্থাপন ইত্যাদি কাজ করে সামাজিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন। তিনি ছিলেন একাধারে পীর, সমাজসেবক ও সংস্কারক। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে সমাজ সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন (প্রাণ্ডক্ত, ৩৪-৩৫)।

৪. চিকিৎসা সেবা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) মানুষের নফসের যেরূপ ডাক্তার ছিলেন তেমনি তিনি মানুষের দেহেরও ডাক্তার ছিলেন। সাধারণত মানুষ রোগাক্রান্ত হলে তার মন বিনম্র হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কারো সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই তিনি মানুষকে আল্লাহও রাসূলমুখী (সা.) করার অভিপ্রায়ে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি তাঁর অধীত ইউনানী চিকিৎসা ও কুরআনী চিকিৎসা দিয়ে রোগাক্রান্ত ও জিনগ্রস্থ অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য লাভে সাহায্য করতেন। এমনকি প্রচলিত ডাক্তারি চিকিৎসা থেকে নিরাশ হওয়া অসংখ্য লোককে কুরআনি চিকিৎসা সেবা দিয়ে তিনি পরিপূর্ণ সুস্থতার জীবন উপভোগের সু-ব্যবস্থা করেন। ফলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মসজিদ, মাদরাসা, এতীমখানায় তাদের দানের হস্ত সম্প্রসারিত করেছে (চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *গারাংগিয়া ছোট হুজুর (রহ.)'র জীবন ও অবদান*, চট্টগ্রাম: বন্ধন কম্পিউটার এ প্রিন্টার্স, ৪ নভেম্বর, ২০০৪, ১১)।

৫. ইখলাসের অপরিহার্যতা

তিনি তাঁর আলোচনা ও ওয়াজের সময় মানবজীবনে ইখলাসের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরতেন। ইখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন এই নীতি সর্বদা অনুসরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। ইখলাস ব্যতীত সকল আমল নিষ্ফল বা অন্তঃসারশূন্য হওয়ার মত ব্যক্ত করতেন (রহমান, ৫৫)।

৬. আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখা

তিনি সর্বদা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। মৌখিক কিংবা কলবী যিকির অথবা আমলী যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ করার জন্য তিনি মাওলানা রুমির কবিতা উদ্ধৃত করে বলতেন, “হে মানুষ! আমি তোমাকে এ কথা বলছি না যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি পার্থিব জীবন ত্যাগ কর। বরং আমি তোমাকে এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, তুমি দুনিয়ার যে কাজেই ব্যস্ত থাক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে তুমি আল্লাহ তা‘আলার সাথে থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যেও না, বরং তাঁকে সর্বদাই স্মরণ রাখ। তাহলে তোমার উভয় কুলই রক্ষা হবে” (প্রাগুক্ত)।

৭. সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুশীলন

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করাই হলো ইসলাম। তাই তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী (রহ.)-এর ন্যায় তিনিও একমাত্র সুন্নাতকেই তরীকত বলে বিশ্বাস করতেন। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, আহার ও নিদ্রাসহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি সুন্নাতের পরিপালন করতেন। সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করে তিনি তাঁর সংশ্লিষ্ট সকলকে রাসূলের (সা.) অনুপম আদর্শের প্রতি উৎসাহিত করতেন (শেখ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দী, খ. ৪, ৪৬)।

৮. শিরক পরিহার

ইসলামের ভিত্তি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর সাথে শরীক করাই শিরক হিসেবে গণ্য। এরূপ শিরক তাওহীদের বিশ্বাসে ত্রুটি সৃষ্টি করে বিধায় তিনি সর্বপ্রকার শিরককে পরিহার করে আল্লাহর একত্ববাদকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিতেন। শিরকের সাথে দূরতম সম্পর্ক রাখে এ জাতীয় উপকরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (সিদ্দীকী হামেদী, মাওলানা আব্দুর রশীদ, *হিব্বুল বাহর*, প্রাগুক্ত)।

৯. বিদ‘আত বর্জন

রাসূল (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের বিপরীত নব সৃষ্ট আমল বিদ‘আত হিসেবে গণ্য। দ্বীনের মধ্যে এসব বিদ‘আতের পরিণাম ভয়াবহ বিধায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর ন্যায় সর্ব প্রকার বিদ‘আতকে তিনি পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য পীরের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি সর্বাঙ্গিকভাবে বিদ‘আতকে পরিত্যাগ করার মানসিকতা পোষণ করতেন। যেমন তাঁর খেলাফত নামায় রয়েছে- *از بدعت و رسوم صوفیه بچو عرس*

“বিদ’আত, সূফীদের রেওয়াজ যথা ওরস ও সেমা ইত্যাদি অবশ্যই পরিতাজ্য” (কুদ্দুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬)।

১০. বিনয় ও নম্রতা

তিনি প্রায় সময় বিনয় ও নম্রতার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। মাওলানা শেখ সাদীর কবিতা আবৃত্তি করে তিনি বিনয়ের উচ্চ প্রশংসা ও ফলাফল তুলে ধরতেন। তিনি বলতেন- মানুষের বদ অভ্যাস ও অসৎ চরিত্রের মধ্যে অহংকারই সর্বাপেক্ষা কু-অভ্যাস। এই অহংকার বিনয় ও নম্রতার বিপরীত। অহংকারের কারণেই শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিরামভাবে তার উপর লানত বর্ষিত হবে। সুতরাং অহংকারকে পরিত্যাগ করে বিনয়ী ও নম্র স্বভাব গড়ে তোলতে হবে (রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯)।

১১. নামাযের গুরুত্ব

তিনি তাঁর ওয়াজে প্রায়শ নামায কায়েম করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে বলতেন, যেসব মানুষ নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করে না এবং সময়মত নামায পড়ে না কিংবা নামায কাজা করে ফেলে, তাদের সাবধান হয়ে যাওয়া জরুরি। কারণ নামায আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক এমন এক ফরয, যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে (প্রাগুক্ত)।

১২. আল্লাহর ইবাদত করা

মানবজাতির প্রতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত অশেষ নিয়ামত ও রহমতের কথা উল্লেখ করে তিনি আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতেন। প্রখ্যাত ফার্সী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রুমির কবিতা উদ্ধৃত করে তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর আলোচনাকে মনোমুগ্ধকর করে তুলতেন। তিনি রুমির কবিতা বলতেন,

ما نود بيم وتقاضا مان نبود ☆ لطف تو تا مفتحه مای شنود

অর্থাৎ “মানবজাতির সৃষ্টির পূর্বে আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আমাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। হে রাব্বুল আলামীন! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছা পূরণ করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (রহমান, ৬০)।

১৩. মাতাপিতার সেবা করা

তিনি মাতাপিতার সেবা করার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে তাঁর মূল্যবান চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটান। তিনি কুরআন মজীদে আয়াত-إِنَّمَا بِرُّكَانُ الْإِنْسَانِ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا- “আমি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছি”। (আল কুরআন, সূরা আহকাফ, আয়াত: ১৫) এটি উদ্ধৃত করে সাথে হাদীস এবং ঈসা (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে তাঁর আলোচনাকে আরো প্রাণবন্ত করতেন। এভাবে তিনি শ্রোতাদেরকে মাতাপিতার সেবার প্রতি আকৃষ্ট করতেন (রহমান, ৬২-৬৩)।

১৪. শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বিশেষ আমল

স্বল্প সময়ের এ জীবনকে মূল্যবান করার জন্যে বিশেষ বিশেষ সময় ও দিনে আল্লাহর ইবাদতে নিজকে নিয়োজিত রাখার গুরুত্ব দিতেন। বিশেষ করে পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে ইতিকাক্ষের মাধ্যমে লাইলাতুল ক্বদর রাত্রির ফযিলত হাসিল করার চিন্তা পোষণ করতেন। তাই তিনি অনুসারীদেরকে ইতিকাক্ষের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন (প্রাণ্ডক্ত, ৬৪)। এ লাইলাতুল ক্বদর অসামান্য ও অকল্পনীয় উন্নতির রাজতোরণ উন্মুক্ত করে দেয় মানুষের সম্মুখে। ফলে সে সার্বিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে নিঃসন্দেহে।

১৫. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পোষণ

তিনি প্রত্যেককে আল্লাহর অসীম ও অসংখ্য শোকরিয়া আদায় করার তাকিদ দিতেন। নিজের চেয়ে নিচু শ্রেণির প্রতি লক্ষ্য করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা পোষণই নিয়ামত বৃদ্ধির এক বিশেষ নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি কুরআন মজীদে আয়াত- **إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ** “যদি তোমরা আমার শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা পোষণ কর, তবে আমি তোমাদের নিয়ামত বৃদ্ধি করে দেবো। আর যদি অকৃতজ্ঞতা পোষণ কর, তা হলে জেনে রাখো, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন” (আল কুরআন, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত: ৭)। এর বাস্তব আমল নিজের মুরীদের জীবনে প্রতিফলনের চেষ্টা করতেন (রহমান, ৬৬)।

১৬. মতবিরোধ এড়িয়ে যাওয়া

ইখতিলাফ বা মতবিরোধ ঐক্য বিনষ্ট করে শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। তাই তিনি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে মতবিরোধ এড়িয়ে চলার নীতি পোষণ করতেন। তিনি বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাথে যাবতীয় ঝগড়া বিবাদ ও বিতর্কিত বিষয়ে ইখতিলাফ পরিহার করে মানুষকে ইসলামের বিশাল ও ব্যাপক চিন্তা-দর্শনের প্রতি দাওয়াত প্রদান করতেন। কুরআন মজীদে আয়াত- **أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** “(হে নবী!) আপনি আল্লাহর পথে আহ্বান করুন সুন্দর নসীহত ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং সুন্দর পন্থায় তাদের বিবাদের উত্তর দিন” (আল কুরআন, সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫)-এর আলোকে যাবতীয় বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন (রহমান, ৬৬)।

১৭. ঈমান-আমল ও দ্বীনই মুক্তির পাথর

তিনি সমগ্র জীবনে যে চিন্তাধারা পোষণ করতেন, তা হলো মানুষের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্যে ঈমান-আমল ও দ্বীনের যথার্থ অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। এর বিকল্প কোনো কিছুই নেই। তাই তিনি তাঁর অন্তিম অবস্থায় নিজ সন্তানদের ডেকে নসীহত করে বলেছেন, “তোমরা দ্বীন, ঈমান এবং আমলের উপর সুদৃঢ় থেকো। দুনিয়াদার মানুষের মতো জায়গা-জমি ও ধন-সম্পদ অর্জনের দিকে নজর দিও না। ঈমান-আমল ব্যতীত ধন-সম্পদ বা ইমারত কাল কিয়ামতের বিচারে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না” (প্রাণ্ডক্ত, ৬৬-৬৭)।

১৮. সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন

তিনি অতি উঁচু স্তরের একজন আল্লাহর অলী হওয়া সত্ত্বেও জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অতিমাত্রিক অবস্থার আশ্রয় নেননি। যেরূপ খুবই সাদা-সিধে অনাড়ম্বর জীবন অতিবাহিত করেছেন ইহকালীন জীবনে ঠিক তেমনি পরকালীন জীবনেও যাতে কোনো ধরনের বিশেষত্বের আমেজ পরিলক্ষিত না হয় সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। তাই তিনি ইতিকালের পর কবরকে কোনো ধরনের পাকাকরণ, চুনকামকরণ কিংবা কবরের উপর ঘর তৈরি করে মাজার বানানো থেকে বিরত থাকার জন্যে নিজ সন্তানদের ও অনুসারীদের প্রতি অসিয়ত করে গেছেন বিশেষভাবে। কবর আকাশের দিকে খোলা রাখার প্রতি জোর তাকিদ দিয়েছেন তিনি (প্রাণ্ডক্ত, ৬৭)।

১৯. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

তিনি চিন্তা পোষণ করতেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান বর্তমান রয়েছে। এ বিধানের অনুসরণ ও বাস্তবায়নই ইবাদত হিসেবে পরিগণিত। ধর্মীয় আচার-আচরণে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের গভির মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজনে ইসলামের অনুসরণ অপরিহার্য। জীবন জিজ্ঞাসার সকল সমাধান ইসলামে রয়েছে। তাই তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবনে ইসলাম বাস্তবায়নের নিমিত্তে সমাজবিদ, রাজনীতিবিদ, শাসন কার্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা, অফিসার ইত্যাদি সবাইকে ইসলামী অনুশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি আহ্বান জানাতেন (আল ইসলাম, জম'ঈয়তে ইত্তিহাদুল ওলামা ওয়াল মুসলিমীন, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, পৃ. ৫)।

২০. উগ্রপন্থা পরিহার

স্পেন-কর্ডোভাসহ ইসলাম অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশ ও এলাকা থেকে ইসলাম বিলুপ্তির জন্য উগ্রপন্থী আলিমদের উগ্র চিন্তাধারা ও তাদের অপতৎপরতা বেশি দায়ী বলে তিনি মনে করেন। সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে ইসলামের শান্তির বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা বাস্তবতার দাবি। কাল-স্থান-পাত্রভেদে ইসলামের বিধানগত বিষয়ের বাস্তবায়নে তারতম্য ঘটে। মহানবী (সা.) ইসলাম প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক কার্যক্রমে এ নীতির অনুসরণে ব্যতিক্রম করেননি। তিনি এরশাদ করেছেন, *هَلِكُ الْمُشْتَطَعُونَ* “অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে” (আল কুশায়রী আন্ নিসাপুরী, আবুল হোসাইন, মুসলিম, আ/স-সহীহ, কায়রো: দারু ইবনি হাযম, ১ম সংস্করণ-১৪২৯ হি. পৃ. ৭৫১) ফলে ইসলামের বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে মানুষের জীবনে। মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছোট খাটো ও ক্ষুদ্র বিষয়কে বাদ দিয়ে মৌলিক ও ভিত্তিমূলক বিষয়াবলির যথার্থ বাস্তবায়নে সব ধরনের উগ্রতা, একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করে উদার নীতির অনুসরণ করতেন (আল ইসলাম, প্রাণ্ডক্ত, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪)।

২১. যুগসচেতন ও বাস্তববাদী

তিনি দেশ-জাতি, মাযহাব ও মিল্লাতের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্বের সাম্প্রতিক কালে যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। বিংশ শতাব্দির যে-সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিশ্বকে তন্মধ্যে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ ছিল অন্যতম। এ সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় তিনি জনগণকে

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করার মানসিকতা ও চিন্তাধারা পোষণ করতেন। তাই তিনি দেশ-জাতির কল্যাণে সর্বস্তরের মানুষের উপকারার্থে দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কায়েমের বিষয়ে জোর তাকিদ দিয়েছেন। ফলে বহুসংখ্যক দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাঁর হাতে গোড়াপত্তন ঘটেছে দেশব্যাপী (প্রাণ্ডক্ত, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৫)।

২২. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ

তিনি ছিলেন কুরআন-সুন্নাহ'র আদেশ পালনের মূর্ত প্রতীক। মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামের ফরয কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম। কুরআন মজীদে আয়াত-
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ “তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সৃজন করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে”। (আল কুরআন, সূরা আ-লু-ইমরান, আয়াত: ১১০)
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ “তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত, যারা (মানুষকে) আহ্বান করবে কল্যাণের প্রতি, সৎ কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজে বাধা দেবে”। (আল কুরআন, সূরা আ-লু ইমরান, আয়াত: ১০৪) মহানবির (সা.)
বাবী-
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ “তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় ও গর্হিত কাজ দেখলে তা যেন হাত দ্বারা প্রতিহত করে। তাতে সক্ষম না হলে মুখের শক্তি দ্বারা প্রতিহত করবে। আর যদি সে ক্ষমতাও না থাকে, অন্তর দ্বারা করবে। এটাই হলো ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়” (কুশায়রী, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯)। এর আলোকে তিনি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকে অতীব গুরুত্ব দিতেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে কিছু লোক সাতকানিয়া কলেজের মাঠে নাচ, গান, জুয়ার আসরসহ শরী'আ বিরোধী কাজের আয়োজন করলে তিনি সংবাদ পেয়ে দশ সহস্রাধিক মানুষ সাথে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং তা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১৯)।

২৩. নারী শিক্ষার গুরুত্ব

জ্ঞানার্জন ইসলামে অপরিহার্য কার্যাবলির অন্যতম। এতে পুরুষের সাথে সাথে নারীও সমানভাবে আদিষ্ট। পুরুষদের জন্য ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও নারীদের জন্য ছিল বরাবরই অনুপস্থিত। তিনি সর্বপ্রথম পৃথকভাবে পর্দাসহকারে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। গারাংগিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসায় শিফটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্বিতীয় শিফটে ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তাঁর নিজের ক্রয়কৃত জমি দান করে গারাংগিয়া মাদরাসা সংলগ্ন ‘রব্বানী মহিলা মাদরাসা’ নামে স্বতন্ত্র মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা আজ ফাযিল (ডিগ্রি) শ্রেণিতে উন্নীত। এটি ছিল সে সময়ের নারীদের ইসলামী শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান (রহমান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৭)।

২৪. দান-সদকায় উৎসাহ দান

তিনি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীদের প্রায় সময় দান-সদকার বিষয়ে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন, الصدقة ترد البلاء “সাদকা বা দান মুসিবত দূর করে এবং হায়াত বৃদ্ধি করে”। বিভিন্ন রোগগ্রস্ত মানুষকে ছাগল বা

যে-কোনো সদকা দিতে নির্দেশ দিতেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর হাদীস- *داووا مرضاكم بالصدقة* “তোমরা সদকার দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা কর” এর বাস্তব শিক্ষা দিয়ে মানুষকে নবীর (সা.) সুনাতের পথে পরিচালিত করতেন (আলবানী, নাসিরুদ্দীন, *সহীহু তাবগীব*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১ম সংস্করণ-১৪২১ হি. পৃ. ৪৫৮)।

২৫. এতিমদের মানব সম্পদে রূপান্তর

এতীম অসহায় মানুষ বিশ্ব মানব সভ্যতার একটি অংশ। তাদের যথার্থভাবে গড়ে তুলতে পারলে তারাও দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা পরিণত হবে মানব সম্পদে। তাই তাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধান বিষয়ে নবী (সা.) এরশাদ করেছেন- *أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى*, “আমি এবং এতীম তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় একত্রিত করে দেখান” (কুশায়রী, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৮৩৫)। তাই তিনি এতীম ছেলেদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য পৃথক এতীমখানা প্রতিষ্ঠা করে মানবতার এক পরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন (রহমান, *প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ৯৮)।

২৬. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিন্তা

দেশ ও জাতির অভিভাবক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর জনগণের চিন্তা-চেতনা ও শান্তি নির্ভর করে। মুজাদ্দিদে আলফে-সানী (রহ.) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিধি-বিধান প্রচলনের যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তারই ধারাবাহিকতায় মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদীও (রহ.) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন ও বিধান প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্বারোপ করতেন (*প্রাণ্ডক্ত*)।

২৭. শরী‘আত ও তরীকতের সমন্বয় সাধন

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান পবিত্র কুরআন ও রাসূলের (সা.) প্রতিষ্ঠিত সুনাত বা হাদীস সমগ্র ইসলামের মৌলিক বিধান হিসেবে স্বীকৃত। এর প্রায়োগিক তত্ত্বের বিশ্লেষণে শরী‘আত ও তরীকত অভিধায় বিভূষিত করেছেন ওলামা ও সূফীগণ। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) ওলামা ও সূফীদের মাঝে বিভাজন বিদূরিত করে অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করে তাসাওউফের যে নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন, তিনিও আলিম ও সূফীদের সমন্বয়ের জন্য “আনজুমানে তাবলীগে শরী‘আত ও তরীকত” গঠন করে তাসাওউফকে সুনাতী ধারায় চর্চার সুব্যবস্থা করেছেন। সব ধরনের বিদ‘আত, ওরস, সেমা ইত্যাদি সুনাত বিরোধী কার্যক্রম বন্ধ করার পথ প্রশস্ত করেছেন (*প্রাণ্ডক্ত*, পৃ. ১৩৮)।

২৮. দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ইসলামী সংগঠন

আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে সামষ্টিক পর্যায়ে ইসলামী আইন-কানুন প্রচলন প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিগত পর্যায়ের ইবাদতের ন্যায় অপরিহার্য। ব্যক্তির ইচ্ছা ও উদ্যোগে ব্যক্তিগত ইবাদত সম্পন্ন হলেও সামষ্টিক ইবাদতে তা সম্ভবপর নয়। সামষ্টিক ইবাদতের জন্য সামষ্টিক ইচ্ছা ও উদ্যোগ একান্ত অপরিহার্য। ইসলামী আইন ও বিধানকে সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সাংগঠনিক শক্তি ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই তিনি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর ইবাদত কায়েমের জন্য ইসলামী সংগঠনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারই ধারাবাহিকতায় দেশে বসবাসরত মুসলমান ও আলিমদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “জম’ঈয়েতে ইন্ডিহাদুল উলামা ওয়াল মুসলিমীন” নামে। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তিনি আজীবন দায়িত্ব পালন করেন (প্রাণ্ডুজ, পৃ. ১৩৯)।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, মাওলানা আব্দুর রশীদ সিদ্দীকী হামিদী (রহ.) ছিলেন কামালিয়াত বা পূর্ণতা অর্জনকারী একজন আল্লাহর প্রিয়ভাজন আলোকিত ব্যক্তিত্ব। যার সমগ্র জীবন ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সূনাতের আলোকে উদ্ভাসিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে তিনি অতি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করতেন। প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতেন। ফলে তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, চিকিৎসক, শিক্ষা বিস্তারকারী মনীষী, ইয়াতীম ও অসহায়দের আশ্রয়স্থল ও নারী শিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে দেশ ও জাতির কাছে পরম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হয়েছেন। তাঁর অসামান্য অবদান দেশ-সমাজ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে মানুষের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা, কর্মতৎপরতা, সৎ ও চরিত্রবান জাতি গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ ও দেশ উন্নয়নের জন্য আলোকিত মানুষের অভাব পূরণ করবে নিঃসন্দেহে। তাঁর সমুজ্জ্বল জীবন ও চিন্তাধারা ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিবেচিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনাকারী প্রতিটি মু’মিন-মুসলিমের নিকট। একবিংশ শতাব্দির ঝঞ্ঝা-বিক্ষুদ্ধ অশান্ত এ বিশ্বে তাঁর যুগোপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারার সঠিক বাস্তবায়নে মানুষ পাবে জ্বলুম ও শোষণমুক্ত সমাজ এবং শান্তি-সমীরণের আলোক বন্যায় উদ্ভাসিত এক নব পৃথিবী। যা হবে সৎ ও নেককার সালেহীনের আবাসভূমি। ফলে প্রায়োগিক পদ্ধতিতে বাস্তব জীবনে প্রতিধ্বনিত হবে আল্লাহর এ বাণী-*اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ* “নিশ্চয় আমার সৎ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে” (আল-কুরআন, সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৫)।

সূত্র নির্দেশ

১. আল-কুরআনুল কারীম
২. আল বুখারী, মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল, *আস সাহীহ*, কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।
৩. আল কুশায়রী আন নিসাপুরী, আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, *আস-সহীহ*, কায়রো: দার ইবনে হাম্মাম, ১ম সংস্করণ-১৪২৯ হিজরী।
৪. আলবানী, নাসিরুদ্দীন, *সহীহত তারগীব*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা’আরিফ, ১ম সংস্করণ-১৪২১ হিজরী।
৫. সিরহিন্দী, শেখ আহমদ ফারুকী, *মাকতুবাত শরীফ*, অনু: শাহমুহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী, ঢাকা।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

৬. সিদ্দীক, ড. আ.ফ. ম আবু বকর, *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)*, ফরিদপুর: ইসলামী রিসার্চ এন্ড কালচার প্রকাশনী, জানুয়ারি ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
৭. রহমান, ড. মুহাম্মদ বদিউর, *মুজাদ্দিদে জামান ইমামুত তরীকত হযরত শাহ মাওলানা আব্দুর রশিদ ছিদ্দিকী হামেদী (রহ.) জীবনী ও চিন্তাধারা*, চট্টগ্রাম: মনোরমা আর্ট প্রেস ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।
৮. চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *গারাংগিয়া ছোট হুজুর (রহ.)'র জীবন ও অবদান*, চট্টগ্রাম: বন্ধন কম্পিউটার এ প্রিন্টার্স, ৪ নভেম্বর, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ।
৯. চৌধুরী, আহমদুল ইসলাম, *কুতবুল আলম সুলতানুল আওলিয়া হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মজীদ (রহ.)*, চট্টগ্রাম: জাহানারা কালার প্রিন্টার্স ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।
১০. কুদ্দুস, মুহাম্মদ আব্দুল, *আসরারে আওলিয়া*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস ১৩৯৭ হিজরী।
১১. খতীবী, মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক, *একটি আদর্শ জীবন*, চট্টগ্রাম: মোহাম্মদী আর্ট প্রেস, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।
১২. হামেদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, *কিতাবুস সরফ*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৩. হামেদী, মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *হিব্বুল বাহর*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, ৯৭ চন্দনপুরা।
১৪. হামেদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, *শাজরা শরীফ*, চট্টগ্রাম: খাজা, ইলেকট্রিক প্রেস, চন্দনপুরা, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
১৫. হামেদী, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, *কাসীদায়ে ওয়াসফিয়া*, চট্টগ্রাম: ইসলামী লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
১৬. মহিউদ্দীন, এ. কে. এম. *চট্টগ্রামে ইসলাম*, ঢাকা: ই. ফা. বা. ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।
১৭. হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা: আদিল ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
১৮. করিম, আব্দুল, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, চট্টগ্রাম ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ।
১৯. চৌধুরী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন, *আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, ঢাকা: ই.ফা.বা ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ।
২০. আল ইসলাম (১ম-১৩ তম সংখ্যা), *জমঈয়েতে ইত্তেহাদুল উলামা ওয়াল মুসলিমীন*, চট্টগ্রাম: ইসলামিয়া লিথো এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ১৪০২ হিজরী।
২১. Haykal, Muhammad Husayn, *The Life of Muhammad*, New Delhi-110002: Farid Exports, 1st Edition-2012.

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন: বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার প্রসঙ্গ

শাসনানন্দ বড়ুয়া রূপন*

প্রতিপাদ্যসার

মানব সভ্যতার ইতিহাসে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা ভাবনা গৌতম বুদ্ধের এক শ্রেষ্ঠ উপহার। সৎ, আলোকিত ও আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলনের দ্বারা পরিপূর্ণ মানবতার বিকাশ ঘটে। বিশ্বশান্তি, বিশ্বমানবতা ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিশ্বমৈত্রী তথা বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শনের দ্বারা বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণ সহজ হতে পারে। গৌতম বুদ্ধ জগতকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন। তিনি একটি নৈতিক ও জীবনভিত্তিক ধর্ম দর্শনের প্রবর্তন করেছিলেন। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার সাধনার মাধ্যমে মানুষের মানবিকতা বিকশিত হতে পারে। মানবিকতা বিকশিত না হলে চিত্তের পাশবিক দিকটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে হিংসা, বিদ্বেষ, বৈরীতা, ঘৃণা, লোভ, পরশ্রীকাতরতা বেড়ে যায়। ফলে সমাজে অশান্তি, অসম্মিতা, অমানবিকতা, অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধ সর্ব প্রকার বিরাজমান অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার লক্ষ্যে একটি শান্তিপূর্ণ ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণের অভিপ্রায়ে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা অপ্রমেয় ভাবনা (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা) অনুশীলনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মানুষকে। তাছাড়া সৎ জীবন-যাপন, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি, সদগতির প্রয়াসে এ ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং বলা যায় যে, এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা দ্বারা মানুষ ইহলোকে শান্তিময় জীবন-যাপনান্তে মৃত্যুর পরে সুগতি বা ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হতে সক্ষম হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের অনুশীলন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিকতা বিকাশে যে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখা সম্ভব তা আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা:

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা) দর্শন বা অপ্রমেয় ভাবনার উপকারিতা অপরিসীম। অন্তর থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, বৈরিতা পরিহার করে দয়া, সমতা, ন্যায় পরায়ণতা, ত্যাগ, বিশ্বশান্তি, মানবিকতা, মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যে ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন করা একান্ত কর্তব্য। বুদ্ধ হিংসামুক্ত, বৈরীতামুক্ত, ভেদাভেদমুক্ত, মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সর্বস্তরের মানুষের জন্য ব্রহ্মবিহার দর্শনের উপদেশ প্রদান করেন। ইচ্ছে করলে যেকোনো ব্যক্তি এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা করতে পারে। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলনের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং মানুষের চিত্ত অনাবিল শান্তিতে ভরে ওঠে। এতে করে সহিষ্ণু, পরোপকার, কল্যাণভিত্তিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এ দর্শনের দ্বারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা, মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উপর্যুক্ত কারণে এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের অনুশীলন ব্যক্তি জীবনকে মহিমান্বিত করে এবং বিশ্বশান্তিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। মানুষে মানুষে সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, একতা, সম্প্রীতির বন্ধন, পারস্পরিক সহ অবস্থান, প্রীতির আদর্শ, সাম্যভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ, সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, অহিংসা, সাম্যনীতিকে ধারণ, মনন, লালন, চর্চার ক্ষেত্রে বিকশিত করার ক্ষেত্রে এ ভাবনার অনুশীলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সমগ্র মানবজাতি তথা সর্ব সত্ত্বকে আপন করে নেয়ার মূলমন্ত্র হলো এ ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি গুণী, সাধু ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি সর্বস্তরের মানুষের নিকট প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে নন্দিত ও সমাদৃত হন। একজন ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি কখনও মানুষের বা প্রাণীজগতের অশান্তি সৃষ্টি বা অনিষ্ট করেন না। আবার ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তির কোনো ব্যক্তি ক্ষতি করতে পারে না। ব্যক্তি স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হলেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তির লোভ, হিংসা, ক্রোধ, মোহ, স্বার্থান্ধতা থাকে না। ফলে তিনি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি লোভ করেন না। ফলে তাঁর দ্বারা মানব সমাজে কোনো প্রকার অশান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনার অর্থ

‘ব্রহ্মবিহার’ বলতে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ, আদর্শ, মানবিক জীবন-যাপনকে বোঝায়। স্বীয় অন্তরে ও কর্মে অহিংসাবোধ বা মৈত্রী, দয়া, সাম্যভাব পোষণ, মনন ও লালন করাই হলো “ব্রহ্মবিহার” ভাবনা। বৌদ্ধধর্ম দর্শনে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনাকে একত্রে ব্রহ্মবিহার দর্শন বা বিশুদ্ধির পথ হিসেবে অপ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত করা হয়। উপর্যুক্ত কারণে বৌদ্ধ ‘ব্রহ্মবিহার’ অর্থ শ্রেষ্ঠ বা সাত্ত্বিকরূপে বসবাস করাকে বোঝায় (বুদ্ধঘোষ ভিক্ষু ২০১৭, ৩৮১)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ব্রহ্মার-আচার-আচরণরূপে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বসবাস করাই হলো ব্রহ্মবিহার দর্শন। এ দর্শন দ্বারা সর্ব জীবের প্রতি অপ্রমেয় আন্তরিক অনুভূতি জাগ্রত করা যায়। এ অনুভূতি প্রতিফলিত হবে আচরণীয় উপরোল্লিখিত চারটি ধারায়। এরূপে যাপিত জীবনই হলো হলো শ্রেষ্ঠ।

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন : বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার প্রসঙ্গ

বৌদ্ধধর্ম, ধর্ম হলোও এটি একটি দর্শন। এ দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হলো বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা ভাবনার গুণ তাৎপর্যপূর্ণ। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনা বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন চর্চা মানুষকে আলোকিত জীবন গঠন ও মানবীয় গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষার অনুশীলনের দ্বারা মানবতা, মানবিক বিশ্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য।

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন: বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার প্রসঙ্গ

ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন মানুষকে মানবিকতা অর্জন করতে সাহায্য করে। আধুনিক বিশ্বে বিজ্ঞানের বস্তুকেন্দ্রিক উৎকর্ষ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিলাসিতা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। দেশ থেকে দেশান্তরের সীমা পেরিয়ে গ্রহ-গ্রহান্তরে ভ্রমণও মানুষ আয়ত্ত করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সীমাহীন উন্মেষ সাধনের মাঝেও মানুষের মনের ভারসাম্য ও মানসিক শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য, অশান্ত বিশ্বে শান্তি, মানব জীবনে অনাবিল সুখ প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। মানব সমাজে বিরাজমান উদ্বেগ, উৎকর্ষ, যুদ্ধ, হানাহানি, শত্রুতা, অনৈক্য, অশান্তি দূর করতে হলে এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অভূতপূর্ব উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্ব নানা সমস্যায় নিমজ্জিত। তার মাঝে চরম আকার ধারণ করেছে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, যুদ্ধ, হানাহানি, বৈষম্য, অবিশ্বাস। পুঁজিবাদী চিন্তা-চেতনা, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ, বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে হিংসা-বিদ্বেষ, অশান্তি। আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, স্বার্থান্ধতার কারণে মানব জীবনে অশান্তি বিরাজমান। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, হানাহানি লেগেই আছে। আধুনিক বিশ্বে বিরাজমান অন্যায়, অমানবিকতা, অশান্তি, ভেদাভেদ, সংঘাত নিরসনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিহার অনুশীলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুর প্রতিও মৈত্রীভাব পোষণ করতে হবে। অহিংসা, সাম্যভাব, দয়া, ত্যাগ, সাধনা অনুশীলন দ্বারাই প্রকৃত মানবতার উদ্ভব এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। বুদ্ধের জীবনেও আমরা দয়া, মৈত্রী, ক্ষমার পরিচয় পেয়ে থাকি। বুদ্ধের মৈত্রী গুণ ছিলো অপরিসীম। ত্রিপিটক সাহিত্যে এর সপক্ষে বহু উদাহরণ ও কাহিনী দৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দেবদত্তের প্ররোচণায় রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের প্রাণনাশের জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিলেন। গুপ্ত ঘাতক জেনেও বুদ্ধ অজাতশত্রুকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। মৈত্রী বাণী দেশনা করে তাকে সন্ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এ মৈত্রী শক্তির বলেই বুদ্ধ অকল্যাণকারী, দুষ্ট, শক্তিশালী মার দেবরাজ, খুবই হিংস্র ও শক্তিদ্র আলবক যক্ষ, হিংস্র অবুঝ প্রাণী মাতাল নালাগিরি হস্তী, নরহত্যাকারী ক্ষিপ্ৰ গতিসম্পন্ন অঙ্গুলিমাল, অসৎ ও মায়াবী সুন্দরী চিঞ্চল মানবিকা, অহংকারী দাঙ্কিক দার্শনিক সচ্চক পরিব্রাজক, ভয়ংকর নন্দোপনন্দ নাগরাজ এবং নিজেকে ঈশ্বর মনে করা মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন বক ব্রহ্মাকে বুদ্ধ বিনা অস্ত্রে, বিনা রক্তপাতে এমনকি বিনা বাকবিতণ্ডায় জয় করেছিলেন। সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের ধর্মপদ গ্রন্থে রয়েছে :

নহি বেরেন বেরানি সম্মাস্তিধ কুদাচনং,

অবেরেন চ সম্মাস্তি এস ধম্মো সনন্তনো (মহাস্থবির ১৯৫৪, শ্লোক নং-৫, ২)।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে শত্রুতার দ্বারা শত্রুতার উপশম হয় না। মিত্রতা বা বন্ধুত্বের দ্বারা শত্রুতার উপশম হয়। এটাই সনাতন ধর্ম। গুণী, সহিষ্ণু, শান্তিপূর্ণ, সুখময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার ভাবনা অসাধারণ ভূমিকা রাখতে পারে। বৌদ্ধধর্ম দর্শন মানুষের মঙ্গল ও মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচারিত হয়েছিলো। বিশ্ব সভ্যতায় মানবতার প্রবক্তা বুদ্ধ এবং মানবতা সত্য প্রকাশমান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে। বৌদ্ধ দর্শন যে সম্পূর্ণরূপে মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে মুক্তির পথ দেখিয়েছে তা চিরন্তন ও শাস্বত (বড়ুয়া, ২০০০, ৯৭-১০০)। মানুষের অন্তর সত্তা বিকশিত হলেই মনুষ্যত্ব, মানবিকতাবোধ জাগ্রত হয়। মানবিকতা বিকাশে ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধের অনুপম প্রকাশ ব্রহ্মবিহার ভাবনার আবেদন অনবদ্য। আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, মানবিক গুণাবলীকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে ব্রহ্মবিহার ভাবনার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি সর্বত্র নন্দিত ও সমাদৃত হন। তাঁকে সবাই সম্মান, শ্রদ্ধা করে। কারণ, তাঁর দ্বারা বিশ্বজগতে, বিশ্বমানবতার কোনো প্রকার অকল্যাণ, অমানবিক কার্য সম্পাদনের সম্ভাবনা থাকে না। ফলে বিশ্বশান্তি সমুন্নত থাকে। মনে যখন মৈত্রী চেতনার সঞ্চার

হয়, মন তখন মানবিকতা, দয়া, করুণা, প্রেম ইত্যাদিতে শুভ্রভাবে সিক্ত ও পূর্ণ হয়। এরূপ চেতনায় কর্ম অনাবিলতার কারণে সুন্দর, সুশোভন ও কল্যাণমূলক হয়। এ জন্য একে কল্যাণ বা কুশলকর্ম নামে অভিহিত করা হয়। তন্মধ্যে ব্রহ্মবিহার ভাবনা হলো অন্যতম কুশল কর্ম। ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলনে চিত্ত যখন শান্ত, সরল, বিশুদ্ধ, নির্মল হয় তখন মনে আনন্দের ফল্গুধারা, শান্তিধারা বইতে থাকে। শান্ত চিত্তের অধিকারী ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি মানবিকতা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে সক্ষম হন। বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশ ঘটে। বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার বিকাশে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। সহিষ্ণুতা, সমতা, বন্ধুত্বভাব, মানবিকতা ও বিশ্বশান্তি সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম বলে প্রতীয়মান হয়। অহিংসা বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের শ্রেষ্ঠ নীতি, অক্ৰোধ এ ধর্ম দর্শনের উচ্চ আদর্শ এবং শান্তি পরম লক্ষ্য (দাশ গুপ্ত ১৯৯৮, ১০৪)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলনের দ্বারা মানবিকতার বিকাশ সাধিত হয়। ফলে মানব সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধিত হয়। সত্যিকার অর্থে ঘৃণার পরিবর্তে মৈত্রীর দ্বারা শত্রুরও হৃদয় জয় করা যায়। হিংসাকে অহিংসা দ্বারা জয় করতে হবে। ক্রোধকে অক্ৰোধ দ্বারা জয় করা সম্ভব হয়। এ মৈত্রী শক্তি দ্বারাই বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাহলে ক্ষত-বিক্ষত, হিংসা-বিদ্বেষ জর্জরিত এ মানবকূলে ও প্রাণীকূলে শান্তি বিরাজ করবে। সত্যিকার অর্থে আধুনিক মানব সমাজে বিশ্বশান্তি, মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণে ব্রহ্মবিহার ভাবনা গুরুত্ব অপরিসীম। তার (ব্রহ্মবিহার দর্শনের) আলোকে চিত্ত শুদ্ধিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানব চিত্তের পরিশুদ্ধিতা ছাড়া বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর এ চিত্ত শুদ্ধিতার জন্যে ব্রহ্মবিহার অনুশীলন অত্যাবশ্যক। মৈত্রীর গুণ ও শক্তি অতুলনীয় ও অচিন্তনীয়। এ মৈত্রী ভাবনা দ্বারা মানুষের অন্তর কলুষমুক্ত হয়, পাপমুক্ত হয়, হিংসামুক্ত হয়, দ্বেষচিত্ত মুক্ত হয়, তাঁদের চিত্ত স্বর্গীয় সুষমায় সুষমামণ্ডিত হয়। এ ভাবনা মানুষকে ক্ষমা ও প্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে সরাসরি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হতে সক্ষম হয়। তাঁর অন্যতম উপদেশ হলো সর্বজীবে দয়া। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে : ‘সবের সত্তা সুখিতা হোম্ভ’ অর্থাৎ, বিশ্বের সর্ব প্রাণী সুখী হোক। বুদ্ধ সর্ব প্রাণীর প্রতি অপার মৈত্রী প্রদর্শনের শিক্ষা প্রদান করেন। মৈত্রীচিত্ত ধারণ পূর্বক অবস্থান করা মানুষের জন্য উপকারী। এরূপে বসবাস করলে মানুষের চিন্তায় কোনোভাবেই উদ্বেজনা ও হিংসা ভাবের উদ্বেক হয় না। এর ফলে মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। এ শান্ত চিত্তেই আধ্যাত্মিক সাধনায় সাধককে উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। বুদ্ধ অপ্রমেয় মৈত্রীভাবকে সর্বদিকে সর্বতোভাবে প্রসারিত করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার দর্শন অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শন মানুষকে সকল প্রকার অকুশল, অশুভ, অকল্যাণ, অশান্তি, অমানবিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা দূর করতে সাহায্য করে। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, বিশ্ব জগতের শান্তি বিনষ্ট হয় এমন কর্মকাণ্ড পরিহার করে চলেন। এরূপ ব্যক্তি সবাইকে তা মেনে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। আলোকিত জীবন গঠন, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় শান্তি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা করা খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা হলো মানুষের মানবীয় উচ্চতর সদৃশ। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিকতা বিকাশে বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের মূল উপাদান প্রসঙ্গ নিম্নে আলোকপাত করা হলো :

মৈত্রী

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের প্রথম স্তর হলো মৈত্রী। এ মৈত্রী হলো মানুষের সকল গুণসম্ভারের উৎস। হিংসা, বিদ্বেষ পরিহারে এর গুরুত্ব অপরিসীম। পালিতে ‘মেত্তা’ শব্দের বাংলা অর্থ হলো ‘মৈত্রী’। এটি মিদ্র ধাতু নিম্পন্ন শব্দ। সংস্কৃত অনুসারে এর অর্থ হলো মিত্রতাভাব বা মৈত্রী; যা মনকে কোমল করে, অথবা মিত্রতা স্বভাব বা বন্ধুত্বই মৈত্রী নামে অভিহিত। এ ‘মৈত্রী’ শব্দটি মিত্রতা, বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা, পরোপকারিতা, শুভেচ্ছা, সৌহার্দ্য, সৌজন্য ইত্যাদি গুণধর্মের নামান্তর। এ মৈত্রী

নিষ্কাম প্রেম হিসেবে অভিহিত (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া ২০১০, ১৩১)। এ মৈত্রীর পরিভাষা হলো বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব। পরিশুদ্ধ জীবন-যাপন মৈত্রী ভাবনার অনুশীলন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিশ্বমৈত্রী ভাবনা সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার বিকাশে ব্রহ্মবিহার ভাবনা অমূল্য ভূমিকা পালন করতে পারে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্ধক নিকায়ের ইতিবৃত্তকে মৈত্রীকে অতি উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। স্নেহ বা প্রীতি, সৌহার্দ্য অনুরাগই মৈত্রীর নামান্তর। এর অর্থ হলো সকল প্রাণীর প্রতি স্নেহ বা প্রীতিবহুল মৈত্রী ভাব পোষণ করা। মিত্র বা বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন কিংবা মিত্রত্বে সেরূপ প্রবর্তিত হওয়াকেই মৈত্রী নামে অভিহিত করা হয়। তথাপি বিশেষ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যে আঘাত বা বিদ্বেষে ন্দ্রতা বা বিনয়ীভাব এবং সকল প্রাণীর প্রতি প্রীতি বা সুখকর ভাবদর্শন ও প্রত্যক্ষকরণ। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, “আদর করা, স্নেহ করাই মৈত্রী অথবা মিত্রগণের মধ্যে বাস করাই হলো মৈত্রী (ইতিবৃত্তক, মূল পালি)। মৈত্রী অর্থাৎ সৌহৃদ্যতা, মিত্রতা; সদ্ভাব সহযোগ অর্থে মৈত্রী। এ মৈত্রী বলতে নিজের মতো করে সর্বজীবকে দেখা। নিঃস্বার্থ মৈত্রীর সহিত করুণা, করুণার সহিত মুদিতা এবং মুদিতার সহিত উপেক্ষাভাব যথাক্রমে উৎপন্ন হয়ে মৈত্রী আচরণে ব্রহ্মবিহার ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে থাকে। কাজেই মৈত্রী ভাবনাকারী ব্যক্তিকে “মৈত্রীবিহারী বা ব্রহ্মবিহারী” নামে অভিহিত করা হয়। সর্বজীবের প্রতি নিঃস্বার্থপ্রিয়তা, আদর, স্নেহ ইত্যাদি প্রদর্শনই হলো মৈত্রীর নামান্তর। এর স্বরূপ কি? জীব-জগতে প্রত্যেক জীবের নিজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়বস্তু আর কিছুই নেই। সুতরাং নিজেকে, নিজের প্রাণকে প্রত্যেকে যেমন ভালোবাসে, আদর যত্ন করে, সর্বতোভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করে, জগতের জীবমাত্রেরই তেমন নিজের প্রতি, নিজের প্রাণের প্রতি মমতা রাখে। এটা মনে করে সর্বজীবের প্রতি নিজ প্রাণের মমতা দিয়ে ভালোবাসার নাম পরম মৈত্রী। মৈত্রীতে লোভ থাকে না, হিংসা বা দ্বেষ থাকে না, মোহ থাকে না নিঃস্বার্থতার পরিপ্রেক্ষিতে; শুধু অনাবিল প্রশান্তভাব তখন চিত্তের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। এ মৈত্রীগুণে ক্রোধ পরিত্যক্ত হয়, ক্ষমাশীল হয় আর জীবের প্রাণে জাগিয়ে তোলে প্রশান্তির পবিত্র আনন্দ। অতএব মৈত্রীধর্ম শুধু মৌখিক বচনসার মাত্র নয়, নীতি আচরণে, অনুশীলনে, পালনে, রক্ষণে মৈত্রী সুপরিষ্কৃত হয়ে থাকে। ক্রোধ ও মোহের মূল লোভ, লোভহীন হৃদয় দয়ার উৎস করুণার নির্ধারিণী। এ দয়ায় জীব-জগতে আনীত হয় সাম্য-মৈত্রী। সাম্য-মৈত্রীই মুদিতার অর্থাৎ অপরের সুখে সুখী হওয়ার সুযোগ প্রদান করে থাকে (মহাস্থবির ৮০, ৮১)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সর্বপ্রাণীর প্রতি মমতাময় চিত্ত জাগ্রত রাখাই মৈত্রী। দয়া, পরোপকারীতা, সেবার সদিচ্ছা ইত্যাদি মৈত্রীর পর্যায়ভুক্ত। মৈত্রীর বিপরীতে রয়েছে দ্বেষ, ক্রোধ। এবং পরোক্ষ বিরুদ্ধচারী হলো-ব্যক্তিগত আসক্তি বা প্রেম বা অহংবোধ। সুতরাং মৈত্রীর অনুসারী হলে দ্বেষ, ক্রোধ ও অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে। সকল প্রকার প্রাণীকে আপনবোধে অপ্রমেয় প্রেমে সিক্ত করতে হবে। দান, ধর্ম, সহযোগিতা ও পরোপকারীতা ইত্যাদিতে স্বতস্কৃর্তভাবে উদ্যমী হতে হবে। তাহলেই মৈত্রীচর্চা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। (বড়ুয়া ও কান্তি বড়ুয়া, ২০০০ : পৃ. ৯৬) হিংসা, বিদ্বেষ হলো মৈত্রীর বিপরীত দিক। বিদ্বেষ পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মায়। ফলে হিংসার দাবানল জ্বলে ওঠে। এতে মানুষের মন হিংস্র পশুর চেয়েও খারাপ হয়। বিশ্বমৈত্রী ভাবনা হিংস্রতা ও ঘ্রানি থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করে। একে অপরের সম্পর্কে মধুর করে এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে। মন আকাশের মতো উদার, অসীম, শান্ত ও স্নিগ্ধ হয়। মৈত্রী চিন্তা মানসিক ক্ষিপ্ততা, রক্ষতা ও কঠোরতা বর্জন করার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক। অহিতকর বিষয় অবলম্বনে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, মৈত্রী চিন্তা তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সৌম্যভাব ধারণ করে। এ চেতনা সর্বপ্রকার কলুষ থেকে মনকে বিমুক্ত কবে (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ২০১০ খ্রি. প্রাগুক্ত, ১৩১, ১৩২)। জীবের হিত সুখ কামনা মৈত্রী। এর আলম্বন হলো প্রাণী (মুৎসুদী ১৯৪০, ২৮৪)। সর্বসত্ত্বের সঙ্গে একাত্মবোধই হলো মৈত্রীর বিকাশ। সর্বজীবের প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা এবং মঙ্গলাকাজ্জ্বলি মৈত্রী নামে অভিহিত। এটা দ্বেষ ধ্বংস করে। নিঃস্বার্থ পরোপকার এর স্বভাব (ভিক্ষু ২০১২, ৪৩)। মৈত্রী

আমাদের সহজাত সংস্কার। যদিও এর প্রকাশ সকল মানুষের মধ্যে সমান নয়। মৈত্রী মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ করে তোলে। এটি মানুষের বসবাসের পরিবেশকে পবিত্র করে তোলে। প্রেমের অনাবিল পরিবেশের মধ্যে শান্তির স্পর্শ হয় নিবিড়। কিন্তু হীন স্বার্থবুদ্ধি এ শুভ সংস্কারটিকে অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করে বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে দেয়। হিংসা বিদ্বেষের কুফল, ক্ষমাশীলতা প্রেমগুণ বিচার করাই সাধকের কর্তব্য। মৈত্রী ভাবনার মূল লক্ষ্য হলো ক্রোধ ও হিংসা পরিহার করা। এ মৈত্রী মানুষকে ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক প্রথম জীবনে নিষ্ঠুর প্রকৃতির, কঠোর স্বভাব সম্পন্ন লোক ছিলেন। নিগ্রোধ শ্রামণ সূত্রপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদের একটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। সেই শ্লোকটি হলো :

অপ্পমাদো অমতপদং, পমাদো মচ্ছুনো পদং
অঙ্গমত্তা ন মীয়ত্তি, যে পমত্তা যথামত্তা (মহাস্থবির, ১৯৫৪ : শ্লোক নং -২১, প্রাগুক্ত, ৯)

অর্থাৎ, অপ্রমাদ অমৃত লাভের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ, অপ্রমাদ পরায়ণ ব্যক্তির অমর আর প্রমাদ পরায়ণ ব্যক্তির জীবিত থেকেও মৃত সদৃশ। এ শ্লোকটি শ্রবণ করে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট অশোক তাঁর স্বভাবের জন্য চণ্ডাশোক নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মৈত্রীমূলক বৌদ্ধধর্ম-দর্শন গ্রহণ করে তিনি ‘ধর্মাশোকে’ পরিণত হয়েছিলেন। তিনি রাজ্য জয়, যুদ্ধ, নিপীড়ন, হিংসা নীতি পরিহার করেন। এর পরিবর্তে মৈত্রী, প্রেম, অহিংসা, ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, মানবিকতা ও মানবতার আদর্শকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি রাজ্য জয়ের পরিবর্তে ধর্ম বিজয়কে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। তাই তিনি মানবতা, মানবিকতার বৃত্তকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩২)। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বিশ্বশান্তি ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধ সর্ব জগতের সর্ব প্রাণীর প্রতি অপার মঙ্গল, মহামৈত্রী ও করুণার শিক্ষা প্রদান করেন। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের অন্যতম বেশিষ্ট্য হলো সর্বজীবে দয়া, বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা। যাঁরা মৈত্রীচিন্ত ধারণ পূর্বক অবস্থান করে তাঁদের চিন্তায় কোনোভাবেই উদ্বেজনা ও হিংসা ভাবের উদ্রেক হয় না। সুতরাং তাঁরা সুখ-শান্তিতে বাস করতে সক্ষম হয়। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। এ শান্ত-অশান্ত চিন্তেই বিমুক্তের বীজ উগ্ঠ হয়ে সাধককে সাধনার উন্নততর স্তরে অগ্রসর করে। বুদ্ধ অপ্রমেয় মৈত্রীভাবকে সর্বদিকে সর্বতোভাবে প্রসারিত করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে বিশ্বমৈত্রী বা করণীয় মৈত্রী সূত্রে রয়েছে : খালি চোখে দেখা যায় বা খালি চোখে দেখা যায় না, অর্থাৎ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়, কাছে বা দূরে সকল প্রাণীকে ভালবাসার কথা বুদ্ধ শিক্ষা দেন। যেমন :

“দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,

ভূতা বা সম্ভবেসী বা সবে সত্তা সবন্ত সুখিতত্তা (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, ৪৭)।

করণীয় মেত্ত সুত্তে বুদ্ধ মৈত্রী ভাবনার স্বরূপ সম্পর্কে বলেন :

মাতা যথা নিযং পুত্রং আয়ুসা একপুত্রা মনুরক্খং,

এবম্পি সত্ত্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, ৪৭)।

অর্থাৎ, মাতা যেমন একমাত্র সন্তানকে জীবন দিয়ে ভালোবাসেন, রক্ষা করেন অনুরূপভাবে তোমরাও সেভাবে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। এ সম্পর্কে সূত্রপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদ গ্রন্থে রয়েছে :

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন: বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার প্রসঙ্গ

সবের তসত্তি দণ্ডসুস, সবের ভাযন্তি মচ্চুনো,
অভানং উপমং কত্বা ন হাণেয্য ন ঘাতয়ে তি (মহাছবির ১৯৫৪ : শ্লোক নং-১২৯, ৪৮)।

অর্থাৎ, সকল প্রাণী দণ্ড, শান্তি ও মৃত্যুকে ভয় পায়; তুমি যেভাবে এগুলোকে ভয় পাও, অনুরূপ নিজের সাথে উপমা বা তুলনা করে কারো দণ্ড, শান্তি বা মৃত্যু বিধান করবে না। তাছাড়াও করণীয় মৈত্রী সূত্রের ৩ নং গাথায় বুদ্ধ আরো বলেন, যেসব সভয় বা নির্ভয়, দীর্ঘ, বড়, মধ্যম, হ্রস্ব, ক্ষুদ্র অথবা স্থূল প্রাণীসহ সকল প্রাণী সুখী হোক। একই সূত্রের ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, দাঁড়ান অবস্থায়, চলতে চলতে, বসে বসে, শুয়ে শুয়ে, যতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়বে না ততক্ষণ এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে অর্থাৎ মৈত্রীভাবনা করতে থাকবে। উপর্যুক্ত কারণে একেই ব্রহ্মবিহার বলে। জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বুদ্ধের উপরোক্ত উপদেশসমূহ কালজয়ী উপদেশ বলেই প্রতীয়মান হয়। বুদ্ধ বলেন, সবের সত্তা সুখিতা হোন্ত। অর্থাৎ, সকল প্রাণী সুখী হোক।

করণীয় মেত্ত সুত্তে রয়েছে :

মেত্তঞ্চ সর্বলোকস্মিং, মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ, অসম্মাধং অবেরমসপত্তং (মহাছবির ও বড়ুয়া, ৪৭)

অর্থাৎ, প্রত্যেকে উপরদিকে, নিম্নদিকে, চতুর্দিকে সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয়, মৈত্রীপূর্ণ, বাধামুক্ত, হিংসামুক্ত, বিদ্বেষবর্জিত, শত্রুত্যাগ মনোভাব পোষণ করা সমীচীন। ভদন্ত বুদ্ধঘোষ বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে পর্যায়ক্রমে মৈত্রী ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে মৈত্রী ভাবনার নিয়ম সম্পর্কে বলা হয়েছে মৈত্রী ভাবনা করতে হয় প্রথমে নিজেকে নিয়ে। যেমন : আমি সুখী হই, আমি শত্রুহীন হই, দ্বেষহীন, রোগহীন হয়ে সুখে বাস করি। আমার মতো আমার আচার্য ও উপাধ্যায়গণ, মাতা-পিতা, উপকারী ব্যক্তি ও মধ্যম ব্যক্তি এবং শত্রু ব্যক্তিগণও শত্রুহীন, বিপদহীন, রোগহীন হয়ে সুখে বাস করুক, দুঃখ হতে মুক্ত হোক, সৎকার্য দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। এ জগতে সকলেই কর্মাধীন। (থেরো ও মুৎসুদি, ১৯৩৬: পৃ. ২৭৩) দ্বেষ পরিত্যাগ করে ও ক্ষান্তিকে অবলম্বন করে, এ ভাবনায় অগ্রসর হতে হয়। যেমন, দ্বেষ দ্বারা অভিভূত ব্যক্তি প্রাণিবধ করে। এটা দ্বেষের স্বভাব। ক্ষান্তিই তপস্যার নামান্তর। এটা ক্ষান্তির স্বভাব। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, কি দেবতা, কি মনুষ্য সকল জীবই সুখী হোক, শত্রুর কল্যাণ হোক, সকলেই রোগ, শোক পাপ হতে মুক্ত হোক, এরূপ শুভ চিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা বলে (ঠাকুর ১৪০৫, ৯১, ২৪৯, ২৫০) এরূপে সকল দেশ, জনপদ, এমনকি স্বর্গ নরকে সকল প্রকারের প্রাণীগণ বিভিন্ন উপদ্রব ভয় হতে মুক্ত হয়ে সুখে জীবন-যাপন করুক বলে প্রার্থনা করতে হয়। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্ম কল্যাণ ও অন্যের কল্যাণ, বিশ্ব কল্যাণ ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। মানুষে মানুষে সকল প্রকার ভেদাভেদ ঘুচে যাবে। এ মৈত্রী ভাবনা বিশ্ব মৈত্রীর এক অমর ও কালজয়ী বাণী হিসেবেই বিবেচিত। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, প্রথমে নিজের মঙ্গল চিন্তা করা হয়েছে। পরে মৈত্রী ভাবনা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। এটা ক্রমশ সকল পর্যায়ের ব্যক্তিদের প্রতি ব্যাপ্ত হয়েছে। এ ক্রমিক ধাপে মানুষের উদারতাভাব, চিন্তের প্রসারতার, বিকাশ ঘটে থাকে। নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের জন্যও সমভাবে কল্যাণ কামনা করা হয়েছে। নিজের কল্যাণ কামনার সাথে সাথে অন্যের কল্যাণ কামনা করা একান্ত প্রয়োজন। এটি করতে না পারলে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংবোধ, সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, বৈরিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যার প্রভাবে সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। মৈত্রী ভাবনা প্রসঙ্গে বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে রয়েছে : ভয় প্রাপ্ত প্রাণীরা ভয়হীন ও নিরাপদ হোক, শোকার্তগণ প্রীতি লাভ করুক, উদ্ভিগ্ন যারা তারা নিরুদ্ধ হোক (বোধিচর্যাবতার)।

রোগীরা আরোগ্য লাভ করুক, বন্দী প্রাণীগণ সকল বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করুক, দুর্বলেরা সবল হোক, সকলে পরস্পর স্নেহময় চিত্ত হয়ে বাস করুক (বোধিচর্যাবতার)।

যথা সুখী কৃতশ্চাত্তা ময়াযং সর্বং দেনিৎ
য়ন্তে নিন্দন্ত বা নিত্যমাকিরন্ত চ পাংসুভিঃ (স্থবির, ৬৬) ।।

অর্থাৎ, সর্ব প্রাণীর সুখ লাভ হোক। সকল প্রাণীর সুখ বিধানের নিমিত্তে আমি এ দেহ উৎসর্গ করলাম। তারা ইচ্ছে করলে এ দেহ হত্যা করতে, নিন্দা করতে কিংবা এতে ধুলা নিক্ষেপ করতে পারে।

মৈত্র্যাশয়শ্চ মতপূজ্যঃসত্ত্ব মাহাত্ম্যমেব তত্ ।
বুদ্ধ প্রাদাদ্যত পূণ্যং বুদ্ধ মাহাত্ম্যমেব তত (স্থবির, ১১৪) ।

অর্থাৎ, জীবের প্রতি মৈত্রী সাধক শ্রদ্ধা লাভ করেন। তা জীবের মাহাত্ম্য বলা যায়। যেহেতু জীবকে ভিত্তি করেই মৈত্রী সাধনা আবর্তিত হয়। তা বুদ্ধেরই মাহাত্ম্য। ব্রহ্মবিহার সম্পর্কে বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক দেবব্রত সেন-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

“ব্রহ্মবিহার ভাবনার মাধ্যমে আমিত্ব লোপ পায়, চিন্তের প্রসারতা বাড়ে। এটা সম্যক সমাধিরই মতো উপায়। এ পথে রাগ, দ্বেষ ও মোহরহিত হয়ে সাধক অর্হত্ব প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করে”(সেন, ৮৯)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ব মৈত্রী বুদ্ধের অমর সৃষ্টি। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবিক ও আদর্শ জীবন-যাপন করার জন্য যাপিত জীবনে চার প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শন কেবলমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরঞ্চ বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেও এর অনুশীলন অপরিহার্য। কেননা, বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় হলো এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা। ব্যক্তিগত আক্রোশ, হিংসা, বিদ্বেষ এবং জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ পরায়ণতা, যুদ্ধ, ধ্বংসের, অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা। এ ভাবনার আলম্বন অসংখ্য বা অপ্রমেয় সত্ত্ব, তাদের দুঃখ ও সম্পদ। এ কারণে এ ভাবনা অপ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত। এ চার প্রকার ভাবনা অনুশীলনের মাধ্যমে মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মবিহারী হওয়া সম্ভব হয় বলেই এটাকে ব্রহ্মবিহার নামে অভিহিত করা হয়। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা সুন্দর, মানবিক, উত্তম জীবন-যাপনের, বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি বা মূলমন্ত্র। মৈত্রী ভাবনা দ্বারা মন পরিচ্ছন্ন ও শান্ত হয়। এ অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করলে সাধকের আসক্তি ও বিদ্বেষ আস্তে আস্তে দূর হয়ে যায়। শুভ চিন্তার উদয় হয়। সাধনার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে গুরুজন, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দিকে ভাবনা করে শত্রুর মঙ্গল চিন্তায় মন নিবিষ্ট হয়। এরূপে মৈত্রীভাব বিশ্বের প্রাণীকুলের প্রতি প্রসারিত করতে হয়। তখন সাধকের সাধনায় পূর্ণতা আসে। ক্রোধ, হিংসা, হীনপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয়। আত্ম-পর ভেদজ্ঞান রহিত হয়ে সাধকের মৈত্রীসিক্ত প্রথম ধ্যানের উদয় হয়। উপর্যুক্ত কারণে সাধক বৈরীশূণ্য ও বেদনাহীন উদার মৈত্রী মানস নিয়ে অবস্থান করে (ব্রহ্মচারী, ৬০)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, মৈত্রীপরায়ণ ব্যক্তি বিশ্বশান্তির সহায়ক শক্তি। এরূপ ব্যক্তি মানব সমাজের অলংকার। মৈত্রী বা বন্ধুত্বের দ্বারা বিশ্বশান্তি ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। বিশ্বমৈত্রী ছাড়া বিশ্বশান্তি,

মানবিক বিশ্ব, ন্যায় ভিত্তিক, সাম্যভিত্তিক, প্রবঞ্চনামুক্ত, সুখম মানব সমাজ বিনির্মাণ করা আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং মৈত্রীর চর্চা, বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। এ মৈত্রীই হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, দুর্নীতিমুক্ত মানবিক সমাজ বিনির্মাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এ মৈত্রী ভাবনা দ্বারা হিংস্র মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির হিংস্র মনোভাব পরিহার করা যায়। এরূপ স্বভাবের ব্যক্তির ক্ষেত্রে মৈত্রী ভাবনা খুবই উপকারী ও ফলপ্রসূ হতে পারে (মুৎসুদী, ১৩৯)। মৈত্রী হলো একটি উচ্চ আদর্শ বিষয়। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ মৈত্রীতে করে পূর্ণপ্রকাশ। দ্বেষ পরিহার পূর্বক এবং ক্ষান্তিকে ধারণ করতে পারলে মৈত্রী ভাবনায় উন্নতি করতে হয়। যেমন : দ্বেষ দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি প্রাণীহত্যা করে। এটা দ্বেষের স্বভাব। ক্ষান্তিই তপস্যার নামান্তর। এটা ক্ষান্তির স্বভাব (চৌধুরী, ২৪৯, ২৫০)। বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে মৈত্রী ভাবনার শক্তি সম্পর্কে রয়েছে : পৃথিবীতে অশুভ বা অন্যায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে আছে। তার শক্তি প্রবল। নানাবিধ শুভ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রভাব রয়ে গেছে। কিন্তু ঐ ভয়ংকর অন্যায়কে জয় করবার শক্তি কারও নেই। তাকে জয় করতে পারে ‘মৈত্রী’। পরলোক, মোক্ষ বা নির্বাণ তো দূরের কথা, এটা না থাকলে সংসারই যে অচল হয়ে যায় (পাল স্থবির, ১০)। সূত্রপিটকের মধ্যম নিকায়ের অন্তর্গত মহারাহুলোবাদ সূত্রে রয়েছে : মৈত্রী ভাবনা করলে চিন্তে যে ব্যাপাদ (বিদ্বেষ) উৎপন্ন হয় তা ধ্বংস হবে (মহাস্থবির, ৭২)। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দ্বেষহীন অবস্থাই হলো মৈত্রী। মৈত্রী দশ পারমীর একটি অন্যতম উপাদান। জীবন সাধনায় পরিপূর্ণতা, মানবিক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধ মৈত্রী পারমীকে সাধনার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শুধু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নয়; মানব জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এমনকি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও মৈত্রী ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে যেকোন ইহজীবনে স্বীয় অশান্ত, অস্থির মনকে প্রশান্ত করে অনাবিল সুখ শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। তেমনি সাধকও আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি করতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির হিংসা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ মৈত্রী পরায়ণ হতে পারলে বর্তমান হিংসা বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করবে যা সর্বতোভাবে সত্য (বিকাশ বড়ুয়া, ৮৯)। দুঃখ-কষ্ট, নানাবিধ বাধা বিপত্তিতে পরিপূর্ণ মানুষের জীবন। এরূপ জীবনে মৈত্রী ভাবনা ছাড়া চিন্তে প্রশান্তি ভাব আনয়ন করা সম্ভব নয়। চিন্তের প্রসারতা-প্রসন্নতা আনতে হলে মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে অন্তরে অবস্থিত হিংসাবাবকে (পটিঘ) সমূলে ধ্বংস করা সাধকের একান্ত প্রয়োজন। মৈত্রী বিহীন চিন্তে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুঃখ নিবৃত্তির সাধনা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ ও সম্প্রসারণের জন্য মৈত্রীগুণে গুণান্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ মৈত্রী সাধনা সর্বদা প্রত্যেকের করা দরকার। বুদ্ধ বোধিসত্ত্বাবস্থায় মৈত্রী সাধনা দ্বারা মৈত্রী গুণ অন্তরে সঞ্চিত করেছিলেন। যে কারণে বুদ্ধ স্থান কাল পাত্র ভেদে মানবের মঙ্গলার্থে উপদেশচ্ছলে এ মৈত্রীশক্তি, মৈত্রীগুণ, মৈত্রী সাধনার উপকারিতা উপস্থাপন করেন (বড়ুয়া, ৯০)। এ মৈত্রী সম্পর্কে সূত্রপিটকের অন্তর্গত দীর্ঘনিকায়ের তেবিজ্জ সূত্রে রয়েছে : বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত দ্বারা এক, দুই তিনদিক ব্যাপ্ত করে বিহার করেন, এরূপে চতুর্দিকে। এভাবে তিনি উর্ধ্বে, নিম্নে, তির্যক দিকে, সর্বলোকব্যাপী, সর্বত্র, সর্বব্যাপী অপ্রমেয়, বৈরহীন, দ্রোহহীন, বিদ্বেষ বিরহিত হয়ে মৈত্রীপূর্ণ চিত্ত ব্যাপ্ত করে অবস্থান করে, বলবান শঙ্খার অল্লায়াসেই চতুর্দিকে শঙ্খ ধ্বনি সকলের শ্রুতিগোচর করে, তেমনি এ মৈত্রী ভাবনা ও চিত্ত বিমুক্তি সর্বভূতে নির্বিশেষে নিযুক্ত হয়, কেউই উপেক্ষিত হয় না (শীলভদ্র, ১৮৬)। এরূপে বাস করাই ব্রহ্মের সাথে মিলিত হওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, মৈত্রী ভাবনার গুণাবলী অপরিসীম। সুতরাং সর্বদা মৈত্রী ভাবনায় রত থাকা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের এক সর্বোত্তম উপায়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণে বুদ্ধ উপদিষ্ট বিশ্বমৈত্রী ভাবনার বিকল্প নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের অটুট বন্ধনের জন্য, সুখী পরিবার গঠনে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে, সর্বক্ষেত্রে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থান, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এ মৈত্রী শক্তির প্রভাব অতুলনীয়। বুদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ‘ককটোপম সূত্রে’ মৈত্রীভাব পোষণের জন্য যে উপদেশ প্রদান করেন তা প্রণিধানযোগ্য। বুদ্ধ বলেন: কেউ যদি তোমাদেরকে কালে বা অকালে, যথা বা অযথা, মধুর বা কর্কশভাবে, অর্থত বা অনর্থত, মৈত্রীচিন্তে বা দ্বেষবশে অখ্যাতিসূচক কোনো কথা বলে, পাপমূলক কথা বলে, নিরর্থক দ্বেষ পোষণ করে কিছু বলে, তথাপি তোমাদের এ শিক্ষাই করা কর্তব্য যে, এরূপ আচরণে আমাদের চিন্ত কলুষিত হবে না, আমরা পাপ বাক্য উচ্চারণ করবো না, আমরা হিতকামী করুণা পরবশ হয়ে বিহার করবো। আমরা চিন্তকে মৈত্রীতে পূর্ণ রাখবো, অন্তরে দ্বেষ পোষণ করবো না। আমরা সে ব্যক্তির প্রতি মৈত্রী চিন্ত হয়ে অবস্থান করবো। আমরা সমগ্র ভূবনকে রিপূর দূরব্যাপী, অপরিমেয় বৈর ও বিদ্রোহ বিরহিত মৈত্রী চিন্ত দ্বারা বাস করবো। সর্বলোকের প্রতি অবৈর, অপ্রমেয়, মৈত্রীসহগত-চিন্তে অবস্থান করা একান্ত প্রয়োজন (বড়ুয়া, ১৩৭, ১৪০-১৪৩)। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, এ মৈত্রী শুধুমাত্র যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে তা নয়। উপরন্তু মৈত্রী অপরের কল্যাণ, মঙ্গল কামনার দ্যোতক। অভিধর্ম পিটকের বিভঙ্গে রয়েছে : মৈত্রী অব্যাপাদধাতুমূলক। কিন্তু এটা হৃদয়ের উদগ্র স্নেহের পরিপোষক (মজ্জাতীতি মেত্তা)। সর্বজগতের সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী বা ভালোবাসা মৈত্রীকর্ম বা মিত্রতাকরণ, মৈত্রীভাব অর্থাৎ সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্বকরণকে একত্রে মৈত্রী চিন্তবিমুক্তিকে মৈত্রীচিন্ত নামে অভিহিত করা হয় (ভিক্ষু, ৩০৫)। সূত্রপিটকের খুদ্দকপাঠের করণীয় মৈত্রী সূত্রে রয়েছে :

নহি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতীতি (মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং ১০, ৪৭)।

অর্থাৎ, সর্ব জগতের সর্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রী, প্রেমভাব পোষণ করাই পুনর্জন্ম নিরোধের উত্তম পন্থা।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চিৎ যেন বিএঃএঃপরে উপবদেযুয়াং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্ত সবে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা

(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং-৩, ৪৪)।

অর্থাৎ, তিনি (মৈত্রী পরায়ণ ব্যক্তি) এমন কিছু নীচ আচরণ করবেন না, যাতে অপর বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন; তিনি এরূপ প্রত্যাশা করেন যে, সকল প্রাণী সুখী, ভয়হীন ও সন্তুষ্টচিন্ত হোক।

ন পরো পরং নিকুন্বেথ নাতিমএঃএঃথং নং কঞ্চিৎ,
ব্যারিসনা পটিঘসএঃএঃ নাএঃএঃমএঃএঃসস দুক্খমিচ্ছেয়া

(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং-৬, ৪৫, ৪৬)।

অর্থাৎ, একে অপরকে বঞ্চনা করবে না, কাউকেও অবজ্ঞা করবে না; ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে কারও দুঃখ কামনা করবে না।

মেত্তঞ্চ সর্বলোকস্মিৎ মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্মাধং অবেরং অসমপত্তং

(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং-৮, ৪৬)।

অর্থাৎ, জগতের উপর দিকে, নিম্নদিকে, তির্যকভাবে সর্বত্র প্রত্যেক জীবের প্রতি ভেদাভেদ মুক্ত, শত্রুতাহীন অপ্রমেয় মৈত্রী পোষণ করবে।

তিট্টং চরং নিসিন্নো বা সযানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্টএঠয্য ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহ।

(মহাস্থবির ও বড়ুয়া, শ্লোক নং-৯, ৪৭)।

অর্থাৎ, স্থিত অবস্থায়, বিচরণ করতে করতে, উপবিষ্ট অবস্থায়, শয়ন অবস্থায়, যতক্ষণ নিদ্রিত হবে না ততক্ষণ এ স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। একে ব্রহ্মবিহার বলে। হৃদয় যাঁর মেত্তার অধীন, তিনি সর্বদা দৃঢ়মনোভাবসম্পন্ন ও দান প্রবণ হন এবং কারও অনিষ্ট সাধন করে না। সুত্রনিপাতে রয়েছে : মেত্তাপরবশ ব্যক্তি মার কর্তৃক বিমোহিত মিত্র ব্যক্তিরও সংসর্গ পরিত্যাগ করেই চলেন (চৌধুরী, শ্লোক নং-১, ১৩)। মৈত্রীর সর্বজনীন ও উদার পথে অগ্রসর ব্যক্তি কালক্রমে প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয়ও জয় করতে পারেন। এরূপ চরিত্রের ব্যক্তি শত্রুকেও মিত্রের মতই ভালোবাসতে সমর্থ হন। নিখিল বিশ্ব, এমনকি, দেবলোকও তাঁর প্রতি নম্র হয়। মিলিন্দ প্রশ্নে রয়েছে : মেত্তা সম্পন্ন ব্যক্তি অকুতোভয়ে চলাচল করতে পারে, কেউ তাঁর ক্ষতি করতে পারে না। এমনকি অগ্নি, বিষ, কিংবা অস্ত্র দ্বারাও মৈত্রী ভাবনাকারীর অনিষ্ট করা সম্ভব হয় না। (মহাস্থবির, ১৬৮-১৭০) বুদ্ধ স্বয়ং বলেন,

“ভিক্ষুগণ! আমি অতীত জন্মে এক সময় সাত বৎসর মাত্র মৈত্রী ভাবনা করে সত্ত্ব মহাকল্প এ কামলোকে জন্মগ্রহণ করিনি। কল্প শেষে আভাস্মর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়েছি। বহুবার ব্রহ্মা থেকে মহাব্রহ্মা, অপরাজিত সর্বদশী ও সর্বশক্তিমান এবং স্বীয় চিন্তকে বশীভূত রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমি ছত্রিশ বার দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছি। বহুশতবার বিনাদেও, বিনাশস্ত্রে পৃথিবী জয়কারী, সত্ত্ববিধ রত্নলাবী, ধার্মিক, ধর্মরাজ চক্রবর্তী রাজা হয়েছি” (স্থবির, ১৫-১৭)

সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্ধক নিকায়ে ইতিবৃত্তক গ্রন্থে রয়েছে : একটি সত্ত্ব বা জীবের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হলেও মহাকুশল বা পুণ্য সম্বিত হয়। পরম্ভ সর্বজীবের প্রতি নিজের প্রিয় সন্তান সদৃশ হিতানুকম্পায় চতুর্দিকে প্রসারিত বহুভাবে অতিশয় অপ্রমেয় মৈত্রী বিতরণে চৌষটি মহাকল্প পর্যন্ত নিজের কৃত কর্মের সুফলে প্রবর্তিত হয়ে প্রবর্তিত হতে সমর্থ এবং পরিশুদ্ধ চিন্ত আর্য়পুদাল শ্রেষ্ঠ পুণ্যে সজ্জিত হতে সফল হন। পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আমি ধর্মার্জনের জন্য যত উপাদান আছে, তা সমস্ত একত্রে মৈত্রীভাবনার ষোল ভাগের এক ভাগ মূল্যেরও নয়। বিমুক্ত চিন্তে মৈত্রী ভাবনাই সকল সীমা অতিক্রম করে প্রভাস্বর, জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বলতর হয় (স্থবির, ২০-২২)। বিশ্বের সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনা করাই হলো মৈত্রী ভাবনা। সকল প্রাণী শত্রুহীন হোক, নীরোগ জীবন-যাপন করুক এবং সুখে অবস্থান করুক-এরূপ মনোভাব পোষণ করাই হলো মৈত্রী ভাবনার মূলমন্ত্র। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৈত্রী ভাবনার মূল অবলম্বন হলো সর্বসত্ত্ব বা সকল প্রাণী। সকল প্রাণীর কল্যাণকামী, সুহৃদ হিসেবে সকল প্রাণীর সুখ, শান্তি কামনাই হলো মৈত্রী। মৈত্রী ভাবনায় হিংসা বা হত্যা এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ মৈত্রী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় তথা মানুষ-প্রাণী নির্বিশেষে সমগ্র জীব-জগতের প্রতি অহিংসা পোষণ ও আত্মভাব পোষণ করাকে বোঝায়। এমতাবস্থায় মানুষে মানুষে ব্যবধান ঘুচে যায় এবং হিংসা-ঘৃণা, দূরীভূত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পৃথিবী হয়ে উঠবে পরিবার; সকল মানুষ একই পরিবারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হবে। পৃথিবীতে তখন বর্ষিত হবে শান্তি, মহাশান্তি, মানবিকতা (বড়ুয়া, ১৬৮)। সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ে অন্তর্গত অনুস্মৃতি বর্ণের

মৈত্রী সূত্রে রয়েছে : ব্যাপাদ ধ্বংসের ক্ষেত্রে মৈত্রীর ক্ষমতা অতুলনীয়। মৈত্রীভাব পোষণকারী ও মৈত্রী ভাবনাকারী ব্যক্তি চিত্তবিমুক্তির মাধ্যমে, জাগরণশীলতা, সম্যক প্রচেষ্টা, মৈত্রী ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা, উত্তমভাবে অনুশীলন বৃদ্ধির দ্বারা একাদশটি (অংগুত্তর নিকায়-৫ম খণ্ড, মূল পালি, ২. অনুসসতি বগ্গো ৬. মেত্ত সুত্তং)। উপকারিতা লাভ বা অর্জন করতে পারে। সেগুলো নিম্নরূপ :

- সুখে নিদ্রা যায়।
- সুখে নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়
- কোনো প্রকার পাপমূলক স্বপ্ন দেখে না।
- মানুষের নিকট প্রিয়ভাজন হয়।
- অমনুষ্যের নিকট প্রিয়ভাজন হয়।
- বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় দেবগণ রক্ষা করেন।
- অগ্নি, বিষ বা অস্ত্র দ্বারা দুঃখ বা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু হতে রক্ষা পায়।
- দ্রুত চিত্ত একাগ্র হয় অর্থাৎ যথাকালে শান্তিময় মৃত্যু হয়।
- মুখচ্ছবি বা মুখ বর্ণ অত্যন্ত প্রসন্ন ও উজ্জ্বল থাকে।
- মৃত্যুতেও দেহাবশেষ প্রদীপ্ত হয় ও সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে। এবং
- মৈত্রী ভাবনাকারী ইহজীবনে অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত না হলেও মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে সুপ্ত বুদ্ধের ন্যায় ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়।

সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদক নিকায়ের প্রতিসম্বিদা মার্গ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ মৈত্রী ভাবনা করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা মৈত্রী ভাবনা করলে চিত্তবিমুক্তির অলঙ্কার, সুসজ্জিত, সুপরিবৃত্ত হয়। ফলে চিত্ত প্রসন্নতা বা প্রশান্তি উৎপন্ন হয়। আলোকিত মানুষ হতে সক্ষম হয়। ক্লেশসমূহ ধ্বংস করা সম্ভব হয় (ইন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য ২০১২, ৩৫৬-৩৬০)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণে মৈত্রী ভাবনা অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। সর্বক্ষেত্রে সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক মানব সমাজ বিনির্মাণে মৈত্রী শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। মৈত্রী ভাবনায় সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এ মৈত্রী ভাবনায় সকল প্রাণীর প্রতি সমতার প্রকাশ পরিস্ফুট হয়েছে। উপর্যুক্ত কারণে মৈত্রী দর্শন দ্বারা বিশ্বশান্তি ও মানবিকতার বিকাশ সম্ভব হয়।

করুণা ভাবনা

‘করুণা’ শব্দটি অন্যের দুঃখ-কষ্ট উপশম করার মহৎ ইচ্ছা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্ব প্রাণীর প্রতি দয়া, কৃপা, পরদুঃখকাতরতা, অনুকম্পা, সহানুভূতি ইত্যাদি শব্দগুলো করুণার পরিপূরক। এরূপ চিত্ত এ করুণার সাথে সহজাত ও সংশ্লিষ্ট হয় বলে তাকে করুণাসহগত চিত্ত বলে অভিহিত করা হয় (ভিক্ষু, ৩০৬)। একজন ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি একজন দুর্গত (দরিদ্র) ও দুরাবস্থাগ্রস্ত (দুঃখী) ব্যক্তিকে দেখে তার প্রতি করুণাপরায়ণ হয়। অনুরূপভাবে তিনি সমস্ত প্রাণীকে করুণার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। অন্যের দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছা এর কৃত্য বা লক্ষণ। করুণার প্রত্যক্ষ শত্রু হলো হিংসা এবং পরোক্ষ শত্রু হলো পরদ্বীকাতরতা। অন্যের দুঃখ দেখে হৃদয় কম্পিত হয় বলে করুণার অপর নাম অনুকম্পা। আত্মপীড়িত পুত্রের প্রতি পিতার যে প্রেম, তদ্রূপ জগতের সমস্ত প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনই হলো করুণা। এ চিত্তবৃত্তি নিষ্ঠুরতাকে

প্রত্যাখ্যান করে। মৈত্রী ভাবনার ন্যায় করুণাকেও একইভাবে প্রবৃদ্ধি করতে হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর রচিত বিসুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে করুণা ভাবনার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন :

“নিষ্করুণ বা নির্ভীক লোকের পরিণাম স্মরণ করে ও শীলের গুণ প্রত্যক্ষ করে করুণা ভাবনা আরম্ভ করবেন। প্রথমে প্রিয় ব্যক্তি, প্রিয় বন্ধু, মধ্যস্থ ও শত্রুকে উপলক্ষ্য না করে যে দুর্গত, দরিদ্র, হস্তচিহ্ন ভিক্ষাপাত্র হস্তে নিত্য অনাথশালায় গমন করে, তথায় তার শয্যা হস্তপাদের বিষাক্ত ক্ষতের যন্ত্রণায় আতর্নাদ করছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে লক্ষ করে করুণা ভাবনা করবেন”(পূর্ণানন্দ ১৯৩৬, ২০৬)।

করুণাসিদ্ধি চিত্ত সর্বপ্রাণির প্রতি করুণা প্রসারিত করে মৈত্রী ভাবনার মত করুণা মন নিয়ে অবস্থান করেন (ব্রহ্মচারী, ৬১, ৬২)। করুণার দুটি দিক আছে। যেমন : একটি হৃদয়বৃত্তি হিসেবে অনুকম্পাবোধ; অন্যটি সেই বোধ হেতু দুর্দশাগ্রস্তের দুঃখ মোচনের প্রবল ইচ্ছা। সাধকের অন্তরে যখন করুণার উদ্রেক হয় তখন স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। তখন তিনি পরহিতার্থে আত্মনিয়োগ করেন। করুণা সাধনা দ্বারা আত্মপার ভেদাভেদ ঘুচে যায় (ব্রহ্মচারী, ৬১, ৬২)। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনে এই করুণাকে আরও সম্প্রসারিত করে মহাকরুণায় উন্নীত করেছে। মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বের সমস্ত চিন্তা, কর্ম, সাধনাই পরার্থে উৎসর্গকৃত। বোধিসত্ত্বের ধর্মজীবন, সাধনা, চরিত্র বিশোধন প্রভৃতি স্বর্গ কিংবা ইন্দ্রতৃ লাভের জন্য নয়, নিজের ভোগ ঐশ্বর্যের জন্যও নয়; বরং সর্বজীবের হিতের জন্য, সুখের জন্য, কল্যাণের জন্য তাঁর ধর্মজীবন, চরিত্র রক্ষা। মহাকরুণার আবেশে বোধিসত্ত্ব সর্বজীবের উদ্ধারব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত উদ্যাপনকল্পে অশেষ দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করেন। এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুষ্ঠাবোধ করেন না। তবু তাঁর মহাকরুণা সাধনা থেকে বিচ্যুত হন না (স্থবির, ২২-২৩)। সাধক করুণা ভাবনার দ্বারা তার স্বার্থপরতা দূরীভূত করে পরহিতার্থে জীবন উৎসর্গ করেন। গুণবান একমাত্র পুত্রের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠী, বাবা বা গৃহস্বামীর যেমন মজ্জাগত প্রেম, মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বেরও সমস্ত জীবজগতের ওপর তেমনি মজ্জাগত প্রেম। বোধিসত্ত্বের এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পই মহাকরুণার নামান্তর (শিক্ষাসমুচ্চয়-১৬)। অন্যকে দুঃখ প্রদান করে আত্মপ্রসাদলাভী ব্যক্তির পক্ষে করুণা ভাবনা করাই সমীচীন (মুৎসুদী, ১৩৯)। নিষ্করুণ বা নির্ভীক লোকের পরিণাম স্মরণ করে ও করুণাশীলের গুণ প্রত্যক্ষ করে ‘করুণা ভাবনা’ আরম্ভ করতে হয়। যেমন, যদি কোনো দুঃশীল ব্যক্তি বহুবিধ পাপানুষ্ঠান দ্বারা নিজেকে নিরয়মুখী করে, কোনো সজ্জন তাকে দেখে চিন্তা করেন যে, ‘অহো! মরণান্তে এ লোকটা কতই অনন্ত দুঃখের ভাগী হবে।’ এরূপে তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করাই হলো করুণা ভাবনার নামান্তর। সাধারণতঃ দুঃশীল ব্যক্তির উপর সুশীল ব্যক্তির করুণা স্বাভাবিক। মৈত্রী ভাবনার ন্যায় করুণাকে যথাক্রমে বৃদ্ধি করে অর্পণা ধ্যান লাভ করতে পারলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অনিবার্য (চৌধুরী, ২৫০, ২৫১)। বিশিষ্ট বৌদ্ধ দর্শন গবেষক ও লেখক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর করুণা ভাবনা সম্পর্কে বলেন :

“দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কিসে দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয়, অহরহ এরূপ চিন্তা করা করুণা ভাবনা”(ঠাকুর, ৯১)।

সর্বজীবের প্রতি করুণা পোষণ করা একান্ত প্রয়োজন। করুণা ভাবনা দ্বারা মনে যে বিহিংসা (পরপীড়ন প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়, তা বর্জন করা সম্ভব হয় (মহাস্থবির, ৭২)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, অপরের দুঃখ-যন্ত্রণা বিনাশের বা অপনোদনের অভিপ্রায়ই করুণা নামে অভিহিত। দুঃখক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ দেখেই করুণা ভাবের উদয় হয়। পরের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করাই হলো করুণার স্বভাব বা লক্ষণ। অন্যের দুঃখে হৃদয় কম্পিত হয় বলে একে আবার

অনুকম্পা হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। সর্বসত্ত্ব দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করুক—এরূপ প্রার্থনাই হলো করুণা ভাবনার মন্ত্র। করুণার বিপরীত হলো মাৎসর্য। করুণার আলম্বন বা বিষয় হলো পরের দুঃখ। মাৎসর্য চিত্ত বা চিন্তা-চেতনাকে সঙ্কুচিত করে, আমিত্ববোধের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে করুণা চিত্তকে প্রসারিত করে, আমিত্ব লোপে সাহায্য করে (বড়ুয়া, ১৬৮)। বিশিষ্ট অভিজ্ঞ দর্শন গবেষক বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী করুণা ভাবনা সম্পর্কে বলেন :

“পরের দুঃখ অপনোদনেচ্ছা “করুণা”। এর আলম্বন পরের দুঃখ; অসহায় অবস্থা। রুগ্ন সন্তানের আরোগ্য কামনা “করুণা” (মুৎসুদ্দী, ২৮৪)।

উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ করুণা হলো চেতনাভিত্তিক। হিংসা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে পরের দুঃখ-কষ্টকে আপনাররূপে গ্রহণ করাই করুণা। করুণার দুটি দিক। একটি অনুভূতি প্রবণতা বা আন্তরিকতাবোধ, অন্যটি হল দুর্গতের দুর্দশা মোচনে ব্যবস্থা করা। একটি চেতনাভিত্তিক করুণা মানুষের মানবীয় গুণাবলীর একটি অন্যতম উপাদান। এটা মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়ক। বিশ্বশান্তি ও মানবিক মানব সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম উপাদান। দয়ার্দ্র হৃদয়ের বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। করুণার কারণে মানুষ একে অন্যের আপদে-বিপদে এগিয়ে আসে। দুর্গত সর্বসত্ত্বের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে। সর্বসত্ত্বকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। এরূপে মানুষের, সমাজের, বিশ্বের প্রতি দায়িত্ববোধের জায়গা তৈরী হয়। যা মানুষের আচরণে দায়িত্বশীলতার শিক্ষা দেয়। এ করুণা ভাবনা সাধককে সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা দেয়। এ ভাবনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা অর্জন করা সম্ভব হয়। এটাকে বুদ্ধের মানবিকতা, মানবতার শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

মুদিতা ভাবনা

অন্যের সুখে সুখানুভব করার নামই হলো মুদিতা ভাবনা। আবার পরের দুঃখ দেখে হৃদয় বিগলিত হওয়া, পরের দুঃখ দূরীকরণে তৎপর হওয়াকে বোঝায়। পরিচ্ছন্ন অন্তরে পরের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণে ভূমিকা নেয়া। এ মুদিতার বৈশিষ্ট্য হলো এটি কর্মভিত্তিক। ব্রহ্মবিহার সাধনার তৃতীয় স্তর হলো মুদিতা। মুদিতা তুষ্ট, হৃষ্ট, আনন্দিতভাব, প্রফুল্লাভাব প্রকাশ করে। পরের সুখ, সমৃদ্ধি সম্পদ, সৌভাগ্য, যশ, ঐশ্বর্য প্রভৃতিতে প্রসন্ন হওয়াই মুদিতা। ঈর্ষা, মাৎসর্যের ধ্বংস সাধন এর কৃত্য। সাধকের ঈর্ষা ও মাৎসর্যহীন মনেই উদার ও শুভ মনোবৃত্তির উদয় হয়। এর ঐকান্তিক অনুশীলনই মুদিতা ভাবনা। এর দ্বারা পরকে আপন করে নেয়া যায়। মৈত্রী, করুণার সঙ্গে বোধিচিন্তে যে ইন্দ্রিয়াতীত অপরিসীম আনন্দ উৎপন্ন হয় তারই নাম মুদিতা। ব্রহ্মবিহারী ব্যক্তি একজন প্রিয় ও মনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দর্শন করে মুদিতাপরায়ণ হন। একইভাবে তিনি সর্ব প্রাণীর প্রতি মুদিতা প্রদর্শন করে। পরের সুখে সুখানুভবকে মুদিতা নামে অভিহিত করা হয়। মুদিতাকর্ম বলতে পরের উন্নতি বা মঙ্গল দর্শনে সহানুভূতিকে বোঝায়। আবার মুদিতাভাব বলতে পরের উন্নতি ও ঐশ্বর্য দেখে সন্তুষ্টি বা আনন্দ লাভ করাকে বোঝায়। এরূপ মন, মানস, অনুভব করাকে মুদিতা চিত্ত বলে। অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি সাম্যভাব মুদিতা নামে অভিহিত (ভিক্ষু, ৩০৭)। অন্যের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ সৌভাগ্যের অনুমোদনই হলো মুদিতার লক্ষণ (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৬)। ঈর্ষা, মাৎসর্যের ধ্বংস সাধন এর কৃত্য। সাধকের ঈর্ষা ও মাৎসর্যহীন মনেই উদার ও শুভ মনোবৃত্তির উদয় হয়। এর ঐকান্তিক অনুশীলনই মুদিতা ভাবনা। এর দ্বারা পরকে আপন করে নেয়া যায়। মৈত্রী, করুণার সঙ্গে বোধিচিন্তে যে ইন্দ্রিয়াতীত অপরিসীম আনন্দ উৎপন্ন হয় তারই নাম মুদিতা। শুধুমাত্র সহানুভূতি প্রকাশ নয়, অন্যের সুখের মধ্যেই নিজে আনন্দ ও সুখ লাভ করাই হলো মুদিতা। মানুষের যখন কোনো প্রকার স্বার্থবোধ থাকে না, শুধুমাত্র তখনই মানুষ পারে

অপরের সুখে সুখী হতে। সাধনার এ স্তরে উন্নীত হতে পারলে তখন নিজের সাথে অন্যের কোন তফাৎ আর থাকে না। আপন-পর একাত্ম চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার নাম হলো মুদিতা (বড়ুয়া ও কান্তি বড়ুয়া, ৯৬)। যে ব্যক্তি প্রথমে হেসে পরে আলাপে রত হয়, সেরূপ ব্যক্তিকে অবলম্বন পূর্বক যে ভাবনা করা হয় তা ‘করণা ভাবনা’ নামে অভিহিত করা হয়। যে ব্যক্তি সুখে নিরুদ্বেগে জীবন-যাপন করছে, তাকে দর্শন করে ‘অহো! এ ব্যক্তি বেশ মননন্দে বাস করছে; অন্যান্য লোকও তার ন্যায় সম্ভ্রষ্টভাবে বাস করুক।’ এরূপে মুদিতা ভাবকে সম্প্রসারিত করে এক এক দিক ব্যাপ্ত করতে হয়। যদি কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি, পরিবার দরিদ্র হয়, সে ব্যক্তি তার পূর্বাবস্থা স্মরণ করে মুদিতা ভাবনা করতে পারে। অথবা যে ব্যক্তি বা পরিবার আবার সম্পদশালী হয়ে ভবিষ্যতে সুখে থাকতে সমর্থ হবে। এরূপ ভবিষ্যৎ ভেবে মুদিতা ভাবনা করা যায়। এ নিয়মে যথাক্রমে প্রিয় ব্যক্তি হতে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিকে পর্যন্ত অনুস্মরণ করে মুদিতা ভাবনাকে বৃদ্ধি করতে হয়। এ ভাবনার মাধ্যমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি সুনিশ্চিত (চৌধুরী, ২৫১)। সাধনমার্গের তৃতীয় স্তর অনাগামী ফল যিনি লাভ করেন তিনি সদানন্দে বিরাজিত। মুদিতা ভাবনার দ্বারা অর্হত ফলে অধিষ্ঠিত হওয়ার পথ সুগম হয়। মুদিতা শুধু সহানুভূতি নয়, একে প্রশংসাসূচক আনন্দও বলা হয়, এর দ্বারা পরম শত্রুর প্রতিও ঈর্ষা ধ্বংস হয়। মৈত্রী ও করুণা সম্প্রসারিত করা যতো সহজ, মুদিতা ভাবনা ততো সহজ নয়। দুঃখীর দুঃখে অনেকের দুঃখানুভূতির প্রকাশ পায়, কিন্তু অন্যের সুখ-সমৃদ্ধি ও পুত্র-কন্যার উন্নতিতে প্রশংসার চেয়ে মানসিক দুঃশিস্তারই প্রতিফলন ঘটে। নিকট আত্মীয়ের উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করলেও শত্রুর ক্ষেত্রে তা হয় না। (Mahathera, 375-376)। উপর্যুক্ত কারণে সাধককে মুদিতা ভাবনার ক্ষেত্রে আরও বীর্যবান ও উদ্যোগী হতে হয়। মুদিতা ভাবনা ব্যক্তিবিশেষ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র প্রাণিজগতের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকে। আত্মপর বা শত্রু মিত্র ভেদাভেদ থাকে না। মুদিতা ভাবাপন্ন ব্রহ্মবিহারীর নিজ স্বার্থপরতা বলতে কিছুই থাকেনা (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৭)। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনে নিরপেক্ষতাকে উপেক্ষা নামে অভিহিত করা হয়। ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাদের সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হোক, এ চিন্তা মুদিতা ভাবনা (ঠাকুর, ৯১)। মুদিতা (সুখীর প্রতি প্রসন্নতা) চিন্তা উৎপাদন করা উচিত। এ মুদিতা ভাবনা বৃদ্ধির মাধ্যমে চিন্তে যে অশান্তি উৎপন্ন হয় তা ধ্বংস করা যায় (মহাস্থবির, ৭২)। সর্বসত্ত্ব যথালব্ধ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক—এটাই হলো মুদিতা ভাবনার মন্ত্র। ঈর্ষা হলো মুদিতার প্রতিপক্ষ। ঈর্ষা রাক্ষসী, মুদিতা দেবী (বড়ুয়া, ১৬৮)। বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষক শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী মুদিতা সম্পর্কে বলেন :

“পরের সুখ-সম্পদ অনুমোদন করাই হলো “মুদিতা”। যুবক পুত্রের যৌবনাবস্থার চিরস্থিতি কামনা “মুদিত” (মুৎসুদ্দী, ২৮৪)।

মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির পক্ষে মুদিতা ভাবনা বিশেষ উপকারী (মুৎসুদ্দী, ১৩৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ মুদিতা ভাবনা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বার্থান্ধতা দূরীভূত করতে সাহায্য করে। আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষমতা প্রদর্শনে নিরুৎসাহিত করে। অন্যের স্বার্থ সংরক্ষণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এ মুদিতা ভাবনা। মাৎসর্য নির্মূলে সাহায্য করে। ঈর্ষার বিলুপ্তি ঘটায়। অন্যের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করলে শাস্তি বিঘ্নিত হয়। এ ভাবনা অন্যের স্বার্থে আঘাত করাকে, হিংসা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। বরং অন্যের সুখ দেখে ঈর্ষাকাতর না হয়ে সমসুখী হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। ফলে সর্বক্ষেত্রে শান্তি বিরাজ করে। এ ভাবনা উদার হতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ভাবনা বর্তমান সমাজ প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপেক্ষা ভাবনা :

বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শনের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ স্তর হলো উপেক্ষা ভাবনা। পালিতে উপেক্ষা যা বাংলায় হয় উপেক্ষা। সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয়-উপ+ইক্খা+ উপেক্ষা। এখানে ‘উপ’ অর্থে যথার্থতা, নিরপেক্ষতা এবং যুক্তিযুক্ততা প্রভৃতি ভাবের দ্যোতনা করে। ‘ইক্খা’ অর্থে বোঝায় দর্শন করা, নিরীক্ষণ করা এবং উপলব্ধি করা। বস্তুতঃ উপেক্ষা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো যথাযথ নিরীক্ষণের মাধ্যমে সঠিক উপলব্ধি অথবা নিরপেক্ষ দর্শন যা হবে কোনো প্রকার আসক্তি বা বিরক্তিরহীন, কোনো প্রকার আনুকল্যতা বা প্রতিকূলতা থেকে মুক্ত (বড়ুয়া সম্পাদিত, ৯৬)। ‘উপেক্ষা’ শব্দটি বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষ অর্থে প্রযোজ্য। উপেক্ষা শব্দের অর্থ হলো নিরপেক্ষভাব। সুখও নয়, দুঃখও নয় এরূপ মধ্যস্থতাবই উপেক্ষা। এটা মনের, চিত্তের নিরপেক্ষভাব কিংবা সাম্যভাবও বলা যায়। প্রিয়ও নয়, অপ্রিয়ও নয় এমন একজন ব্যক্তিকে দেখে মনে আনন্দ কিংবা বিষাদ কোনোটিরই সঞ্চরণ হয় না (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৭)। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, চিত্তের সাম্যাবস্থাই উপেক্ষা নামে অভিহিত। চিত্তের সাম্যাবস্থাকে (সুখ, দুঃখ, সর্বাবস্থায় অভিন্ন অনুভূতিকে) উপেক্ষা বলে। এটা হলো লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। উপেক্ষা ভাবনার প্রভাবে লোভ ও দ্বেষ ধ্বংস হয়। নিরপেক্ষ ভাব এর লক্ষণ। তিনি অষ্টলোকধর্মে মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখেন। সমাধিপ্রবণ মন মধ্যম মার্গ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে) অবলম্বন, অনুশীলন দ্বারা উপেক্ষাভাবে উন্নীত হয়। এর উৎপত্তি, প্রবৃদ্ধি এবং ভাবনায় পূর্ণতার জন্য বস্তু ও প্রাণীর প্রতি উপেক্ষাভাব পোষণ। চিত্তের অনুদ্রত অবস্থাকে “উপেক্ষা: নামে অভিহিত করা হয়। এরূপ অবস্থার সুগঠনই উপেক্ষা ভাবনা। আত্মনির্ভরক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্ধিগতা “উপেক্ষা”। কর্ম স্বকীয়তা জ্ঞানই চিত্তের “উপেক্ষা” উৎপাদক (মুৎসুদী, ২৮৪)। সূত্রপিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায় রয়েছে : উপেক্ষা বা সর্বাবস্থায় সমভাব পোষণ একটি উচ্চতাবের সর্বোচ্চ ক্রম। এ সোপানের প্রথম ধাপই মেত্তা বা সর্বপ্রাণীর প্রতি হিতভাব পোষণ করা। কালক্রমে এই ভাবই উন্নীত হয় করুণায়। করুণা থেকে উন্নীত হয় মুদিতা বা নিঃস্বার্থ প্রেম। এ মুদিতা ভাবের ক্রমোন্নত অবস্থার নামই হলো উপেক্ষা (উপেক্ষা) (অঙ্গুত্তর নিকায়, ১ম ও ৩য় খণ্ড, মূল পালি)। ব্রহ্মবিহার সাধনার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর উপেক্ষা। এ স্তরে উপনীত মানুষের নিজের ব্যক্তিগত কোনোরূপ ইচ্ছা বা বাসনা থাকে না। তাই এ স্তরকে উপেক্ষা বলা হয়েছে। উপেক্ষা বলতে সাধারণত লোভ-দ্বেষ-মোহ বর্জিত নিরপেক্ষতাকে বোঝায়। এ নিরপেক্ষতা হলো আপন সাধনা ও চর্চার কারণে অর্জিত এক স্বভাব বৈশিষ্ট্য যা চিত্তকে মানুষের কল্যাণে স্থিত রাখে। নিন্দা-প্রশংসা, লাভ-ক্ষতি, যশ-অযশ, সুখ-দুঃখ এ অষ্টলোক ধর্মের কোনো বিষয়ে আকর্ষণ ও চঞ্চলতা হেতু চিত্তকে বিচলিত করতে পারে না। উপেক্ষার প্রতিপক্ষ হলো লোভ। লোভ ও হিংসা পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হলেই “উপেক্ষা” বোধ অন্তরে জাগ্রত হয় (বড়ুয়া ও কান্তি বড়ুয়া, ৯৬)। উপর্যুক্ত কারণে ভাবনার সমস্ত সুফল উপেক্ষা ধ্যানের আওতাধীন (বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া, ১৩৮)। অত্যধিক কামাসক্ত, তৃষ্ণা পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষা দর্শন অনুশীলন করা বিশেষ উপকারী (মুৎসুদী, ১৩৯)। বিশ্বের মধ্যে সকল জীবই সমান। কোনো প্রাণী অপর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার নয়। দ্বেষ-মমতা, ধনী-দরিদ্র, যশ-অযশ, জরা-যৌবন, সুন্দর-অসুন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থায়ই সমান-এরূপ সাম্য ভাবনাই উপেক্ষা ভাবনা বলে অভিহিত। প্রত্যেক কার্যের সাথে পূর্ববর্তী কার্যের কারণ (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) নিহিত-এই তত্ত্বের স্বীকৃতিকেই প্রতীত্য সমুৎপাদ বলে। বিশিষ্ট বৌদ্ধ চিন্তাবিদ অধ্যাপক ভিক্ষু জে, প্রজ্ঞাবংশ খের উপেক্ষা ভাবনা সম্পর্কে বলেন :

“কোনো উত্তাল তরঙ্গমালা যেমন ভাঙতে পারে না অতলান্ত সমুদ্রের তলদেশের অপার শান্তি; স্তব্ধ নিখরতা তেমন অচঞ্চল হতে হবে উপেক্ষা পারমীর অনুশীলনকারীকে” (বুড়িয়া সম্পাদিত, ৯৬)।

উপেক্ষা পারমী সাধককে ভোগাকাজক্ষা, ঘৃণা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি নিন্দ প্রবৃত্তির বিষয় পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। সব সময় উপেক্ষা চিন্তে বসবাস করা সমীচিন। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, উপেক্ষা ভাবনা করা একান্ত কর্তব্য। এ উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা মানুষের যে প্রতিঘ (প্রতিহিংসা বৃত্তি) রয়েছে, তা ধ্বংস করা সম্ভব হয় (মহাস্থবির, ৭২)। লীন ও উদ্ধত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাই হলো উপেক্ষার নামান্তর। অষ্টলোকধর্ম (স্থবির ও বুড়িয়া, খুদ্ধক পাঠো, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি) মনকে আবিষ্ট করে। এ অষ্টলোক ধর্মে জগৎ আবর্তিত হয়। সাধারণ মানুষ এ লোক ধর্মে বশীভূত হওয়ার কারণে তাদের সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান মানুষ এ অষ্টলোক ধর্মকে অনিত্য, দুঃখ ও বিপরিনামদর্শী হিসেবে গ্রহণ করে এগুলোতে কম্পিত বা বশীভূত হয় না (বুড়িয়া, ১৫৮, ১৫৯)। উপেক্ষা পারমীর অনুশীলন বিষয়ের স্বরূপ নির্ধারণে মহামঙ্গল সূত্রের শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন :

ফুট্টসুস লোক ধম্মেহি চিত্তং যসুস ন কম্পতি,

অসোকং বিরজং খেমং এতং মংগল মুত্তমং (খুদ্ধকপাঠো, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি)।

অর্থাৎ, লোকধর্মে চিত্ত স্বভাবতই প্রকম্পিত হয়। কিন্তু যাঁরা সে লোকধর্মে সর্বদা অকম্পিত বা স্থির ব্যক্তি কখনো শোকগ্রস্ত হয় না। তাঁরা ক্লিষ্ট না করে স্থায়ী চিত্তকে রাখেন বিরজ বিমল এবং ক্ষমাশীল চরিত্রের অধিকারী হন তাতেই উত্তম মঙ্গল হয়। লোকধর্ম বলতে লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখকে বোঝায়। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে এ চারটি বিপরীত যুগ্মকেই অষ্টলোকধর্ম হিসেবে অভিহিত করা হয়। মনের স্থিরতা বা সমভাবই হলো উপেক্ষা। কর্মে স্বকীয়তা জ্ঞানই চিত্তের উপেক্ষা উৎপাদক। কর্মই মানুষের বন্ধু বা স্বকীয়-এটাই উপেক্ষা ভাবনার মন্ত্র। সমভাব অবস্থা এর আলম্বন। উপমানুসারে জননীর পক্ষে শিশুপুত্রের যৌবনাবস্থার চিরস্থিতি কামনা-উপেক্ষা হিসেবে বিবেচিত। আত্ম-নির্ভরক্ষম উপযুক্ত পুত্রের জন্য নিরুদ্বেগতা-উপেক্ষা (বুড়িয়া, ১৬৯)। চিত্তের সাম্যাবস্থাকে (সুখ, দুঃখ, সর্ববস্থায় অভিন্ন অনুভূতিকে) উপেক্ষা বলে। এটা হলো লোভ ও দ্বেষ বর্জিত নিরপেক্ষ দর্শন। এটা মনের সাম্যাবস্থা। লোভ ও দ্বেষ উপেক্ষা দ্বারা ধ্বংস হয়। তিনি অষ্টলোক ধর্মে মনের সাম্যাবস্থা বজায় রাখেন। সমাধি প্রবণ মন মধ্যম মার্গ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে) অবলম্বন, অনুশীলন দ্বারা উপেক্ষা দর্শনে উন্নীত হয়। এর উৎপত্তি, প্রবৃদ্ধি এবং ভাবনায় পূর্ণতার জন্য বস্তু ও প্রাণীর প্রতি উপেক্ষাভাব পোষণ। নিম্নোক্ত চারটি (ভিক্ষু ও থের, ৫২) বিষয় দ্বারা উপেক্ষাভাবের জাগরণ ত্বরান্বিত হতে পারে। যেমন :

- প্রাণীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষাভাব, উন্নতি বিচার শক্তি ও অনুভূতির ভাব
- বস্তুর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা
- নিজের বা স্বামীর প্রতি বিরাগ বা উপেক্ষা
- দাষ্টিক বা স্বার্থপর ব্যক্তি বর্জন দ্বারা।

এরূপ ব্যক্তি স্থায়ী ব্যবহার দ্রব্য কাকেও দিতে চায় না। কেউ কিছু চাইলে দিতে অপারগতা প্রকাশ বা কার্পণ্যবোধ করে ও বিমুখ করে থাকে। এ জাতীয় সঙ্গ পরিত্যাজ্য। কারণ এতে উপেক্ষা ভাবের পরিহানি হয়ে থাকে। উপেক্ষা চিত্তের একাগ্রতা, লীনতা ও উত্তেজনার সমতারক্ষা পূর্বক সমোধি উৎপাদনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। আলম্বনের প্রতি নিরপেক্ষতা এবং বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানকে বোঝায়। এ অর্থে উপেক্ষা জ্ঞান সম্প্রযুক্ত শোভন চিত্তের উপেক্ষা। এখানে উপেক্ষা

অর্থে তত্রমধ্যস্থতাকেও বুঝায়। এটা কোনো বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট মোহ, স্বাদ, বিষাদে চিত্তকে নিরপেক্ষ রাখে (বড়ুয়া, ২৯,৩০, ১০৪) পাঁচটি (মহাস্থবির, ১৮১)।

- সত্ত্ব মধ্যস্থতা,
- সংস্কার মধ্যস্থতা
- সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তিকে পরিবর্তন
- সত্ত্ব ও সংস্কারের প্রতিউদাসীন ব্যক্তির সংসর্গ এবং
- উপেক্ষা সম্বোধ্য উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা।

বুদ্ধ বলেন, এখানে সাধক সর্বপ্রকার দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌম্য-দৌর্ম্য (মনের হর্ষ-বিষাদ) দূর করে। না-দুঃখ, না-সুখ, উপেক্ষা ও স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিত্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে এরূপ অবস্থাকে বলা হয় নিরামিষ উপেক্ষা (ভিক্ষু, ৩৫৩,৩৫৪)। একজন সাধক যখন আনন্দ ও বেদনায় কোনো প্রকার সুখ-দুঃখ অনুভব করে না অর্থাৎ সুখে যেমন আনন্দ প্রকাশ করেন না আবার দুঃখ যন্ত্রণায়ও কাতর না হয়ে দুঃখমুক্তির প্রচেষ্টাকে ধ্যান-জ্ঞান করে সাধনার চতুর্থ ধ্যান স্তরে উন্নীত হয়ে জ্ঞান অর্জনকেই মূলত উপেক্ষা বোঝানো হয়েছে। অষ্টলোকধর্মকে সমভাবে গ্রহণ করে যোগীমনের সাম্যাবস্থিতি উপেক্ষা। এ উদারভাব চতুষ্ঠয়কে অবলম্বন করে যে সাধনা করা হয় তা অগ্রমেয় ভাবনা নামে অভিহিত (ব্রহ্মচারী, ৯১)। ধর্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। চেষ্টা করে সাধনা করে সে স্বভাবকে লাভ করতে হবে। মানুষ শ্রেষ্ঠ এ স্বভাব দ্বারা মানবিক ধর্মে অধিষ্ঠিত হয়। মানুষ অন্তরে বাইরে অনুভব করে-সে একটা নিখিলের মধ্যে আছে। সে নিখিলের সঙ্গে সচেতন সচেষ্ট যোগ সাধনের দ্বারাই সে আপনাকে সত্য করে জানতে থাকে। বিশ্বের সঙ্গে, বিশ্ব মানবের মানবাত্মার তখন এক যোগসূত্র রচিত হয়। তখন স্বাভাবিক গতিতেই সে সকলকে মিত্র জেনে সকলের মঙ্গল কামনা করতে পারে। এটাই হলো মানুষের মহৎ স্বরূপের ধর্ম, সত্য স্বরূপের ধর্ম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন:

“সত্যের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তাঁরই ধর্ম, মানুষের মধ্যে যে মহৎ, গুণী তাঁরই ধর্ম” (জানা, ১৩৯)।

সকল জীব সুখী হোক, দুঃখ থেকে প্রমুক্ত হোক এভাবে সেই মানবিক স্বভাব থেকেই উদ্ভূত হয়। তিনি আরো বলেছেন-“মানুষের ধর্ম, শ্রেষ্ঠ মানব-স্বরূপের ধর্ম।” জগৎব্যাপী মৈত্রী, প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে ত্যাগ, নির্বাপিত করতে হয়, এ শিক্ষা দিতে বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন দ্বারা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। প্রেমের দ্বারা সকল সম্পর্ক সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্পর্ক ছিন্ন হয় না (বড়ুয়া, ১২৫)। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা ভাবনার মাধ্যমে তৃতীয় ধ্যান লাভ হয়। উপেক্ষা ভাবনা দ্বারা চতুর্থ ধ্যান লাভ হয় (বড়ুয়া, ৮৭)। জীবের হিত-সুখ কামনা, পর-দুঃখ দূর করার ইচ্ছা, পরের সুখ সম্পদ অনুমোদন ও চিত্তের অনুদ্রুতাবস্থা গঠন, মানব ধর্মও বটে (চৌধুরী, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২)। উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব বা চতুর্দিকে সমস্ত জগৎ ব্যাপী বিশ্বশান্তির জন্যে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষাপূর্ণ চিত্ত দ্বারা মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা বা বিনির্মাণ করা উচিত। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনার ফলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার দৈনন্দিন জীবনের সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। মৈত্রী হলো সর্বজীবের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম বা ভালোবাসা। অন্যের দুঃখে কাতর হওয়ার নামই করুণা নামে বিবেচিত। সর্বজীবে দয়াকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অপরের সুখে সুখী হওয়াই হলো মুদিতা। সকল জীবের মধ্যে সাম্যভাব বা মধ্যস্থতা ভাবের উত্তরণই উপেক্ষা। এতে সাধকের মন সুখ-দুঃখের অতীত এমন এক অবস্থায় নিবিষ্ট হয় যাতে দুঃখের অনুশোচনা ও সুখের আতিশয্য কোনোটাই পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা শূন্যতা বা ইংরেজি পয়েন্টকে উপেক্ষা

বলে। জীব-জগতকে নিয়েই সাধককে এ চার প্রকার ভাবনা করতে হয়। কোনো লোকের ভালো-মন্দ অবস্থা পরিজ্ঞাত হয়ে তাদের সুখে-দুঃখে চঞ্চল না হয়ে ও চিন্তের শান্ত-ভাবালম্বনে উপেক্ষা ফল প্রত্যক্ষ করে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করাই মধ্যস্থ ব্যক্তির লক্ষণ। সর্বদা উপেক্ষাভাব প্রদর্শনে উপেক্ষা ভাবকে জাগ্রত করতে হয়। মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখে উপেক্ষা ভাবে থাকলে উপেক্ষা ভাবের বিকাশ ঘটে। যে কারণে শত্রুও নয়, মিত্রও নয়, এমন ব্যক্তিকে অবলম্বন করে উপেক্ষার সঞ্চয় করা সমীচীন। উপেক্ষার লক্ষণ হলো নিরপেক্ষতা। সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি অদুঃখ-অসুখ বেদনা। এটা কায়িক উপেক্ষা। মানসিক সুখ-দুঃখহীন বেদনাও চিন্তাজ উপেক্ষা। কুশল চৈতন্যিক হিসাবে বোধ্যঙ্গের উপেক্ষা। ব্রহ্মবিহারের উপেক্ষা ও সংস্কারোপেক্ষা জ্ঞানজ, বেদনাজ নয় (চৌধুরী, ২৫১, ২৫২)। বিশিষ্ট বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ ও লেখক আচার্য শান্তিদেব বলেন:

“এই দুঃখময় পৃথিবীতে সুখোৎসব সৃষ্টি করিতে হইলে ইহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নানা দেশ, নানা জাতি বা নানা জনরূপে না দেখিয়া এক অখণ্ড পৃথিবী বা প্রাণিলোক হিসাবেই দেখিতে হইবে। দুঃখকে আমার দুঃখ, তাহার দুঃখ, এ জাতির দুঃখ, এ দেশের দুঃখ-এভাবে বিচ্ছিন্ন না দেখিয়া এক অখণ্ড দুঃখরূপে দেখিয়াই তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। নচেৎ পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর হইবে না। মোহ-মুগ্ধ জনগণ নিজ নিজ খণ্ড খণ্ড সুখ আহরণের চেষ্টায় একে অন্যকে দুঃখ দিয়া প্রত্যেকেই ঘোর দুঃখ আহরণ করিতেছেন” (স্থবির, ১১)।

উপর্যুক্ত কারণে জাগ্রত ও উন্নত জীবন গঠনের জন্য মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা-এ চার প্রকার ব্রহ্মবিহার ভাবনা চর্চা করা প্রত্যেক নরনারীর জীবনে একান্ত অপরিহার্য। ব্যক্তি জীবন তথা সমাজ জীবন পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে ব্রহ্মবিহারের অনুশীলন করতে হবে। বাদ-বিসংবাদ, ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শ্রেণী-সংঘর্ষের পরিসমাপ্তিও ঘটতে পারে একমাত্র ব্রহ্মবিহার সাধনার মাধ্যমে। মানসিক উৎকর্ষ ব্যতীত প্রকৃত শান্তি আসে না। এ সাধনপ্রণালী ব্যক্তি জীবনকে পরিশীলিত করে তা ক্রমশ সমাজজীবনে প্রতিফলিত করতে পারলেই বিশ্বশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কারণ লোভ, দ্বেষ, মোহকে অস্ত্রের আঘাতে কিংবা শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে প্রশমিত করা যায় না। এটি ক্ষণিক সমাধান। একমাত্র ব্রহ্মবিহারের অনুশীলনের মাধ্যমেই মানব সমাজকে অটুট ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। ব্রহ্মবিহার ভাবনা স্থান, কাল পাত্রের উর্ধ্বে সর্বজনীন সাধন প্রণালী (মুৎসুদী, ১৩৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এ চতুর্বিধ অগ্রমেয় ভাবনার অন্য নাম বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার ভাবনা। ব্রহ্ম শব্দ শ্রেষ্ঠার্থ বাচক। যেমন ব্রহ্মচারী। এ ব্রহ্ম বা শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন করা সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। এ ব্রহ্মবিহার ভাবনা জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রত্যেক মানুষের জন্যেই অব্যাহত। ইচ্ছে করলে যে কোনো ব্যক্তি এরূপ ভাবনা করতে পারে। এ বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বিশ্বশান্তি ও মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে। এ চার প্রকার ভাবনা করলে বিশ্বে আর কোনো প্রকার অশান্তি থাকবে না।

উপসংহার

উপর্যুক্ত কারণে বলা যায় যে, বিশ্বশান্তি ও মানবিকতা বিকাশের একমাত্র পন্থা বৌদ্ধ ব্রহ্মবিহার দর্শন বা ভাবনা। উৎকৃষ্ট ও শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের মূলমন্ত্র হলো এ অগ্রমেয় ভাবনা। বুদ্ধের সমগ্র জীবন মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, ক্ষান্তিময়, ত্যাগময় মন্ত্রে অনুপ্রাণিত এবং মানুষের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, কল্যাণ, মানবিকতা প্রসারের ইতিহাস। ব্যক্তি পর্যায়ে মৈত্রী তথা ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলন করলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবিক বিশ্ব বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হয়। বুদ্ধ ছিলেন মানবতাবাদী মহান পুরুষ। তাঁর হৃদয় ছিলো মানবতার গুণে ভাস্বর। মানবপ্রেম ছিলো তাঁর সহজাত বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বের সমগ্র মানব জাতি তথা প্রাণী জগতের সুখ, শান্তি, মঙ্গলের জন্যে বুদ্ধ উপদিষ্ট ব্রহ্মবিহার অনুশীলন করা প্রয়োজন। তিনি মানবকল্যাণমূলক, সাম্যভিত্তিক, অহিংসার ভিত্তিতে মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা, মানবিক, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানুষের চির শান্তির প্রয়াসে এ ব্রহ্মবিহার ভাবনার উপদেশ প্রদান করেন। এ ব্রহ্মবিহার দর্শন বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণের এক অনন্য প্রয়াস। ব্রহ্মবিহার ভাবনা অনুশীলনের দ্বারা অমানবিকতা, অনৈতিকতা, বিদ্বেষ পরিহার করা গেলে মানবিক ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে। এ ব্রহ্মবিহার অনুশীলনের মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তিও অর্জন করা সম্ভব হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. বুদ্ধঘোষ, ভদন্তাচারিয় রচিত, ভিক্ষু, জ্ঞানশাস্ত্র অনূদিত, *বিভুদ্বিমার্গ (বিসুদ্ধিমার্গ)*, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ৮ জানুয়ারি, ২০১৭।
২. মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাদার অনূদিত, *ধর্মপদ*, কলকাতা, ১৯৫৪।
৩. বড়ুয়া, জিতেন্দ্রলাল, *বৌদ্ধধর্মের কর্মবাদ বনাম সৃষ্টি রহস্য*, কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ঢাকা ২০০০।
৪. গুপ্ত, শ্রীশান্তিকুসুম দাশ, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।
৫. বড়ুয়া, প্রফেসর ড. সুমঙ্গল, বড়ুয়া, ড. বেলু রানী, *বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১০।
৬. ‘মেত্তাচিত্ত্তি’ মিজ্জতীতি মেত্তা, সিনিয়হতীতি অথৈখা। মিত্তে ভবা, মিত্তস বা এস পবত্তীতিপি মেত্তা। লক্খণাদিতো পন হিতাকারপ্পবত্তিলক্খণা, হিতপসংহাররসা, আঘাত বিনয়পচ্চপট্টানা, সত্তানং মনাপভাবদসসন পদট্টানা। ব্যাপাদ্পসমো এতিস্স সম্পত্তি, সিনেহসম্মবো বিপত্তি। সা এতস্স অথ্থীতি মেত্তচিত্ত্তং (ইতিবুত্তক, মূল পালি)।
৭. মহাস্থবির, শান্তরক্ষিত, *বৌদ্ধ সাধনা নীতি*, চট্টগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৫ শে জুলাই ২০১০।
৮. বড়ুয়া, ড. সুকোমল ও বড়ুয়া, সুমন কান্তি, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০০।
৯. মুৎসুদ্দী, শ্রীবীরেন্দ্রলাল অনূদিত ও সম্পাদিত, *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম*, চট্টগ্রাম, ১৮ জুলাই ১৯৪০।
১০. ভিক্ষু, শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় অনূদিত, *অভিধর্ম পিটকে বিভঙ্গ*, চট্টগ্রাম, ২০ শে জুলাই ২০১২।
১১. মহাস্থবির, শ্রীধর্মজ্যোতি ও বড়ুয়া, শ্রীনীলাম্বর অনূদিত, *খুদ্ধকপাঠো* (মূল, অশ্বয় ও অনুবাদ), পালি বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ১২, হেমসেন লেন, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে, ১৯৮৭।
১২. অহং অবের হোমি, অবাপজ্জ হোমি, অনীঘা হোমি, সুখী অভানং, পারিহরোমি, অহং বিয় ময়হং আচরিয়ো, উপাজ্জায়, মাতা পিতরো হিতো সত্তা, মজ্জভিকো সত্তা, বেরী সত্তা, অবের হোম্ম, সুখী অভানং, পরিহরন্ত দুকখমুগ্গন্ত যথালদ্ধা সম্পত্তিত্তো মা বিগচ্ছন্ত কম্মস্সকা (থেরো ভদন্ত ধর্মতিলক ও মুৎসুদ্দী, বীরেন্দ্র অনূদিত, *সদ্ধর্ম রত্নাকর*, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৩৬।
১৩. ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ, *বৌদ্ধধর্ম*, করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৫।
১৪. “ভীতাশ্চ নির্ভয়াঃ সন্ত, শোকাতার প্রীতি লাভিনঃ

উদ্বিগ্নাশ্চ নিরুদ্বেগ, বুদ্ধিমত্তা ভবন্ত চ।” বোধিচর্যাবতার

১৫. “আরোগ্যাং রাখিনা মন্ত সচ্যুতাং সর্ববন্ধনাং,
দুর্বলা বলিনঃ মন্ত শ্লিষ্টচিত্তার পরম্পরং।” বোধিচর্যাবতার

১৬. স্থবির, জ্যোতি:পাল অনূদিত, দেব, আচার্য্য শান্তি দেব বিরচিত, বোধিচর্যাবতার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৭৭।

১৭. সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, চুচুড়া, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫।

১৮. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা, জেতবন বিহার পরিষদ, বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনা ট্রাস্ট, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪।

১৯. চৌধুরী, সুকোমল, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলিকাতা ৭০০০৭৩ : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।

২০. মহাস্থবির, পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার অনূদিত, মধ্যম নিকায়, (দ্বিতীয় ভাগ), বৌদ্ধ ধর্মাস্কুর বিহার, ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, ১৯৫৬, (তাইওয়ান প্রিন্ট)।

২১. বড়ুয়া, ডাঃ সিতাংশু বিকাশ সম্পাদিত, দশ পারমী ও চরিত্রা পিটক (সানুবাদ), শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাস্থবির, মৈত্রী পারমী [প্রবন্ধ], চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৮।

২২. শীলভদ্র, ভিক্ষু অনূদিত, দীঘ নিকায় [অখণ্ড], (কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭।

২৩. বড়ুয়া, শ্রীবেণীমাধব অনূদিত, মধ্যম নিকায়, মূল পঞ্চাশ সূত্র, (কলিকাতা: ১০৬এ, চরকডাঙ্গা রোড, ১৯৪০ খ্রি. (তাইওয়ান প্রিন্টিং)।

২৪. সাধনকমল চৌধুরী অনূদিত, বিশুদ্ধ সূত্রনিপাত, করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন-১৪০৯।

২৫. মহাস্থবির, পণ্ডিত ধর্মাধার অনূদিত, মিলিন্দ প্রশ্ন, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ৫০-টি/১সি, পটারি রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ তৃতীয় প্রকাশ ১৯৯৫।

২৬. ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির অনূদিত, সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্ধকনিকায়ের চতুর্থ গ্রন্থ, ইতিবৃত্তক, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি, ১৪ই এপ্রিল, ২০১২।

২৭. বড়ুয়া, সুদর্শন, ত্রিপিটক-সংক্ষিপ্তাকার, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ২৭শে জুলাই ১৯৯৯।

২৮. ১. সুখং সুপতি। ২. সুখং পটিবজ্জতি। ৩. ন পাপকং সুপিনং পস্‌সতি। ৪. মনুস্সানং পিয়ো হোতি। ৫. অমনুস্সানং পিয়ো হোতি। ৬. দেবতা রক্‌খতি। ৭. নাস্স অগ্গিং বা বিসং বা সথ্‌থং বা কমতি। ৮. তুবট্টং চিত্তং সমাধিয়তি। ৯. মুখবল্লো বিপ্পসীদতি। ১০. অসংমূঢ়ো কালং করোতি। ১১. উত্তরিং অঙ্গটিবিজ্জন্তো ব্রহ্মলোকুপগো হোতি (অংগুত্তর নিকায়-৫ম খণ্ড, মূল পালি, ২. অনুস্‌সতি বগ্‌গো ৬. মেত্ত সুত্তং)।

২৯. ভদন্ত ইন্দ্রগুপ্ত ও অন্যান্য অনূদিত, প্রতিসম্ভিদামার্গ, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ৮ই জানুয়ারি ২০১২।

৩০. পূর্ণানন্দ, শ্রমণ অনূদিত, বিশুদ্ধিমার্গ, কলিকাতা, ১৯৩৬।

৩১. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, বিশুদ্ধিমার্গ পরিক্রমা, জেতবন বিহার পরিষদ, বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনা ট্রাস্ট, দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪।

৩২. যথাপি নাম শ্রেষ্ঠিনো বা গৃহপতে একপুত্রকে,

গুণবতি মজ্জাগতং প্রেম, এবমেব মহাকরুণা।

পতিলঙ্কসা সর্বসত্তেসু মজ্জাগতং প্রেমতি (শিক্ষাসমুচ্চয়-১৬)।

৩৩. মুৎসুদ্দী, শ্রীবীরেন্দ্রলাল অনূদিত ও সম্পাদিত, অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম, ১৮ জুলাই ১৯৪০।

৩৪. বড়ুয়া, ড. সুকোমল ও বড়ুয়া, সুমন কান্তি, ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০০।

৩৫. Narada Mahathera, *The Buddha and His Teachings*, Colombo, 1963

৩৬. ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া সম্পাদিত, দশ পারমী ও চরিত্র পিটক (সানুবাদ), অধ্যাপক ভিক্ষু জে, প্রজ্ঞাবংশ, উপেক্ষা পারমী [প্রবন্ধ], চট্টগ্রাম, প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৮।

৩৭. অঙ্গুর নিকায়, ১ম খন্ড ও ৩য় খন্ড, মূল পালি।

৩৮. লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এগুলোকে একত্রে অষ্টলোকধর্ম বলে (খুদ্ধকপাঠো, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি)।

৩৯. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, অঙ্গুর-নিকায়, [চতুর্থ খণ্ড], (সপ্তম, অষ্টম, নবম নিপাত), বনভন্তে প্রকাশনী, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি, প্রথম প্রকাশ : ২০০৫।

৪০. খুদ্ধকপাঠো, মঙ্গল সুত্তং, মূল পালি।

৪১. ভিক্ষু, শ্রীমৎ বুদ্ধবংশ অনূদিত ও থের, শ্রীমৎ তিলোকাবংশ সম্পাদিত, অভিধর্ম পিটকে সঙ্গায়ন-প্রশ্ন, প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ৩০শে মে, ২০১১।

৪২. মহাস্থবির, রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির সংকলিত ও অনূদিত, মহাপরিব্রাজক সুত্তং অর্থাৎ তথাগতের অস্তিত্বাবদান, চট্টগ্রাম, ৮ জুলাই, ১৯৪১।

৪৩. ভিক্ষু, শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় অনূদিত, সূত্রপিটকে সংযুক্ত নিকায়, চতুর্থ খন্ড, ষড়ায়তন বর্গ, (রাঙামাটি: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২৯শে মে, ২০১৮

৪৪. ব্রহ্মচারী, শ্রীশীলানন্দ, অভিধর্ম-দর্পণ, অখণ্ড সংস্করণ, মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাস্টি বোর্ড, পি৬৮, বসুনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলিকাতা ১৩৯৮ বাংলা।

৪৫. অধ্যাপক রাধারমণ, জানা, পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮৫।

৪৬. বড়ুয়া, শ্রীসুধাংশু বিমল, রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি, সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, কার্তিক : ১৩৯৫।

৪৭. বড়ুয়া, শ্রী মহিম চন্দ্র অনূদিত, বিমুক্তিমার্গ, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮।

শেখ সাদির কাব্য-দর্শন

ড. আব্দুল করিম*

প্রতিপাদ্যসার

ফারসি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ নৈতিক কবি হলেন শেখ সাদি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সাধক, দার্শনিক, পর্যটক, নীতিমূলক রচনার শিক্ষক এবং রাজনীতি ও প্রশাসনের পথ প্রদর্শক। তাঁর রচিত বোস্তান, গুলিস্তান, গাজালিয়াতে সাদি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থসমূহ তাঁকে অমর করে রেখেছে। বিশেষ করে বোস্তান কাব্যগ্রন্থটি নৈতিক গ্রন্থের মডেল হিসেবে সারা বিশ্বের সাহিত্যিকদের মাঝে অনুকরণীয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এতে তিনি নৈতিক শিক্ষাকে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে একাধিক গল্প বর্ণনা করে সেটি সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেছেন। তিনি নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজকে পরিশুদ্ধির একমাত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মনে করতেন। তাঁর এসব নৈতিক উপদেশ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণিত হয়েছে যা ধর্মীয় জীবন গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। এ ছাড়া তাঁর কাব্যসমূহে জীবনের উত্থান-পতনে মানুষ কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে মানুষ নামের সার্থকতা ও স্বকীয় ঐতিহ্য ঠিক রাখতে পারে এবং একজন মানুষের নৈতিক উন্নয়ন ও চারিত্রিক মার্ধ্য তাঁকে কোন পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে তারই একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শেখ সাদিকে গজলের ইমাম হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি ফারসি গজল রচনার ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। ফারসি কাসিদা রচনার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শেখ সাদির সংক্ষিপ্ত জীবনী, কাব্যগ্রন্থ এবং কাব্যের দর্শন আলোকপাত করা হয়েছে।

১

ফারসি কাব্য সাহিত্যের আকাশে প্রথম শ্রেণির উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলোর মধ্যে শেখ সাদি অন্যতম। তিনি ইরানের কাব্যকুঞ্জের বুলবুল হিসেবে দেশে-বিদেশের সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছেন। এই মহান কবির আসল নাম মুসলেহ, উপাধি মোশাররফ উদ্দিন এবং কাব্যনাম সাদি (মোহাম্মদ জাফর ইয়াহকি ১৩৭৭, ১৭০)। তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মদ মোশাররফ

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্দিন মুসলেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মোশাররফ সাদি শিরাজি (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৮৪-৫৮৫)। ইরানের পুণ্যভূমি শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে সাদি শিরাজি বলা হয় (মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ১৯৮৯, ১৩৫)। তবে তিনি সর্বসাধারণের কাছে শেখ সাদি ও সাদি নামেই সমধিক পরিচিত। আব্দুর রহমান জামি তাঁকে বুলবুলে শিরাজ বা শিরাজের বুলবুল বলে আখ্যায়িত করেছেন (আবদুস সাত্তার ১৯৭৯, ৬৩)। শেখ সাদির পূর্বপুরুষগণ বিজয়ী আরব সেনাদের সাথে ইরানে এসেছিলেন। তাঁরা শিরাজ নগরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (নাজিম উদ্দিন ভূইয়া ১৯৯৫, ১০)। শেখ সাদির পিতামহ শরফুদ্দিন একজন বিজ্ঞ আলেম ও খ্যাতিমান সুফি সাধক ছিলেন। তিনি ওয়াজ-নসিহত করে মানুষকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ একজন বিশিষ্ট আলেম ও পিতার ন্যায় ধর্মানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেকে হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর বলে দাবী করতেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ শিরাজের বাদশাহ আতাবেক সাদ বিন জঙ্গীর রাজদরবারে চাকুরি করতেন (আল্লামা শিবলি নোমানি তা.বি., ২৫)। বাদশাহ আতাবেক সাদ জঙ্গীর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। এ সময়ে আব্দুল্লাহ ইরানের এক সম্ভ্রান্ত দলপতির কন্যা মাইমুনা খাতুনকে বিয়ে করেন। এ মহীয়সী রমনীর গর্ভেই তিনি ১১৮৪ (মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১, ১১৯৩) খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন (আযিমুল হক জোনাইদি ও মোহাম্মদ তাহের ফারুকি ১৯৬০, ১৮৩)।

শেখ সাদির পিতা আব্দুল্লাহ পুত্রের লেখাপড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি খুব কম বয়সেই লেখাপড়া শুরু করেন এবং পিতার তত্ত্বাবধানে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা শিরাজ নগরে শেষ করেন (J. A. Boyle 1964, 595)। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি পিতার সাথে মক্কায় যান এবং পবিত্র হজ্জ পালন করেন। শৈশবে তিনি পরম সুখে লালিত-পালিত হন। কিন্তু তাঁর এ সুখ বেশি দিন দীর্ঘায়িত হয়নি। মাত্র এগার বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৯২)। শেখ সাদির পিতার অকাল মৃত্যু হলেও তাঁর মাতা মধ্য বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর কাছে থেকেও জীবনোপযোগী পাথেয় গ্রহণ করেন। তিনি আল্লামা কুতুব উদ্দিন শিরাজির কাছে স্থায়ী পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর কাছে থেকে তিনি সাহিত্য ও শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৯২)। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন করেন এবং নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, মানতেক, দর্শন, ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন (W. G. Archer and G.M. Wickens 1964, 35)। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি নিজামিয়া মাদরাসা থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে ‘মাওলানা’ উপাধি লাভ করেন (মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ১৯৮৯, ১৩৭)। এরপর তিনি সুফি সাধক শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি^১ এর মুরিদ হন এবং সুফি সাধনার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শেখ সাদি ১২২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং সিরিয়া, দামেস্ক, হেজাজ, লেবানন, রোম, মক্কা এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ প্রভৃতি দেশের শহরসমূহ পরিভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন (Tanwir Ahmed 1991, 181)। এ ছাড়াও তিনি কাশ্গর, নাজাফ, কারবালা, হিন্দুস্তান এবং তুর্কিস্তান ভ্রমণ করেন (পারভেজ আতাবেকি ১৯৯৬, ৬)। তাঁর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে সময় লেগেছে ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছর পরিভ্রমণে তিনি চৌদ্দ বার পবিত্র হজ্জ পালন করেন (মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানি তা.বি., ৪৩৮)। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ শেষে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর তিনি ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে শিরাজ নগরীতে ফিরে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময় থেকেই তিনি ফারসি সাহিত্য সাধনা এবং কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে স্থায়ী খানকায় মোরাকাবা, মোশাহেদা ও ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করেন। সে সময় শিরাজের বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে শেখ সাদি উক্ত খানকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৯৯)।

শেখ সাদি ফারসি সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ নৈতিক কবি। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন হলো *সাদি নামে* যা পরবর্তীতে *বুস্তান* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে (হাসান আনওয়ারি তা.বি., ১৮)। *বুস্তান* শব্দের অর্থ বাগান। এ কাব্যগ্রন্থে চার হাজারেরও বেশি পঙ্ক্তি রয়েছে। তিনি ৬৫৫ হিজরি মোতাবেক ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন (মাহমুদুল হাসান নিজামী ২০১৭, ১২)। শেখ সাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে এই কাব্যগ্রন্থটিকে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলো হলো ১ম অধ্যায় : ন্যায় বিচার ও রাজ্য চালনার পদ্ধতি, ২য় অধ্যায় : বদান্যতা, ৩য় অধ্যায় : প্রেম, মত্ততা ও শোরগোল, ৪র্থ অধ্যায় : বিনয় ও নম্রতা, ৫ম অধ্যায় : সম্ভটির ফজিলত, ৬ষ্ঠ অধ্যায় : অল্পে তুষ্টি, ৭ম অধ্যায় : প্রশিক্ষণ, ৮ম অধ্যায় : স্বাস্থ্য ও সুস্থতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৯ম অধ্যায় : তওবা এবং ১০ম অধ্যায় : মোনাজাত ও গ্রন্থ সমাপ্তির বর্ণনা (মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, সূচিপত্র)। এই দশটি অধ্যায় সম্পর্কে শেখ সাদি বলেন,

و ایــــن کــــاخ دولــــت بیــــرداختم برو ده دراز تربیــــت ســــاختم
(মোহাম্মদ আলি ফারগি ১৩৮৩, ২০৫)

আমি যখন এই সম্পদের প্রাসাদ সুসজ্জিত করলাম

তাতে শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য দশটি দরজা নির্মাণ করলাম।

শেখ সাদি রচিত অপর একটি কাব্যগ্রন্থ হলো *গাজালিয়াতে সাদি*। তাঁকে গজল^২ কবিতার ওস্তাদ বলা হয়। তিনি গজলে প্রেম, প্রেমাসক্তি, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়াও তিনি এতে মাঝে মাঝে নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন (মালেকুশ গুয়ারা বাহার ১৩৭৩, ২০৯)। নিচে শেখ সাদির গজল থেকে একটি বেইত তুলে ধরা হলো,

آمدی وه كه كى چه مشتاق و پريشان بودم تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم
(মোহাম্মদ আলি ফারগি ১৩৮৩, ৫৫১)

তুমি এসেছ, হে প্রিয়া! অধীর আত্মহে ছিলাম পেরেশান

তুমি চলে গেলে, রেখে আমায় নিষ্প্রাণ।

কবি শেখ সাদির *কাসায়েদে ফারসি* নামে অপর একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তিনি কাসিদা^৩ রচনার ক্ষেত্রে নিজস্ব আত্ম পরিশুদ্ধির সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একত্ববাদ, বাদশাহদের প্রশংসা, উপদেশ ও নসিহত প্রভৃতি বিষয়ে কাসিদা রচনা করেছেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৬০৬)। তিনি বাদশা ও আমিরদের প্রশংসায় দু'চারটি প্রশংসামূলক কাসিদা রচনা করেছেন। এরপর উপদেশ ও নসিহতমূলক বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি তাঁর কাসিদায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব, সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা ও আত্মার পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি বসন্তকাল, শিরাজ নগরী, শবে বরাত, মাহে রমযানের উপর কাসিদা রচনা করেছেন। অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর কাব্য শুধু নিজের মনের শান্তির জন্য ছিল না বরং তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতির উন্নতি সাধন (শায়খ সাদি ১৯৯৩, ৬-৮)। নিচে শেখ সাদির কাসিদা থেকে একটি বেইত তুলে ধরা হলো,

بـــــــراه تـــــــكلف مـــــــرو ســـــــعدیا اـــــــگر صـــــــدق داری بـــــــیار و بـــــــیا
(মোহাম্মদ আলি ফারুগি ১৩৮৩, ২০৯)

হে সাদি! অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির পথে যেওনা
যদি সত্য কিছু জান, তবে তা নিয়ে এসো।

শেখ সাদি অন্যান্য কবিদের ন্যায় মসীয়া বা শোকগাথা রচনা করেছেন। তিনি মসীয়ার নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্যক্তির উপর মসীয়া রচনা করতে গিয়ে পুরো জাতিকে তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মোসতাসিম বিল্লাহর পতন এবং হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ, ধ্বংস, লুণ্ঠণ ও গণহত্যায় মর্মান্বিত হয়ে এক বেদনা-দায়ক ও মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেছেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৬০৬)। নিচে বাগদাদ নগরীর ধ্বংসের উপর রচিত শেখ সাদির শোকগাথার দু'টি পঙ্ক্তি তুলে ধরা হলো:

آسمان را حق بود گر خون بیاردر بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین
ای محمد گر قیامت می بر آری سر ز خاک سر بر آور وین قیامت در میان خلق بین
(মোহাম্মদ আলি ফারুগি ১৩৮৩, ৭৬৪)

আকাশের উচিত আজ রক্তাক্ত করে বর্ষণ
মুসতাসিম বিল্লাহর ঐ ধ্বংসের কারণ।

হে মোহাম্মদ! মাটি থেকে মাথা তুলবে কিয়ামতে
সৃষ্টি লোকের এই কিয়ামত দেখে যাও নয়নেতে।

এছাড়া তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ হলো সাহেবিয়া। এটি কিছু ফারসি ও আরবি কৈতাব এর সমষ্টি যা তিনি শামসুদ্দিন জুয়াইনিকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছেন। শেখ সাদি এবং শামসুদ্দিন জুয়াইনির মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততা ছিল বলে এ সকল কবিতাকে সাহেবিয়া নামকরণ করা হয়েছে। এর অধিকাংশ কবিতা উপদেশ ও নসিহত সম্বলিত। এ ছাড়া তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য এবং প্রেমের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৬০৭)।

৩

আল্লাহ তায়ালা হলেন সর্ব শক্তির আধার, শাস্ত ও চিরন্তন। তিনি একমাত্র সম্মান ও মর্যাদার একচ্ছত্র অধিপতি। শেখ সাদির মতে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিপালক, তিনি প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। আমাদের কথা বলার জন্য বাকশক্তি প্রদান করেছেন। আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধি দ্বারা যে সব কাজ করে থাকি, ভাব-ভঙ্গি দ্বারা যা দেখিয়ে থাকি এবং মুখ দ্বারা যতো বাক্য উচ্চারণ করে থাকি, এর সব কিছুই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ (মোস্তাক আহমাদ ২০১৭, ১১)। শেখ সাদি বুস্তান কাব্যগ্রন্থে বলেন:

به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشنده دسـتگیر کریم خطابخش پوشش پذیر
(গোলাম হোসাইন ইউসুফ ১৩৫৯, ১)

আল্লাহ হলেন বিশ্ব প্রতিপালক ও প্রাণ সৃষ্টিকারী

যিনি বাক্ শক্তি প্রদানকারী ও মহাজ্ঞানী।

তিনি ক্ষমাকারী ও সাহায্যকারী

তিনি উদার ভুল ক্ষমাকারী এবং ক্ষমা প্রার্থনা অনুমোদনকারী।

শেখ সাদির কাব্য-দর্শন

আল্লাহ তায়ালা হলেন আমাদের রিযিকদাতা। তিনি আমাদের অপরাধের জন্য কারো রিযিক বন্ধ করে দেন না। পৃথিবীতে যদি কেউ নিজ পিতার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাহলে পিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু বান্দা শত অপরাধ করার পরও তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। আপন সহনশীলতার মহিমায় তার সকল অপরাধ ঢেকে রাখেন। তার নেয়ামত সবাই সমানভাবে ভোগ করেন। পাপ-পুণ্যের ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং সব অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালা শোকর আদায় করা আমাদের কর্তব্য। শেখ সাদি বলেন,

و لکـین خداوند بـالا و پـسـت
ادیـم زمـین سـفره عام اوسـت
به عصیان در رزق بر کس نیست
بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست
(মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, ৩৫-৩৬)

কিন্তু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মহান খোদা

কারো অবাধ্যতার কারণে রিযিকের দরজা বন্ধ করেন না।

পৃথিবীর সব জায়গা তাঁর সাধারণ দস্তুরখান,

সেখানে গনিমতের মালের মতো বন্ধু-শত্রু সবাই সমান।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসুল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.) হলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল। শেখ সাদি সেই মহান সম্মানিত নবীর প্রশংসা করে নিজে সম্মানের আসন লাভ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর চারিত্রিক বিষয় থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল বিষয়ের প্রশংসা অতি সুন্দর ভাষায় চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই সম্পর্কিত শেখ সাদির দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

کریم السـجایا جمیـل الشـیم
امام رسـل پیشـوای سـبیل
نبی البرایـا شـفیع الامم
امین خدا مهـبط جبرئیل
(গোলাম হোসাইন ইউসুফ ১৩৫৯, ৪)

মহানবী (সা.) সর্বোত্তম স্বভাব ও সচ্চরিত্রের অধিকারী

সমস্ত সৃষ্টি জীবের নবী ও উম্মতের সুপারিশকারী।

সকল রাসুলের ইমাম ও পথপ্রদর্শক

আল্লাহর আমানতদার ও জিব্রাইল (আ.) এর অবতরণ স্থল।

সৃষ্টি জগতে মানুষের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি হলেন পিতা-মাতা। এই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমাদেরকে তাঁদের কথা মেনে চলতে হবে। তাঁরা মনে কষ্ট পান এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁরা যখন বৃদ্ধ হবেন তখন তাঁদের সেবা-যত্ন করতে হবে। দুঃখ-কষ্টে সর্বদা পাশে থাকতে হবে। কারণ বার্ষিক্যে মানুষ অসহায় হয়ে সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু যৌবনকালে মানুষ বার্ষিক্যের দুর্বলতার কথা ভুলে যায়। তাই কবি যৌবনকালে দুর্বল বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্বারোপ করেছেন। শেখ সাদি বলেন:

سـالها بر تو بگـذرد که گـذار
تو بجای پدر چه کردی خیر؟
نکـوی سـوی تربیت پـدـرت
تا هـمان چشم داری از پـسـرت
(গোলাম হোসাইন ইউসুফ ১৩৭৪, ১৫১)

বহু বছর তুমি অতিক্রম করেছ
কিন্তু নিজের পিতার কবরের দিকে লক্ষ্য করনি।
তুমি তোমার পিতার সাথে কিরূপ ব্যবহার করছ?
তোমার সাথেও তোমার ছেলে ঐরূপ ব্যবহার করবে।

শেখ সাদি পিতা-মাতাকে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার উপদেশ দিয়েছেন। সন্তানদেরকে সৎ, জ্ঞানী ও পরহেজগার করে গড়ে তুলতে হবে। সন্তানদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে শাসন করতে হবে। সন্তানদের বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে অসৎ বন্ধুদের সাথে মিশে নষ্ট হয়ে না যায়। শেখ সাদি বুত্তান কাব্যগ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বলেন:

هر آنکس که فرزندان را غم نخورد دگر کس غمش خورد و بدنام کرد
نگهدار از آمیزگار بدش که بد بخت و بی ره کند چون خودش
(মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, ৩২৯)

যে ব্যক্তি সন্তানকে শাসন করে না
লোকে তার ব্যাপারে করে ভৎসনা।
অসৎ সঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে
নতুবা সে নষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হবে।

কবি শেখ সাদি আল্লাহ তায়ালায় সকল সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি কুকুর, বিড়াল এমনকি পিপীলিকার প্রতিও দয়া করতে বলেছেন। দুনিয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ পরকালে দয়া করবেন। আল্লাহর সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সন্ধান পাওয়া যাবে না। এমনকি জীবের সেবা ছাড়া মানুষের নামাজ, রোজা কোনো কাজে আসবে না। শেখ সাদি বলেন,

طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجاده و دلوق نیست
(মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, ১০১)

সৃষ্টির সেবা ছাড়া তরিকত সম্ভব নয়
তসবিহ, জায়নামাজ ও দরবেশী পোশাকে কোনো কাজে আসবে না।

শেখ সাদি কথা বলার ক্ষেত্রে সংযত হয়ে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ বেশি কথা বললে লজ্জিত হওয়ার ভয় থাকে। অনর্থক একশত কথা বলার চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ও মূল্যবান একটি কথা বলা উত্তম। শেখ সাদি কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন। “হে জ্ঞানী! তোমার জিহ্বাকে সদা সংযত রাখবে।” কিয়ামতের আদালতে মানুষের কথারও হিসেব গ্রহণ করা হবে। শেখ সাদি বলেন:

کم آواز هرگز نبینی خجل جوی مشک بهتر که یک توده گل
(মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, ৩১১)

কম কথা বলো, দেখবে কখনো লজ্জিত হবে না
দশ জনের সমান কথার চেয়ে বুদ্ধিমানের একটি কথা উত্তম।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যৌবনকাল। শেখ সাদি এই যৌবনকালের জন্য আফসোস করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমি যৌবনের সময়ের মূল্যায়ন করতে পারিনি। মহান আল্লাহ আমার কাছ থেকে এই যৌবনের মূল্যবান সময়

শেখ সাদির কাব্য-দর্শন

ছিনিয়ে নিয়েছেন। যার প্রতিটি রজনী শবে কদরের মতো ছিল।” তিনি যুবকদেরকে বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা এখন দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর বসে আছ। সুতরাং সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাও। অর্থাৎ যৌবনকালে শরীরে শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে ভাল কাজ করে নাও। শেখ সাদি বুস্তান কাব্যগ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বলেন:

جوانان را طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید ز پیر
(মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, ৩৬০)

হে যুবক! আজ ইবাদতের পথ ধর

বৃদ্ধকালে যৌবনকাল ফিরে আসবে না।

পৃথিবীতে এতিমরা থাকে বঞ্চিত ও অবহেলিত। তারা সব সময়ই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই তাদের সামনে এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে তারা কষ্ট পায়। কারণ তারা পৃথিবীতে আশ্রয়হীন এবং তারা সব সময় পিতা-মাতার স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে। কবি শেখ সাদি এতিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের প্রতি সামান্য আঘাতে কবির হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হতো। শেখ সাদি বুস্তান কাব্যগ্রন্থে বলেন:

الا تانگريد که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم
(মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, ১৬০)

সাবধান আল্লাহর আরশ যেন না কাঁপে

কারণ এতিমের কান্নায় আরশ কাঁপে অবিরত।

শেখ সাদি মানুষের পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ককে দুনিয়াতে জান্নাতের সুখ-শান্তি এবং সম্পর্কের দূরত্বকে জাহান্নামের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, পরিবারে বাধ্যগত সৎ স্ত্রী থাকলে গরীব স্বামী রাজা হয়ে যায়। যার সংসারে অনুগত সৎ ও চরিত্রবান স্ত্রী থাকে তার উপর আল্লাহর শুভ দৃষ্টি থাকে। ফলে স্বামী জান্নাতী সুখ লাভ করে থাকে। যার স্ত্রী নিজের মনের মতো হয়, সে দুনিয়াতে সকল কাজে সফলতা লাভ করতে পারে। শেখ সাদি বলেন:

اگر پارسا باشد و خوش سخن نگه در نکویی و زشتی مکن
(মোহাম্মদ খায়ায়েলি ১৩৭২, ৩২৬)

স্ত্রী যদি উত্তম চরিত্র ও মিষ্টভাষিণী হয়

চেহারার ভাল-মন্দ দেখা উচিত নয়।

ফারসি সাহিত্যের অন্যতম কবি শেখ সাদি সহজ সরল ভাষায় তাঁর চিন্তা-দর্শন কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উপমা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। এছাড়াও তিনি নিজস্ব দর্শন ও চিন্তা ভাবনাগুলো গ্রহণযোগ্য করার জন্য কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন গল্পাকারে তুলে ধরেছেন। এই সব গল্প অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় রচিত হয়েছে বলে সর্বসাধারণের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সৎ, আদর্শ, ও নান্দনিক জীবনযাপন করার জন্য নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই। একজন মানুষকে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং তার মধ্যে দায়িত্ব, কর্তব্য, মানবতা ও নৈতিকবোধ জাগ্রত করার জন্য নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। তাই একজন মানুষকে সত্যিকারের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নৈতিক কবি শেখ সাদির কাব্যের দর্শন ও চিন্তাধারাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাঁর কাব্যের দর্শন যদি কেউতার জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে সে একজন সৎ ও আদর্শবান মানব হিসেবে গড়ে উঠবে। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর দর্শন বাস্তবায়ন করলে সকল

ক্ষেত্রে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জন হবে। তাঁর কাব্যের দর্শন ও চিন্তা ভাবনাগুলোর যথার্থ অনুসরণ ও অনুকরণ মুসলিম সমাজের সদস্যগণকে সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে সহায়তা তাদের পরকালীন মুক্তির পথকে সহজ করবে।

টীকা :

^১ শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দির পুরো নাম শিহাব উদ্দিন আবু হাফস ওমর বিন মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দি। তিনি ৫৩৯ হিজরিতে যানজান প্রদেশের সোহরাওয়ার্দি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুফি আলেম ছিলেন। মারেফাতের বিষয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর শিক্ষা শেখ সাদীর জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি ৬৩২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন (তাওফিক হা. সোবহানী ১৩৭৫, ২৯১-২৯২)।

^২ গজল অর্থ নারীদের সাথে কথা বলা, প্রেম নিবেদন করা, নারীদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের রূপ ও গুণের বর্ণনা, প্রেম ও সৌন্দর্য, যৌবনের কাহিনী, প্রেম কাহিনী ইত্যাদি (জর্জ মরিসন ১৩৮০, ১৭)। কবি ও সাধকগণ গজল গেয়ে প্রেমের মাদকতায় অপূর্ব তরঙ্গ উপভোগ করতেন। গজলের বেইত বা শ্লোক সংখ্যা সর্বনিম্ন পাঁচ এবং সর্বোচ্চ বারটি হবে (সীমাদাদ ১৩৮৭, ৩৫২)। গজলের প্রথম পঙ্ক্তির উভয় মেসরার অন্ত্যমিল হওয়া আবশ্যিক। পরবর্তী সকল বেইতে শুধুমাত্র দ্বিতীয় মেসরাতে অন্ত্যমিল হবে। অর্থের দিক দিয়ে গজল এমন আঙ্গিকের কবিতা যা উৎসব-অনুষ্ঠানে কবি তাঁর অনুভূতি ও মনের অবস্থা বর্ণনা করেন। বিশেষ করে এতে প্রেম ও প্রেমের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়। এ ধরনের কবিতায় এমন সব শব্দ থাকে যা সূক্ষ্ম, নমনীয়, কোমল ও সুমধুর শ্রোতাদের কর্ণে এর এক ব্যঞ্জনাময় প্রভাব পড়ে। শ্রোতাদেরকে ধরে রাখা হয় যাতে তারা কবিতায় বর্ণিত ভাব-কল্পনাগুলো উপলব্ধি করতে পারে এবং সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে বুঝতে সক্ষম হয় (যাহরায়ে খানলারি কেয়া ১৩৪১, ১)। গজল কবিতায় বিষয়বস্তু হল সাধারণত আল্লাহ তায়ালার মহিমা বর্ণনা, মোহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা, স্বদেশের মাহাত্ম্য বর্ণনা, আত্মপ্রশংসা, প্রেমাস্পদের রূপ ও সৌন্দর্য, তাঁর প্রতি অবহেলা, অনাদর, কথা না রাখা, নির্দয়তার বর্ণনা, প্রেমিকের বিরহ-বিচ্ছেদ-যাতনা এবং দুঃখের বিবরণ। এতে কেবল প্রেমই নয়, বরং গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তা, আবেগ, মানবীয় সংবেদনশীলতা, চারিত্রিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও স্থান পায়। তবে গজল একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ ক্ষেত্রে কবি স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে একাধিক বিষয় একটি গজলে সন্নিবেশিত করতে পারেন (পারভিন শাকিবা ১৩৭৩, ২৩)।

^৩ কাসিদা হল প্রশংসা বা নিন্দাবাচক কবিতা বা শোকগাথা যা একই ছন্দ ও অন্ত্যমিলযুক্ত এবং সংক্ষিপ্ত হয় (ফারসী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান ১৯৯৮, ৬৮৪)। হিজরি চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে কাসিদা লেখক কবিদের স্বর্ণযুগ ছিল। কাসিদা এমন কবিতাকে বলা হয় যাতে প্রশংসা বা স্তুতিমূলক বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। যেহেতু কবি নিজ ভাবধারা, স্তুতি, উপদেশ, অভিনন্দন, সমবেদনা প্রকাশের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ জাতীয় কবিতা সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন, তাই একে কাসিদা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের কবিতার প্রথম বেইতের উভয় মেসরা এবং পরবর্তী বেইতগুলোর দ্বিতীয় মেসরায় একই অন্ত্যমিল থাকে। এ সব বেইতসমূহ একই ছন্দবিশিষ্ট হয়। এর বেইত সংখ্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ থেকে একশত সত্তর পর্যন্ত হতে পারে। তবে কেউ কেউ পনের বেইতের কাসিদা রচনা করেছেন (রুহুল্লাহ হাদি ১৩৭৯, ১৯)। বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে এর বেইত সংখ্যা কম-বেশি হয়ে থাকে। এর প্রচলিত বিষয়বস্তু হচ্ছে- কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর স্তুতি, উপদেশ, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা, গুণ বর্ণনা, অভিযোগ, গর্ব, বীরত্বগাথা, শোকগাথা, সমবেদনা, চরিত্র, আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় বিষয়াবলি, প্রভৃতি (আহমাদ তামীমদারী ২০০৭, ১৫৫)।

^৪ কেতা এর শাব্দিক অর্থ হলো কর্তিত, টুকরো, খণ্ড ও অংশ (মোহাম্মদ হারুন রশিদ ২০১৬, ৩৪)। ফারসি কবিতার সূচনাকাল থেকেই কেতা শ্রেণির কবিতা দৃষ্টিগোচর হয়। এ ধরনের কবিতা যেহেতু দেখতে কাসিদার মধ্যবর্তী কিছু বিচ্ছিন্ন বেইতের মতো দেখায়, সেহেতু একে

কেতা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কবিতার প্রথম ছত্রের অন্ত্যমিল থাকে না। প্রত্যেক বেইতের সকল দ্বিতীয় ছত্রে অন্ত্যমিল থাকে। আর বেইতের সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই এবং সর্বোচ্চ ষোল। তবে ফারসি সাহিত্যের অধিকাংশ কেতার পঙ্ক্তি সংখ্যা দুই থেকে দশটি, যা প্রয়োজনে পয়তাল্লিশটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেতা কবিতায় নৈতিক চরিত্র, সামাজিক, শিক্ষা, প্রশংসা, উপদেশ বা ব্যঙ্গ, শোক, প্রশস্তি, অভিনন্দন ও সমবেদনা, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় (রুহুল্লাহ হাদি ১৩৭৯, ৩১)।

তথ্যসূত্র:

ফারসি ও উর্দু গ্রন্থসমূহ

আযিমুল হক জোনাইদি ও মোহাম্মদ তাহের ফারুকি, *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, পেশওয়ার, ১৯৬০ খ্রি.।

আল্লামা শিবলি নোমানি, *শেরুল আযম* (২য় খণ্ড), মালেক নাযির আহমদ তাজ বুক ডিপু, লাহোর, তা.বি.।

গোলাম হোসাইন ইউসুফ (সম্পাদিত), *বুস্তানে সাদি*, এস্তেশারাতে আঞ্জুমানে ওস্তাদানে যাবান ওয়া ফারসি, তেহরান, ১৩৫৯ হি: শা:।

গোলাম হোসাইন ইউসুফ (সম্পাদিত), *গুলিস্তানে সাদি*, এস্তেশারাতে খাওয়ারায়ামি, তেহরান, ১৩৭৪ হি: শা:।

তাওফিক হা. সোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াত*, এস্তেশারাতে দানেশগাহে পায়ামে নূর, তেহরান, ১৩৭৫ হি: শা:।

পারভিন শাকিবা, *শেরে ফারসি আয অগায তা এমরোয*, এস্তেশারাতে হেরমন্দ, তেহরান, ১৩৭৩ হি: শা:।

পারভেজ আতাবেকি, *বারগুযিদে ওয়া শারহে আছারে সাদি*, নাশরে পাজুহেশে ফারযান, তেহরান, ১৯৯৬ খ্রি.।

মরিসন জর্জ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান আয অগায তা এমরোয*, ইয়াকুব অযান্দ (অনূদিত), এস্তেশারাতে গুস্তারে, তেহরান, ১৩৮০ হি: শা:।

মালেকুশ গুয়ারা বাহার, *সাবক শেনাসী*, এস্তেশারাতে আমির কাবির, তেহরান, ১৩৭৩ হি: শা:।

মির্য়া মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাব নামে ইরান*, ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, লাহোর, তা.বি.।

মোহাম্মদ আলি ফারুকি (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াতে সাদি*, রামিন প্রকাশনী, তেহরান, ১৩৮৩ হি: শা:।

মোহাম্মদ খাযায়েলি (সম্পাদিত), *শরহে বুস্তান*, এস্তেশারাতে এলমি, তেহরান, ১৩৭২ হি: শা:।

মোহাম্মদ জাফর ইয়াহকি, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (১ম ও ২য় খণ্ড), ইরান শিক্ষামন্ত্রণালয়, তেহরান, ১৩৭৭ হি: শা:।

যবিহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (৩য় খণ্ডের ২য় ভাগ), এস্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৯০ হি: শা:।

যাহরায়ে খানলারি কেয়া, *রাহনোমায়ে আদাবিয়াতে ফারসি*, কিতাবখানে ইবনে সিনা, তেহরান, ১৩৪১ হি: শা:।

রুহুল্লাহ হাদি, *অরাহায়ে আদাবি*, নাশরে কিতাবে দারসে ইরান, তেহরান, ১৩৭৯ হি: শা:।

সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এসতেলাহাতে আদাবি*, এস্তেশারাতে মোরওয়ারিদ, তেহরান, ১৩৮৭ হি: শা:।

হাসান আনওয়ারি, *গুরিদেহ ওয়া বিকারার দার বারাহে যিন্দেগি ওয়া আছারে সাদি*, এস্তেশারাতে কাতরে, তেহরান, তা.বি.।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

- আবদুস্ সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯ খ্রি.।
- আহম্মদ তামীমদারী, *ফারসী সাহিত্যের ইতিহাস*, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূদিত), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.।
- নাজিম উদ্দিন ভূইয়া, *হযরত শেখ সাদী রহ.*, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.।
- ফারসী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান*, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি.।
- মাহমুদুল হাসান নিজামী, *বোস্তান*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.।
- মোস্তাক আহম্মদ, *আল্লামা শেখ সাদীর আত্মদর্শন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.।
- মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (সম্পাদিত), *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী* (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রি.।
- মোহাম্মদ হারুন রশিদ, *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬ খ্রি.।
- শায়খ সাদী, *গুলিস্তাঁ*, মোহাম্মদ মোবারক আলী (অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

- J. A. Boyle, *The Cambridge History of Iran* (Voll.5), Cambridge University press, Cambridge, 1964 CE.
- Tanwir Ahmed, *A Short History of Persian Literature*, Naaz Publishing Center, Calcutta, 1991 CE.
- W. G. Archer and G.M. Wickens, *The Gulistan of Sadi*, Capricorn Books, New York, 1964 CE.

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

ড. মুহাম্মদ মানজুর রহমান*

প্রতিপাদ্যসার

যখনই মানবজাতি কর্তৃক আল্লাহর অবাধ্যতা, অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নিপীড়ন, অন্যায়, অশীলতা, ব্যভিচারের মতো অপরাধসমূহ সমাজ ও রাষ্ট্রে বেশি হয়; তখনই তাদের উপর আল্লাহর গজব ও বিপর্যয় নেমে আসে; যেন তারা পুনরায় সত্যের দিকে ফিরে আসে। পবিত্র কুরআনে অন্যায়কারীদের সীমালংঘনের কারণে বিভিন্ন জাতি যেমন- আদ, সামুদ, লূত ও ফেরাউন প্রভৃতির ধ্বংসের কাহিনী স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবজাতির উপর প্রকৃতিক বিপর্যয়সমূহ অবতীর্ণের কারণ বিশ্লেষণ করে এগুলো থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানাধরনের বালা-মুসীবত, বিভিন্নভাবে ভয়, ক্ষুধা এবং জীবনহানী, ধন-সম্পদ ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গজবের মাধ্যমে প্রকৃতিক বিপর্যয় দিয়ে থাকেন। এর দ্বারা আল্লাহ বান্দাদের পরীক্ষা করে থাকেন। এ পরীক্ষাগুলো ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত কিছু নয়। এমনকি আল্লাহ নবী-রাসূলদেরকেও বালা-মুসীবত দিয়ে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছিলেন। তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহদ্রোহিতায় লিপ্ত হয় তখন বিপদ-আপদ ও আল্লাহ প্রদত্ত গজব তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় আসে বলে উল্লেখ করা হয়েছে আল-কুরআনের অনেক স্থানে। বিশেষভাবে যখন ইসলাম তথা কুরআন-হাদীস ভুলুষ্ঠিত হয়, যিনা-ব্যভিচারে সমাজ-রাষ্ট্রে বেড়ে যায়, আল্লাহর অবাধ্যতা সর্বত্র সয়লাব হয়, নির্বিচারে পরস্পরকে হত্যা করা হয়, মুসলিমরা অমুসলিমদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হয়। তখনই মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন নামে বিপদ-আপদ ও

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আল্লাহর গজব বা প্রকৃতিক বিপর্যয় আসে এবং বান্দা তাওবা করে পুনরায় ইসলামের পথে ফিরে আসলে আল্লাহ তায়ালা গজব উঠিয়ে নেন মর্মে আল-কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে।

প্রকৃতিক বিপর্যয় ও বিপদগ্রস্তের কারণ

আল্লাহদ্রোহিতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির উপর অসন্তুষ্ট হন। যদি আমরা সবাই সকল ধরনের পাপকর্ম, যিনা-ব্যভিচার, যুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নীপিড়ন বর্জন করে আল্লাহর নিকট গুণাহ ক্ষমা চেয়ে তাঁর দিকেই আবার প্রত্যাবর্তন করি, সত্য পথে চলি, নিয়মিত সালাত আদায় করি, তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তিলাওয়াতসহ আমলে সালেহ করি, তাহলে প্রকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা সম্ভব। মোটকথা আল্লাহর বিধান কুরআন-সুন্নাহ সার্বিক আদেশ নিষেধ মেনে জীবন পরিচালনা করি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সকল প্রকারের গজব বা প্রকৃতিক বিপর্যয় উঠিয়ে নিবেন।

প্রকৃতিক বিপর্যয় হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তায়ালা নাক্ষত্রমাণি করা। কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা না করা। বিপদ থেকে রক্ষা তথা মহামারী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ না করা। পরস্পকে কষ্ট দেয়া। যুলুম-নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা করা। পরস্পকে সহযোগিতা না করে কৃপনতা করা। গুনাহ করেও তাওবা ও ইস্তেগফার না করা। আল্লাহর যিকির না করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দুরন্দ না পড়া ইত্যাদি। ইসলামিক স্কলারগণ বিশেষভাবে প্রকৃতিক বিপর্যয় তথা বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব আসার সাধারণত দু'টি কারণ নির্ধারণ করেছেন,

এক. ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা

দুই. আল্লাহদ্রোহিতা

নিম্নে এ দু'টি কারণ বিশ্লেষণ করা রয়েছে।

এক. ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা

ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করার জন্য মানব জাতির উপর বিপদ-আপদ-মুসীবত আল্লাহর গজব তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় আসতে পারে। যেমন বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের পর বর্তমানে ডেঙ্গুজ্বর সবার মাঝে মহাআতংক হয়ে দাঁড়িয়েছে, মূলত তা আল্লাহর গজব বা প্রকৃতিক বিপর্যয়। যা ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা।

প্রকৃতিক বিপর্যয়ে সম্পদহানী, জীবননাশ ও ফসলের ক্ষতি দ্বারা ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা

বিপদ-আপদ, বিভিন্ন ভয়-ভীতি, খাদ্য সংকট, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদহানী, জীবননাশ ও ফল-ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। এমতাবস্থায় ঈমানদারদেরকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

“আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। আপনি শুভসংবাদ দিন ধৈর্যশীলগণকে। যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, ‘আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী [সূরা আল-বাকারাহ ০২:৪১]।” এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নানাধরনের বালা-মুসীবত তথা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, ক্ষতিকারক করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে জীবনহানী ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা পরীক্ষা করেন। আর এটি ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত কিছু নয়। এমনকি আল্লাহ নবী-রাসূলদেরকেও বালা-মুসীবত দিয়ে অনেক ঈমানী পরীক্ষা করেছেন।^১ ইমাম বুখারী (রহ.) এ মর্মে একটি পরিচ্ছেদ শিরোনাম এভাবে করেছেন **بَابُ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءَ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ** “মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবী ও রাসূলগণ। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রথম ব্যক্তি এবং পরবর্তী প্রথম ব্যক্তি।”

প্রকৃতিক বিপর্যয় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত হয় না

আল-কুরআনের এক আয়াতে মু’মিনদেরকে (আল্লাহর উপরই পূর্ণ ঈমান বা আস্থা রাখা উচিত) লক্ষ্য করে বলা হয়েছে,

قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“(হে রাসূল!) বলুন, তোমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের জন্য কিছুই হবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মু’মিনদের নির্ভর করা উচিত [সূরা আত-তাওবা ০৯:৫১]।” এ আয়াতে স্পষ্ট যে, একজন মুসলিম সদাসর্বদা আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং ফয়সালার প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখতে হবে। বালা-মুসিবত বা খোদায়ী গজব তথা প্রকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা আক্রান্ত হলেও ঈমানদারদেরকে ধৈর্যশীল হতে হবে বেশি বেশি আল্লাহর হুকুম পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

দুই. আল্লাহদ্রোহিতা

আল্লাহদ্রোহিতা বলতে আল্লাহ নাফরমানি করা। আল্লাহ প্রদত্ত আদেশ-নিষেধকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হায়প্রতিপন্ন করা এবং কুরআন বিরেখী জীবন পরিচালনা করা। যা আল্লাহর আইনের সাথে যুদ্ধ করার শামিল।

যখন আল্লাহদ্রোহিতা চরমশীর্ষে অবস্থান করে, তখন বিপদ-আপদ বা অদৃশ্য আল্লাহর গজব আরম্ভ হয়ে যায়। ইসলাম তথা কুরআন-হাদীস ভুলঠিক হয়, যিনা-ব্যভিচারে সমাজ-রাষ্ট্র রোগগ্রস্থ হয়, আল্লাহদ্রোহিতা সর্বোত্র সয়লাব হয়, মুসলিমরা বিধর্মীদের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হয়। তখনই বিপদ-

আপদ ও আল্লাহর গজব বিভিন্ন নামে আল্লাহর পক্ষ থেকে ‘আযাব আসে মর্মে আল-কুরআনে ঘোষণা রয়েছে।

বিভিন্ন স্থানে অসহায় নারী-পুরুষ ও অবুঝ শিশুসহ মানবতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা

মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নির্যাতন, চীনে ‘উইঘর’ এলাকায় (বড় বড় বিল্ডিং এর ভিতরে বন্দি অবস্থায়) মুসলিমদের উপর নির্যাতন, ভারতে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বার্ষিকে সরকারের সহযোগিতায় মুসলিম জনতার উপর নির্যাতন ও ধর্মীয় স্থান মসজিদ ভাঙ্গা, কাশ্মিরে মুসলিমদের অধিকার হরণ, ইরাক ও আফগানিস্তানের উপর আমেরিকার আত্মসন, ফিলিস্তিনে মুসলিমের উপর অকাতরে হত্যা ও লুণ্ঠন, সিরিয়া, জিনজিয়ানসহ বিশ্বের বহু স্থানে ২০০০ সাল থেকে মুসলিম অসহায় নারী-পুরুষ ও অবুঝ শিশুসহ মানবতাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়।

বিশেষভাবে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর সে দেশে বৌদ্ধ জনগণ ও সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে নির্যাতন তথা নিধনযোগ্য চালাচ্ছে তা শুধু মুসলমানদেরকেই নয় বরং দেশ-জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বর্তমান বিশ্বসভ্যতাকে হতবাক করেছে। এ ধরনের অমানবিক অত্যাচার-অবিচার কোন বিবেকবান মানুষের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সু চি নীরব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। রোহিঙ্গা মুসলিমকে আগুন লাগিয়ে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা, রোহিঙ্গা মুসলিমের লাশকে ক্ষত বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো করলেও রাষ্ট্র কোন প্রতিকার করছে না। অথচ মানবতাবাদী আমাদের বাংলাদেশের গণমানুষের নেতা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে বাংলাদেশে স্থান দিয়েছেন। প্রচণ্ড শীতের মাঝে তিনি যদি দয়া করে স্থান না দিতেন, তাদের ভাগ্যে কি হতো? আল্লাহই ভালো জানেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা মুসলিমকে বাংলাদেশে স্থান দেয়ায় সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জনতা তাঁর প্রতি অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

মিয়ানমার একটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত দেশ। বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম মূলকথা “অহিংসা পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ।” আর জীব হত্যা মহাপাপ হলেও রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী যুবক, নারী ও শিশুর উপর পরিচালিত নির্বিচারে গণহত্যা করছে। আবার কখনো রোহিঙ্গা মুসলিমকে পাখির মতো গুলি করে অথবা কাউকে কুপিয়ে হত্যা করে লাশকে ক্ষত বিক্ষিপ্ত করছে এবং পবিত্র সতী-সাবী নারীর ইজ্জত-আব্রুকে ধর্ষণ করার পর নির্মমভাবে হত্যা করছে (দৈনিক যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর-২০১৬খ্রি.)। প্রশ্ন জাগে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠী কি জীবের সংজ্ঞায় পড়ে না? এরই নাম কি ‘অহিংসা পরম ধর্ম?’ মায়ানমারের আর্মি কর্তৃক রোহিঙ্গা মুসলিম হত্যা, শিশু হত্যা ও নারীদের ধর্ষণের বিষয়টি তদন্তের রিপোর্টে একবারেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের ‘Daily Sun’ পত্রিকার মোটা অক্ষরে লেখা প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম সংবাদ শিরোনাম “Hundreds of Rohingyas killed in Myanmar: UN; children slaughtered, women raped by Army” শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল লেখা প্রকাশ পায়। রিপোর্টের বিবরণ হলো- Myanmar’s military crackdown on Rohingya Muslim has likely killed hundreds of people, with children slaughtered and women gang-raped in a camping

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

that may amount to ethnic cleansing, the UN said (03.02.2017) Friday, Reports AFP. Soldiers have fired on sibilinas from helicopters while bands of troops have gone door-to-door in northern Rakhine state, terrorising Rohingya and torching their homes, according to a report from the United Nations human rights office. (The Quranic Studies, VOLUME-6 NO.4, June-2016. p- 129). অর্থাৎ, রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর মিয়ানমারের সামরিক দমন-পিড়নে শতশত লোককে হত্যা করা হয়েছে, শিশুদের জবাই করা হয়েছে এবং একটি শিবিরে নারীদের গণধর্ষণ করা হয়েছে। যা জাতিগত নির্মূলের সমান। মিয়ানমারের সৈন্যরা হেলিকপ্টার থেকে সিবিলিনাদের উপর গুলি চালিয়েছে, তখন সৈন্যদের দল উত্তর রাখাইন রাজ্যে দ্বারে দ্বারে গিয়ে রোহিঙ্গাদের আতঙ্কিত করেছে। তাদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করেছে। আর হত্যা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ। আর এ পাপই তাদের জন্য বিরাট গজব।

প্রকৃতিক বিপর্যয়: প্রেক্ষিত করোনা ভাইরাস

২৩ মে ২০২২ তারিখে ‘ভাইরাস (COVID-19)’ এর গজবে সমগ্র বিশ্বে মানুষ মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৬৩ লক্ষ ৩৩১ জনে এবং ৫২ কোটি ৭৬ লাখ ৮৩ হাজার ৯৯১ জন লোক এ ভাইরাসে আক্রান্ত। এর ফলে সমগ্র বিশ্ব হতবাক হয়ে থমকে গেছে। অচল হয়ে গেছে সমগ্র বিশ্ব। আজ বিশ্বে ভাইরাস এর ভয়াবহতা দেখলে আল-কুরআনে বর্ণিত জাতিসমূহ ধ্বংসের কাহিনী স্মরণ হয়ে যায়। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, সেরা অর্থবীদ ও সমর কৌশলে যুগের সেরা ছিলো। কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা, ক্ষমতার বড়াই, অত্যধিক জঘণ্য পাপের কারণে তাদের সকল কিছু ধ্বংস হয়ে ধূলয় মিশে গেলো। বর্তমান পরাশক্তির অধিকারী, পারমানবিক শক্তির অধিকারী, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অধিকারী চীন, আমেরিকা, জাপান, ইটালী, ভারত, রাশিয়া, কানাডা, পাকিস্তানসহ প্রায় ২১০ (দুইশত দশ) রাষ্ট্রের উপরে ভাইরাস এর মতো অদৃশ্য একটি জীবানুর কাছে কতো অসহায় বিশ্ববাসী। তাদের এটম বোম, প্রযুক্তি ও সমরাস্ত্র আজ আল্লাহ প্রদত্ত গজব করোনা ভাইরাস এর কাছে সম্পূর্ণ অসহায়। সবাই আল্লাহর ক্ষমতার কাছে নতী স্বীকার করছে।

প্রকৃতিক বিপর্যয়: আল্লাহর অবাধ্যতা

মূলত সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের উপর সীমাহীন যুলুম-নির্যাতন, আল্লাহর অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের ফল বলে অনেকেই মনে করেন। ঐশীবাণী আল-কুরআনের বর্ণনানুযায়ী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল ‘আলামীনের দু’আর বরকতে পুরো জাতি ধ্বংস না হলেও আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অথচ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে গজব দিয়ে শেষ করার জন্য তৈরী করেনি। আল্লাহ মানুষকে أَشْرَفَ الْمَخْلُوقَاتِ (আশরাফুল মাখলুকাত) ‘সৃষ্টির সেরা’ হিসেবে সুন্দর আকৃতিতে মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে [সূরা তীন ৯৫: ৪]।” অপর আয়াতে বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ “নিশ্চয়ই মানুষ তো স্পষ্টই

অকৃতজ্ঞ [সূরা যুখরুফ ৪৩:১৫]।” অথচ যখনই বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে তাগুতিশক্তির প্রভাবে মানবজাতির মাঝে যুলুম, শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, ন্যায়বিচার বহিঃভূত বিচারকার্য, চতুর্দিকে মিথ্যার সয়লাব, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি হয়। তখনই আল্লাহর গজব মানবজাতির উপর নাযিল হয়।

প্রকৃতিক বিপর্যয়: যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতা

যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতা যে কোন সমাজের জন্য বড় মারাত্মক ব্যধি। ভাবতেও অবাক লাগে, গ্রীসে শিক্ষিত নগ্ন পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র কলোনী রয়েছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে প্রায়ই সেসব লটারী হয়। এই লটারীর প্রধান পুরস্কার হিসেবে একটি হোটেল কক্ষের চাবি ও যৌন ক্রিয়ার জন্য একটি মেয়ে সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর সাপ্তাহিক ‘ষ্টার্ন’ পত্রিকার প্রচ্ছদে ‘যৌন সামগ্রী’ হিসেবে মহিলাদের নগ্ন ছবি ছাপানো হয়ে থাকে। ইতালীর অবস্থা আরও মারাত্মক, সেখানে মহিলারা সমুদ্র সৈকতে নগ্ন স্নান করার অনুমতি লাভ করেছে, কিন্তু পুরুষেরা সেই অনুমতি পায়নি।

মহামারি এইডস প্রসংগে ডাঃ রবার্ট রেডফিল্ড বলেন, (AIDS is a sexually transmitted disease) “এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ।” তিনি বলেন, “আমাদের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই বাকী নেই। কম-বেশি আমরা সকলেরই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গিয়েছি। এইডস হচ্ছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমাদের উপর শাস্তি এবং অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে।”

প্রকৃতিক বিপর্যয়: বিভিন্ন নামে বালা-মুসীবত

সকল বিষয়ে আল্লাহই জানেন। আল-কুরআনের ঘোষণায় تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ “আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা [সূরা আন-নূর ২৪:১৯]।” তখন আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে শাস্তি প্রদানের জন্যে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসীবত দিয়ে থাকেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ১৪৪২ বছর পূর্বেই এরশাদ করেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে [সূরা আর-রুম ৩০:৪১]।”

প্রকৃতিক বিপর্যয়: মানুষের কৃতকর্মের ফল

যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো আমাদের কৃতকর্মের কারণেই হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনের বলা হয়েছে,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

“তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। (ক্ষমা চাইলে) তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন [সূরা আশ-শুরা ৪২:৩০]।” লজ্জা থাকলে একজন মানুষ অশ্লীলতাপূর্ণ ছবি দেখতে পারে না। কেননা এটা চরম সীমালংঘনের পর্যায়ভুক্ত। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ হারাম জিনিস দেখার কারণে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর বলেন, **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ**, “তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী [সূরা আল-বাকারা ০২:১০]।” মিথ্যাবাদীরা সৎ পথ পায় না। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مَسْرُوفٌ كَذَّابٌ

“আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না [সূরা মু’মিন ৪০:২৮]।”

প্রকৃতিক বিপর্যয়: অশ্লীলতার প্রসার

অশ্লীলতা সমাজে যখন বেড়ে যায়, তখন প্রকৃতিক বিপর্যয় হয়। অশ্লীলতার জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। অশ্লীলতার প্রসারকারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُجْبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“যারা চায় যে, মু’মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি [সূরা আন নূর ২৪:১৯]।” আর এটা শতভাগ সত্য যে, নাফরমান, আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য বিরোধিতা, আল-কুরআন-হাদীস অবমাননা, যিনা-ব্যভিচারের ব্যাপকতা, যুলুম-নির্যাতন-নীপিড়ন বৃদ্ধি এবং বিধর্মী কর্তৃক মুসলিম নিধন ইত্যাদি মানুষের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তখন আকাশ থেকে যমিনে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন নামে ভাইরাস বা জীবানু অথবা সরাসরি গজবের ‘আযাব দিয়ে শাস্তি প্রেরণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ**, “যে ব্যক্তি মন্দকাজ করবে তাকে সে কাজের প্রতিফলন দেয়া হবে [সূরা আশ-শুরা ৪২:৩০]।”

প্রকৃতিক বিপর্যয় তথা বালা-মুসীবত দ্বারা মু’মিন ব্যক্তির পাপ মোচন

বালা-মুসীবত, যে কোন খারাপ অনুসর্গ, খারাপ জীবানু বা ভাইরাসসহ বিভিন্ন নামে সকল প্রকার গজব আল্লাহর হুকুমেরই হয়ে থাকে। আর তা কখনো ব্যক্তিগতভাবে হয় আবার কখনো সামষ্টিকভাবে হয়ে থাকে। আর সামষ্টিকভাবে রোগের প্রাদুর্ভাব হলে নিষ্পাপ মা’সুম শিশু বা ঈমানদার মুত্তাকী বান্দাও তাকদীরের কারণে মৃত্যু হবে। হাদীসের পরিভাষায় তা শহীদের মৃত্যু সমতুল্য বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ঘোষণা রয়েছে, যা সহীহুল বুখারী [كَفَّارَةُ الْمَرْضِ] باب হাদীস নং- ৫২০৯, সহীহ মুসলিম [باب مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ] হাদীস নং- ৪৬৬৭, সুনানুত

তিরমিযী [হাদীস নং- ২৯৬৪], আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হাদীস নং- ২০৩১২] ও মুসান্নাফু আবদুর রাজ্জাক [হাদীস নং- ৭৪৮৫] কিতাবে এভাবে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا

“আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলমান ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ পাপ মোচন করে দেন। এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় এর দ্বারাও।” অনুরূপভাবে সহীহুল বুখারীসহ হাদীসের বহু গ্রন্থে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির উপর সকল যন্ত্রনা, রোগ ব্যাধি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও ফেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয়, এ সবার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তার পাপসমূহ মোচন করে দেন [সহীহুল বুখারী الْمَرَضُ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ] বুখারী হাদীস নং- ৫২১০।” অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَرَضَ الْمُسْلِمِ يَذْهَبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تَذْهَبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

“মুসলমানদের অসুখের দ্বারা আল্লাহ তাদের গুনাহ তেমনি দূর করে দেন, যেমনি আগুন সোন-রূপার মরিচা দূর করে দেন [আবু দাউদ: عِيَادَةُ النِّسَاءِ] হাদীস নং- ২৬৮৮।” অপর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বলেন, “আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন, তাকে মুসীবতে লিপ্ত করেন [বুখারী الْمَرَضُ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ] হাদীস নং- ৫২১৩।” রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى إِلَّا حَاتَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ

“যে কোন মুসলিম মুসীবতে আক্রান্ত হয়, তার উপর থেকে গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরে যায়, যেভাবে বৃক্ষ থেকে ঝরে যায় তার পাতাগুলো [সহীহুল বুখারী, وَمَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ] হাদীস নং- ৫২১৫ ও ৫২২৯।” হাদীসের অপর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, “আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাযুক্ত গাছের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করলে অমনি পাতাগুলো ঝরে পড়ে। তিনি বলেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ কোন বান্দা “আল-হামদুলিল্লাহ”, “সুবহানাল্লাহ” এবং “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তিনি অতি পবিত্র এবং তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি মহান) বললে তা তার গুনাহগুলো এমনভাবে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে এ গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়েছে।” এ হাদীসটি সুনানুত তিরমিযী [অধ্যায়: কিতাবুত

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

দাওয়াত, **عَفْدُ الشَّيْبِ بِالْيَدِ** হাদীস নং- ৩৪৫৬], ‘কানযুল ‘উম্মাল’[হাদীস নং- ২০১০], আল-মুসনাদুল জামে’ [হাদীস নং- ১১৫৫, খ. ৪র্থ, পৃ. ৬৮], সহীহ ওয়া দা’ঈফু আল-জামি’উস সগীর [খ. ৬ষ্ঠ, হাদীস নং- ২৪৮১, পৃ. ৪২৮], সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব [খ. ২য়, হাদীস নং- ১৫৭০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩] এবং সহীহ ওয়া দা’ঈফু সুনানুত তিরমিযী [খ. ৮ম, হাদীস নং- ৩৫৩৩, পৃ. ৩৩] কিতাবে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে হাদীসটি ‘তাকসীরে কুরতুবী’ [খ. ১০ম, পৃ. ৪১৫] কিতাবেও উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী হাদীসটিকে ‘হাসান’ বলে মন্তব্য করেছেন [সহীহ আত-তারগীব, খ. ২য়, হাদীস নং- ১৫৭০, পৃ. ১১৩]।

অত্যধিক গুনাহের কারণে প্রকৃতিক বিপর্যয়

অত্যধিক গুনাহের কারণে ‘আযাব বা গজব সংঘটিত হয়ে থাকে। আর তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা বান্দার অত্যধিক গুনাহের কারণে (‘আযাব বা গজব) তা লিপিবদ্ধ করে থাকেন। তিনি বলেন,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

“পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে তা খুবই সহজ [সূরা আন-নিসা ০৪:১২৩]।” এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, সকল প্রকারের বালা-মুসীবত, ভাইরাস ও জীবানু আল্লাহর হুকুমেই হয়ে থাকে এবং শিশু বা মু’মিন মুত্তাকী বান্দাও তাকদীরের কারণে মৃত্যু হয়ে যায়। তা শহীদের মৃত্যু। তবে মু’মিনদের ভরসা শতভাগ আল্লাহর উপরই করা উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“(হে রাসূল!) বলুন, তোমাদের জন্য আল্লাহ যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ব্যতীত আমাদের জন্য কিছুই হবে না; তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহর উপরই মু’মিনদের নির্ভর করা উচিত [সূরা আত-তাওবা ০৯:৫১]।”

অত্যধিক যুলুম করার কারণে প্রকৃতিক বিপর্যয়

আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে সময় দিয়ে থাকেন, যেনো তারা তা উপলব্ধি করে তাওবা করে। তিনি বলেন,

وَأْمَلِي لَهُمْ إِنْ كُنْذِي مَتِينٌ

“আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ [সূরা আ’রাফ ০৭:১৮৩]।” যালেমদের সময় থাকতে উপলব্ধি করে তাওবা না করলে তাদের গজবের শাস্তি অবধারিত। তিনি বলেন, **لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ** “যালিমদেরকে আমি (আল্লাহ) অবশ্যই বিনাশ করবো [সূরা ইবরাহীম ১৪:১৩]।” যালিমরা গাফিল বা তাদের গুনাহের ব্যাপারে তারা উদাসিন। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

“তুমি কখনো মনে করো না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল, তবে তিনি তাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির [সূরা ইবরাহীম ১৪:৪২]।” সীমালংঘন ও যুলুমের কারণে আল্লাহ তায়ালা ‘আদ, সামূদ ও ফেরাউনের বংশের উপর কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে, “তুমি কি দেখো নাই তোমার প্রতিপালক করেছিলেন ‘আদ বংশের। ইরাম (‘আদ জাতির পূর্বপুরুষদের একজন) গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিলো সুউচ্চ প্রসাদের? যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি এবং সামূদের প্রতি, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহনির্মাণ করছিলো ও বহু সৈন্য-শিবিরের অধিপতির ফেরাউনের প্রতি? যারা দেশে সীমালংঘন করেছিলো এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিলো। অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। প্রতিপালক সবার উপর অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। মানুষ তো এইরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানানিত করেছেন’। আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিয়িক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, ‘আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন’ [সূরা ফাজ্র ৮৯:৬-১৬]।”

লুত পরিবারের সীমালংঘন ও যুলুমের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলেন এবং কঠিন শাস্তি দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ، وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذِرِّ، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ صَافِيهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرْ، وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرْ

“আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বহণকারী প্রচণ্ড ঝড়িকা, কিন্তু লুত পরিবারের উপর নয়; তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাত্রির শেষাংশে। আমার বিশেষ অনুগ্রহরূপ; যারা কৃতজ্ঞ, আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। লুত তাদেরকে সতর্ক করেছিলো আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করলো। তারা লুতের নিকট হতে তার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশ্যে দাবি করলো, তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং বললাম, ‘আশ্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম [সূরা কামার ৫৪:৩৪-৩৮]।” সীমালংঘন, অপরাধ ও যুলুমের কারণে এবং ঈমান না এনে রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে আল্লাহ তায়ালা বহু মানবগোষ্ঠীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করলেন। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

“তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমাতিক্রম করেছিলো। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলো, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি [সূরা ইউনুস ১০:১৩]।” আল্লাহর আযাব নাযিল

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

করার কারণ এবং কোন কোন জনপদের অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করার কারণ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّغُونَ

“আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে তার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা আক্রান্ত করি (আল্লাহর নবীকে অস্বীকার করলেও দীন প্রচারে বাধা দিলে তবেই আমি আল্লাহ আযাব নাযিল করি) যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে [সূরা আ'রাফ ০৭:৯৪]।”

সাবাবাসীরা শাম (প্রাচীন সিরিয়া) একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচের ব্যবস্থা করেছিল; ফলে সাবাবা দেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতো। তাদের অকৃতজ্ঞ ও অহংকার করায় এক সময় এ বাঁধ ভেঙ্গে ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার পানিতে ভেসে যায়। মূলত এটা তাদের অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞ ও অহংকারের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে বলে আল্লাহর ঘোষণা,

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جُنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ

“..পরে তারা অবাধ্য হলো। ফলে আমি তাদের উপর প্রবাহিত করলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের উদ্যান দু'টি পরিবর্তন করে দিলাম [সূরা সাবাবা ৩৪:১৬]।” অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ অহংকারী ছাড়া এমন শাস্তি আমি আল্লাহ কাউকে দেই না। মানবতার উপর যুলুম ও অত্যধিক অত্যাচারের কারণে আল্লাহ তায়ালা আকাশ বা উর্ধ্বদেশ অথবা যমীন বা পাদদেশ হতে গজবের শাস্তি প্রেরণ করে থাকেন। এ মর্মে আল্লাহর নির্দেশনা,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

“(হে রাসূল!) বলুন, তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আশ্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনি সক্ষম [সূরা আন'আম ০৬:৬৫]।”

আল্লাহর রাসূলের রেসালতকে অস্বীকার করলে প্রকৃতিক বিপর্যয়

আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বা তাঁর রেসালতকে (তথা কুরআন-সুন্নাহকে) অস্বীকার করলে মানুষকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ বা করোনা ভাইরাস দ্বারা পীড়িত করে থাকেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّغُونَ

“তোমার পূর্বেও আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; অতঃপর তাদেরকে অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করেছি, যাতে তারা বিনীত হয় [সূরা আন'আম ০৬:৪২]।” আল্লাহর প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর রেসালতকে স্বীকৃতি দিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে মানতে হবে। বলতে হবে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব তাঁরই ‘ইবাদত করতে হবে এবং তাঁর স্মরণার্থে সালাত কায়ম করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

“আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ‘ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করো [সূরা তাহা ২০:১৪]।” তাই মহান আল্লাহর নির্দেশ মেনে ‘ইবাদত করলে ও তাঁর স্মরণার্থে সালাত কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করলেই তিনি যাবতীয় গজব হতে মানবতাকে রক্ষা করবেন। রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার অপরাধ মারাত্মক। আর এ জাতিয় অবিশ্বাসীরাই মূলত ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلٌّ مَّا جَاءَ أُمَّةً رُسُوهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

“অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তার রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একেরপর এক ধ্বংস^{৩০} করলাম। আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয় করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা [সূরা আল-মুন ২৩:৪৪]।” তাই ঐশীবাণীপ্রাপ্ত আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে ‘মিথ্যাবাদী’ বলে গালি দিলে সে ধ্বংস হবেই।

মূলত তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করা প্রত্যেক মানবজাতির একান্ত প্রয়োজন এবং আল্লাহর একাত্ববাদের বিষয়টি Common Sense দ্বারা অনুধাবন করা দরকার। Common Sense দ্বারা অনুধাবন না করলে আল্লাহ তায়ালা দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি সাধন করে থাকেন। এ বিষয়ে ফেরা’উনের অনুসারীদের প্রসংগে তিনি বলেন,

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ

“আমি তো ফেরা’উনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে [সূরা আ’রাফ ০৭:১৩০]।” ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় কারা, তাদের পরিচয় আল্লাহ কুরআনে তুলে ধরেছেন। আল্লাহদ্রোহীতার ফলে গজব রাতে-দিনে সকালে-বিকালে যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে। আল্লাহ বলেন,

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ، أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

“তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন। অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত? তারা কি আল্লাহর কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহর কৌশল হতে নিরাপদ মনে করে না [সূরা আ’রাফ ০৭:৯৭-৯৯]।”

সর্ববস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া না করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন

প্রবাহমান পানিসহ সকল প্রকারের পানি আল্লাহ তায়ালা প্রেরণ করে থাকেন। সুতরাং সর্ববস্থায় তারই শুকরিয়া করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْحَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

“(হে রাসূল!) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি? [সূরা মুলক ৬৭:৩০]” আর আল-কুরআনের বর্ণিত ওয়াদাসমূহ অবশ্যই বাস্তবায়িত হবেই, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহর ঘোষণা,

إِنْ مَا تَوْعَدُونَ لَأْتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

“তোমাদের সঙ্গে যা ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না [সূরা আন’আম ০৬:১৩৪]।” বহু মানবগোষ্ঠকে আল্লাহদ্রোহিতা ও কুকর্মের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَا وَرَثًا

“তাদের পূর্বে আমি কতো মানবগোষ্ঠকে বিনাশ করেছি- যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিলো [সূরা মারইয়াম ১৯:৭৪]।” অপর আয়াতে বলা হয়েছে, “যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভর করেছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না, যা তাদের ধারণাতীত। অথবা চলাফেরা করতে তিনি তাদের ধৃত করবেন না? তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সম্ভ্রান্ত অবস্থায় ধৃত করবেন না? তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ালু, পরম দয়ালু [সূরা নাহাল ১৬:৪৫-৪৭]।”

আল-কুরআনকে সতর্কবাণীস্বরূপ গ্রহণ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে সতর্কবাণীস্বরূপ পাঠিয়েছেন। যাতে প্রত্যেক মানুষ তাকে ভয় করে ও তার মূল্যবান উপদেশসমূহ গ্রহণ করে চলে। এ প্রসংগে কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

“এরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি ‘আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী যাতে তারা ভয় করে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ [সূরা তাহা ২০:১১৩]।” অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্তৃতামুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে [সূরা আয-যুমার ৩৯:২৭-২৮]।”

প্রকৃতিক বিপর্যয়ে নাক্ষত্রমানদের উপর শাস্তি আকস্মিকভাবে প্রেরণ

আল্লাহ তায়ালা নাক্ষত্রমানদের উপর শাস্তি আকস্মিকভাবে প্রেরণ করে থাকেন। যারা চিন্তাও করতে পারে না। তিনি বলেন,

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

“তাদের জন্য আফসোস! যারা স্বহস্তে পুস্তক রচনা করে এবং পার্থিব তুচ্ছ স্বার্থের জন্য বলে যে, এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত- তাদের হস্তে যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ এবং তারা যা উপার্জন করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ! [সূরা আল-বাকারা ০২:৭৯]।” আর আল্লাহর নাক্ষত্রমানদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে। তারা চিন্তাও করতে পারবে না। এ মর্মে কুরআনের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

“তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকতো তবে শাস্তি তাদের উপর অবশ্যই আসতো। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে [সূরা আনকাবুত ২৯:৫৩]।” আর যালিমদেরকে যুলুম করার অবকাশ দেয়া প্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكَايْنٍ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا وَإِلَى الْمَصِيرِ

“...এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কতো জনপদকে যখন তারা ছিলো যালিম; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট [সূরা হজ্জ ২২:৪৮]।” যালিমদেরকে নতজানু অবস্থা বিভিন্ন মহামারী গজব দিয়ে ধ্বংস করা হবে এবং মুত্তাকী ঈমানদারদেরকে ঐ গজব থেকে উদ্ধার করা হবেই। আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেন,

لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثًّا ، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا

“...আমি তো তাদেরকে এবং শয়তানদেরকেসহ একত্রে সমবেত করবোই ও পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবোই। ... পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেবো [সূরা মারইয়াম ১৯:৬৮ ও ৭২]।” আর ইচ্ছাকৃতভাবে ঈমানদার ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তার বদলে শাস্তি হলো চিরকালের জাহান্নাম বলে আল্লাহর ঘোষণা, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ঈমানদার কাউকে হত্যা করলে তার বদলে শাস্তি হলো চিরকালের জাহান্নাম [সূরা আল-বাকারা ০২:১১]।”

সীমাতিক্রম ও অপরাধী সম্প্রদায়ের কারণে প্রকৃতিক বিপর্যয়

সীমাতিক্রম ও অপরাধী বা পাপি সম্প্রদায়কে প্রতিফল প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ
“অবশ্য তোমাদের পূর্বে মানবগোষ্ঠীকে আমি তো ধ্বংস করেছি যখন তারা সীমাতিক্রম করেছিলো। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ এসেছিলো, কিন্তু তারা ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। এভাবে আমি অপরাধী (পাপি) সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি [সূরা ইউনুস ১০:১৩]।” অনুরূপভাবে সূরা আল-ইসরা বলা হয়েছে-

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
“নূহের পর আমি কতো মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তার বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট [সূরা আল-ইসরা ১৭:১৭]।” অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ الْأُولَىٰ بِصَانِعِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
“আমি তো পূর্ববর্তী বহু মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে [সূরা আল-কাসাস ২৮:৪৩]।” এ আয়াতে স্পষ্ট যে, আসমানি গ্রন্থসমূহ মানব জাতির জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহস্বরূপ। সুতরাং সর্বশেষ আসমানি কিতাব ‘আল-কুরআন’ এর অনুগত্য করলেই সঠিক পথ ও সকল প্রকার বাল্য-মুসীবত ও ক্ষতিকারক ভাইরাস থেকে রক্ষা পাবে। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে ‘আদ, সামূদ ও রাস্‌স এর অধিবাসীকে ধ্বংসের প্রসংগে এসেছে,

وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا
“আমি ধ্বংস করেছিলাম ‘আদ, সামূদ ও রাস্‌স এর অধিবাসীকে এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কে [সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩৮]।” মানবগোষ্ঠীকে তাদের অত্যাচার ও যুলমের কারণে ধ্বংস করা হয়, যেনো তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। এ প্রসংগে সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে,

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ
“তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের পূর্বে কতো মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না? [সূরা ইয়াসীন ৩৬:৩১]।” ‘সূরা ত্বা-হায় বলা হয়েছে,

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى
“ইহাও কি তাদেরকে সৎপথ দেখালো না যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? অবশ্যই তাতে বিবেকসম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শন [সূরা তা-হা ২০:১২৮]।” অস্বীকারকারীদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ
“ইহাও কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করলো না যে, আমি তো তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কতো মানবগোষ্ঠী-যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে থাকে? তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; তবুও কি তারা

শুনবে না? [সূরা আস-সিজদা ৩২:২৬]।” অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ করার শাস্তি পেতেই হবে। এ জন্য পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ الْمُجْرِمُونَ

“এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইও না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না। সে বললো,^২ ‘এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।’ সে কি জানতো না আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে যারা তা অপেক্ষা শক্তিতে ছিলো প্রবল, জনসংখ্যায় ছিলো অধিক? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না [সূরা আল-কাসাস ২৮:৭৭-৭৮]।” জীন ও মানব সম্প্রদায় নাফরমানি করলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

“তাদের পূর্বে যে জীন ও মানব সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের মতো এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো ক্ষতিগ্রস্ত [সূরা আল-আহকাফ ৪৬:১৮]।” অর্থাৎ আল্লাহর কথা সব সময়ই সত্যই হয়ে থাকে এবং তার নাফরমানি করলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীগণ আল্লাহর গজবে আক্রান্ত

আর সীমালংঘনকারীরা দুনিয়াতে সাময়িক সুখস্বচ্ছন্দ্য করলেও আখেরাতে তাদের কোন উপকার আসবেনা। ফলে তারা জাহান্নামের আসামি হিসেবে চিরস্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থান করবে এবং দুনিয়াতে বিভিন্নভাবে আল্লাহর গজবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা:

لَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ

“তোমাদের পূর্বযুগে আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিলো না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাতে নিষেধ করতো। সীমালংঘনকারীরা যাতে সুখস্বচ্ছন্দ্য পেতো তারাই অনুসরণ করতো এবং তারাই ছিলো অপরাধী [সূরা হুদ ১১:১১৬]।” অর্থাৎ সীমালংঘনকারীরা সর্বাবস্থায় মারাত্মক অপরাধী এবং তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার কারণে বিভিন্নভাবে আল্লাহর গজবে আক্রান্ত হয়ে ধ্বংস হয়।

উপর্যুক্ত আল-কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে স্পষ্টভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আল্লাহদ্রোহিতা কারণে আল্লাহ তায়ালা বহু জাতিকে বিভিন্ন ধরনের গজব পাঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে নির্বিচারে নির্মমভাবে গণহত্যাসহ বিশ্বের অনেক স্থানে মানবজাতির মাঝে যুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, ন্যায়বিচার বহিঃভূত বিচারকার্য, মিথ্যাচার, যিনা-ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি হয়। যা যে কোন সমাজের জন্য বড় মারাত্মক ব্যাধি।

বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার উপায়

১. পরস্পকে কষ্ট না দেয়া। সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার্থে মানবজাতিকে শারীরিক-মানসিক শান্তিদান বা অথবা মানসিকভাবে কষ্ট দেয়াকে রাসূল (সা.) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

الْمُسْلِمُ مِنَ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার কথা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে [সহীহুল বুখারী: ২০৯]।”

২. যুলুম-নির্যাতন ও কৃপনতা থেকে বেঁচে থাকা। রাসূলুল্লাহ (সা.) সবাইকে সাবধান করে বলেছেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ

“তোমরা যুলুম করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা যুলুম কিয়ামতের দিন মারাত্মকভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাবে, তোমরা কৃপনতা করো না, কেননা, কৃপনতা ধ্বংস করে [সহীহ মুসলিম: ৪৬৭৫]।” সুতরাং প্রত্যেক মানুষকে যুলুম ও কৃপনতা থেকে বেঁচে থাকা ঈমানী দায়িত্ব। অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

“যালেম (যুলুমকারী ব্যক্তি) ও মাযলুম (যার ওপর যুলুম করা হয়) উভয়কে সাহায্য করো [সহীহুল বুখারী, ৬৪৩৮]।” মাযলুমকারীকে যুলুম হতে রক্ষা করা এবং যুলুমকারীকে যুলুম করতে না দেয়ার অর্থই উভয়কে সাহায্য করা।

৩. নিজ নিজ উদ্যোগে নিষ্ঠুরতা থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ [সূরা আল-আন‘আম ০৬:১৬৪]।” রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ঐতিহাসিক বিদায় ভাষণে বলেন, “যে কারো অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেয়া যাবে না। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের পিতাকে দায়ী করা যাবে না [সহীহ ইবন হিব্বান, হা. নং ৬০৯৫]।” সুতরাং নিষ্ঠুরতা কোন অবস্থাতেই করা যাবে না। সচেতন হয়ে নিজ নিজ উদ্যোগে এর থেকে সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে।

৪. কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“রাসূল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক (সূরা আহযাব ৫৯:২১)।” রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদীর্ঘ নবুওয়াতী জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামী শরী‘আতের নির্দেশনা দিয়েছেন। আর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) যা আদেশ করেছেন’ এবং ‘যা নিষেধ

করেছেন’ এ সবকিছু গ্রহণ ও বর্জন করতে হলে এবং তাঁর আদর্শ অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে [‘ইলমু উসূলিল ফিক্হ, পৃ. ২৪]। আল্লাহ বলেন,

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

“তোমরা সামনে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত [সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২১]।” অপর আয়াতে এসেছে,

يُخَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

“আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে ও পরকালে। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন [সূরা ইব্রাহীম ১৪:২৭]।” পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ধাবিত হওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“যদি কোন বিষয়ে তোমাদের পারস্পারিক ঝগড়া-বিবাদ ঘটে, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে যাও (সূরা আন-নিসা ০৪:৫৯)।” এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মায়মুন ইবন মেহরান বলেন, আল্লাহর প্রতি ফিরানোর অর্থ আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল মাজীদে দিকে ফিরানো এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ফিরানোর অর্থ হলো: সাহাবীগণ সরাসরি তাঁর থেকে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর মৃত্যু (জান কবয) ঘটিয়েছেন, তখন এর অর্থ হবে তাঁর সুন্নাত বা হাদীসের দিকে ফিরানো (তাফসীরু মাহাসিনিত তাবীল, খ. ১ম, পৃ. ১৩৮)।”

বাতিল জিনিসের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা এবং তার দ্বারা প্রতারণিত না হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

لَا يَغُزُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ

“নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। এটা তো কয়েক দিনের সজ্জাগ। এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটা হলো অতিনিকৃষ্ট অবস্থান [সূরা আল-ইমরান ০৩:১৯৭-১৯৮]।” মসজিদে, বাজারে, কর্মক্ষেত্রে এবং ঘরে সর্বক্ষেত্রে সঠিক পথকেই ধরে থাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“বলুন! আমার সালাত নামায, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন-মরণ বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তার কোন অংশিদার নেই। আমি তারই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল [সূরা আল-আন’আম ০৬:১৬২-১৬৩]।” কুরআন সূন্যাহর দিকে দৃঢ়ভাবে ফিরে আসা। বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব আসলে মুসলমানদের উচিত হলো আল-কুরআন সূন্যাহর দিকে দৃঢ়ভাবে ফিরে আসা।

৫. নাফরমানি থেকে ফিরে আসা। সকল প্রকার বালা-মুসীবত আল্লাহ তায়ালায় অবাধ্য ও নাফরমানি থেকে ফিরে আসার জন্য সতর্কতামূলক আযাব আসে থাকে। আর ভাইরাসও অন্যতম সতর্কতামূলক

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

অন্যতম একটি আযাব। গজবের কোন মোকাবিলা হয় না। বরং আল্লাহ বিধান আল-কুরআন ও হাদীসের দিকে ফিরতে হয় এবং গজব থেকে পানাহ চাইতে হয়।

৬. ‘তাওবা’ ও ‘ইস্তেগফার’ করা। আল্লাহর গজব ও আযাব থেকে রক্ষার জন্য ‘তাওবা’ ও ‘ইস্তেগফার’ করতে হয়। এর বিকল্প আর কি হতে পারে?। ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলা ও সচেতনতার কথাও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। তবে গজব আসলে বিজ্ঞান-ডাক্তার কোনটাই কাজে আসেনা। কারণ خُلِقَ الإنسان ضعیفًا “মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বলরূপে [সূরা আন-নিসা ০৪:২৮]।” আল্লাহর নিকট ‘তাওবা’ করার জন্য তিনি ‘সূরা আন-নূর’-এ নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো [সূরা আন-নূর ২৪:৩১]।” আল্লাহর নিকট ‘তাওবা’ করার জন্য ‘সূরা আত-তাহরীমে’ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়ে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো, আন্তরিক তাওবা (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:০৮)।” আল্লাহর নিকট ‘ক্ষমা’ চাওয়ার জন্য ‘সূরা হুদ’-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

“আর তোমরা নিজেদের পালন কর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করো। তাহলো তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন [সূরা হুদ ১১:০৩]।” আল্লাহর তায়ালা তাঁর বান্দার ‘তাওবা’ কবুল ও গুনাহ ক্ষমা করার কথা ‘সূরা আশ্-শুরা’-এভাবে বলেছেন-

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত আছেন [সূরা আশ্-শুরা ৪২:২৫]।” আল্লাহর তায়ালা তাঁর বান্দার ‘তাওবা কবুল করার কথা এভাবে বলেছেন,

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“তারা কেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে না? ক্ষমা প্রার্থনা করে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু [সূরা আত-তাওবা ০৯:১০৯-১১০]।” আল্লাহর তায়ালা তাঁর বান্দার ‘তাওবা কবুল করার কথা ‘সূরা আল-ফুরকান’এ এভাবে বলেছেন-

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

“কিন্তু যারা তাওবা করে ও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে ভালো আমল

দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু [সূরা আল-ফুরকান ২৫:৭০]।” সকল প্রকার মহামারী থেকে মুক্তি পেতে হলে ‘আমলে সালেহের পাশাপাশি ‘তাওবা’ ও ‘ইস্তেগফার’ বেশি বেশি করা দরকার।

৭. ‘আমলে সালেহ বা নেককর্মে করা। ‘আমলে সালেহ বা নেককর্মের উসীলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি দ্রুত কবুল করেন। যা সহীহ লি-মুসলিম [بَابُ تَقْدِيمِ بَرِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى التَّطَوُّعِ] হাদীস নং- ৪৬২৬] হাদীসে বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তির দু’আ কবুলের ঘটনাটি দ্বারা স্পষ্ট। বেশি বেশি ‘আমলে সালেহ করা।

৮. রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দুরূদ পাঠ করা। দু’আ করার পূর্বে কিছু সূরা তেলাওয়াত করা ভালো। তবে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উপর দুরূদ পাঠ না করলে (إِنَّ الدُّعَاءَ مُؤَقُّوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا) “আসমান ও যমীনের মাঝে দু’আটি থেমে থাকে [بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى] “বলে সুনানুত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে [জামে আত-তিরমিযী, صلى, ৮৪৮]।” সহীহ লি-মুসলিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা.) “يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ” (হা. নং- ৪৪৮)।” হাত উঠু করে দু’আ করতেন [সহীহ মুসলিম, الاستِسْقَاءُ فِي الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ] (হা. নং- ১৪৯০)।” তবে (لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) “আযান ও ইকামতের মাঝখানের সময়ে বেশি দু’আ কবুল হয় [সুনানু আবী দাউদ, الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ] (হা. নং- ৪৩৭)।” রাসূলুল্লাহ (সা.) মা’সুম বা নিষ্পাপ হওয়ার পরও সর্বদা তাঁর ‘আমল সম্পর্কে সহীহুল বুখারীতে এসেছে-

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِحَذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي

“রাসূলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর নিকট গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ তুমি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা কর [সহীহুল বুখারী, مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ] (হা. নং- ৫৯১৯)।” “হে আল্লাহ তুমি আমাকে জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, দাজ্জালের ফিৎনা থেকে রক্ষা কর [সহীহ মুসলিম, مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ] (হা. নং- ৯৩০)।”

৯. আল্লাহর যিকির করা। ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর যিকির করতেন [জামি’ আত-তিরমিযী, অনু. মুহাম্মদ মুসা, হা. নং- ৩৩২০, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৯৬]।” এ হাদীসটি ‘সহীহ লি-মুসলিম’ [الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا] (হা. নং- ৫৫৮), সুনানুত তিরমিযী [بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ دُعَاةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ] (হা. নং- ৩৩০৬), ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁর ‘আল-মুসনাদ’ [হা. নং- ২৫১৭২, খ. ৫৩, পৃ. ৩২০] ‘আস-সুনানুল কুবরা’ [খ. ১ম, باب الرجل يذكر الله تعالى] (খ. ১ম, ১৭০৪৯, খ. ৫১, পৃ. ১৪২), ‘আল-মুসনাদুল জামে’ [হা. নং- ০১, পৃ. ৯০], ‘আল-মুসনাদুল জামে’ [হা. নং- ১৭০৪৯, খ. ৫১, পৃ. ১৪২],

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

‘তুহফাতুল আশরাফ বিমা’রিফাতিল আতরাফ’ [হা. নং- ১৬৩৬১, খ. ১২, পৃ. ৩৫৯] এবং ‘সহীহ ওয়া দা’ঈফু সুনানুত তিরমিযী’ [খ. ৭ম, হা. নং- ৩৩৮৪, পৃ. ৩৮৪] সহ আরো অনেক কিতাবে পাওয়া যায়। মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী হাদীসটিকে গষণামূলক তাহকীক করে صحيح ‘সহীহ’ বলে মন্তব্য করেছেন [সহীহ ওয়া দা’ঈফু সুনানুত তিরমিযী, খ. ৭ম, হা. নং- ৩৩৮৩, পৃ. ৩৮৩]।^{১০} দু’আ ও যিকির উচ্চস্বরে না পড়ে নিম্নস্বরে পড়তে হয়। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“তোমরা প্রভুকে স্মরণ করো, মনে মনে বিনীত ও সশংকচিত্তে (ভীতিসহকারে) অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ, সর্বক্ষণ) এবং তুমি উদাসীন হবে না [সূরা আল-‘আরাফ ০৭:২০৫]।”

১০. আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে দু’আ করা। দু’আর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর নিকট মানুষের ফরিয়াদ (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) “দু’আ করাও ইবাদাতের পর্যায়ভুক্ত [সুনানু আবী দাউদ, باب الدُّعَاءِ, হা. নং- ১২৬৪]।” দু’আ বা মহান আল্লাহর নিকট সরাসরি প্রার্থনার মাধ্যমে একজন মানুষের দৈহিক রোগের শিফা বা আরোগ্য, দুঃখ-বেদনা দূরকারী এবং ক্বালব বা অন্তরের শক্তি ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে থাকে, অহংকার দূর হয়ে যায়। দু’আ করা (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) ‘ইবাদাতের প্রাণ [সুনানু আবী দাউদ, অনুচ্ছেদ-باب الدُّعَاءِ, হা. নং- ১২৬৪]।’ হাদীসের অপর বর্ণনায় দু’আকে (الدُّعَاءُ مَحْ الْعِبَادَةُ) ‘ইবাদাতের মগজ বলা হয়েছে’ [সুনানুত তিরমিযী, অনুচ্ছেদ-باب الدُّعَاءِ, হা. নং- ৩২৯৩]। আর ‘ইবাদতের জন্যই আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ‘ইবাদত করবে [সূরা আযযারিয়াত ৫১:৫৬]।” আর ‘ইবাদত কখনো বিফলে যায় না। আর দু’আ করলে কখনো সাথে সাথে আবার কখনো বিলম্বে কবুল হয়। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী (الدُّعَاءُ فِي الْأَيْدِي) “দু’হাত উত্তোলন করে দু’আ করতে হয় [সহীহ মুসলিম, الاستِسْقَاءُ فِي الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ, হা. নং- ১৪৯০]।” আল্লাহ মানুষকে দয়া ও মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। মানবতাকে ধ্বংস করার জন্য নয়। তিনি বলেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقَرْيَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

“তোমার প্রতিপালক এরূপ নহেন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করবেন, অথচ এর অধিবাসীরা পুন্যবান (সূরা হূদ, ১১৭)।” দু’আর মাধ্যমে আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করে [সুনানুত তিরমিযী, অনুচ্ছেদ-باب الدُّعَاءِ, হা. নং- ৩২৯২]। আল্লাহর কাছে বান্দা প্রার্থনা করলে অবশ্যই তিনি তা কবুল করবেন মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে-

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

“তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো, যারা অহংকারে আমার ‘ইবাদাত বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্চিত হয়ে [সূরা মু’মিন ৪০:৬০]।” পৃথিবীর পূর্ববর্তী-পরবর্তী ‘আলিমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষ মহান আল্লাহর নিকট যতো ধরনের দু’আ করে, তন্মধ্যে ওহীলব্ধ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত দু’আসমূহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক উপকারী। কেননা, দুনিয়া ও আখিরাতে এর এমন কোন দিক ও প্রয়োজন নেই, যা এসব দু’আয় বর্ণিত হয়নি। নিজ নিজ ভাষায় প্রার্থনার পূর্বে দু’আগুলো সর্বদা পাঠ করা দরকার। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ

“আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু’আর চাইতে কোন জিনিস আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত নয় [তিরমিযী, অনু. মুহাম্মদ মুসা, হা. নং- ৩৩০৭, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ৮৯]।” এ হাদীসটি সুনানুত তিরমিযী (باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الدُّعَاءِ-), হাদীস নং- ৩২৯২), ‘সহীহ ওয়া দা’ঈফু আল-জামি‘উস সগীর’ [খ. ২০, হা. নং- ৯৫২৩, পৃ. ৯৫] এবং ‘সহীহ ওয়া দা’ঈফু সুনানুত তিরমিযী’ [খ. ৭ম, হা. নং- ৩৩৭০, পৃ. ৩৭০] কিতাবে পাওয়া যায়। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়াল্লা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي

“আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে রূপ ধারণা করে, আমি সে ধারণার নিকটে আছি (অর্থাৎ বান্দার ধারণা অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকি) এবং আমি বান্দার সাথে আছি যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।” এ হাদীসটি সহীহ লি-মুসলিম (إِلَى اللَّهِ تَعَالَى) (باب فَضْلِ الذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى), হা. নং- ৪৮৪৯), সুনানুত তিরমিযী (باب مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ) [খ. ২০, হা. নং- ২৩১০] এবং মুসনাদু আহমদ ইবন হাম্বল [হা. নং- ৯৩৭৩, ৯৮৩৪, ১০৫৩৮, ১২৭১৫ ও ১৩৪২৯] কিতাবে পাওয়া যায়।

‘উমর (রা.) এর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বিপদগ্রস্ত ভাইরাসে আক্রান্ত না হওয়ার দু’আ করতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفَضُّلاً

“আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তোমার (মহামারী) বিপদ হতে মুক্ত রেখেছেন এবং যিনি আমাকে অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা প্রদান করেছেন।” এ দু’আটি জামি‘উত তিরমিযী [باب مَا يَقُولُ إِذَا] (باب مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ) [খ. ৫ম, হাদীস নং- ১৯৬১, পৃ. ৫৯], সহীহ ইবন হিব্বান [হা. নং- ৫৩০৯, খ. ২১, পৃ. ৪৮০] এবং আল-মু‘জামুল কাবীর লিত-তাবারানী [হা. নং- ২২১, খ. ১১, পৃ. ৩৫৪] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

খালেদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) এর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বিপদগ্রস্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্কে বা ভয়ে ঘুম না আসলে এ দু’আ পড়া শিক্ষা দিয়েছেন,

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونِ

“আমি পানাহ চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের ওসিলায় আল্লাহর গজব ও শাস্তি হতে এবং আল্লাহর বান্দাগণের অনিষ্টকারিতা হতে এবং শয়তানদের ওয়াস্ ওয়াসাহ হতে ও যেনো শয়তানেরা আমার নিকট আসতে না পারে।” এ দু’আটি জামি’উত তিরমিযী [رَأَى مُبْتَلًى] হা. নং- ৩৩৫৩, ৩৩৫৪, মুয়াত্তা ইমাম মালিক [التَّعَوُّذُ] হাদীস নং- ১৪৯৬) ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর ‘আল-মুসনাদ’ [হা. নং- ৬৪০৯, ১৫৯৭৮ এবং ২২৭১৯] মুসান্নাফু আবী শায়বা [في الرجل يفرغ من في الرجل يفرغ من] হা. নং- ০১, খ. ৫ম, পৃ. ৪৪৮] এবং আল-মু’জামুল আওসাত লিত-তাবারানী [হা. নং- ৯০৯, খ. ২য়, পৃ. ৪৪২] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। বিপদগ্রস্ত সকল মহামারীতে আক্রান্ত হওয়ার আতঙ্কে বা ভয়ে ঘুম না আসলে উক্ত দু’আ পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ‘আমল।

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত দু’আসমূহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। আল-কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু’আসমূহ ওহীয়ে মাতলু বা প্রত্যক্ষ ওহী এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত দু’আসমূহ ওহীয়ে গাইরে মাতলু বা পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মাধ্যমে এসেছে। তাই এ দু’আসমূহের মাধ্যমে রয়েছে অধিক কল্যাণ ও উঁচু স্তরের মর্যাদা। আল-কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর শেখানো ভাষা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র যবানে বর্ণিত ভাষার মাধ্যমে দু’আ আরও বেশি মর্যাদা-সম্মান ও কবুলের আশা করা যায়।

১১. মহামারী থেকে বেঁচে থাকা দু’আ

আবী সালমা (রা.) এর বর্ণনায় রাসূল (সা.) বিপদগ্রস্ত ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেলে তা থেকে দু’আ করতেন-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ اخْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأَجْزِنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا

“আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার মুসিবতের সাওয়াব চাই, এ মুসিবতের মধ্যে আমাকে তুমি আশ্রয় দান করো এবং এ মুসিবতের পরিবর্তে আমাকে কল্যাণ দান করো।” এ দু’আটি সুনানুত তিরমিযী [بِإِلْدٍ التَّسْبِيحِ] হা. নং- ৩৪৩৩ ও মা’রিফাতুস সাহাবা [হা. নং- ৩৭৭৪, খ. ১২, পৃ. ১১৭] কিতাবে এসেছে। তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করোনাসহ যেকোন মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে গেলে পড়তে হবে,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

“আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তমকার্য নির্বাহক, তারই ভরসা করছি।” এ দু’আটি জামি’উত তিরমিযী [بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الصُّورِ] হা. নং- ২৩৫৫, মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল [হা. নং- ২৮৫৩, ১০৬১৪] সহীহ ইব্ন হিব্বান [হা. নং- ৮২৪, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৩৮], মুসান্নাফু আবী শায়বা [হা. নং- ৮২৪,

খ. ৪র্থ, পৃ. ১৩৮] এবং আল-মু'জামুল কাবীর লিত-তাবারানী [হা. নং- ২২১, খ. ১১, পৃ. ৩৫৪] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

হে আল্লাহ! আমরা দুর্বল। আমাদের ঈমানও দুর্বল। তুমি আমাদের ঈমানের পরীক্ষা দিও না। আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর। আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করো। আমাদের সকল প্রকারের গুনাহ ক্ষমা করো। বেশি বেশি আমলে সালেহ করার তাওফীক দাও। আমাদেরকে সকল স্তরের মহামারী থেকে হেফায় করো। বিশেষ করে ‘করোনা ভাইরাস’ বা ডেঙ্গুজ্বর এর মতো মারাত্মক মহামারি দিও না। সকল স্তরের মহামারি থেকে মুক্তির দু‘আ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

“হে আল্লাহ! তোমার গজব দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না, তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না, বরং তার আগেই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।” এ দু‘আটি জামি‘উত তিরমিযী [باب مَا يَقُولُ] হা. নং- ৩৩৭২, মুসনাদু আহমদ [হা. নং- ৫৫০৩, খ. ১২, পৃ. ৪০] আল-মুসান্নাফু আবু শায়বা [হা. নং- ০৬, খ. ৭ম, পৃ. ৩০], ইমাম বাইহাকী তাঁর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ [খ. ৩য়, অনুচ্ছেদ-৪, শাযবা [হা. নং- ০৬, খ. ৭ম, পৃ. ৩০], ইমাম নাসাঈ তাঁর ‘আস-সুনানুল কুবরা’ [খ. ৬ষ্ঠ, হা. নং- ১০৭৬৪, পৃ. ২৩০], ইমাম হাকেম তাঁর ‘আল-মুত্তাদারাকু’ [খ. ১০, হা. নং- ১৩০৫২, পৃ. ৪৫৬], কানযুল ‘উম্মাল [হা. নং- ১৮০৩৫, খ. ৭ম, পৃ. ৭৬] এবং ‘মেশকাতুল মাসাবীহ’ [باب في الرياح, হা. নং- ১৫২১] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। গজব থেকে মুক্তির আরেকটি পরীক্ষিত দু‘আ,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

“হে আল্লাহ! আমি শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ হতে, পাগলামী হতে, খুঁজলী-পাঁচড়া হতে এবং বিভিন্ন প্রকারের ঘৃণ্য রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।” এ দু‘আটি সুনানু আবী দাউদ [باب في الاستعاذة] হা. নং- ১৩২৯ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁর ‘আল-মুসনাদ’ [হা. নং- ১২৫৩৪] ও মুহাম্মদ ইবন হিব্বান তাঁর ‘আল-মুসনদুস সহীহ’ [খ. ৫ম, ذكر ما يستحب للمريض أن يتعوذ بالله, হা. নং- ১০২৩, পৃ. ২৮] কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

সকল প্রকারের গজব, ভাইরাস ও মহামারী থেকে রক্ষা পাওয়ার দু‘আ,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي...وَأَمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদ সম্পর্কে আপনার কাছে অনুকম্পা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমার লজ্জাস্থানকে ঢেকে দিন এবং আমার ভয়গুলো বিদূরিত করুন এবং আমাকে সামনে ও পিছন থেকে এবং ডান ও বাম দিক থেকে এবং আমার উপরের দিক

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমার নিচে দিয়ে আমাকে ধসিয়ে দেয়া থেকে আমি আপনার নিকট পানাহ চাই।” এ দু’আটি সুনানু আবী দাউদ [إِذَا أَصْبَحَ] হা. নং- ৪৪১২ ও সুনানু ইব্ন মাজা [وَإِذَا أَمْسَى] হা. নং- ৩৮৬১] কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।
দেহের অনিষ্ট এবং শয়তানের অনিষ্ট ও শিরক থেকে মুক্ত থাকার জন্য আবু বকর (রা.)কে রাসূল (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন,

اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَ

“হে আল্লাহ! অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞতা, আসমান ও জমীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমি আমার দেহের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট ও শেরেকি কার্যকলাপ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।” এ দু’আটি সুনানু তিরমিযী [إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى] হা. নং- ৩৩১৪, সহীহ ইব্ন হিব্বান [হা. নং- ৯৬৭] আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হা. নং- ৭৭১৫ ও ৯৮৩৯] ও মুসনাদু আহমদ ইব্ন হাম্বল [হাদীস নং- ৪৯, ৬০ ও ৭৬২০] কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন বিধায় তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতাল, বাজার^৪-ঘাট বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মহামারী হতে মুক্তির দু’আ প্রসঙ্গে এসেছে,

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ أَوْ نُضِلَّ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا

“আল্লাহর নামে, আমি ভরসা করলাম আল্লাহর উপর। হে আল্লাহ! আমার পদস্থলন থেকে কিংবা পথভ্রষ্টতা থেকে কিংবা অত্যাচার করা থেকে অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে অথবা অজ্ঞতাবশত কারো অশোভন আচরণ থেকে বা আমাদের প্রতি কারো অজ্ঞতাপ্রসূত আচরণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।” এ দু’আটি সুনানু তিরমিযী [إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ] হা. নং- ৩৩৪৯, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হা. নং- ২৫৩৫০, খ. ৫৪, পৃ. ৬২] ও আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর ‘আল-মুসনাদ’ [হা. নং- ২৫৪০০] কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, যে এ দু’আ পড়বে, কোন কিছুই তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তা হলো,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

“আ‘উযু বি কালিমাতিল্লাহিত্ তা‘ম্মাতি মিন শারির মা-খালাক।” হাদীসটি সহীহ লি-মুসলিম [বাব ৭] হা. নং- ৪৮৮১, ৪৮৮২ ও ৪৮৮৩, ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা [হা. নং- ১৪৯৭], সুনানু আবী দাউদ [بَابُ كَيْفِ الرُّفَى] হা. নং- ৩৩৯৯, সুনানু তিরমিযীতে ০৩ বার (بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ) হা. নং- ৩৩৫৯, ৩৪৫১ এবং ৩৫২৯, সুনানু ইব্ন মাজা (بَابُ رُقِيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ) হা. নং- ৩৫০৯, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁর ‘আল-মুসনাদ’ [হা. নং- ৬৪০৯] কিতাবেও উল্লেখ করেছেন।

তাই করোনা ভাইরাসসহ সকল প্রকারের ক্ষতিসাধন থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে এ দু'আটি কার্যকর। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসীবতের সময় এ দু'আ পড়তেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

“আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, যিনি মহান ধৈর্যশীল, যিনি মহান আরশের অধিপতি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, যিনি আকাশসমূহে রব ও যমীনের রব এবং সম্মানিত ‘আরশের রব [সহীহ মুসলিম, ১-৮৯০৯]।” বাল্লা-মুসীবতে আক্রান্ত হয়ে গেলে তার থেকে মুক্তি পাওয়া অপর দু'আ,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

“আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি মর্যাদাসম্পন্ন, মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি অতি সহনশীল, অতি দয়ালু। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আমি তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি, তিনি মহান আরশের প্রতিপালক [তিরমিযী, অনু. মুহাম্মদ মুসা, হা. নং- ৩৪৩৬, খ. ৬ষ্ঠ, পৃ. ১৭৪-১৭৫]।”

শরীরের যে-কোনো স্থানে ব্যথা হলে তা মুক্তি পাওয়ার দু'আ, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

صَبَّحَ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأْتَمُّ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ

“তুমি তোমার হাত ব্যাথার জায়গায় রাখো এবং তিনবার ‘বিসমিল্লাহ’ বলো এবং সাতবার এ দু'আ পড়। وَأَخَذِرْ. [আমি যে ব্যথা অনুভব করছি এবং যে ভয় পাচ্ছি তা থেকে আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।] এ দু'আটি সহীহ লি-মুসলিম [بَابُ اسْتِخْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ] সহীহ ইবন হিব্বান [بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا] হা. নং- ৪০৮২, সুনানু ইবন মাজা [بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا] হা. নং- ৩৫১৩, সহীহ ইবন হিব্বান [بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا] হা. নং- ৩০২৬ আল-মু'জামুল কাবীর [হাদীস নং- ৮২৬৩] আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ [হা. নং- ২০৮৩৯] কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত দু'আর শব্দগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেই তিনি কবুল করেন।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে পারি যে, যখনই মানবজাতির মাঝে যুলুম, শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন, ন্যায়বিচার বহিঃভূত বিচারকার্য, যিনা-ব্যভিচার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি হয়, তখনই আল্লাহর গজব মানবজাতির উপর নাযিল হয়। স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। বিপদ-আপদ ও আল্লাহর গজব আসলে মুসলমানদের করণীয় হলো আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে এবং তাঁর নিকট কায়মনোবাক্যে

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার

ক্ষমা প্রার্থনা করা। আল-কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা মেনে যুলুম-নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর নিকট দু'আ চাইতে হবে। গজব থেকে রক্ষায় দু'আর বিকল্প নেই। বর্তমান সময়ের ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতিক বিপর্যয়: কারণ ও প্রতিকার শীর্ষক শিরোনামের প্রবন্ধটির প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা :

১. যেমন: আইয়ুব (আ.) বলেছিলেন (سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ٢٥: ٨٣) “হে আমার রব আমাকে কষ্ট-যাতনা স্পর্শ করেছে অথচ তুমি তো পরম দয়ালু।”
২. এ কথাটি কারুনের। সে ছিলো মূসা (আ.) এর চাচাতো ভাই। (দ্র. সূরা আনকাবূত: ৩৯ ও মু'মিন ২৪ আয়াতদ্বয়) ফির'আওনের অন্যতম পারিষদ; কার্পণ্যের জন্য বিশেষভাবে খ্যাত।
৩. ‘ধ্বংস’ শব্দ মূল ‘আরবীতে উহ্য আছে। দ্র. কাশ্শাফ, জালালাইন, বায়যাবী ইত্যাদি। উদ্ধৃতি-সম্পাদনা পরিষদ / আল-কুরআনুল কারীম / বাংলা অনুবাদ, ৫৪তম মুদ্রণ, ঢাকা : ই.ফা.বা. ১৪৩৭ হি./২০১৭ খ্রি., টিকা নং- ১১৫৮, পৃ. ৫৪৯।
৪. বাজারে গেলে এ দু'আ পড়া: ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذَا السُّوقِ ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا بَيِّنًا فَاجِرَةً ، أَوْ صَفَقَةً خَاسِرَةً দ্র.- সুলায়মান ইবন আহমদ আবুল কাসেম আত-তাবারানী / আল-মু'জামুল কাবীর / হা. নং- ১১৪২, খ. ১ম, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি, পৃ. ৪৯৭।

গ্রন্থপঞ্জি

১. ‘ফখরুদ্দীন, আবু ‘আবদিল্লাহ ইবনুল হাসান, আর-রাযী, আত-তাইমী / মাফাতীহুল গাইব / বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ, ২০০০ খ্রি.
২. সালেহ উদ্দিন আহমদ জহুরী / অপসংস্কৃতির বিভীষিকা / ঢাকা : আল-হেরা প্রকাশনী, ১৯৯০ খ্রি.
৩. মোঃ ওসমান গনি / ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান / খ. ১ম, ঢাকা : ‘আবদুল্লাহ এন্টার প্রাইজ, ২০০১ খ্রি.
৪. মুহাম্মদ ইবন হিব্বান ইবন আহমদ আবু হাতেম আত-তামিমী আল-বাসতী / আস-সহীহ / বৈরুত : মু'আসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.
৫. মুহাম্মদ ইবন আহমদ, আল-কুরতুবী / আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন / বৈরুত : দারুল ইয়াহুইয়ায়িত তুরাসিল ‘আরাবী, ১৯৬৫ খ্রি.
৬. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, আলবানী / সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব / খ. ২য়, প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি
৭. ওয়ালী উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ / মিশকাত আল-মাসাবিহ / ১ম খ, কলিকাতা : এম বশির হাসান এন্ড সন্স, তা.বি.
৮. আবুল ফাযল, আন-নববী আস-সাইয়েদ / আল-মুসনাদুল জামে' / প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি

৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, ইমাম, আল-বুখারী / সহীহুল বুখারী / খ.১ম, ইঞ্জিয়া, ইউ.পি : আসাহুল্ল মাতাবি তা.বি
১০. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, ইমাম, আল-কুশায়রী / আস্-সহীহ লি-মুসলিম / কলকাতা : মাতবা'আতু আসাহুল্ল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়াহ, তা.বি.
১১. মুহাম্মদ ইবন 'ঈসা, আবু 'ঈসা, ইমাম, আত-তিরমিযী / আস-সুনান / বৈরুত : দারুল-ইহইয়াইত তুরাসিল 'আরবী, তা.বি
১২. সুলায়মান ইবন আশ'আছ, আবু দাউদ, ইমাম, আস্-সিজিস্তানী / সুনানু আবী দাউদ / কলকাতা : আসাহুল্ল মাতাবি', দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়াহ, তা.বি
১৩. আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজা, আল-কায্বীনী, ইমাম / সুনানু ইবনি মাজা / আল-হিন্দ : আসাহুল্ল মাতাবি' তা.বি
১৪. আবু 'আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আযব নাসাঈ, হাফেয, ইমাম / আস্-সুনান / খ.১ম, কিতাবু সালাতিল 'ঈদাইন, দেওবন্দ : দারুল কিতাব, তা.বি
১৫. আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম / আল-মুসনাদ / কায়রো : মু'আসসাযাতু কুরতুবাহ, ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮ খ্রি.
১৬. আলা উদ্দীন 'আলী মুত্তাকী ইবন হুসামুদ্দীন, আল-হিন্দী আল-বুরহানপুরী / কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল / আলোপ্পো : ৯৭৫ হি./১৫৬৭ খ্রি.
১৭. মালিক ইবন আনাস, ইমাম / আল-মুয়াত্তা / মুওয়াসসাযাতু য়ায়েদ ইবন সুলতান, ১ম সংস্ক, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি.
১৮. আবু 'আবদিল্লাহ, আল-হাকেম, ইমাম, আন-নায়সাপুরী / আল-মুস্তাদরাকু 'আলাস্ সহীহাইন / বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪১১ হি./১৯৯৯ খ্রি.
১৯. আবু মুহাম্মদ আল-হুসাইন ইবন মাস'উদ, আল-বাগভী, মুহীউস সুন্নাহ / তাফসীরে আল-বাগভী / দারুল তাইয়েবা লিননাশর ওয়াত তাওয়ীহ, ৪র্থ সংস্ক. ১৪১৭ হি.-১৯৯৭ খ্রি.
২০. ইমাম. আশ-শায়বানী, আহমাদ ইবন হাম্বল / মুসনাদু ইমাম আহমদ / কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তা.বি
২১. 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবু শায়বা, আবু বকর / আল-মাসান্নাফু ফী আহাদীসিল আসার / রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম. সংস্ক, ১৪০৯ হি.
২২. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী / সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব / রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৩য় সংস্ক. ১৯৮৮ খ্রি.
২৩. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী / সহীহ ওয়া দা'ঈফু আল-জামিউস সগীর / প্রকাশনা অনুল্লেখ, তা.বি
২৪. 'আবদুর ওহাব খাল্লাফ / 'ইলমু উসূলিল ফিকহ / আল-কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশধারা

আলতাফ হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার

পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহের মধ্যে ফারসি ভাষা অন্যতম। এই ভাষা খ্রিষ্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে ইরানে উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই ইরানি ইসলাম প্রচারক, সুফি-সাধক ও বণিকগণ ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করেন। এতদ্ব্যতীত মুসলিম ইতিহাসের সাথে ফারসি ভাষার নিগূঢ়তম সম্পর্ক রয়েছে। ১২০৩/৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতবর্ষে প্রায় ৬৩৪ বছর রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি। ফলে পারস্য ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার সাথে ভারতবর্ষের ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফারসি ভাষা ভারতবর্ষের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তৎকালীন শাসকগণ এ অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদেরকে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বিশেষকরে সুলতান মাহমুদ, নাসির উদ্দিন মাহমুদ বোগরা খান, রোকন উদ্দিন কায়কাউস, সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ, সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ, আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, সম্রাট আকবর, সম্রাট শাহজাহান উল্লেখযোগ্য। যার ফলে অগণিত কবি ও সাহিত্যিক ফারসি ভাষায় কাব্য ও সাহিত্য রচনা করেছেন। যেমন- *কিতাব আল-হিন্দ*, *তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী*, *আইন-ই আকবরী* ও *কিরান উস-সা'দাইন* লক্ষণীয়। এসব সাহিত্যকর্মের গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। যা ভারতবর্ষের ফারসি ভাষার উন্নয়ন, অগ্রগতি ও বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী আলোচনা উপস্থাপনই মূল উদ্দেশ্য।

* সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর এক বিশাল জনসংখ্যার আবাসভূমি। জাতি, ধর্ম, আচার-আচরণের এক বিচিত্র মিলনক্ষেত্র। এখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, জৈন, পারসিক প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের মানুষ বহুকাল ধরে নিজ নিজ ধর্মাচার পালন করা সত্ত্বেও পরস্পরের মিলনে গড়ে তুলেছে শান্তি ও সম্প্রীতির সহাবস্থান (সবুর খান ২০২১, ১৭)। ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার আগমনের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গ বিজয় করেন (সাফা ১৩৭৩, ১৩২)। মূলত তার বিজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ফারসি ভাষার আগমন ঘটে। এর পর থেকে ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মপ্রচারক, কবি, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেণির ফারসি ভাষাভাষী মানুষের আগমন ঘটে ভারতবর্ষে। এভাবেই ধীরে ধীরে ফারসি ভাষা ভারতবর্ষের মাটি ও মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। এছাড়াও ফারসি ভাষা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। দীর্ঘ সাড়ে ছয় শত বছর ব্যাপী রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত থাকার পর ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের এক অধ্যাদেশে ফারসি ভাষা তার মর্যাদা হারায়।

ভাষার সংজ্ঞা

বাগ্যব্দের সাহায্যে তৈরিকৃত অর্থবোধক ধ্বনি-সংকেতের সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকেই ভাষা বলে। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠনিঃসৃত বা মুখ থেকে বেরিয়ে আসা অর্থপূর্ণ কতগুলো আওয়াজ বা ধ্বনির সমষ্টিকে ভাষা বলা হয়। ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, “মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা” (২৩)। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, “মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্যব্দের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে” (৩১)। ভাষাবিজ্ঞানীদের নিকট এ ভাষাগুলো বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ফারসি ভাষা হলো মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের ইরানীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা। এ ভাষা তার উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিকাশ লাভ করেছে।

ভাষার উৎপত্তি

মানুষ ভাষার উৎস নিয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তেমন গবেষণা করেনি। কেবল অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে নৃবিজ্ঞানী, জিনবিজ্ঞানী, প্রাইমেটবিজ্ঞানী এবং স্নায়ুজীববিজ্ঞানীদের আহরিত তথ্য কিছু কিছু ভাষাবিজ্ঞানী খতিয়ে দেখছেন। বিশ্বের অনেক ধর্মেই ভাষার উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের ধারায় বলা হয়, “আল্লাহ প্রথম মানুষ আদমকে বিশ্বের যাবতীয় পশু-পাখির উপর কর্তৃত্ব দেন এবং আদম এই সব পশু-পাখির একটি করে নাম

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশধারা

দেন” (সূরা বাকারা, আয়াত ৩১)। এটি ছিল ভাষা উৎপত্তির ক্ষেত্রে হযরত আদম (আ.)-এর ভাষাজ্ঞানের উপর প্রথম বড় প্রয়োগ।

ভাষা পরিবার

পৃথিবীতে প্রচলিত ও বিদ্যমান ভাষার আদি রূপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, প্রচলিত ভাষাগুলো কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। একই স্তরের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে যদি শব্দ ও ব্যাকরণগত মিল থাকে তবে সে ভাষাগুলোর মধ্যে বংশগত তথা উৎপত্তিগত মৌলিক সম্পর্ক থাকবেই যা ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ভাষাবিজ্ঞানের একটি সূত্র বলে বিবেচিত (কাসেমী ১৩৭৮, ১৮)। একটি ভাষা পরিবার বলতে বংশগতভাবে সম্পর্কিত একাধিক ভাষাকে বোঝায়। এগুলো একটি সাধারণ আদি-ভাষা থেকে উদ্ভূত। বেশীর ভাগ ভাষাই কোনো না কোনো ভাষা পরিবারের অন্তর্গত। এ সম্পর্কে Joel Waiz Lal বলেছেন,

The Persian language belongs to the Aryan branch of the Indo-European family of tongues. A family of languages means a large group of exhibiting and unmistakable likeness in words, grammatical forms, and general structure of sentences. (1).

বিশ্বে প্রায় ১০০টিরও বেশি ভাষা পরিবার বিদ্যমান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাষা পরিবার হলো:

১. ইন্দো-ইউরোপীয়
২. উরালীয় ভাষা
৩. সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠী
৪. আলতায়ীয় ভাষা
৫. চীনা-তিব্বতি ভাষা
৬. মালয়-পলিনেশীয় ভাষা
৭. আফ্রো-এশীয় ভাষা
৮. ককেশীয় ভাষা
৯. দ্রাবিড় ভাষা
১০. অস্ট্রো-এশীয় ভাষা

১১. নাইজার-কঙ্গো ভাষা

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার

পৃথিবীর সর্বাধিক মানুষ এই ভাষা পরিবারটির অন্তর্গত ভাষাগুলোতে কথা বলে এবং এই ভাষা পরিবারের উপরেই সবচেয়ে বেশি গবেষণা হয়েছে। এই ভাষা পরিবারের অন্তর্গত ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফরাসি, রুশ, গ্রিক, ফারসি, পশতু, হিন্দি, উর্দু, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠি, সিংহলি, নেপালি, গুজরাটি ইত্যাদি। এছাড়াও আছে ধ্রুপদী ভাষা যেমন, সংস্কৃত, লাতিন ও আদি পারসিক। ভারত থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা প্রচলিত ছিলো (সিরাজী ২০১৪, ১)। গবেষকদের মতে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী মূলত নয়টি প্রাচীন শাখা নিয়ে গঠিত। যেমন : ১. ইন্দো-ইরানীয়, ২. ইটালিক, ৩. কেল্টিক, ৪. জার্মানিক, ৫. বাল্টো-স্লাবিক, ৬. গ্রিক, ৭. আল্‌বানীয়, ৮. আর্মেনীয়, ৯. তোখারীয় (সুকুমার সেন ২০০২, ৭১)।

ইন্দো-ইরানীয় ভাষা

ইরান নামক ভূখণ্ডটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শুরুতে ইরানিরা যে ভাষায় কথা বলতো তাকে প্রাচীন ইরানি ভাষা বা ইন্দো-ইরানীয় ভাষা বলা হতো। ইন্দো-ইরানীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের একটি শাখা (সিরাজী ২০১৪, ৩)। আবেস্তা ভাষা ও পশতু ভাষা এই শাখার প্রাচীনতম দুইটি ভাষা। বর্তমানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ কোটি লোক ফারসি দারি ভাষায় কথা বলে। এসআইএল-এর করা ২০০৫ সালের প্রাক্কলন অনুযায়ী ৮৭ রকমের ইরানীয় উপভাষা আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ভাষাটি হল ফারসিয়ে দারি। এছাড়াও পশতু ভাষাতে ৪ কোটি, কুর্দি ভাষাতে আড়াই কোটি, বেলুচি ভাষাতে ৭০ লক্ষ এবং আচোমে ভাষায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ মানুষ কথা বলে।

ফারসি ভাষার পরিচয়

ইরানের জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য প্রায় তিন হাজার বছরের। বিশ্বের প্রাচীন সম্রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্য সম্রাজ্য অন্যতম। ইরানের সভ্যতা, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে এসেছে। বর্তমান ইরানের আদিবাসীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আর্য বংশোদ্ভূত (উদ্দিন ২০১৯, ৯)। ফারসি ভাষা হলো মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সপ্তম শাখার অন্তর্ভুক্ত একটি ভাষা (আনিসুজ্জামান ১৯৮৭, ২৯৪)। পারস্যের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর ভাষা থেকে ফারসি ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে ভাষাটির তিনটি সরকারি রূপ প্রচলিত রয়েছে। ইরানে এটি ফারসি ভাষা নামে পরিচিত। আফগানিস্তানে এটি দারি এবং তাজিকিস্তানে তাজিকি নামে পরিচিত (<http://iran-chamber.com>)। ইরানীয় ভাষাগুলোর বিকাশ তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন : প্রাচীন (খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম হতে খ্রিষ্টপূর্ব ৩য়), মধ্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় হতে সপ্তম খ্রিষ্টাব্দ (৬৫০ খ্রি.) পর্যন্ত

এবং আধুনিক ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত (<http://bangla.trib.ir>)। আবেস্তা ভাষা এবং প্রাচীন ফারসি ভাষা প্রাচীন ইরানীয় ভাষার নিদর্শন। এই ভাষাতে জরথুষ্ট্রবাদের পবিত্র গ্রন্থ *আবেস্তা* লেখা হয়। এ সম্পর্কে Tanwir Ahmed বলেছেন,

Among the old Iranian languages- the Avestan (most probably a language of eastern Iran) was the religious language of the Zoroastrians. It retained its status for several centuries among the priests and followers of this religion. The Avesta, the sacred book of ancient Iran, contains the oldest documents of the prose and poetry of Iran. It is a collection of prayers and religious teachings of the Zarathushtra, the celebrated Prophet of Iran, who, as it is guessed, lived during the 7th century B.C (18).

জরথুষ্ট্র ইরানের প্রাচীন যুগের মনীষী ও ধর্মসংস্কারক ছিলেন। তিনি এ ধর্মীয় গ্রন্থটি আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রচনা করেছিলেন (সিরাজী ২০১৪, ৫)। ধর্মভিত্তিক প্রাচীন সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন যে *আবেস্তা* গ্রন্থখানি পাওয়া গেছে তাতে জরথুষ্ট্রের দেবতার 'মিত্র'র প্রশংসা ও প্রার্থনা বিষয়ক অনেক সুন্দর সুন্দর গাথা রয়েছে (মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ২০১০, ৭)। *আবেস্তা* ভাষা ধর্মীয় শাস্ত্রমূলক ব্যবহার ছাড়া পারস্যে ইসলামের আগমনের অনেক আগেই মৃত ভাষায় পরিণত হয়। প্রাচীন ফারসি ভাষাটি পারস্য সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমের কিউনিফর্ম লিপিতে ধারণ করা আছে। কিউনিফর্ম একটি লিপির নাম অর্থাৎ পেরেক আকৃতির বর্ণ। এগুলো মূলত সম্রাট প্রথম দারিউশ এবং প্রথম খাশাইয়ের আমলে লিপিবদ্ধ করা হয়। পাহলভি আশকানিযুগে (খ্রি.পূ. ২৪৯-২২৬) পাহলভি বা মধ্য ফারসি নামে ইরানে আর একটি ভাষার উদ্ভব ঘটে। এটি মূলত *আবেস্তা* ও প্রাচীন ফারসির বিবর্তিত রূপ। এ ভাষার লিপিগুলো ডান দিক থেকে শুরু করে বাম দিকে লেখা হতো। এটি লেখার সময় সেমিটিক ভাষায় লেখা হতো আর উচ্চারণের সময় তা পাহলাভিয়াতেই উচ্চারিত হতো (পাল ১৩৬০, ১৬)। পাহলাভি হলো ইরানের প্রাচীন ফারসি ভাষার আরেক নাম। সাসানিদের রাজত্বকালে (খ্রি.পূ. ২২৬-৬৫২ খ্রি.) এ ভাষার উচ্চারণ ও আঙ্গিকগত উৎকর্ষ সাধিত হয়। এভাবে আশকানি ও সাসানিদের রাজত্বকাল মিলে প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী এ ভাষা ইরানে প্রচলিত ছিল। এ শাসনামলে গ্রিক ও ভারতীয় মূল্যবান বইপত্র পাহলভি ভাষায় অনূদিত হয়। উল্লেখ্য যে, বিখ্যাত সাসানি সম্রাট নওশেরওয়ান ভারতের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *পঞ্চতন্ত্র* পাহলভি ভাষায় অনুবাদ করেন (বাংলাপিডিয়া ২০০৩, ১৩৬)। প্রাচীন ফারসি খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সালের দিকে হাখামানিশি যুগে ইরানে এ ভাষার প্রচলন ছিল (Josef Wiesehofer 2007, 119)। এ ভাষা সাংকেতিক মিথ বা পেরেক আকৃতির চিহ্ন বিশেষের মাধ্যমে লেখা হতো। ভাষাটি কেবল রাজকীয় নির্দেশাবলি প্রচারের কাজেই ব্যবহৃত হতো। কারণ, স্বল্পসংখ্যক লোক এর পাঠ জানত। বিসতুন পর্বত ও নাকশে রোস্তমের পাথরে এবং পারসিপোলিস প্রাসাদের দেয়াল ও স্তম্ভে খোদাই করা শিলালিপিতে এ ভাষার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। আধুনিক ফারসি শেষ সাসানি সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ (৬৪৬-৬৫২ খ্রি.)-এর রাজত্বকালে মুসলমানগণ কর্তৃক ইরান দখলের পর ইরানের জনগণ বিপুলভাবে

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। পাহলভি ভাষা ক্রমান্বয়ে ফারসিতে রূপান্তরিত হতে থাকে (বাহাউদ্দিন ও সালাম ২০১৫, ৫০)।

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার আগমন

হিজরী চতুর্থ শতকে সামানিগণ সাহিত্যের দৃঢ় ও মজবুত একটি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং ফারসি সাহিত্যের প্রতি সামানীদের মনোযোগের ফলেই পঞ্চম শতকে তথা গাজনভিদের যুগে ফারসি সাহিত্যের অগ্রগতি উন্নতি সাধিত হয়েছে। গাজনভি সম্রাটগণ ভারত থেকে যে সীমাহীন সম্পদ লাভ করেছিলেন তা তারা বিপুলভাবে কবি সাহিত্যিক ও লেখকদের মাঝে উপটৌকন হিসেবে দান করেন। গাজনভিরা ভারতের পশ্চিম অঞ্চল দখলের মধ্য দিয়ে এবং সে অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে এক নতুন রাজ্যে বা অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন যা ভারতীয় বা ভারত উপমহাদেশীয় অঞ্চল নামে প্রসিদ্ধ (আহম্মদ তামীমদারী ২০০৭, ৪৮)। ইসলাম ধর্ম সর্বপ্রথম পারস্যে আগমন করেছে। ফারসিভাষীদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রবেশ করে। তাই ইসলাম আগমনের সাথে সাথে ভারতবর্ষে ফারসি ভাষাও আগমন করেছে বললে অত্যাুক্তি হবে না। মুসলিম শাসকগণ ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের সাথে সাথে ফারসি ভাষার প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। সুতরাং ফারসি ভাষার আধুনিক কাঠামো দান, পারস্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা এবং ফারসিকে আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা প্রদানে মুসলিম শাসকদের অসামান্য অবদান রয়েছে। ফারসি ভাষার উন্নয়নে সুলতান মাহমুদ গাজনভির অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে, ফারসি সাহিত্যের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের নাম গাজনি এবং সুলতান মাহমুদ গাজনভি (মৃত্যু ১০৩০ খ্রি.)-এর দরবার (1962, 231)। একজন প্রতাপশালী যোদ্ধা হওয়ার পরও প্রেমের কবিতার প্রতি সুলতান মাহমুদের অনুরাগ ছিল। প্রকৃত অর্থে গাজনির শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি গীতিকবিতা ও মহাকাব্যের বিকাশ ঘটে।

ফারসি ভাষার যেসব কবি ও সাহিত্যিক আধুনিক বিশ্বে আলোচিত ও সমাদৃত হয়েছেন তাঁদের প্রায় সবাই মুসলিম। যেমন- ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, জালাল উদ্দিন রুমি, হাফিজ সিরাজী ও আমির খসরু অন্যতম। তাঁদের রচনাগুলো ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করেছে। ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই পারস্য সভ্যতা ও ফারসি ভাষার সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ রয়েছে। উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পরের মাধ্যমে উন্নতি ও বিকাশ লাভ করে। ভারতের নৌ বন্দরগুলো যেমন- দেবল, নিরুন, সুপারাকা, বাড়িগাজা, টাগারা, মুজিরিস, নেলকিনডা, আরিয়েক, তাম্রলিঙ্গি, গাঙ্গে, সাগুগ্রামা (সাতগাঁও/সগুগ্রাম), সরন্দিপ প্রভৃতি থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের নৌযান পারস্য উপসাগরের উবুলা, ওমানা, ইউডেইমন, সিরফ, কাইস, হরমুজ, সকেট্রো এবং গেড্রসিয়া উপকূল অতিক্রম করত। ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্যের গুপ্ত বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয়, সাংস্কৃতিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। পারস্যের বণিক ও বাণিজ্যপণ্যের সঙ্গে পারস্য সৈন্যবাহিনী, প্রকৌশলী, কারিগর, সুফি-দরবেশ এবং শিল্পীদেরও ভারতে আগমন ঘটেছে। এ ধরনের সম্পর্ক পর্যায়ক্রমে রাজদরবার, সমাজ, শিল্প ও

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশধারা

সাহিত্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে (বাংলাপিডিয়া ২০০৩, ১৩৬)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষা আইন ১৮৩৫ প্রবর্তনের আগ পর্যন্ত মুসলিম শাসনের সব পর্যায়ে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি। উদাহরণস্বরূপ, শাহ সুলতানের মাজারে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে নিষ্কর সম্পত্তি রয়েছে তার স্বীকৃতি ১০৮২ হিজরীতে (১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ) বাদশাহ শাহজাহানের পুত্র বাংলার সুবাদার শাহ সুজা ফারসি ভাষায় একটি সনদ রচনা করেছিলেন (মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন ২০০৯, ৪৭)। দীর্ঘ ৬৩৪ বছর রাজভাষা হিসেবে ফারসি ভাষা ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

আফগানিস্তানের পারওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের পারসিয়ান দারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মারিয়াম সাহেবি লেখেন, ভারতে মোগল শাসনামলে ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, যা উভয় জাতির মধ্যে বিনিময় হয়েছিল তা ফারসি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ সময় প্রায় সব ভারতীয় ভাষা ফারসি দ্বারা প্রভাবিত হয় (বাংলাপিডিয়া ২০০৩, ১৩২)।

ভারতবর্ষে মুসলমানের আগমন ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। মুসলমানের আগমনের ফলে আরবি-ফারসির অফুরন্ত শব্দভাণ্ডারে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফারসির প্রভাব সম্পর্কে বলেন,

মুসলমান আগমনের আগে বঙ্গভাষা কোনো কৃষক রমণীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী কুটিরে বাস করিতেছিলো। ...হীরা কয়লার খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরির আগমনের প্রতীক্ষা করে, শুক্তির ভিতর মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরীর অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গভাষা তেমনই কোনো শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মুসলমান বিজয় বাঙ্গলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড়দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেলো। তাঁহারা ইরান যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন (১৯৩৮, ১৮-১৯)।

ভারতে আগমনের পরবর্তীকালে পার্সি সম্প্রদায়ের জীবন ও অভিজ্ঞতা কেমন ছিল তা জানার একমাত্র সূত্র *কিসসা এ সানজান* নামক তুরান গ্রন্থটি। *কিসসা এ সানজান* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী, জাদি রানা নামক একজন ভারতীয় শাসক ভারতে আগত জরথুষ্ট্র গোষ্ঠীটিকে নিজ রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। বিনিময়ে তাঁদেরকে ঐ রাজ্যের প্রচলিত ভাষা এবং (নারীদের ক্ষেত্রে) পোশাক পরিচ্ছদ (শাড়ী) গ্রহণ করতে বলা হয়। প্রদত্ত শর্ত দুটি মেনে নিয়ে গোষ্ঠীটি ভারতে বসবাস শুরু করে। তাঁদের এই বসতিই পরবর্তীকালে সানজান নামক জনপদে পরিণত হয়। এদের পরেও ইরানের সারি অঞ্চল থেকে জরথুষ্ট্রদের আরও একটি গোষ্ঠী ভারতে এসেছে বলে জানা যায়। সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সানজান অধিবাসীদের পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে জরথুষ্ট্রপন্থী বা বাদীদের আগমন

ঘটেছিল। পারস্যের সর্ব পূর্ব সীমান্তে বেলুচিস্তান প্রদেশ। আর বেলুচিস্তান প্রদেশ ঘেঁষে অবস্থিত সিন্ধু উপত্যাকা। এই সিন্ধু প্রদেশও কিছুকাল পারস্য শাসনাধীন ছিল। সেই সময়টাই পারস্য সাসানি সাম্রাজ্যের (খ্রি.পূ. ২২৬-৬৫২ খ্রি.) অধীনে ছিল। ফলত সাসানি সাম্রাজ্যের বহু সামরিক প্রতিনিধি ও শিবির ছিল সিন্ধু প্রদেশে। সিন্ধু প্রদেশ হাতছাড়া হবার পরও পারস্য প্রতিপত্তি ও প্রভাব ফুরিয়ে যায়নি, বরং ইরান ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পারস্যে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সুপ্রাচীন জরথুষ্ট্র ধর্ম হুমকির মুখে পড়ে। নিজ ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে জরথুষ্ট্র ধর্মানুসারীগণ মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। পার্সি উপগাথাগুলোতে তাঁদের পূর্বপুরুষদের দেশান্তরের কাহিনী এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইরানে আরবদের আগমনের পরপরই ভারতের পশ্চিম তীরবর্তী তটে পার্সিরা বসতি গড়ে তোলে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চ্যাপলিন হেনরি লর্ড মত প্রকাশ করেন যে, পার্সিরা চেতনার বিকাশ ও উন্মুক্তির খোঁজে ভারতগামী হয়েছিল। কিন্তু একই সাথে তিনি বলেন,

“জাত ব্যবসায়ী পার্সিরা ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার সূত্রে ভারত অভিমুখী হয়েছিলেন। মুসলিম সাম্রাজ্যে অমুসলিম ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করা হতো। অনেকের মতে এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ নিষ্পেষণের পর্যায়ে পড়ে। তবে শুধুমাত্র এই কারণেই একটি জাতি দেশান্তরী হয়েছিলেন তার সম্ভাবনা ক্ষীণ (Encyclopaedia Britannica. Vol. 5, 852)।

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশ

মুসলিমদের ভারত বিজয় ও শাসনের ফলে ভারতে পারস্য সভ্যতার প্রভাব স্থানীয় জনজীবনে দৃশ্যমান। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পারস্য প্রভাব খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে শুরু হয়েছিল। ফলে ভারতীয়রা পারস্য সভ্যতার নানা উপকরণকে নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। এ কারণে ভাষা, সংগীত, স্থাপত্য, শিল্পকলা, সাহিত্যসহ নানা বিষয়ে ভারতীয়রা পারস্য সভ্যতার কাছে ঋণী। ভারতীয় সভ্যতায় পারস্যের প্রভাব নানা কারণে ঘটেছে। পারসিকরা ভারতের কতিপয় অঞ্চল শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাচীন যুগে পারসিক সামরিক বাহিনীতে ভারতীয়দের নিযুক্তি, মধ্যযুগে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে পারসিকদের নিযুক্তি, সুলতানি ও মোগল আমলে ভারতে পারসিক আলেম, উলামা, সাহিত্যিক-শিল্পীদের অংশগ্রহণ এবং ভারতের সঙ্গে পারস্যের কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করে।

বিজেতা শাসকদের প্রভাব

ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস তাঁর *The Histories* গ্রন্থে লিখেছেন, দারিয়ুসের সেনাবাহিনীর প্রতিটি স্তরে ভারতীয় সৈন্য নিযুক্ত ছিল। দারিয়ুসের পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী ভারতীয় সৈন্য দিয়ে সজ্জিত ছিল। ৩৩০

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশধারা

খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৃতীয় দারিয়ুসের সঙ্গে জগৎখ্যাত গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের যুদ্ধে ভারতীয় হাতি বাহিনী দারিয়ুসের হয়ে গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ভারতীয় অঞ্চলে পারস্যের শাসনের ফলে ভারত পারস্য সভ্যতার নিবিড় সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে গোটা ভারতবর্ষে পারস্য সভ্যতার নানান বিষয় দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে। মৌর্য রাজকীয় শিল্পে পারস্য প্রভাব তার বড় প্রমাণ। ভারতীয়রা ঐ যুগে পারস্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহার করত। সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতীয় সভ্যতায় পারস্যের প্রভাব আরো সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়। তার অনেক স্থাপত্যের নির্মাণ কৌশলে পারস্যের প্রভাব দেখা যায়। সাসানীয় যুগেও ভারতের গুপ্ত শাসকের সঙ্গে সাসানীয় শাসকদের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ঐ যোগাযোগের প্রভাব জনজীবনে পড়ে। এর প্রমাণ প্রাচীন ভারতে প্রাপ্ত অজস্তা গুহাচিত্রে পাওয়া যায়। অজস্তা গুহাচিত্রে সাসানীয় পোশাক পরিহিত পারস্য রাজার চিত্র অঙ্কিত আছে। কুশান, গান্ধারা ও গুপ্ত চিত্রেও সাসানীয় তথা পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট।

পারসিকদের ভারত অভিবাসন

ভারতে পারসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবের প্রধান কারণ ছিল নানা সময়ে পারসিকদের ভারত অভিবাসন। প্রাচীনকাল থেকেই পারস্যবাসীর জন্য ভারত ছিল আশ্রয়স্থল। পারস্য যতবারই রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে, বৈদেশিক শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে, ততবারই পারসিকরা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আলেকজান্ডারের পারস্য আক্রমণ ও বিজয়ের সময়ে অনেক পারসিকই প্রাণ রক্ষার্থে পালিয়ে ভারতে চলে আসে। ঐ সব অভিবাসী পরবর্তী সময়ে আর পারস্যে ফিরে না গিয়ে ভারতে স্থায়ী হয়েছে। তাদের ভারতে স্থায়ী বসবাসের ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পারসিক অনেক রীতিনীতির আদ্যকরণ ঘটেছে। সাধারণ মানুষ পারসিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে এবং যেসব পারসিক সংস্কৃতি, চিকিৎসা পদ্ধতি ও রীতিনীতি উন্নত তা গ্রহণ করেছে। এভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পারসিক প্রভাব দৃঢ় হয়।

শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা

মধ্যযুগে ভারতে মুসলিম বিজয় ও শাসনের ফলে আরব, তুর্কিসহ পারস্যের বিপুলসংখ্যক ভাগ্যান্বেষী মুসলিমের ভারতে আগমন ঘটে। তারা মুসলিম সুলতান ও বাদশা, আঞ্চলিক শাসক এবং সুফিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে স্থায়ী হয়। ফলে তাদের মাধ্যমেও পারসিক সংস্কৃতি ভারতের অভিজাত থেকে নিম্নস্তরের মানুষের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ভারতে মুসলিম বিজয়ের প্রথম দিকে পারসিক সংস্কৃতি ও রাজকীয় রীতিনীতি সুলতানদের দরবারি চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির বিনির্মাণে প্রভাব রাখে। এ ক্ষেত্রে সুলতান ইলতুৎমিশকে পথিকৃৎ বিবেচনা করা যায়। তিনি পারস্যের শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানীদের ভারতে আমন্ত্রণ জানান। স্থায়ী বসবাসে উৎসাহিত করেন এবং তাদের জ্ঞানচর্চায় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। খিলজি যুগে দিল্লির সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় আমির খসরুর মতো অনেক পণ্ডিত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেন। লোদী যুগে

বিশেষ করে সিকান্দার লোদীর সময়ে পারসিক কবিতা রাজদরবারে বিশেষ মর্যাদা পান (রেজা রেজায়ী ১৩৯৪, ৩২)।

মোগল দরবার ছিল তুর্কি ও পারসিক শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের চর্চার জন্য উপযুক্ত স্থান। তারা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চা করতেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের পারস্যবাস এবং পারস্য শাসকের সহায়তায় হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের ঘটনায় বিপুলসংখ্যক পারসিক সৈন্য ভারতে আগমন করে। তারা আর পারস্যে ফিরে না গিয়ে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস শুরু করে। সুলতানি শাসনের দরবারি সংস্কৃতিতে পারস্যের প্রভাবের যে সূচনা হয় তা মোগল আমলে মহীরুহ আকার ধারণ করে।

সুফি সংস্কৃতি

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পারস্য প্রভাবের অন্যতম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সুফি সংস্কৃতিকে। মূলত ভারতীয় মরমি ধারণা পারস্যে গিয়ে পারস্য ও ভারতীয় চিন্তার মিশ্রণে নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে সুফিবাদ। যা রূপান্তরিত হয়ে মুসলিম যুগে ভারতে ফিরে আসে। ভারতের অর্ধেকেরও বেশি সুফি-সাধক পারস্য থেকে ভারতে অভিবাসী হয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন। চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকার সুফিবাদের মূল জন্মস্থান পারস্য হলেও তা বিকশিত হয়েছে ভারতে। ঐ ঘরানার সুফিরা পারস্য থেকে এসে ভারতে স্থায়ী হয়ে তাদের সুফি মতবাদ প্রচার করেছে। সুফি সংস্কৃতির পুরোটা জুড়েই রয়েছে পারসিক প্রভাব যে কারণে ফারসি ভাষা দ্রুত বিকাশ লাভ করে (রেজা রেজায়ী ১৩৯৪, ৩৪)।

ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনা

মধ্যযুগে ফারসি ভাষায় বহু ইতিহাসমূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এর মধ্যে বেশির ভাগই রচিত হয়েছে ভারতে। আল বেরুনীর *কিতাব আল হিন্দ*, জিয়া-উদ-দীন বরানীর *তারিখ-ই-ফিরুজ শাহী* ও আবুল ফজলের *আইন-ই আকবরী* এর মতো ফারসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলো মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এভাবে ধীরে ধীরে ফারসি ভাষার শব্দ ভারতীয় ভাষার শব্দভাণ্ডারে যুক্ত হয় (রেজা রেজায়ী ১৩৯৪, ৩৪)। কবর, মসজিদ, মাদরাসা ও বিভিন্ন স্থাপত্যে ফারসি শিলালিপিই ভারতবর্ষের সাথে ফারসির সম্পর্কের গভীরতা নির্ধারণ করে থাকে।

উপসংহার

মধ্যযুগে পারস্য প্রভাবিত মুসলিম শাসকরা ভারত শাসন করায় ভারতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে যার প্রভাব আজও বাংলাসহ ভারতের অন্য অঞ্চলের মানুষের জনজীবনে বিদ্যমান। পৃথিবীর অপরাপর ভাষার মতো ফারসি ভাষাও গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষা। এ ভাষা তার উৎপত্তির সময়কাল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে অতিক্রম করে বর্তমান পর্যন্ত এসেছে। মানব ইতিহাসে দুই হাজার বছরের বেশি প্রাচীন সাহিত্য-দর্শনের

ভারতবর্ষে ফারসি ভাষার বিকাশধারা

ঐতিহ্য ও ইতিহাস সমৃদ্ধ জাতির সংখ্যা খুব কমই আছে। নিঃসন্দেহে বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমীরা ইরানি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কথা শুনে থাকবেন। ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদি ও হাফিজ সিরাজী মতো বিখ্যাত কবিদের কথা কিংবা ইবনে সিনা, আল-বিরুনি, আল-রাজি ও জহির ফারওয়াবির মতো মনীষীদের এবং তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কথা সবারই জানা। এঁদের সবাই ফারসি ভাষায় তাঁদের সাহিত্যকর্ম লিখে গেছেন। বিশ্বের বুকে তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার কারণে সাহিত্যপ্রেমীরা ফারসি ভাষার ব্যপারেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফারসি ভাষা মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা। ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ইতিহাস, কালাম বা নীতিবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ফারসি ভাষায় যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেগুলো আজও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য মুসলমান ইসলাম এবং ইসলামি জ্ঞান ফারসি ভাষার মাধ্যমেই শিখেছেন।

তথ্যসূচি:

আল কুরআন, সুরা বাকারা, আয়াত-৩১।

আনিসুজ্জামান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।

আহম্মদ তামীমদারী, অনুবাদ- তারেক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মোঃ ঈশা শাহেদী, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৭।

আবদুস সবুর খান, *ভারতবর্ষের অসামান্য কাব্য ও সংগীত প্রতিভা আমির খসরু*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০২১।

তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী, *ফারসি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বাড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৪।

দীনেশচন্দ্র সেন, *প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলিমানেব অবদান*, বেহালা, ঢাকা, ১৯৩৮।

বাংলাপিডিয়া, খণ্ড ৬, এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.), *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫।

মুহসেন আবুল কাসেমী, *তারিখে যাবানে ফারসি*, কেতাব খানেয়ে যহুরি, ইরান, ১৩৭৮।

মো : কামাল উদ্দিন, *ফরিদ উদ্দিন আভার : কাব্য ও সুফি দর্শন*, পরিলেখ প্রকাশনী, রাজশাহী, ২০১৯।

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, *বাংলাদেশে মরমী সাহিত্য চর্চায় সৈয়দ আহমদুল হক*, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৯।

মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, ও মো: আব্দুস সালাম, *বাঙালি ও ইরানি : বঙ্গবন্ধু ও খোমেনি*, আবিষ্কার কোয়ালিটি পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৫।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, *পারস্য প্রতিভা*, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১০।

যবিহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান*, ১ম খণ্ড, কিতাব ফুরুশিয়ে ইবনে সিনা, তেহরান, ১৩৭৩।

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

রেজা রেজায়ী, *যাবানে ফারসি দার হিন্দ বর আসাসে মুলাহিজাতে ইবনে বতুতা*, পুরতাল জমায়ে উলুম ইনসানি, ইরান, ১৩৯৪।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২।

সুকুমার সেন, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০২।

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রকাশক অজিত চন্দ্রঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬০।

Encyclopaedia Britannica, Vol-5, 11, 12, 18, Cambridge University Press, London.

<http://iranichamber.com>

<http://bangla.irib.ir>

Joel Waiz Lal, *An introductory history of Persian literature*, Atma ram and sons educational publishers, Lahore, 1914.

Tanwir Ahmed, *A short history of Persian literature*, Naaz Publishing Centre. Calcutta, 1991.

Qissa-i Sanjan Wikipedia

Wiesehofer Josef, *Ancient Persia*, I.B. Tauris Ltd, 2007.

Interactive Approaches to Teaching the Four Core Skills of English at the Higher Secondary Level in Bangladesh: A Proposal

Dr. Sukanta Bhattacharjee*

Abstract

When we communicate in diverse real-life situations, we often use more than a single language skill. On the telephone, for instance, we listen and speak simultaneously. We also jot down a host of points and, later, read over what we have written. Thus, we use the four core skills of a language in integration: listening, speaking, reading, and writing for day-to-day societal interactions and purposeful or transactional communications. An efficient English as a foreign language (EFL) teacher should plan and adopt an integrated approach while teaching English, for it engages Bangladeshi EFL learners to learn English in interesting ways and through stimulating activities. This paper intends to shed light on the interactive approaches to teaching the four core skills of English, the lingua franca of today's IT-oriented global village, a crucially important soft skill badly required for 4IR, at the Higher Secondary level in Bangladesh. It is suggested here that all the productive and receptive skills of English be taught in integration with one another as a lesson involves activities that relate listening and speaking to reading and writing. Unfortunately, the majority of our EFL teachers often teach the English skills in isolation, not in conjunction. As a matter of fact, both Basic Interpersonal Communication Skill (BICS) and Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) are indispensable in order for our target learners to be well-versed in all the four core skills of English, which may continue to play positive roles in increasing employability and facilitating international mobility (migration, tourism, and studying abroad), and so forth.

* Professor, Department of English, University of Chittagong

Keywords: four core skills, integration, interaction and transaction, soft skills, 4IR, BICS and CALP, employability, international mobility

1 Introduction

The four skills can be referred to as receptive skills (listening and reading) and productive skills (speaking and writing). Today, linguists of repute are of the prudent view that the easiest and most effective way to start integrating language skills in the class is by combining the receptive and productive skills, which are used across the same medium. In a variety of real-life situations, we listen to others and receive a considerable bulk of comprehensible inputs, which prepare us to unlock our hearts to interlocutors for diverse interactions or transactions. Gradually, we master how to read and write. McDonough and Shaw aptly posit, “If we look around us in our daily lives, we can see that we rarely use language skills in isolation but in conjunction” (2003, p. 171). According to Richards, Platt, and Weber (1985, p.144), an integrated approach is “the teaching of the language skills of reading, writing, listening, and speaking, in conjunction with each other, as when a lesson involves activities that relate listening and speaking to reading and writing.” As a matter of fact, if an EFL learner listens to a recorded or live L2 presentation, and has an efficient EFL teacher’s insightful reflections, s/he can internalize the subtleties or nuances of English much better and gain a deeper understanding of how communication works in real-life situations in the target language. What is more, EFL/ESL learners “become more motivated when they see the value of performing meaningful tasks and activities in the classroom” (1985, p. 174). Ironically, Communicative Language Teaching (CLT) began its journey in Bangladesh way back in the 1990s; still the majority of our target learners (i.e., HSC-level students) struggle to be communicatively competent as they fail to use the four core skills of English in integration. In essence, CLT equips L2 learners with communicative competence which includes a set of composite skills as Canale and Swain (cited in Leech and Svartvik, 2000, p. 3) explicitly state:

Communicative competence is composed minimally of grammatical competence, sociolinguistic competence, and communication strategies, or what we will refer to as strategic competence. ... The primary goal of communicative approach must be to facilitate the integration of these types of knowledge for the learner.

This paper delineates how the four core skills of the world's lingua franca can be taught in EFL classes at the HSC level interactively and in integration through an array of stimulating and interesting activities designed in line with Task-Based Instruction. In fact, the two receptive skills — listening and reading — facilitate mastery of the two productive skills — speaking and writing. But in the current flow of EFL/ESL pedagogy, communicative competence is nothing but the 'will-o'-the-wisp' because two core skills (listening and speaking) which may be termed 'Cinderella skills' are almost ignored in our existing CLT and testing at the Higher Secondary level in Bangladesh. Pretty naturally, teaching and learning of the two other skills (reading and writing) are also hampered. Apart from providing a real-life flavour, integration of the four skills in a single class is effective for all students in that different students have diverse mindsets, likes, and dislikes. Some may enjoy listening while some others may like speaking; a cohort of our target learners may prefer reading whereas an array of them may have fascination for the writing activities.

2 Exposures to authentic English through listening and IPA

Universal language pedagogy reveals the fact that when learners are exposed to authentic, comprehensible L2 inputs, they, with the timely and useful feedback or facilitations of the ELT experts, can grasp the subtleties, nuances, sub-skills, and skills of a language properly. They need to be introduced to syntactic patterns, semantic levels, collocation, cohesion, coherence, discourse, pronunciation, fluency, articulation, rhythm, stress, intonation, body language, and so on through adequate contextualization with the help of necessary audio-visual aids. For instance, our target learners can gain valuable language inputs through a combination of extensive and intensive listening materials and procedures. According to Nunan, "Listening is an active, purposeful process of making sense of what we hear. ... Since listeners combine what they hear with their own ideas and experiences, in a very real sense they are "creating the meaning" in their own minds (2003, p. 24). Vivian Cook also states in the similar fashion, "Listening is the crucial skill in providing the key to extracting information from what you hear" (1996, p. 191). In fact, in a well-equipped classroom having audio-visual teaching-learning aids, extensive listening (for pleasure) and intensive listening (for details), as Harmer maintains, is "especially important since it provides perfect opportunity to hear voices other than the

teacher's, enables students to acquire good speaking habits as a result of the spoken English they absorb, and helps to improve their own pronunciation" (2001, p. 228). As aural and oral skills are interconnected and interdependent, keen listeners usually turn into impressive or fluent speakers, if both the EFL/ESL teachers and learners are enthusiastic and serious. For example, our target listeners need to be exposed to the authentic sounds of strong form *a/ eɪ /* and weak form *a / ə /* in a variety of contexts, such as *I saw a/ə/ magician at 9:00 a /eɪ/ m /əm/*. In the same way, they can be taught the phonemes *o (/əʊ/ or /ou/)*, *j (/dʒeɪ/)*, *k (/keɪ/)*, labio-dentals (*/v/*, */f/*), inter-dentals (*/θ /*, */ ð/*), bi-labials (*/p/*, */b/*, */m/*), palatal plosive (*/z/*), palato-alveolar fricative (*/ʒ/*), alveolar plosives (*/t/*, */d/*) and labio-velar approximant (*/w/*) through effective contextualized drilling and listening. Well-versed in phonetics or pronunciation, an ELT expert can familiarize our target learners with International Phonetic Association/Alphabet (IPA) and teach them 44 phonemes—12 vowel sounds/monophthongs, 08 diphthongs (06 triphthongs) and 24 consonant sounds or phonemes with the aid of the IPA chart (given on page 203) or Google search engine in order that the L2 learners can master articulatory, acoustic, and auditory phonetics and turn into autonomous learners who can rectify, repair, and improve their own pronunciations and understand the utterances made by the model native English speakers. In fact, "... with appropriate scientific techniques, the sounds of English can be mastered. A description of the manner and place of articulations should make a proper impact both in the recognition of mispronunciations and in rectifying them, that is both speech perception and production may be enhanced" (Muzaffar, 1999, p.72).

IPA- International Phonetic Alphabet

Phonetic Symbols

Consonant -24	Vowel - 12
1. p (p ^h) Pen /'pen/, happy	1. i: (ঈ) Sheep /ʃi:p/, breathe, these
2. b (b ^h) Bed /'bed/, cab, book	2. ɪ (ঐ) Ship /ʃɪp/, bit, started
3. t (t ^h) Time /'taɪm/, little, watched	3. e (এ) Men /men/, breath, any
4. d (d ^h) Dance /'da:ns/, played, advance	4. æ (এ) Man /mæn/, back, marry
5. k (k ^h) Cup /'kʌp/, kind, pack	5. ɑ: (আ) Arm /ɑ:m/, rather, heart
6. g (g ^h) Good /'gu:d/, mug, toggle	6. ɒ (অ) Clock /klɒk/, what, because
7. tʃ (চ) Chin /'tʃɪn/, chatter, arch	7. ɔ: (ও) Floor /flɔ:(r)/, law, caught
8. dʒ (জ) Jam /'dʒæm/, geometry, judge	8. ʊ (উ) Wood /wʊd/, would, woman
9. f (ফ) Fan /'fæn/, life, photograph	9. u: (উ) Shoe /ʃu:/, school, July
10. v (ব) Very /'veri/, live, advance	10. ʌ (আ) Won /wʌn/, son, rough
11. θ (থ) Think /'θɪŋk/, path, thank	11. ɜ: (...) First /fɜ:st/, journey, earth
12. ð (ড) Then /'ðen/, mother, that	12. ə (অ) Again /ə'geɪn/, photograph, teacher
13. s (স) Sail /'seɪl/, cell, boats	Diphthong (Two vowel sounds together) : 8
14. z (জ) Zoo /'zu:/, lens, lends	01. eɪ (এই) Play /pleɪ/, rage, great
15. ʃ (শ) Shell /'ʃel/, mesh, ship	02. əʊ (এউ) Ago /ə'gəʊ/, /ə'g ou/
16. h (হ) Hymn /'hɪ:m/, hand	03. aɪ (আই) Tiny /'taɪni/, kite, buy
17. m (ম) Meet /'mi:t/, bomb,	04. aʊ (আউ) Now /'naʊ/, mouth, clown
18. n (ন) No /'nəʊ/(UK), /nou/(US)	05. ɔɪ (ওই) Spoil /spɔɪl/, boy, enjoy
19. ŋ (ং) Ring /'rɪŋ/, singer, playing	06. ɪə (ইয়) Cheer /'tʃɪə(r)/, clear, weird
20. l (ল) Let /'let/, sell, lullaby Player	07. eə (এয়) Bear /'beə(r)/, where, their
21. r (...) Ring /'rɪŋ/, wring, tomorrow	08. ʊə (উয়) Pure /pjʊə(r)/, sure, tour
22. j (জ) Yes /'jes/, yacht, opinion	Triphthong (Three vowel sounds together) : 6
23. w (...) When /'wen/ (UK), /wɛn/ (US)	1. eɪə (এইয়) Player /'pleɪə(r)/, layer
24. ʒ (...) Pleasure /'pleɪʒ(r)/, decision	2. aʊə (আউয়) Power /'paʊə(r)/, tower,
	3. aɪə (আইয়) Tired /'taɪəd/, science
	4. əʊɪ/əʊɪ (এউই) Poet /'pəʊɪt/, 'pouət
	5. ɔɪə (ওইয়) Lawyer /'lɔɪə(r)/, employer
	6. əʊə (এউয়) Lower /ləʊə(r)/, /louə(r)/

3. Connected speech

In addition, extensive and intensive exposure to connected speeches, with which our target learners are barely familiar, is indispensable to enable the target L2 listeners to decipher the confusing or baffling assimilations, as are stated below:

ten men ----- /tem men/

right place-----/raɪp pleɪs/

not me-----/nəʊp mi:/

good boy-----/gʊd bɔɪ/

red gate-----/reg geɪt/

(O'Connor, 2005, pp. 102-103)

What are you doing? Whacha doin'? (Richards, 1990, p. 73)

The waiter cut it-----*the way to cut it*

I scream-----*Ice cream*

How strained-----*House trained*

Night rate-----*Nitrate* (Gimson, 1974, pp. 300-301)

One should bear in mind that non-native speakers seldom use connected speeches in naturalistic interactions as native speakers do. But, they ought to have ideas about them so that they can decipher if connected speeches are used. While teaching pronunciation, never should our EFL teachers overemphasize R.P. (Received Pronunciation) or adhere to British and American variants strictly, for modern English is neither British nor American; it is rather 'bad' English, and mutual intelligibility is of paramount importance to become a good communicator. Moreover, learners pick up a foreign language through 'trial and error'. While teaching speaking, fluency should be given more importance than accuracy. Quoting Savignon (1972), Lightbown and Spada prudently view that "... focus on accuracy and form do not give students sufficient opportunity to develop communication abilities in a second language" (2000, p. 121).

4 Teachers' training on phonetics

Ironically enough, quite a few EFL teachers at schools and colleges do not have linguistics or ELT background, nor do they have good command over phonetics and phonology. A vast majority of them are reluctant to take pains of mastering it and familiarizing the target learners with assimilations, primary or secondary stresses, rising,

falling or rise-fall intonations, rhythms of speeches, and paralinguistic features or body languages, which are a dire need in turning the L2 users into competent ones. As a matter of fact, extensive listening can have a dramatic effect on EFL learners' language learning. It is a heartening matter that most of our schools and colleges are now equipped with computer labs. So, EFL teachers can use CDs, audio/video tapes, and/or cell phones in order to teach the model or standard form of American/British pronunciation. Through this receptive skill i.e., listening L2 learners can also improve their grammatical knowledge and enrich their vocabulary, which helps them be fluent, correct, and confident speakers, readers, or writers. When an audio/a video recording is presented in a listening class, an efficient EFL/ESL pedagogue must focus on the essentials of speaking, reading, and writing such as pronunciation, fillers, and backchannels, heads and tails, vocabulary, idioms, syntactic and semantic patterns, cohesion and coherence, sentential and discursal points, and so on. But it should be done in an interesting, stimulating, and hilarious manner.

It is worth pointing out here that our EFL teachers should conduct English immersion classes (where around 95% of the utterances are in English and around 5% are in learners' L1 used for telling refined jokes, quoting texts or interesting lines from prolific writers). Highlighting the significance of judicious use of learners' L1 in EFL classes, Rod Ellis aptly points out:

The learners' L1 can facilitate L2 acquisition. Learners draw on their L1 in forming interlanguage hypotheses. Learners do not construct rules in a vacuum; rather they work with whatever information is at their disposal. This includes knowledge of their L1. The L1 can be viewed as a kind of 'input from the inside'. According to this view, the transfer is not an 'interference' but a cognitive process (2002, p. 52).

5 Importance of English immersion classes

However, the scenario is just diametrically opposed in actuality. Seldom are English-immersion classes conducted by Bangladeshi EFL teachers teaching at the Higher Secondary level, especially in rural areas where English is looked upon as a language of the affluent or urban elites or upstarts, not of the poverty-stricken rural folk. So, extensive

listening, along with efficient teachers' facilitations, provides the L2 learners with adequate comprehensible inputs that prompt them to speak the target language fluently, accurately, and confidently. Rod Ellis has this to say:

... all that is needed is minimal exposure to input in order to trigger acquisition. Interactionist theorists of L2 acquisition acknowledge the importance of both input and internal knowledge processing. Learning takes place as a result of complex interaction between the linguistic environment and the learners' internal mechanisms (2002, p. 44).

Here we realize the importance of juxtaposing both innatism and behaviorism in the complete process of mastering L2.

6 Teaching listening and speaking with the aid of audio-visuals

In order to have an interactive session to teach all the four skills in integration, for instance, EFL teachers of Bangladesh teaching at the Higher Secondary level can play the English audio-version of Bangabandhu's 7th March historic speech and discuss the salient syntactic, semantic, and idiomatic features of the discourse. Then the students might be asked to describe the picture given in the textbook in pairs or groups as the situations allow, pose a variety of questions to their peers, groups, or teacher regarding the topic, and take some relevant notes provided by the teacher. Later, the target learners can be asked to read the epoch-making speech closely, summarize it, and make the historic speech individually in a nutshell. Role-play/simulation, pair, and group or project work can play an effective role in helping our reticent or shy L2 speakers come out of their cocoons and take part in English interactions because students hardly feel shy or experience affective filters (anxiety, fear, nervousness, etc.) when they converse with their peers in the L2. Of course, there should be some incentives or rewards for the best speaker as well as for all participants. On some other occasions, Blake's poem, "The School Boy", can be used as an interesting topic for teaching listening, speaking, reading, and writing altogether. Listening to the poem being recited by efficient teachers or students who pronounce accurately, maintain appropriate rhyme and rhythm, intonation, pauses and body language motivates almost all L2 learners to do the same. Before the students begin to speak, they ought to be instructed to use fillers like *well, like, um, er,*

you know, and the interlocutors or listeners should be trained to use backchannels such as, *Really? How come? That sounds great! Right, O my God! O dear me!* and so forth. Proper turn-taking techniques (e.g., *I agree with the point just made. But may I add some novel ones? etc.*) need to be highlighted and elaborated. What is more, a range of formulaic languages, automatic speeches or embolalia, or fixed verbal expressions — “You’ve got to be kidding,” “Excuse me?” or “Hang on a minute” — should be presented to the inquisitive EFL learners through interesting contextualization as comprehensible inputs.

7 Formal and informal English

While integrating listening (receptive skill) and speaking (productive skill), skillful EFL teachers must show the distinctive differences between contracted spoken and elaborated written grammar, elision (omission), colloquial language, formal, semi-formal and informal utterances and make the target group understand when to use, where to use, how to use and what to use:

Informal (with friends): I wanna go.

I’m gonna start a new business.

I gotta go.

Semi-formal (with family members or close ones): I want to go.

Formal (with superiors or unknown people): I’d like to go.

I’m going to start a new business.

I got to go.

Informal	Formal
Kinda	Kind of
Congrats!	Congratulations!
Thanks a lot.	Thank you so much.
Hi friends!	Hello Sir/ Madam!
What’s your name?	May I know/have your name, please?
Yeah/Yeh/Yep	Yes

Not	Nope
Give me some money.	Would you give me some money?
	Would you mind giving me some money?
	May I have some money, please?

John and Soars also present an array of formal and informal linguistic components:

Informal

Dear Jack
Thanks for your letter

I'm sorry.
Can you let me know...?

See you soon.

Thanks a lot.
Love
Jack

Formal

Dear Mr. Higgins
Thank you for your letter.
I would like to thank you
for your letter.

I am afraid.
Would/Could you please
inform me ...?

We look forward to
hearing from you soon.

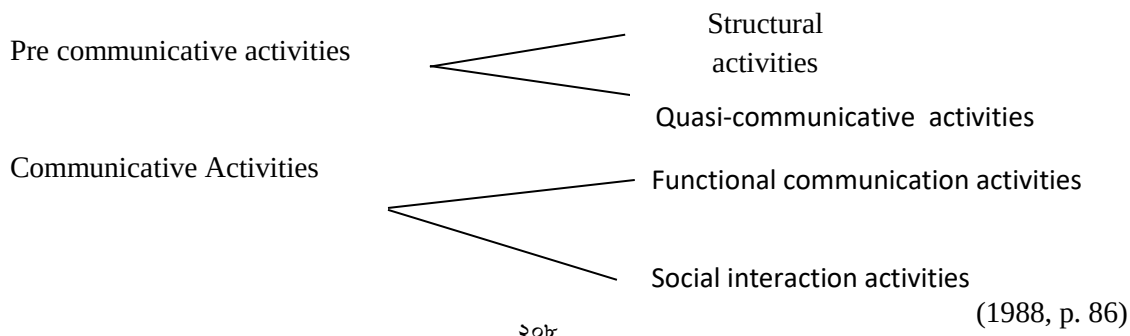
Thank you so much.

Yours sincerely

Jack Higgins
(2000, p. 57)

8 Pre-communicative and communicative activities

The researcher's personal experiences reveal the fact that in order to construct rock-solid footing or building block of English of the target groups, EFL teachers need to go for a range of pre-communicative activities as are presented by Littlewood:



Both transactional (official or purposeful) and interactional (social) modes of communications can facilitate mastering speaking. It is mentionable here that when a speaker goes for bottom-up communications, s/he must be more polite or formal whereas top-down communication necessitates less polite, less formal, or semi-formal language. It should be borne in mind that full-length expressions or grammatically well-constructed sentences sound awkward in spoken English, which prefers somewhat colloquial or semi-formal utterances:

Example 1:

A: Well, in this job we do er a lot of cradle work you see, and er on different tower blocks in Birmingham.

B: A lot of what did you say?

A: Cradle work. That's ou, outside work, on the er blocks of flats, where you can see the outside cradles up the outside of the tower blocks.

B: Oh, I'm with you now, you sort of sta, hang in a basket to clean the windows then?

A: Yeah, that's right, I do, yeah! Good job we're well insured isn't!
(from *Listeners*, Underwood and Barr, 1980.)

Example 2:

John: Hello, how are you?

Tom: I'm fine, thank you, how are you?

John: I'm also fine, thank you.

Tom: How's your wife?

John: She's very well, thank you.

How's your wife?

Tom: She's also very well, thank you.

If we make a comparative and contrastive analysis of the two conversations shown above, we discover the fact that the first example is a natural conversation where there is an information gap whereas the second example is "rather artificial as conversation and sounds more like a script than a piece of spontaneous language" (McDonough & Shaw, 2003, p. 141). In essence, pair or group discussion, role-play/simulation, recitation, extempore speeches and English debates can play an instrumental role in making/producing fluent, confident and articulate speakers. Euphemistic, useful, non-

threatening and encouraging teacher or peer feedback can also boost speaking. On top of this, our monolingual or 'Bengali-only' society should change its frowning attitude towards our EFL speakers for, as D. A. Wilkins aptly points out, "Society creates the context of learning and within this we try to meet the needs of the individual" (1972, p. 150).

9 Teaching language through literature and elaborating famous quotes

After conducting a sizable number of interactive classes through integrating listening and speaking, reading and writing can be blended to brush up our target learners' English. Language experts are of the view that "Reading is one of the four basic skills which is important for students of all levels. Students' success in an academic programme often depends on their reading proficiency" (Bashir, 2020, p. 134). While teaching reading as an integrated skill at the HSC level, an EFL teacher can have his/her target students read Bangabandhu's epoch-making 7th March speech or Blake's poem, "The School Boy" in part or full. Through a host of effective and interesting pre-, while-, and post-reading activities conducted by efficient EFL teachers (following Presentation, Practice, and Production or PPP approach), almost all students will be able to learn new vocabulary, structure, spelling, pronunciation, grammar, and text/discourse in stimulating ways, rather than in a tedious manner. A variety of literary pieces or write-ups from different genres can enthuse our EFL learners to brush up their English through an internalization of new phrases, idioms, collocations, syntactic and semantic patterns, figurative expressions, and so forth. Teaching language through literature is a very popular concept of the day because renowned writers or poets are the best users of a language. It is they who coin new words (neologism) that enrich our languages. Furthermore, famous, thought-provoking quotes prompt avid readers to reflect, speak, or write elaborately on them. A range of oft-quoted extracts from English literature include:

"All the world's a stage,

And all the men and women merely players;" (William Shakespeare)

"Uneasy lies the head that wears a crown." (William Shakespeare)

"Sweet are the uses of adversity." (William Shakespeare)

“Reading maketh a full man; conference a ready man; and writing an exact man.”
(Francis Bacon)

“Knowledge is power.” (Francis Bacon)

“Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.” (P. B. Shelley)

“Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air.” (Thomas Gray)

“A thing of beauty is a joy forever.” (John Keats)

“The woods are lovely, dark and deep.

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.” (Robert Frost)

“A man can be destroyed, but not defeated.” (Ernest Hemingway)

“The child is father of the Man.” (William Wordsworth)

“What is this life if, full of care,

We have no time to stand and stare.” (W.H. Davies)

“It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.” (Jane Austen)

“It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, ... it was the spring of hope, it was the winter of despair.” (Charles Dickens)

“Fortune favors the bold.” (Virgil)

“I think, therefore I am.” (Descartes)

“There is no Frigate like a Book

To take us Lands away

...

How frugal is the Chariot

That bears the Human Soul.” (Emily Dickinson)

If efficient EFL teachers having impressive command over language and literature read out these types of sparkling and stimulating quotes to our target EFL learners, illustrate them, and engage the learners in diverse pair or group work, such as debate, discussion, extempore speech, and recitation, they will be able to brush up their listening, speaking, reading, and writing in lively and interesting ways.

10 Amalgamating bottom-up and top-down reading

Two common strategies or approaches to reading that facilitate EFL learning — bottom-up and top-down models — help highly, moderately, and low proficient target students to pick up English. To elaborate explicitly, the bottom-up model is a text-based approach in which readers focus on individual components of a text, such as phonemes, morphemes, words, phrases, and grammatical ingredients in order to comprehend the text or discourse. This process moves from letters to words to meaning (Anderson, 1999; Nuttall, 2005). In Alderson's in-depth analysis, "the reader begins with the printed word, recognizes graphic stimuli, decodes them to sound, recognizes words and decodes meaning (2000, p. 307). In contrast, in the top-down approach to reading known as "a psycholinguistic approach", readers use their schemata with a view to deciphering the overall semanticity of the text. Interestingly enough, a novel and effective approach to reading called "interactive model" (Erler & Finkbeiner, 2007) cropped up in the early 1980s, which refers to an interaction between information obtained through bottom-up processing and top-down analysis. An avid reader usually uses strategies of both bottom-up and top-down models and shifts from one to the other depending on the purposes of reading. The striking techniques of reading include:

1. Skimming: reading to get at the gist of the text
2. Scanning: reading to look for specific piece of information
3. Extensive reading: reading for pleasure
4. Intensive reading: reading for detail

Initially, students can be encouraged to read aloud, but it divides their time between speaking and reading. So, L2 readers need to be prompted to opt for silent reading and quick reading. Guessing the meaning from the context and using background knowledge or schemata also facilitate reading. Through quick reading techniques, the target readers should read around 187 words per minute, which give them the status of standard readers. In essence, a well-designed EFL lesson plan incorporates adequate stimulating pre-, while- and post- reading activities that help our target L2 learners grasp all the core skills of English.

11 Familiarizing the target learners with diverse templates through reading for mastering writing

Interestingly, if EFL teachers motivate our target students to read letters, letters of application, stories, CVs, precis, reports, memoranda, posters, paragraphs, and essays on a wide range of topics, get them to discuss these through well-designed pair or group work, L2 learners will have the necessary components (e.g., vocabulary, collocation, structures, spelling, idioms, etc.) at their disposal for writing on those genres maintaining proper structures or lay-outs. Thus, reading and writing can be taught as integrated skills. A productive skill, i.e., writing is crucially important because “human memory is short-lived and the brain’s storage capacity is limited” (Fromkin et al, 2004, p.546). There is a Chinese proverb regarding the significance of writing, “The palest ink is better than the sharpest memory” (cited in Fromkin et al, 2004, p. 545). With a view to facilitating teaching-learning writing, EFL teachers can familiarize the target L2 learners with the acronym CODER, which means the following:

C= Collecting Ideas

O= Organizing

D= Drafting

E= Editing

R= Redrafting

12 How to write a well-knit paragraph and essay

Before asking the target L2 learners to write a well-knit paragraph, a proficient EFL teacher needs to motivate them to go for brainstorming or group discussion, which generates a host of novel ideas among the budding writers, who ought to be encouraged to practise both ‘free’ and ‘guided’ or ‘controlled’ writing. Neophyte writers are instructed that in addition to sentential accuracy, cohesion and coherence must be maintained; and, both the useful teacher and peer feedback (both formative and summative) can contribute significantly to the improvement of writing. To ensure peer feedback, L2 students can be asked to write on a topic and swap their papers with each other. Then they provide constructive feedback on the write-ups and have a one-on-one conversation to understand the points clearly and discuss further questions and issues.

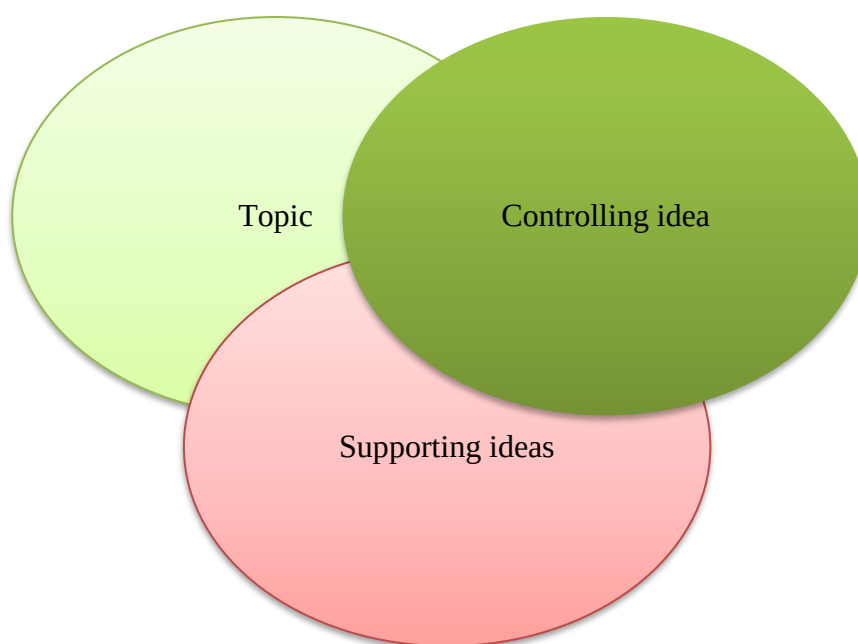


Figure 2 A well-knit paragraph

A well-knit paragraph has an introducer, developer, and terminator; and, there is an inalienable connection among topic, controlling ideas and supporting ideas. It should be mentioned here that cohesion (syntactic unity) and coherence (semantic unity) must be maintained in a paragraph.

13 How to draft a standard piece of writing/composition

The web-diagram shows the key features which good writers can deal with for producing a standard piece of writing/essay:



Figure 3 An organized composition (Adapted from Aslam, 2003, p. 90)

14 Picking up writing through a host of stimulating in-class activities and corrective feedback

The target learners can also be encouraged to write letters or emails to their classmates on diverse topics after their liking and send SMS to their peers on a variety of topics, asked to read them loudly, and give corrective feedback. Then the teacher can take close looks at some of them and offer common corrective feedback so that no writer feels offended. There is no denying the fact that “feedback is an essential component of writing classes, as polished writing and improved writing skills are products of multiple revisions” (Yol, 2019, p. 26). In fact, efficient, euphemistic, non-threatening, and useful feedback can help L2 learners improve all the four skills remarkably.

15 Teaching the four skills in conjunction

In order to teach the four core skills of English interactively and in integration to our target students, efficient EFL teachers can select a topic from *English for Today Classes XI-XII and Alim* and teach listening, speaking, reading and writing altogether. The easiest form of integration is within the same medium (either oral or written), from receptive to productive skills.

	Receptive skills	Productive skills
Oral Medium	listening	speaking
Written Medium	reading	writing

As a matter of fact, the process of integrating skills involves using some or all of the core skills (listening, speaking, reading and writing) to practise new materials such as vocabulary, pronunciation, grammar, text/discourse and the like. In order to ensure interaction in the EFL classes, all four skills must be practised in every lesson. As listening and speaking go together naturally, it is always desirable to integrate these two skills in a single class. In fact, the sequence — hear-speak-read-write — is the most appropriate one for integrated skills work. A common, interesting or stimulating topic like *Describe yourself or Your favourite food, hobby, sport, personality, season, pet*, “is a device linking the separate activities in integrated skills lessons” (Lubelska and Matthews, 1997, p.174).

16 Linguistic competence versus communicative competence

Both efficient, well-trained, committed EFL/ESL teachers and enthusiastic learners need to have a good understanding of a discourse and be able to use text books flexibly. This is also time-consuming. Besides, selecting or designing suitable materials is also a gigantic job, which should suit age, ability and aptitude of the target learners. In essence, the process of integrating the four skills enhances the focus on realistic or naturalistic communication involving “the knowledge (linguistic competence) and its practice (communicative competence)” (Norman et al., 1989, p. 154), which is inevitable for developing EFL learners’ overall competence in English. In general, “Linguistic competence is a part of communicative competence” (Brumfit and Johnson, 1985, p. 168). The following diagram will make the point clear:

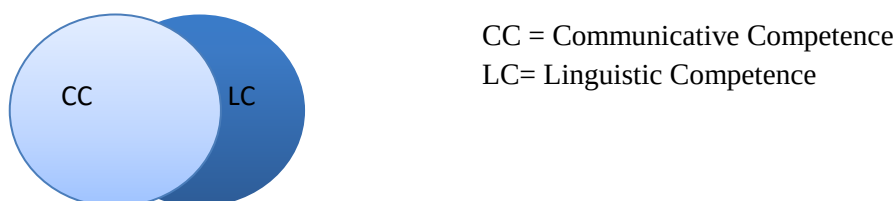


Figure 4 Linguistic and Communicative Competence (Adapted from Brumfit and Johnson, 1985, p. 168)

17 Simple and complex integration

Interestingly, there are two ways of integrating skills: simple integration, whereby a receptive skill serves as a model for a productive skill, and complex integration, which is an amalgamation of multifarious activities involving different skills linked thematically. What is worth pointing out here is that integrated language learning can be more motivating as the learners are using the language for a real purpose, instead of just cramming or practicing the grammar points, which is nothing but a drudgery. Integration requires skillful teaching, and it can bring worthwhile results. To ensure interaction and integration, our EFL teachers need to be trained both at home and abroad adequately as was done through the English Language Teaching Improvement Project (ELTIP) and

English in Action (EIA). Furthermore, the teacher-student ratio should be around 1:30, and class time should be extended to ninety minutes in place of forty-five minutes. Listening and speaking must be included in the formal assessment process because washback effect matters a lot in teaching and learning. On top of that, proper teacher development and adequate incentives are a must with a view to ensuring quality teaching-learning. Highlighting the significance of integrated skills approach to L2 teaching, Nunan is of the prudent view:

Rather than isolated skills in skill-specific classes (e.g., “English Grammar,” “Writing,” “Listening and Speaking”), CBI (Content-Based Instruction) practitioners use an integrated skills approach to language teaching, covering all four language skills as well as grammar and vocabulary. ...a lesson may begin with any skill, or alternatively, with focus on grammar and vocabulary (2003, p. 306).

18 Pair and group work for teaching and learning four skills in integration

By giving the target L2 learners tasks, McDonough and Shaw (2003) assert, that expose them to the four core skills in conjunction, it is very much possible that they will gain a deeper understanding of how communication works in the foreign language as well as becoming more motivated when they see the value of performing tasks and activities in the classroom. Morrow (1981, p. 61) wisely but wryly comments on teaching language skills in isolation:

One of the significant features of communication is that it is a dynamic and developing phenomenon. In other words, it cannot easily be analysed into component features without its nature being destroyed in the process. It is of course possible to identify various formal features of the way language is used communicatively, and these can be studied individually. But the ability to handle these elements in isolation is no indication of ability to communicate.

19 Salient causes of low proficiency of Bangladeshi EFL learners

Referring to the state of low proficiency of Bangladeshi L2 learners and sorry state of English education here, Kirkpatrick (2016, p. 11) quotes an array of linguists (Hamid and Erling; Hamid and Baldauf) and points out that “English occupies a significant place in the Bangladeshi curriculum and is a compulsory subject from grade 1, yet results are unimpressive countrywide and even worse in rural areas”. He goes on to say that “Part of this can be explained by a lack of teacher training, minimal resources, and low expenditure on education” (p.11).

20 Conclusion

As a matter of fact, a host of remarkable pedagogical changes — a range of novel and stimulating warm-ups and a wide variety of interesting and stimulating activity-based, more or less student-centred and teacher-facilitated classes (in which teacher–student ratio is around 1:30) conducted by efficient and thoroughly trained EFL teachers or ELT experts with adequate audio-visual aids, moveable seating arrangements conducive to adequate pair and group work, formative assessments along with summative ones of all the four skills and command over BICS and CALP — can guarantee the effective and desired teaching-learning of listening, speaking (two Cinderella skills) as well as reading and writing through interaction and in integration. In essence, authority over the four core skills of the world’s lingua franca can enable our target EFL/ESL learners to tie up with 4IR and be turned into skilled and efficient workforce. By mastering one of the essential soft skills of the 21st century, they will be able to pursue higher/vocational education at home and abroad and contribute significantly to our economic emancipation. Attaching enormous importance to our EFL/ESL learners’ mastering all the four core skills of English in conjunction, Bangladesh National Curriculum explicitly states (2012b, p. 2):

The curriculum focuses on teaching-learning English as a skill-based subject so that learners can use English in their real-life situations by acquiring necessary language skills as well as knowledge, learning about cultures and values, developing positive attitudes, pursuing higher education and having better access to local and global employment.

An eminent ELT practitioner of Bangladesh, Professor Hamidur Rahman (2021, p. 57), also refers to the heartening matter that the government policy with regard to ELT in Bangladesh has undergone changes at different times. Curricula have been revised, new textbooks have been written, and novel approaches and methods have been advocated. Teachers have been asked to move away from the Grammar-Translation Method (GTM) and veer towards CLT. There also exists a negative attitude among the Bangladeshi teachers towards CLT because demands have been made on them to change their habitual practices and acquire new techniques to teach all four skills in integration. It would not be possible to discard age-old Grammar-Translation Method (GTM); rather, a synthesis of GTM and CLT can facilitate teaching-learning of the four core skills in conjunction, which can turn our linguistically unequipped, conceptually barren, and communicatively underprepared target EFL learners into linguistically sound, conceptually rich, and communicatively competent human resources.

References

- Alderson, J. C. (2000). *Assessing Reading*. Cambridge University Press.
- Anderson, N. J. (1999). *Exploring second language reading: Issues and strategies*. Heinle & Heinle.
- Aslam, M. 2003. *Teaching of English*. Foundation Books.
- Bashir, A. (2018-19). English language learners' level of reading proficiency and their use of reading strategies. *Spectrum, 14-15*, 134–153.
- Billah, Q. M., Alam, F., Shahidullah, M., Mortuza, S., Haider, Z., & Roy, G. (2012). *English for today: Classes XI-XII* (S. M. Islam & S. M. Kabir, Eds.). National Curriculum and Textbook Board.
- Brumfit, C., & Johnson, K. (1985). *The communicative approach to language teaching*. Oxford University Press.
- Cook, V. (1996). *Second language learning and language teaching*. Arnold.
- Ellis, R. (2002). *Second language acquisition*. Oxford University Press.
- Erler, L., & Finkbeiner, C. (2007). A review of reading strategies: Focus on the impact of first language. In A. D. Cohen & E. Macaro (Eds.), *Language Learner Strategies* (Vol. 30, pp. 187–206). Oxford University Press.

- Fromkin, V., Roadman, R., & Hyams, N. 2004. *An Introduction to Language*. Thomson Asia Pte. Ltd.
- Gimson, A. C. (1974). *Pronunciation of English*. Edward Arnold.
- Harmer, J. (2001). *The practice of English language teaching*. Pearson Education Limited.
- John, & Soars, L. (2000). *Pre-intermediate new headway*. Oxford University Press.
- Kirkpatrick, R. (Ed.). 2016. *English language education policy in Asia*. Springer.
- Leech, G. N., & Svartvik, J. (2000). *A communicative grammar of English*. Longman.
- Lightbown, P. M., & Spada, N. 2000. *How languages are learned*. Oxford University Press.
- Littlewood, W. (1988). *Communicative language teaching*. Cambridge University Press.
- Lubelska, D., & Matthews, M. (1997). *Looking at language classrooms*. Cambridge University Press.
- McDonough, J., & Shaw, C. (2003). *Materials and Methods in ELT*. Blackwell Publishing Limited.
- Morrow, K. (1981). Principles of communicative methodology. In K. Johnson & K. Morrow (Eds.), *Communication in the classroom: Applications and methods for a communicative approach* (pp. 59–66). Longman.
- Muzaffar, T. B. (1999). On gees and zeas: A comparative phonological study towards better English pronunciation. In *Collected papers of the international conference on national and regional issues in English language teaching: International perspectives* (pp. 69–72).
- Norman, D., Levihn, U., & Hedenquist, J. A. (1989). Communicative ideas: An approach with classroom activities. *ELT Journal*, 43(2), 154.
- Nunan, D. (2003). *Practical English language teaching*. Contemporary.
- Nuttall, C. (2005). *Teaching Reading Skills in a Foreign Language*. Macmillan Education.
- O'Connor, J. D. (2005). *Better English Pronunciation*. Cambridge University Press.
- Rahman, A. M. M. H. (2021). Confluence of influences shaping ELT in Bangladesh. In S. Sultana, M. M. Rashid, Md. Z. Haider, M. Md. N. Kabir, & M. H. Khan (Eds.), *The Routledge Handbook of English Language Education in Bangladesh* (pp. 46–59). Routledge.
- Richards, J. C. (1990). *The Language Teaching Matrix*. Cambridge University Press.

- Richards, J., Platt, J., & Weber, H. (1995). *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. Longman.
- Wilkins, D. A. (1972). *Linguistics in Language Teaching*. Athenaeum Press Ltd.
- Yol, Ö. (2019). Peer feedback in second-language writing classes: “Dear My Friend....” *English Teaching Forum*, 57(3), 26–29.

Contemporary Bengali Muslim Society in the Literary Works of Kazi Motahar Hossain: Thoughts on Education and Society

Dr. A. S. M Borhan Uddin*

Abstract

Kazi Motahar Hossain was one of the writers who considered social responsibility as the key in bringing the Muslim society of Bengal in the 20th century into the trend of progress. As a keen observer of contemporary events, he engaged in literary work to express his thoughts on social education, culture and religion. The social humanity he showed in removing the shadow of decadent values that stood as an obstacle to the progress of the Bengali Muslim society, has been highlighted in the article under discussion. Where there are contemporary Bengali Muslim societies ideas, the development of the middle class, their mentality, religious beliefs, reformation and reformation efforts. His memoirs and literary works and other bibliographies have been used as material in the present essay.

Kazi Motahar Hossain (1897-1981), one of the messengers of the renaissance in the Muslim society of Bengal in the 20th century, was an educator, scientist, mathematician, numerologist, thinker, writer, musician, and chess player¹. His career continued to cover various topics including religion, education, society, literature, culture and sports. Kazi Motahar Hossain's profound scholarship and knowledge can be found in his literary works. Rachnabali is a bright sign of open mind, liberal thinking, thoughtfulness, humanism, non-sectarian sense of life.

His keen interest in literature was evident from childhood. He got his first taste of literature from the Palligram's Punthipath event. Literary practice began during his studies at Kushtia High School. His writing was inspired by the teacher Jyotindra Mohan Roy. Nazrul's companionship and closeness left a deep impression on Motahar's mind.² The influence of the Shika group in the formation of Motahar Hossain's personality and psyche is particularly noteworthy. Motahar Hossain's open-mindedness, strong thinking and

* Professor, Department of Islamic History and Culture, University of Chittagong

fearlessness in expressing his speech and comments on various social and cultural issues originated from the Shika group. Motahar Hossain himself has raised the issue: The goals and objectives with which we fought with an orthodox, culture-bound, progressive society have been very successful—it can be said by looking at the progressive society of Bangladesh today. But what we said that day was very difficult to say. But to have integrity in our consciousness and we believe in the larger society's interest in changing the status quo I did not hesitate to read it. (*Motahar Hossain Rachnaboli*, 1st Vol., 1976:6)

That writing has a strong social value, that the writer also has a social responsibility, should remain, standing in the midst of adverse times and environment; Kazi Motahar Hossain held pen with firm conviction after absorbing this fact at the beginning of the writer's life. His first work 'Galileo' was published in *Saugat* magazine. A collection of transmission essays was published in 1937. In 1955, *Nazrul Kavya-Parichiti* was published. The book is basically a compilation of various parts of Nazrul Islam's songs and poems. It came out in 1951 *Aiming at that path*. Hazrat Abu Bakr RA. And the death of Hazrat Omar. Biographical essay inserted. *Selected Essays* was published in 1976 containing 24 essays. Notable among his translation works are *Symposium* (Original Plato), (1965) *Nivedan*, (Original Kazi Ashraf Mahmud's Hindi Poetry Invitation), *Dataganj Baksh* (Original Shaikh Abdur Rashid's biography *Life and Teachings of Hazrat data Ganj Baksh*, 1968, *Birahi* Original Kazi Ashraf Mahmud Hindi Poems *Biyogi*, 1968, *Kutzmala* (Original Kazi Ashraf Mahmud's Hindi Poems Kutz', 1968 etc. Apart from books on literature, he also wrote essential textbooks for several schools, colleges and universities. Among them *Modern Geography* (1990), *Sahitya Vikas* (1951) *Introduction to Geometry* (1951), *Introduction to Bengali Grammar* (1952), *Pakistan and Earth* (1952), *Elements of Statistics* (1955), *Literature* (1957), *History of Islam*, *Data-Mathematics* (1969), *History of Mathematics* (1970), *Light Science*, Volume 1, (1975), his poem 'Asa-Jawa' published in *Agrahayan* was compiled in *Kavya Malanche* edited by Kavi Abdul Qadir and Karim.

His works were original, translated and textbook. However, in the field of literature, Kazi Motahar Hossain is better known as an essayist and critic. Most of the articles are related to society, literature and culture. He also wrote some poems separately. The frank identity of the writer's personality and character is found in his memoirs. Associated with this were two essays on music, science and philosophy of life.³ The *Sancharan* Prabandha collection received special praise from Rabindranath, Pramath Chowdhury, Upendranath Gangopadhyay and others. Rabindranath's comment is quite suggestive:

I am satisfied to read the articles that you have published in your 'Sancharan' book in which you have translated the various ideas and topics of discussion into clear language. Your

courage and originality of thought deserve applause. I wish you success in your pursuit of literature. (*Motahar Hossain Rachnaboli*, 4th vol.1992:333)

The modern education system developed in Bengal in the early part of the 20th century gave life to the renaissance, but its vibrancy in the Muslim society arose later. Bengali Muslim society in the second decade not interested in the scientific method in the field of education, got education in the medieval method in Maktab-Madrassa. naturally detached from modern life and world. The schools were dilapidated, most of the primary teachers were poorly educated and unskilled and their teaching methods and school curriculum were not up to date in many cases. Writing practice started with clay on the floor. In later stages, writing was taught on palm leaves, palm leaves etc. Pieces of straw or reed, bamboo Kanchi, bird, peacock and goose feathers etc. were used as pens. The matter is reflected in the memories of these contemporary Maktab Pathshalas. Kazi Motahar Hossain has presented such a picture:

Our kali is not the ink of quinque, hero, pilot or black pill-it is dry bamboo bark burnt and the ashes placed in a patil (or chapin) and first kneaded with a 'nakur (small stick), then a little dry acacia gum and little by little that ink is obtained by repeated mixing with water, not raw ink. The duaat to keep them was a kind of muda duaat, which is still seen from time to time among the deed-writers. Our paper was mainly banana leaves, but sometimes long palm leaves were also used. The advantage of this is that once it is written, it can be reused again and again by throwing it in hot water and removing the stains. In this rustic simple system we have completed primary education almost free of cost. (Motahar, *smritikatha*, 2007:19)

As the infrastructure of primary education became largely religious, a student had to acquire religious education before receiving general education. As a result, Muslim students used to go to school later than Hindu students. Most students were irregular in attendance and dropped out before completing primary school and relapsed into illiteracy. In the work of Kazi Motahar Hossain, the picture of schools, colleges, etc. educational institutions in different regions of Bengal becomes clear in this way:

The number of Muslim students was almost negligible. Apart from myself, cousin Belayet and Baker Sheikh of Balrampur, no other Muslim student is mentioned. Amanat Mallik of Bahadurpur and Jafar Sheikh Jadu Gachhu of Jaikrishtapur passed from Bagmara Lower Primary School ... (7)

Around 1917, Kazi Motahar Hossain was admitted to Dhaka College. In his description of that time, it can be seen that among the students in the hostel, there were about 270 Hindus and about 70 Muslims. That is, the ratio of Hindu students to Muslim students in the hostel was roughly 4:1. And this ratio of the entire Dhaka College will be around 7:1. This is because many Hindu students attended college from home, but the number of Muslim students attending college from home was negligible. Again, the total number of Hindu Muslim students in the college was about 850, out of which the number of Muslim students was less than 110. However, at the time of the establishment of Dhaka University in 1921, the total ratio of Hindu-Muslim students was about 3:1. "(53)

It may be mentioned that in the beginning of the 20th century, some political measures taken by the British government in Bengal accelerated the spread of education. During this period of British policy i.e. II. In the third decade, schools, colleges and universities were built in the place of tol-chatuspathi, maktab, madrasa. As a result, a middle class gradually emerged in Bengal. These individuals played an important role in the progress of education by highlighting the obstacles of Muslims in the field of education in various ways. Kazi Motahar Hossain highlighted the issue:

Sometime before this, the British Government had been somewhat sympathetic towards the Muslims; Because of that, a large number of highly educated Muslims have appeared, who can serve the country and their people by being employed in government jobs. ... Names of particularly notable Muslim thinkers. Nawab Sir Salimullah, Sir Syed Ahmad Khan, Nawab Bahadur Abdul Latif, Hakim Habibur Rahman, Abul Kashem Fazlul Haque, Nawab Ali Chowdhury, Khawaja Nazimuddin, Ismail Hossain Sirazi, Abdur Karim, Nawab Yusufjan Sahib, Yakub Ali Chowdhury, Rawshan Ali, Munshi Meherullah, Munshi Maziruddin, Syed Abdul Quddus Rumi, Sir A. F. Rahman, Prof. Maulana Mohammad Erfan, Prof. Feda Ali Khan, Prof. Abdur Rahman Khan, Dr. Muhammad Shahidullah, Mr. Fakhruddin Ahmad, et al. Among them were sadasaya zamindars, rank-and-file officials, professors, orators and personal advisors. (9)

Kazi Motahar Hossain while highlighting the expansion of education in Kushtia region said that in 1912, a man named Aminul Islam became Deputy Magistrate. It was during his tenure that 'Ezekiel Muslim Hostel' was established for Muslim students on the western side adjacent to Kushtia School. He used to pay a substantial amount from his own pocket to the superintendent of the said hostel for Muslim boys during the Eid Bakris for the feast of the students; And among the meritorious students, he introduced a system of discounting the accommodation and food expenses of three or four students. On that occasion, Kazi Motahar Hossain used to get a discount on hostel accommodation (Taka two per month) and food cost (Taka five-six per month). Instead these students are called 'monitors' or

Sardar's students. Their duties were to keep a record of attendance and absence in the daily attendance register, and to provide some assistance to the hostel superintendent by supervising the work of the cooks and other servants and to maintain peace and order in the student community."(31)

Kazi Motahar Hossain has also highlighted the pattern of punishment by teachers in his childhood memories. As the government's generous attitude towards the teachers is revealed, the nature of the teachers at that time also becomes clear in front of us: 'Ashu babu was a master of English, a tough guy. If he could not read, he would press the student's two fingers with a pencil, sometimes he would hit the head and body with a scale, and sometimes he would hit him with his umbrella'. During the discussion, many of the teachers have fulfilled their professional responsibilities with commitment. He could remove the dust of complexity from a very complex subject through simple elements and present it to the students in simple language. In this case their only objective was the welfare of the students. In 1917, Kazi Motahar Hossain highlighted how many teachers employed them to instill moral thought in the minds of students: He often asked non-academic questions and listened to our answers, but did not make any comments himself. One day, he raised a question in the class, "Look, the Hindu boys will pray in the evening, and the Muslim boys will also pray in the Maghrib, when it was seen that a house was on fire." Then which of you will go first to put out the fire, and who will finish the worship first?" Some of us gave judgment on one side and some on the other side. I voted for Sandhya Ahnik or Namaz. He only saw and heard, said nothing. Twenty or thirty years later, I met him once in Kushtia and said, "Sir, you once asked us all a question while teaching in the fourth grade, I understand now, I gave the wrong answer." He smiled and asked, "What's the question?" I said, "Sir, I will first go to put out the fire, then go home and perform the 'Qaza' prayer." He patted me on the back and said, "Good, good." (36)

The reminiscences of student life by many eminent scholars in their writings show that the personal influence of teachers on their self-development was far-reaching. The deep erudition and strong personality of a large section of contemporary teachers mesmerized the students. As a proverbial man of penance, many have kept alive the memory of their teacher in their writings where it can be seen that they made a wonderful combination of generosity with piety and kindness with dutifulness. He was deeply seated in the hearts of students and colleagues. Kazi Motahar Hossain said:

When I think of Kushtia School, I first think of my beloved teacher Jyotin Babu. His full name is Jyotindra Mohan Roy, Bardhishnu Nagar Bari Prame belongs to Pabna. When In (1911) was

a student of the fourth standard, he used to teach us geography. I studied the geometry with him in third grade ... In fourth grade my water springs: On hearing the news, my father came to school to take me home. I was in class at that time. Jyoti Babu stopped teaching for a while and called my father and told me in detail, what should I eat or what should I eat? How to always keep mosquitos away from mosquitos, how to apply medicine and ointment, etc. I saw two drops of water falling from Jyoti Babu's eyes. I realized how much he loves me, what special love and care he has for me, how much he strives for my healing. One day, in third grade I was late to school. In the afternoon he called me from the hostel. I thought he would scold me for being late to school today. So I approached him with fear. He said, "I saw your clothes (washer) a little wet today." You don't have any clothes, so it was late to dry the clothes? I remained silent. I thought to myself, how did he feel? After that, he made a puppet and said, "This is it." I have brought a dhoti, shirt and genji for you. He hesitated and said, "What are you ashamed of? Did your father give Nitin? I see all of you as my own sons." After that, can we not take love gifts? (34)

Kazi Motahar Hossain expressed his opinion very clearly and fearlessly for being associated with the progressive cultural movement of the country. He protested against all forms of social state injustice, communalism, conservatism and reactionism. In 1953, his free-spirited speech at the literature fair held at Santiniketan caught the attention of the elite society. In this context the progressive literature of Kolkata *Natun Sahityapatra* in its report mentions:

Dr. Kazi Motahar Hussain, in a crisp, simple, erudite speech, declared one key point-which will be remembered by all: his warning against the Hinduization or based Islamization of literature. He said-"Literature will not be caste biased if water is referred to as water-it will be caste if Jalchouki is Panichowki, water path is Jalpath, Jalyoga is Paniyoga, Jalpani or water-seeker is called water-seeker."(Quoted in: *Motahar Hossain Rachnaboli*, 4th vol.1992:345-46)

Kazi Motahar Hossain in his memoirs of Kushtia mentions how mutual harmony and compassion flowed towards each other in hundreds of ways, breaking the barriers of touching the strictness and prohibitions of various customs from outside:

Not to mention a word about Phanindranath. We appeared at the matriculation exam to 23 students from Kushtia School. Due to the onset of spring in Calcutta, arrangements are made to hold the exam at the Pabna center. Our accommodation at Pabna Collegiate School was that we did not know the mosquito infestation there. So many of us did not take mosquito nets with us. Only Fonindra brought mosquito nets. Everyone will be bitten by mosquitoes, and Fanindra

will sleep with mosquito nets? And only me or how to get in the mosquito net. So, Fanindra and Mushari do not sleep; Let everyone speed. How many people can consider such? This is definitely a sign of great character. (Motahar, 2007:42)

When the sky of Bengal's politics is filled with the poison of communalism, the Muslim Literary Society was born in the beginning of 1926 with the aim of involving the society mind in the progress of the age by keeping liberal and rational ideals in front. Kazi Motahar Hossain, a member of this society, said:

As one of the patrons of free intellect in 1926, a public organization called 'Muslim Literary Society' was established. The question may arise here, how can it be called universal when the first word of this organization is 'Muslim'? Answer: Kazi Abdul Odud (brain), Syed Abul Hussain (hands-feet-body) Kazi Motahar Hussain heart); The words in brackets were introduced by Surendranath Maitra, Principal of Dhaka Intermediate College. He was present at almost all our meetings, and gave lectures from time to time. The mouthpiece of this society was an annual magazine called *Shikha*; It recorded all the papers read at the Annual Meeting and the President's Address and the Editor's comments. Many articles read in other meetings were published in magazines such as *Saugat*, *Mohammadi*, *Pravasi*, *Bharat Varsha* etc. None of these articles were sectarian or promoted the superiority of any particular religion. However, the cautionary word 'Muslim' was included at the beginning (perhaps) so that the backward Muslim society of the time would not think of us as Christians, atheists, Jews or pagans, as intelligence and knowledge were highly valued. This warning is probably Syed Abul Hussain's manipulation; However, it is not that we have to endure less trouble. Only the names of the first, second and third men identified by Maitra Mashay are mentioned above. Besides, many others small and large, were associated with the 'Shikha group'. (66)

In reference to the family of Retired Magistrate Shri Girish Chandra Nag, Kazi Motahar Hossain's reminiscence reveals the contemporary social psyche. Leela Nag used to study one class below her in Dhaka College. He never seen a socialite and dignified woman like her. The theory of which is that women must be earners, otherwise they will never be respected by men. So, he arranged for sale by painting beautiful designs on girls' handkerchiefs, tablecloths, etc. By selling all these, he opened up a way of earning for the girls. Their friends used to help in selling all these works. They had a union. Leela and Kazi Motahar were the joint vice presidents of the association, Mrs. Sujatha Roy's husband

Mr. Satyendra Kumar Roy (Professor of English) was the president. Not only this, he also created Armanitola Girls' School, Kamrunnesa Girls' High School at Tikatuli and the 'Nari Shiksha Mandir' on the other side of the then Nawabi Bridge for girls' education. Ori opened a primary girls' school near her house in Kayetuli. It gradually expanded to become the present two-storied college covering the whole of Girish Nag's old house. This place still seems to be a sacred place of pilgrimage to him. As soon as Kazi Motahar Hossain appeared, Girish Babu used to call the housewife and say, "Look, our Kazi Sahib is coming, arrange his food soon". There was always an allocation of milk, curd, chire, murki, khai for him. Every year from 1930 onwards, he stayed as an overseas lecturer (invited guest) at the Indian Statistical Institute in Barahnagar area of North Kolkata. Leela Devi used to come to meet him when he got news; And he invited him to his house and fed him Khichuri Polao etc. Even in Dhaka, when they lived in Bharate Bari (Rented house) in their village, Kazi Motahar's wife used to go to their house, he also came to meet them, and discussed with his wife about women mangal and women's status. (58)

Kazi Motahar Hossain did not hesitate to express his opinion regarding the national language, language reform, font change etc. In contemporary times, a strong tendency to ignore Bengali language and adopt Urdu as their own language can be noticed. There was a belief and idea prevalent among a section of the Bengali Muslim community that Muslims did not need to learn Bengali language. Foreign languages like English should not be learned at all but Arabic language must be learned. Many people in the society had the idea that the mother tongue of Bengali Muslims is not Bengali. Motahar Hossain's speech regarding the national language was the most revolutionary, clear and fearless. He unequivocally states:

... It is natural and appropriate that East Pakistan's royal language or state language be Bengali. Some forward-looking Bengalis are already hearing the sound of Urdu. But their judgement cannot be appreciated. ... All these sayings are expressions of the ignorant and malnourished mind of the "koler manush". This will break the national backbone of Bengali. As a result of this, Bengali Hindu-Muslims will be freed from the hands of British-Raj and will fall under the control of Punjab-Sindhu-Baluchi Raj. In the blind frenzy of religion, many are shouting Urdu. But as I have already said, if not through the Bengali language, the true sense of religion or traditional knowledge will never enter the heart of a Bengali. (*Motahar Rachanaboli*, 4th vol., 1976: 58)

According to him, we have to spend Mohabesh. You have to verify the subject and matter with your eyes. That movement will be our true independent movement. The only help for this is the proper practice of the mother tongue and the acquisition of its correct knowledge through the medium of some beautiful attractive or attractive mother tongue. In his article 'State language and the language problem of East Pakistan' published within a month of the establishment of Pakistan on September 15, 1947, he identified indifference towards the mother tongue as the reason for the decline of Bengali Muslim society. In this context, he mentions two more reasons in the discussion article. One. Neglect of mother tongue Bengali; Two. Urdu language is considered related to religious language Undue attraction or infatuation. He mentioned: Motahar Hossain demanding to make the mother tongue the vehicle of education mentioned in the context of education, "The mother tongue will be the vehicle of education in the university as well." Then knowing English will not be necessary for higher education assistance... (59)

In 1947 and 1971, he spoke out against the attempts of the West Pakistani ruling class to make Urdu the state language. Because smoldering discontent cannot be suppressed for long. Soon, then, there is a danger that East-West relations will end. (59) Through the course of history, this cautionary saying has gained extreme truth value. Because in fact the language movement was mainly responsible for the mental separation and gap between East and West Pakistan.

Motahar's work presents a piecemeal picture of the degenerate values of prejudice, child marriage, polygamy, concubinage, in-law torture, lack of education, etc. prevailing in the contemporary Bengali Muslim women's society and the history of its evolution. Violence against women is not an isolated incident in the Muslim society during the period under discussion. The subject is depicted in various ways in many places in his works. While drawing a pathetic picture of a poor and helpless woman named Kulsoom in the story 'Samajchitra', he mentions:

... Kulsoom used to arrange all the affairs of Nasir miya with such painstaking care that even a temperamental person like him could not get upset with her. Instead, after six months, he

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

'exposed' Kulsoom. He wanted to leave Kulsoom there when he resigned from his job as Nasir Mia and returned to the country after four years. Sharif people of that time had such custom; Wherever they went, whenever they got a chance, they would greet Atraf's daughter, and suddenly one day they would leave. He did not feel it necessary to think about what will happen to the poor person. But Kulsum did not leave the company of her husband. But if she has to promise that she will not be able to reveal Nick's words to anyone, she will have to live like a maid in every way, and she will have to earn and eat by working ten times. Fearing Nasir Mia's disgrace or loss of caste, Kulsoom renounced all rights from that day—her tears turned into condensed shadows ... Her name is Panchi's ma` (Sirazul,1983:416)

Music was not viewed favorably in the society. There were two reasons for the obstruction. The reluctance of the Muslim society about sensitive subjects like fine arts due to the contemporary political situation. Religious restrictions. However, the members of Dhaka's 'Muslim Sahitya Samaj' (Muslim Literary Society) were the first to comment in favor of music practice. They present music as the patron of Sukumar scholarship. He also expressed the opinion that cultural practice is a way to improve the overall quality of Bengali Muslims. As a member of this society, Motahar Hossain's passion for music as well as literature was noticeable. Muslims in music, Bengali songs, Rabindranath in music, my friend Nazrul in his songs, his essays and discussions about musical tone of music testify to his love and passion and expertise towards music as well as made the contemporary Muslim society shine. According to him, the Muslim society has deprived itself of joy for a long time and thus they are homeless in a sense. When he is homeless, people call him a homeless person. Muslim society is real, so homeless people yearn for a little happiness but they don't get it. A The people of the society are also a little happy, greedy, thirsty, but where to get it? One of the reasons why a Muslim does not have a home is the lack of means of pleasure. Muslims don't sing. Will not paint, in a word, will not be in any form of interesting fine art. He mentions in the article 'Ananda and Muslim Homes': 'If you don't see joy and profession in the world, then come and go to this Muslim society of Bengal. You must obey the command of this call: and you must be happy in it. If you want to get pleasure in any other way, it will be bed'at and haram'. (*Shikha*:1334, Quoted in Sirazul,1983:534-36)

In 1927, Nazrul performed the opening song of the first annual conference of the 'Muslim Literary Society in Dhaka' and the audience even Mullah-Maulbira were captivated by the

euphoria of that song. Then Kazi Motahar Hossain was also hypnotized by that magical effect. He read an essay on 'Muslims in Music Practice' at the literary conference. And the words that came out of the mouths of the Mullah community after listening to his article were: "Babbaah! Even in the beard, so much kufr?" And the words that came out after listening to Nazrul's song were: "Ba! Ba! What a beautiful Islamic song-just like a ghazal!" It should be noted that Nazrul's gathering of well-known allegories of Urdu-Persian literature, Sanai of Shahi Durbar, Nupur Jhankar of Rupwali, Shiri-Farhad and Laili-Majnoon Majlis overflowing from 'Palash Ashok' in the joy of the festival, Hinduanis 'Ful Dalite' A slight odor was not detected.⁴ (Motahar, 2007:91-92) He said in *Sancharan*: The essence of national life is revealed through music. The deep feeling of the heart, which has an unpredictable shadowy form, is best expressed through the obscurity of music. ... The play of musical tones is like stirring a cotton ball and awakens the imagination of a complete beauty or form in the mind. (Motahar, 1969: 67)

Various traditional reforms and superstitions prevailing in the society take a complex shape in the contemporary Bengali Muslim society. The lower middleclass Muslims understood religion only as superstition and bigotry. There was no argument between them about religion. As the reason for the backwardness of the society, this issue has emerged obliquely like other subjects in his writings:

...we want to remove the ingrained superstitions and long-accumulated rubbish of the present Muslim society. We don't want to dream of happiness while drowning in the fascination of the past - we want to jump into the stream of action and glorify the future of Islam. We want to show our sense of responsibility by steering the way of thinking of the society from the crooked and crooked path to the simple true path of love and beauty. (*Shikha* Quoted in: Laila, 1989:120)

In a conservative, fanatical social environment, his science minded thinking was revolutionary against the background of the time. can be said in the essay 'Religion and Society' his bold voice of conscience echoes:

As long as Sanskar keeps pace with intelligence, he can create many things with his living energy. But when this reform overshadows reason and judgment, it turns into superstition. Common people forget the real essence of religion and consider all these external reforms as religion - these are dearer than their lives. In fact, these are the religions for them ... (Motahar *Rachanabali*, Ist vol.,1985:140)

That refers, failing to understand the true meaning of religion, they consider external reforms as religion. He talked about analyzing religion in terms of age and accepting it in life. If scriptures or religious beliefs are considered immutable, the main purpose of religion-inspiration which is peace and profit, is destroyed. Religion in conflict with science and reason (i.e. with the progressive development of knowledge, judgment and intellect) A slight change in accessory beliefs is not harmful, but rather necessary. Like this, the real religion is not scratched by the change. (141)

Conclusion

Kazi Motahar Hossain's writings are an excellent attempt to prepare the field of social progress through the spread of contemporary education, the practice of logic, patriotism, humanity, open minded practice, sports -programs and above all the creation of modern ideas. His role in the establishment of liberal humanism was unique in the introduction of progressive ideas in the formation of society in the pursuit of knowledge. It depicts the evolution of the Bengali Muslim society of that time. This eminent writer and literary man was able to identify the superstitions that kept the Muslim society stagnant in the first half of the 19th century and tried to move the society forward by expressing his experienced thoughts through writing. He was always trying to build a society of humanity and liberal thinking.

¹. 1. In 1915, he passed the first division entrance examination from the Kushtia High English School. In 1917, he passed ISC from Rajshahi College by securing fourteenth rank in the first division. In 1919 from Dhaka College with honors in Physics B. SC and M. in 1921 from Calcutta University in second class in the same subject. Passed SC. He received his Ph. D. degree from Dhaka University in 1950 in computer science without the help of a supervisor. His career began in 1921. In June of this year, he joined Dhaka University as a lecturer in the Department of Physics. He taught till 1975. In 1975 he got the status of National Professor of Bangladesh. From 1926 to 1935, he was associated with the 'Buddhir Mukti Movement' and the society's mouthpiece *Shikha* as a member of the 'Muslim Literary Society'. Edited *Dilruba* magazine since 1950. From 1949 to 1958 served as the President of the 'Pakistan Literary Council'. He received Bangla Academy

Literary Award (1966), Dhaka University Honorary DSC (1974), Independence Day Award (1979) besides Nasiruddin Gold Medal (1977), Muktaadhara Sahitya Award (1980), etc.

² . In this regard, He mentioned: The days of intimacy with Nazrul are invaluable assets of my literary life. Acuity in vision (as a scientist) was already there, but coming in contact with Nazrul, I learned to think of people closer, closer. If this rare human feeling has really come to some extent, then at least 12 if not 16 years of it have been influenced by Nazrul.

³ . At various times, his articles, speeches, book reviews, interviews have been published in various literary anthologies including *Bangla Academy Patrika*, *Bangla Development Board Patrika*, *Sahitya Patrika*, *Nazrul Academy Parikram Book*, *Samakal*, *Maheno*, *Ittefaq*, *Dainik Pakistan*, *Dilruba*, *Lok Sahitya Patrika*, etc. Many of his works have been published in *Pravasi*, *Sawgat*, *Mohammadi*, *Shikha*, *Bulbul*, *Moazzin* newspapers in the past. Kazi Motahar Hossain has also translated several poetry books of Kazi Ashraf Mahmud including a poem by Maxim Gorky under the name 'Jhoro Bajer Gan'. 1336

⁴ . Kazi Motahar Hossain mentioned in the commemoration of Dhaka University - "Taja Batajar" singer poet Nazrul Islam in his famous song "Asile ke go guest Uaye Nishan Sonali Navin threw flower branches on his way. It is surprising that everyone present is a supporter. Whether he was a Saugat Panthi or Mohammadi Panthi was completely enthralled by the song. All the Majlis became guljars. At least at that time, no one raised the question whether the music was permissible or not. (Motahar, 2007:92)

Works Cited

Books:

Kazi Motahar Hossain Rachnaboli, 1st Volume, Muktaadhara, Dhaka, 1st Publication, 1976

Kazi Motahar Hossain Rachnaballi, Volume 1, Bangla Academy, Dhaka, 1985

Kazi Motahar Hossain Rachnaboli, 4th volume, Bangla Academy, Dhaka, 1992

Kazi Motahar Hossain, *Sancharan*, 2nd edition, Dhaka, 1969

Kazi Motahar Hossain, *Smritikha* Nava Yuga Publications, Dhaka, 2007

Laila Zaman, *writer for Sawgat magazine, Contribution and Social Role*, Bangla Academy, Dhaka, 1989

Khondkar Sirajul Islam, *Muslim Literary Society: Social Thought and Literary Works*, Bangla Academy, Dhaka, 1983

Articles:

Motahar Hossain, Kazi "Religion and Society", Transcription, *Kazi Motahar Hossain Rachnaballi*, Volume 1, Bangla Academy, Dhaka, 1985

Motahar Hossain, Kazi “Selected Essays”, *Kazi Motahar Hossain Rachnaboli*, 1st Volume, Muktdhara, Dhaka, 1st Publication, 1976

Motahar Hossain, Kazi “Muslims in Music Practice”, *Sancharan*, 2nd edition, Dhaka, 1969

Motahar Hossain, Kazi, “New literature”, 3rd year, 12th issue, quoted by: *Kazi Motahar Hossain Rachnaboli*, 4th volume, Bangla Academy, Dhaka, 1992

Motahar Hossain, Kazi “Memoirs of Dhaka University and other topics”, *Smritikha*, Nava Yuga Publications, Dhaka, 2007

Motahar Hossain, Kazi “The Origin and Evolution of My Philosophy of Life”, *Smritikha*, Nava Yuga Publications, Dhaka, 2007

Motahar Hossain, Kazi “Samajchitra” *Moazzin*, 2nd year 1st, 2nd issue Kartik Agrahayan, 1336 p. 54, quoted in: Khondkar Sirajul Islam, Muslim Literary Society: Social Thought and Literary Works, Bangla Academy, Dhaka

Motahar Hossain, Kazi “Ananda and Muslim Homes”, *Saugat*, 5th Year 6th Issue, Agrahayana, 1334, pp.534-36, quoted by Khondkar Sirajul Islam, *Muslim Literary Society: Social Thought and Literary Works*, Bangla Academy, Dhaka,

Motahar Hossain, Kazi “Religion and Society”, *Sancharan*, Transcription, *Kazi Motahar Hossain Rachnaboli*, Volume 1, Bangla Academy, Dhaka, 1985'

Motahar Hossain, “State language and the language problem of East Pakistan” *Kazi Motahar Hossain Rachnaboli*, 1st Volume, Muktdhara, Dhaka, 1st Publication, 1976

‘Reports of the second year’, *Shikha*, second year, 1928, quoted by: Laila Zaman, *writer for Sawagat magazine. Contribution and Social Role*, Bangla Academy, Dhaka, 1989

Newspapers:

Moazzin, 2nd year 1st, 2nd issue Kartik-Agrahayan, 1336

Shikha, second year, 1928, quoted by: Laila Zaman, *writer for Sawagat magazine, Contribution and Social Role*, Bangla Academy, Dhaka, 1989

Zeno's Paradox: A Mathematical Exposition

Dr. Akikul Haque*

Abstract

About 2,500 years ago, the Greek philosopher Zeno of Elea, was a disciple of Parmenides. He asked a simple question that turned out to be exceedingly difficult to answer. He is well known as the author of several ingenious arguments to prove the impossibility of motions. We can ask: how can an arrow travel from the bow of the archer to its target? If it could really move, then, at any place in its (assumed) path, it would be exactly where it is. It would be occupying a space equal to itself. For this reason, there would be no extra space in which to move. Again, at any moment or point of time, it is where it is. The moment is indivisible. The arrow could not be at one place in one part of the moment and at another place at another part of the moment. It simply would have no space or time in which to move. At every point in its trajectory it would be at rest. So, it cannot possibly move. Hence, Zeno concluded that motion is an illusion. The aim of this paper is to explain firstly the Zeno's arguments concerning space and motion, and secondly we would like to analyze it from the mathematical point of view.

1. Zeno's Argument Concerning Space and Motion:

Zeno's paradoxes are primarily about the possibility of motion. Parmenides had combated pluralism. He had declared change and motion to be illusion. Zeno, a strong supporter of the theory of Parmenides, attempted to prove it. According to him, change and motion are impossible even on the pluralistic

* Professor, Department of Philosophy, University of Chittagong

hypothesis. Parmenides denied the existence of the empty space. Zeno tries to support this denial by reducing the opposite view of absurdity. Assume for a moment that there is a space in which things are. If it is something, it will itself be in space. That space will itself be in space, and so on indefinitely. Here we can say that this is absurdity. Things, according to Zeno, are not in space or in any empty void. Therefore, both Parmenides and Zeno were quite right to deny the existence of a void.¹

Zeno also denied the reality of motion. In support of this statement concerning motion he gave the following argument: **first**, according to him, let us assume that we want to cross a stadium or race course, In order to do so, we would have to traverse an infinite number of points. Moreover, we would have to travel the distance in finite time, if we wanted to get the other side at all. Now the questions arise that how can we traverse an infinite number of points, and so an infinite distance, in a finite time? It can be pointed out that we cannot cross the stadium. In fact, we must conclude that no object can traverse any distance whatsoever, and that all motion is consequently impossible.²

Second, let us assume that Achilles and a tortoise are going to have a race, we know that Achilles is a sportsman, so he gives the tortoise a start. Now, by the time that Achilles has reached the place from which the tortoise started, the latter has again advanced to another point. It is important to note that when Achilles reaches that point, then the tortoise will have advanced still another distance, even if very short. We can represent this argument of Zeno by a diagram below:

T₁.....T₂.....T₃

A₁.....A₂.....A₃

Achilles is always coming nearer to the tortoise. But Achilles never actually overtakes it. T₁ is the starting point of Tortoise and A₁ is the starting point of Achilles. Whenever Tortoise move from T₁ to T₂ then Achilles moves from A₁ to A₂ and so on. This moving process will be going on infinitely (time). From the diagram it is proven that the Tortoise will win the race competition.

The Achilles never can do so, on the supposition that a line is made up of an infinite number of points [i.e, ←.....→], for then Achilles would

have to traverse an infinite distance. According to Pythagorean hypothesis³, Achilles will never catch up the tortoise. Although they assert the reality of motion, the Pythagoreans make it impossible on their own doctrine. For it follows that the slower moves as fast as the faster.

Third, let us assume a moving arrow. According to Pythagorean theory the arrow should occupy a given position in space. But to occupy a given position in space is to be at rest. Therefore, the flying arrow is at rest, which is a contradiction.⁴ We know the idea that the arrow flies through space. But in order to reach its destination, it must pass over a series of points in space. Hence it must successively occupy these different points [i.e., we assume these points are: $X_1, X_2, X_3, \dots$]. Now it is important to note that, to occupy a point of space at given moment, means to be at rest. Here we can say that the arrow is at rest and its moment is but illusory.

The moving arrow goes from distance A to B (figure-1). Here, A is the starting point and B is the last point where it moves. Here AB line is $= X_1 + X_2 + X_3$. But the arrow is stationary to its own space, i.e., if we assume that the length of arrow is the same length of X_1, X_2 , and X_3 at each point respectively, is stationary to its space. X_1, X_2 and X_3 . So it does not move. Therefore, $X_1 = 0$ (Length), similarly $X_2 = 0$ and $X_3 = 0$; at every point or its trajectory it would be at rest. Symbolically this can be shown as:

$$X_1 = 0 \text{ [arrow is stationary and no move]}$$

$$X_2 = 0 \text{ [arrow is stationary and no move]}$$

$$X_3 = 0 \text{ [arrow is stationary and no move]}$$

$$\text{Thus, } AB = X_1 + X_2 + X_3 = 0 + 0 + 0$$

$$\therefore AB = 0 \text{ [No space moves]}$$

$$\therefore AB = 0 \dots (I)$$

But practically (in real distance) $AB \neq 0 \dots (II)$.

Then, equation (I) and (II) are clearly contradictory. We know that a paradox is generally a puzzling conclusion we seem to be driven towards by our reasoning, but which is highly counterintuitive, nevertheless.

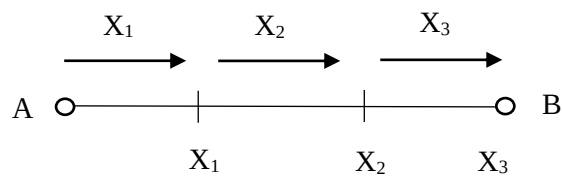


Figure: 1 (moving arrow).

Additionally, if movement takes place, it can take only in space, If space is a reality, it exist somewhere, that is, in a space, which in turn exists in another space, and so on. Thus motion is impossible from every point of view. We cannot suppose it to be real, unless we are willing to affirm an absurdity.

Aristotelean Argument:

Fourth, we know that the fourth argument of Zeno was given by Aristotle. According to this argument, we have to represent to ourselves three sets of bodies on a stadium or race-course. One set is stationary, the other two are moving in opposite directions to one another with equal velocity. Let us consider the below figure:

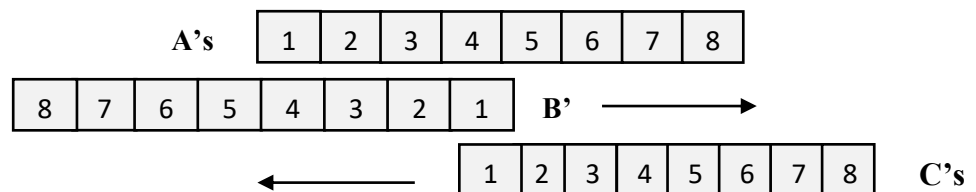


Figure: 2

From the above figure 2, the A's are stationary; the B's and C's are moving in opposite directions with the same velocity. Now they will come to occupy the following positions:

A's	1	2	3	4	5	6	7	8
B's	8	7	6	5	4	3	2	1
C's	1	2	3	4	5	6	7	8

Figure: 3

It is important to realize from the figure 3 that in attaining this second position the front of B₁ has passed four of the A's, while the front of C₁ has passed all the B's. If a unit of length is passed in a unit of time, then the front of B₁ has taken half the time taken by the front of C₁ in order to reach the position of Fig.3. On the other side the front of B₁ has passed all the C's, just as the front of C₁ has passed all the B's. Here the time of their passage must then be equal. We are left then with the absurd conclusion that the half of a certain time is equal to the whole of that time⁵.

2. An Explanation from Differential Calculus:

Calculus was invented in the late 1600's by Newton and Leibnitz. Their calculus is a technique for treating continuous motion as being composed of an infinite number of infinitesimal steps. Most mathematicians and physicists believed that continuous motion should be modeled by a function which takes real numbers representing time as its argument and which gives real numbers representing spatial position and its value. This positional function should be continuous or gap-free. In calculus, it is easy to make a distinction between being in motion at a point and being at rest at a point. In order to explain this, first we have to know what the rate of change and derivative is.

Change in dependent variable due to one unit change in independent variable is called the rate of change in the dependent variable with respect to independent variable.

Assume a function $y = f(x)$ in which y depends on x .

Suppose Δx unit change in x causes Δy unit change in y . Therefore, rate of change in y with respect to x is $\frac{\Delta y}{\Delta x}$. Derivative $(\frac{dy}{dx})$ measures the rate of change in y when Δx approaches to zero. In other words, $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Here simply assume the $\frac{dy}{dx}$ and $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ are same. This process of finding derivative is called differentiation.⁶

Aristotle had a way of resolving Zeno's paradox. His resolution involved distinguishing between space and time being in themselves divided into parts without limit and simply being divisible without limit. According to him, no magnitude is truly composed of parts. Although it may be divisible into parts without limit, the continuum is given before any such resulting division into parts. Indeed, Aristotle denied that there could be any non-finite parts. This is called a "Finitist". This indicates that non-finite 'parts' cannot be parts of space or time. As he thought that no magnitude can be composed of what has no extension. This means that an arrow can only be "at rest" if it is at the same place at two separate times. For Aristotle, both rest and motion can only be defined over a finite increment of time. Later the notion of an instantaneous velocity came to be accepted. This includes the case where the velocity is zero.⁷

Bishop Berkeley [with Newton] took a skeptical line about the possibility of instantaneous velocities. In the calculation of a derivative, let us consider the following fraction:

$$f(x+\delta x) - f(x) / \delta x,$$

Here δx is a very small quantity. In the elementary case where $f(x)=x^2$, for example, we get

$$\begin{aligned} & (x+\delta x)^2 - x^2 / \delta x \\ \Rightarrow & x^2 + 2.x.\delta x + \delta x^2 - x^2 / \delta x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot x \cdot \delta x + \delta x^2 / \delta x \dots\dots\dots (I)$$

$$\Rightarrow 2x + \delta x$$

$$\therefore 2x + \delta x \dots\dots\dots (II)$$

And then to $2x + \delta x$, with δx being subsequently set to zero to get the exact derivative $2x$. Berkeley objected that only if δx was not zero could one first divide through by it, and so one was in no position, with the result of that operation, to then take δx to be zero. On the other side, according to Newton's calculus, if it took δx to be zero, it seemed, required the impossible notion of an instantaneous velocity. Aristotle had denied this in connection with his analysis of Zeno's paradoxes.⁸ The association between derivative and motion, Newton use the term 'fluxion'. This involved the idea that increment δx was never zero, but merely remained a still finite "infinitesimal".

According to Aristotle, infinities, such as the possible successive division of a line, were only 'potential' not 'actual'. An actual infinite division would end up with non-existential and non-finite points.

We shall explain Zeno's arrow in the following way by Bertrand Russell. Let us consider the following arrow's figure:

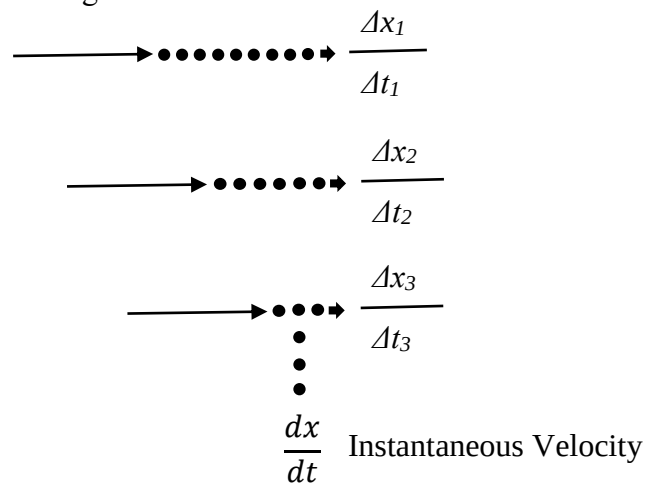


Figure 4: Zeno's Arrow

Let us pick one point in the arrow; we say its center of mass. Then, the motion of the arrow is defined by the position of that point at each moment of time. The calculus defines instantaneous velocity as the derivative of space with respect to time, i.e., $\frac{dx}{dt}$. The value of the derivative at time t is the instantaneous velocity at that time. If $\frac{dx}{dt} = 0$, the arrow is not moving at t .⁹

According to Bertrand Russell, because of the definition of the derivative, this answer to Zeno begs the question. To define the derivative at time t_0 we consider the distance the object travels in a finite time span Δt , which includes t_0 . The ratio $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ is its average speed in the in time span Δt . The operation is repeated for smaller and smaller values of Δt . The derivative at the moment t_0 is the limit of the ratio $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ as Δt goes to Zero.¹⁰

For this reason, the definition of the derivative requires consideration of motions over finite stretches of space and time, precisely the kind of motion Zeno claimed to be impossible. To define the derivative, we have to suppose that the conclusion of Zeno's argument is false.¹¹ This would only evade the problem, not answer it.

Russell then offered an alternative solution of Zeno's paradox. As we have already stated, the motion of the arrow can be represented by nothing the position of its center of mass at each moment in the duration of its flight. Russell proposed an "at-at" theory of motion.¹²

It is important to say that the arrow moving from A to B indicates that it occupies each point in its trajectory at each corresponding moment of time. He does not say that it zips rapidly through these points. If we consider the arrow's state of motion at just one moment, without taking into account its position at any other time, the instantaneous velocity has no meaning.¹³

If we ask how the arrow gets from the beginning of the path A to the midpoint C, Russell answers that it is by occupying each point between these two points at the appropriate time. Again, if we ask how the arrow gets from one point to the next, he reminds us that there is no next point – between any two points in its continuous path there are infinitely many others.¹⁴

According to Salmon, Russell's solution to the arrow paradox is completely satisfactory. In addition, it indicates an analogous approach to the concept of causal transmission. According to him, instead of an arrow, for example, we think of a bullet shot from a gun, when the bullet leaves the gun, marks are made upon it that enable experts to identify the gun from which the bullet was shot. The moving bullet is a causal process; the marks are transmitted. Once the marks have been imposed by the interaction of the bullet with the gun, they remain on the bullet as it travels. It is important to note that the mark is transmitted indicates that it is at the appropriate place in the process at the appropriate time. Moreover, the bullets transmit mass, a conserved quantity in this non-relativistic context. It possesses a certain mass when it exists from the gun. It continues to possess that same mass without any further interactions to replenish mass. Here the mass in question is at the appropriate place at the appropriate stage in the evolution of this process. For this reason, we can adapt Russell's "at-at" theory of motion to an "at-at" theory of causal transmission.¹⁵ The significance of this theory is that the bullet transmits information. The marks identify the gun from which it was shot. According to Salmon, it also transmits causal influence. If the bullet strikes a person, it will produce a wound – possibly a fatal wound.

3. Mathematical Exposition:

The oldest 'solution' to the paradox was done from a purely mathematical perspective. The claim admits that, there might be an infinite number of jumps that we would need to take. But that each new jump got smaller and smaller than the prior one. Therefore, as long as we could demonstrate that total sum of every jump we need to take adds to a finite value, it doesn't matter how many chunks we divide it into. For example, if the total journey is defined to be 1 unit, then we could get there by adding half after half after half, etc. The series $1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$ does indeed converge to 1, so that we wind up covering the entire needed distance if we add an infinite number of terms.

Suppose, series = $1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$

$$\begin{aligned} 2 * \text{series} &= 2[1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots] \\ &= 1 + [1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots] \end{aligned}$$

Therefore, $[2 \times (\text{series}) - (\text{series})] = (1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots) - (1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots)$
 $= 1.$

But it is also flawed. This mathematical line of reasoning is only good enough to show that the total distance we must travel converges to a finite value. It does not tell us anything about how long it takes us to reach our destination; this is the tricky part of the paradox¹⁶.

4. Concluding Remarks:

Many thinkers, both ancient and contemporary, tried to resolve this paradox by invoking the idea of time. According to Ethan Siegel, pure mathematics alone cannot provide a satisfactory solution to the paradox¹⁷. He argues that the reason is simple: the paradox isn't simply about dividing a finite thing up into an infinite number of parts, rather about the inherently physical concept of a rate. Although the paradox is usually posed in terms of distance alone, the paradox is really about motion, which is about the amount of distance covered in a specific amount of time. He also argues that objects can move from one location to another in a finite amount of time. Their velocity are not always finite, but because they don't change in time unless acted upon by an outside force. This is basically Newton's first law¹⁸, but applied to the special case of constant motion. There is an explicit relationship between distance, velocity and time. So, motion from one place to another is possible. This is still an interesting exercise not only for philosophers and mathematicians, but also physicists who have extended it to quantum phenomena to resolve Zeno's paradox.

The arguments of Zeno are mere sophistries on the part of Zeno. These arguments are ingenious tricks. They err by supposing that a line is composed of points and time of discrete moments. It may be that the solution of the riddles is to be found in showing that the line and time are continuous and not discrete. In this sense, Zeno was not concerned to hold that they are discrete. On the other hand, he is concerned to indicate absurd results which follow from supposing that they are discrete. Zeno believed that motion is an illusion and is impossible. The assumption of its possibility leads to contradictory and

absurd conclusions. According to Copleston, this hypothesis of Zeno does nothing to explain motion, but only leads one in absurdities.¹⁹For this reason, Zeno reduced the hypothesis of his adversaries to absurdity. This indicates that the real result of his dialectic was not so much to establish Parmenidean monism.

Aristotle's resolving Zeno's paradoxes convinced most people until more recent times. His notion of an instantaneous velocity came to be accepted. But Zeno's paradoxes lead us into twentieth century developments in the area of logical paradoxes, a branch of formal logic, intensional logic, and mathematics.

Notes and References:

1. Fredrick Copleston, S. J. *A History of Philosophy*, Vol.1, Search Press, London. 1946. P. 56.
2. *Loc.cit.*, also see, (c.f) Aristotle, *Physics*, Z 9, 239 b 9; 2, 233 a 21; Top. , 8160 b 7.
3. The Pythagoreans hypothesis is that reality is made up of units. These units are either with magnitude or without magnitude. Suppose, a line is made up of units possessed of magnitude. The line will be infinitely divisible and the units will still have magnitude and so be divisible. In this case the line will be made up of an infinite number of units, each of which is possessed of magnitude. As a result, the line must be infinitely great, as composed of an infinite number of bodies.
4. Copleston, *Ibid*, P. 57.
5. *Ibid*. Pp. 57-58.
6. Mohammed Saiful Islam, *Microeconomics*, 3rd ed., Sumaiya Publication, Chittagong, 2017, P. 21.
7. 'Classical Logical Paradoxes' *Internet Encyclopedia of Philosophy*. [www.https://iep.ulm.edu/per-log/Logical Paradoxes] dated: 23.03.2022, time 2.00pm.

8. *Ibid.*

9. Salmon. Wesley C, 'Causation', in Richard M. Gale (ed.) *The Blackwell Guide to Metaphysics*, Blackwell Publishers Ltd; Oxford, UK, 2002, P.34.

10. *Loc. cit.*

11. *Loc. cit.*

12. *Loc. cit.*

13. Russell Claims that these considerations actually vindicate Zeno. However, Russell points out, even if the arrow is at rest at each point of its trajectory, it does not follow that it is always in the same place.

14, Salmon,W C., *Op. cit.* P. 34.

15. *Loc. cit.*

16. Ethan Siegel, 'This is How Physics, Not Math, Finally Resolves Zeno's Famous Paradox', [[https:// :forbes.com/sites/starts with bang/2020/05/05/this-is-how-physics-not-math-finally-resolves-Zeno's-paradox-?sh=4f011b1233f8](https://forbes.com/sites/starts-with-bang/2020/05/05/this-is-how-physics-not-math-finally-resolves-Zeno's-paradox/?sh=4f011b1233f8), dated:22-06-2022,time 10 am.

17. *Loc. cit.*

18. Newton's first law: objects at rest remain at rest and objects in motion remain in constant motion unless acted on by an outside force.

19. Copleston, *Ibid.*, P. 58.

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

Marzia Khatan Smita^{*}

Abstract

Rabindranath Tagore showed multifarious skills as a poet, storyteller, novelist, playwright, lyricist, singer, composer, painter, educator, essayist, and philosopher in his vibrant, long and successful career. Although his words about education were spoken centuries ago, they are still surprisingly contemporary. His thoughts on child education make us think anew. His educational concepts and theories are the core of child development, present in the National Education Policy of Bangladesh. In the following paper, an attempt will be made to evaluate the reflection of his philosophy on the pre-primary and primary levels of the existing Educational Policy of Bangladesh. Secondary sources were used to collect data for the study, which was analysed qualitatively. The research methodology employed here includes historical approaches. According to him, the cornerstone of a perfect human future is laid in childhood. Therefore, he believes that education should be simple, child-centric, basic, simple, modern, mother language based, independent, joyful, scientific, technical, fearless, and in a natural environment. Tagore's educational and philosophical ideas can be used to help children develop their spiritual, moral, and aesthetic values, as well as their academic abilities when they are implemented into educational policy. It is widely visible in the pre-primary and

^{*} Assistant Professor, Institute of Education and Reserch, University of Chittagong

primary stages of the education policy of Bangladesh which is vastly commendable in terms of an efficient education system.

Keywords: Rabindranath Tagore, Education, Educational Philosophy, Educational Practices, Pre-primary Education, Primary Education, Child Development, National Education Policy-2010.

Introduction

“At first, children must gather knowledge through their life, and it is their first love. All its colour and movement attract their eager attention, and then they will renounce their lives to gain knowledge”– Rabindranath Tagore

Rabindranath was an Indian at heart, but he did not consider himself to be a member of any specific race or community intellectually. He was perpetually the spokesperson or the voice for all of humanity (Md. Saiful 2012, 11). Rabindranath Tagore, a Bengali philosopher and educator, exposed the world to his educational theory at the dawn of the twentieth century, sparking a new era of revolutionary reform. His passion for the educational system stems from his own traumatic school experiences as a child (Abdullah 2006, 119). Later, his ideas on education were expanded upon, published in important works, and used to influence educational reform in a number of settings.

His thoughts are a synthesis of Eastern and Western perspectives (Danes 2019, 285–292; Nisha and D.S. 2016, 69-72). According to him, every human being possesses a great soul with the capacity to grow into a superhuman being of the universal soul, but this can only be accomplished through education. He argues that the primary goal of education is to provide people with the tools they need to achieve their own personal fulfilment. A country's educational system should be capable of fostering the holistic development of its citizens, placing equal value on the acquisition of theoretical as well as practical skills (Nisha and D.S. 2016, 69-72).

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

As a child, he did not participate in the conventional educational system. His education was taken care of by a private tutor who came to his house. From an early age, he never showed any interest in pursuing a conventional education. Rabindranath wrote in his book *Jibansmriti* that during the short amount of time, he spent in school, the lessons, the environment, and the school days seemed to him like "a daily allotment in the mouth."

Children represent the most precious resource available to the common people. When the painter Ananda Kumar Swamy saw Rabindranath's works, he had the impression that the artist had depicted the world as seen through the eyes of a child (Md. Saiful 2012, 10).

Even though Rabindranath presented several concepts and perspectives on education centuries ago, his influence is still noticeable in Bangladesh's contemporary education policy. His thoughts on education make us think anew. Tagore's approach to education is based on four key principles: naturalism, humanism, internationalism, and idealism (Ankhi 2021, 3984-3987; Thriveni 2018).

Bangladesh's first education policy was implemented 49 years after independence. The country's first education commission, led by Dr. Kudrat-e-Khuda, a prominent scientist and educator, was formed shortly after independence to formulate education policy. After extensive scrutiny, the Commission formulates a people-oriented modern and science-based education policy, which also reflects many aspects of Rabindranath's philosophy of education. However, Dr. Kudrat-e-Khuda's proposed education policy was not implemented. After that, work on the Education Policy 2000 got back on track, but it wasn't released until the end. Shortly after taking responsibility, the government initiated the formulation and implementation of an education policy. In less than four months, National Professor Kabir Chowdhury and Dr. Kazi Khaliquzzaman Ahmed, co-chairman of the 18-member Education Policy Making Committee, drafted an education policy. Extensive publicity-based discussions are reviewed. Through various seminars and discussion meetings, opinions are gathered.

Incorporating the opinions, recommendations, and suggestions of people from all walks of life, including educators, teachers, students, parents, politicians, scholars, businessmen, investors, and professionals, the draft of the National Education Policy-2010 was finalised. This was done with the intention of developing the next generation into a human resource that was knowledgeable in both knowledge and technology, as well as being inspired by moral values, national tradition, and the spirit of the liberation war. Religion, science, and technical education have been given priority in this policy, which is an important aspect. It emphasises human instincts and the provision of life-sustaining education in the world, which will open the door to employment opportunities.

The objectives of Education for All (EFA), as well as the Millennium Development Goals (MDGs), and other international declarations, have been fully complied with by this Policy (UNESCO 2018). It is divided up into a total of 28 chapters. The second chapter covers pre-primary and primary education, also known as the first two levels of formal education. Pre-primary and Primary education are considered to be the basic levels of education.

Pre-primary education is the cornerstone of an individual's education, which begins in infancy (Samir and Goutam 2018, 1-27). Pre-primary education is a fun education system at the preparatory level for children that prepares them to accept and adapt to their future primary education stage and reduces school fear (Sabina and Mahbuba 2020, 251). It is an early preparation of schooling 5+ children and subsequently, it will also be expanded to children aged 4 and older to make them a source for the nation's growth as well as monumental for the cognitive, mental, and other development of children (National Education Policy 2010, 11).

Primary education is vital to our national existence. Primary education is the foundation for developing skilled citizens and a means of incorporating the entire population into the educational system. Consequently, equal opportunities will be created to ensure that all classes of children have access to primary education, regardless of ethnicity, socioeconomic status, physical or mental disabilities, or geographic location. It

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

is the state's constitutional responsibility (Kamrunnesa and Salma 2000, 34-61). Primary education in Bangladesh is provided free of charge to all children in accordance according to Article 17 of the Bangladesh Constitution. (Abdul et al. 2015, 131-222). Primary education will now last for a total of eight years instead of the current five, taking students all the way through eighth grade. Meeting the requirements for the necessary infrastructure and locating an adequate number of teachers are the two primary challenges that must be overcome in order to put this into effect (National Education Policy 2010, 13).

The following are the study's objectives:

1. To analyse Rabindranath Tagore's educational ideas and his fundamental view of education.
2. Evaluate the reflection of his philosophy on the pre-primary and primary levels of the existing National Educational Policy 2010.

Research Methodology

This investigation typically takes the form of historical approach with analytical and descriptive study. Within this section of the research for Tagore's biography, the historical method is utilised. An investigation of people's lives through the lens of history is impossible without also taking into account the ways in which those people engaged with the ideas, movements, and institutions of their eras. The focus serves only to establish the focal points toward which historians direct their attention (Best et al. 2014, 73). In this study, the educational philosophical ideas proposed by Tagore are analysed using analytical methodology. Analytical research is a specialised form of research that requires analytical thinking skills as well as the evaluation of facts and information pertinent to the research that is being carried out. Through analytical research, an individual is able to discover essential particulars that allow them to contribute new ideas to the content that is being produced (Mohanlal Sukhadia University). In order to demonstrate how Tagore's educational and philosophical ideas reflect Bangladesh's National Education policy, a

descriptive study is used. A descriptive study examines, explains, and describes the current situation. It is concerned with conditions or relationships that currently exist, opinions that are held, processes that are currently taking place, effects that are evident, or trends that are currently developing. It is primarily concerned with the present, but it frequently takes into account events from the past that have an influence on how they relate to the current condition. (Best et al. 106).

Thus this study was based entirely on theoretical concepts, the qualitative analysis of the research data involved the collection of information from secondary sources. Intricate details about phenomena such as feelings, thoughts, and emotions can be obtained using qualitative methods rather than more conventional approaches (Creswell and Creswell 2018, 11). I have gathered secondary data from scholarly works such as books, research articles, journals, and electronic papers that were written about Tagore and by Rabindranath Tagore.

Tagore's Educational Philosophy and its Reflection on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy

A good education can help children develop a sense of fairness and responsibility, as well as a sense of civic responsibility and etiquette. It can also help children develop a liberal outlook, respect for human rights, an understanding of the challenges faced by businesses, and a thirst for knowledge and friendship. They need to be ready to devote their lives to nation-building, arousing the national liberation movement's conscience, and instilling a sense of patriotism in its members. According to Rabindranath Tagore, the goal of life is the goal of education– the overall development of the student. He did not just talk about the development of the brain. He spoke of the full development of the body, mind, and heart of the students. It is very important for the child to come forward from an early age to develop into a real human being. Adequate leisure should be given for the independent management of thinking and imagination from childhood, not just putting all the dawn on memory (Rabindranath 2010, 7-19).

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

The issue of creating curricula and textbooks inspired by the national consciousness, has been mentioned with the aim of building humanitarian values. It is also mentioned that for the healthy physical and mental development of the children, a beautiful and joyful environment should be created in the school. Prior to beginning formal schooling, the pre-primary education curriculum in child development will be aimed at instilling in children a sense of discipline and encouraging them to develop their subtle senses (National Education Policy 2010, 11). Rabindranath wanted the environment for children to be educated, completely fear-free and burden-free. He spoke of giving children free rein so that education does not become a mental burden on the child. There is no greater burden than lifeless learning in childhood; it crushes out much more than it gives to the mind. For this reason, he denies the confined environment of the concrete building of the traditional school, the threat of the master, the tenacity of the ten-four rules, the fear of the examination system, the memorized learning method, etc. He aspired to raise his children in an environment that was as close to the natural world as possible. It didn't matter that school followed the conventional schedule here. It was decided based on the student's wants and needs. There is no joy in continuing one's education from childhood. The students are merely learning the essential information by heart. In this manner, only the minimum passing requirements are fulfilled, but no development is gained (Rabindranath 2010, 7-19).

Rabindranath Tagore vehemently opposed the idea of children receiving a primarily academic education through the use of books. For him, the issue is more complex than simply restricting children to the confines of classrooms and textbooks. A student's natural instincts will be smothered and he will become bookish as a result. They lose their ability to think creatively if they do this. As a result, students should be liberated from a curriculum centred around the textbook and provided with more options for learning.

There will be a variety of ways to teach preschoolers, including the use of images, colours and other easy and exciting teaching materials: models, rhymes, stories, songs, games and handicrafts (National Education Policy 2010, 11). Rabindranath was concerned about giving the children a thorough education on the non-verbal level in addition to the usual conventional education on the level of words. Psychological, emotional, imaginative,

and non-rational aspects of human nature are all included in what is known as the non-verbal side of human beings. He wanted the best of both worlds, so he built Shantiniketon to meet those needs. His dedication to educating children in the arts through music, dance, and the visual arts was admirable. (Huxley 1960, 129-232). He placed high value on one's capacity to make complete and independent use of one's body. He asserted that it was important to free children from confinement so that they could experience the elements freely, including getting wet in the rain and getting sunburned in the sun. After that, one's senses will be sharp, and their body will be healthy. In his ashram, he encouraged regular physical activity and made it a point to organize a number of different sports (Ram 2017, 150-160).

It is not possible to educate all children in Bangladesh in primary school due to economic, geographical, and regional constraints, according to the National Education Policy 2010. To this purpose, initiatives will be taken to create at least one primary school in all the villages where there is no primary school. Rabindranath also focused great emphasis on the integration of village community and education. He undertook a number of initiatives in this direction. Education will not be limited to the city. He thought of developing rural infrastructure, economy and society through education. Sriniketan was established with this specific goal.

The mother tongue was neglected in the colonial school system. Rabindranath Tagore could not accept it. He was an outspoken opponent of foreign language immersion as a means of acquiring a foreign culture. As a result, students are unable to grasp the core meaning of a subject when learning it in a foreign language. Furthermore, students must put forth so much effort to learn a foreign language that they are unable to grasp the gist of the material. As a result, education becomes "intelligible" to them, boring, understandable and monotonous. It is mentioned in National Education Policy that all children in Bangladesh as well as indigenous and small ethnic groups should be able to receive primary education in their native tongue (National Education Policy 2010, 12). He penned a two-volume book titled "Sahajpath" with the intention of making it less difficult for children to learn the Bengali alphabet. The alphabet could now be learned through the use of rhymes and pictures.

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

Real education was the goal of his life while visiting Russia in 1930, he said. He aimed to cultivate a person's entire personality, as well as their capacity for activism (Subhamoy 2014, 14). To ensure that children are able to progress to the next level of education and meet the requirements of their basic education, steps should be taken to effectively ensure that students acquire the necessary knowledge based on particular subjects, life skills, attitudes, values, and a sense of social awareness. A quality primary education system is necessary, as it serves as the foundation for the next level of education. Since many students seek employment after this stage, a solid elementary education will better prepare them for the job market (National Education Policy 2010, 12).

The children of Bengal suffer from malnutrition because there is not enough food available. In his dissertation titled "Sikkhar Herfer," he asserts that there are certain prayers addressed to the Creator, including requests to unite food and hunger, clothing and winter, language and the mind, and life and education (Rabindranath 2010, 12). It is of the utmost significance that schools provide lunch for the children. Free admission, free education materials, free lunch, and scholarships will be provided as part of the special arrangements that will be made to bring and keep children who have dropped out of school, children living on the street, and other children from disadvantaged backgrounds in primary schools. They will be protected in schools by means that are both efficient and effective (National Education Policy 2010, 6-7).

Beginning in Class VI and continuing through Class VIII, children will participate in pre-vocational education in order to foster an appreciation for manual labour and to introduce them to the concept of vocational education (National Education Policy 2010, 13). Thus, Tagore's philosophy of vocational education as a means of securing one's means of subsistence has been incorporated into the educational system of Bangladesh. The children's potential for future employment will also increase as a result of this measure's assistance in capacity building.

Rabindranath had a lot of passion and love for science and his footsteps in the field of science are significant (Arupratan 1990). In order to make science accessible to the general public, he conducted science studies and wrote about it in a language that anyone could understand. He is the author of the book *Bishwa Parichay*, which is about science.

This book at the time provided an account of the most recent developments in contemporary science (Rabindranath 1940). In addition, it embellished that description with the right amount of wonderful literary touch to strike the right balance (Abdullah 2006, 119-129). It is essential that children be provided with education in areas such as science and culture and that they be encouraged to grow as individuals free from prejudice (National Education Policy 2010, 12).

“A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame”– Rabindranath Tagore.

Placing teachers above the method of teaching Tagore said that Teachers' duties and responsibilities should be given the utmost importance because education is so essential. To instil a passion for learning in the students, teachers must know that they must model the way they live their lives in order to serve as role models for them. Teachers of high calibre will be procured in sufficient numbers. The development of physical infrastructure, a pleasant social climate, an excellent educational system, a warm teacher-student relationship and respect for the dignity of women must also be ensured in this country (National Education Policy 2010, 12).

Education is essential to the emancipation of the nation. Indulging in nationalism may seem like a simple way to liberate the country, but in reality, this is a very difficult task to accomplish (Rabindranath 2014, 106-109). The child needs to be encouraged to develop patriotism and contribute to the development of the nation by having the spirit of the war of liberation instilled in them (National Education Policy 2010, 12). It is not only necessary to know the country in the scriptures, moreover, it is necessary to master it through direct knowledge. This direct knowledge will be the real education for the children which will have the power to enrich the country in new ways. The nationalism of Bengali is the path that leads to the throne of success. It is essential to develop the vigour of the nationalist students who are currently enrolled. When compared to the power of the nation as a whole, the loss of personal gain is extremely insignificant. Every assignment that needs to be turned in at school must be completed with only the importance of one's own religion and one's own nation in mind (Rabindranath 2010, 56).

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

In order to assist the child in acquiring moral and spiritual qualities such as a sense of justice, sense of duty, discipline, etiquette, non-communal attitude, human rights, the mentality of coexistence, curiosity, love, friendship, perseverance, etc., preparations should be made to help the child acquire these qualities (National Education Policy 2010, 12). The Ministry of Religious Affairs is currently running educational programmes in mosques, temples, churches, and pagodas that aim to teach religious teachings alongside alphabetical knowledge and modern education alongside moral lessons (National Education Policy 2010, 11). Rabindranath evolved into a spiritual thinker in his later years. In Tagore's educational philosophy, moral and spiritual training were emphasized. When it comes to developing a child's character, moral and spiritual education is more important than academic knowledge. Children in educational institutions should be able to engage in activities that promote selflessness, cooperation, and a sense of community and belonging without feeling isolated. He shared the views of others on the topic of humanity and remarked that it is a wonderful thing that the Creator is in man (Rabindranath 1966).

Reconsideration

Even though we can see Tagore's philosophy reflected in our system today, there are certain aspects of his philosophy that need to be re-examined. Tagore's educational philosophy places an excessive amount of emphasis on the spiritual growth of the young learner. The pursuit of this goal is more ascetic and monastic in nature. It is possible that it is not appropriate for the fast-paced, technologically advanced world that we live in today.

Both Tagore's philosophies and the national system of education acknowledge the important role that teachers play in the lives of their students. It also discusses their competitive emoluments and training, but unfortunately, the data show that in practice, they are paid minuscule wages, and the scope of their training is also limited. This is something that is discussed in the article. They have very little of a voice, and they are nothing more than wage labourers. Students' academic performance suffers as a direct result of teachers' low morale and inability to properly instruct them. As a result, the worth and respect of a teacher are falling victim to this trend. The relationships between the

teacher and the students also have an effect on the children's ability to learn. During the learning process, the teacher frequently takes on a more authoritative role, while the student maintains a more submissive stance.

As a result of the fact that classrooms in a natural setting may not be feasible in all regions of the country, the national system of education mandates that classroom learning should be supplemented with either practical experiences or productive work that is socially useful. As a result, the child's ability to learn from their natural environment and develop their natural senses is constrained. In addition, in order for these sorts of actions to yield results, the adults who guide the children in them need to have high intellectual and spiritual capacities. Also, it's possible that such large open spaces won't be available, and as a result, the educational system in Bangladesh is structured with buildings, furniture, and the like.

How do we analyse and judge the development of a child's moral values in an education system that is geared toward getting good grades? How can a child develop their natural senses and enable self-realisation and self-determination in themselves? These are some of the important questions that come up in an education system that is oriented toward getting good grades. Because of the excessive amount of competition and the excessive amount of pressure placed on the children and the teachers to perform well, rote learning and cramming have become commonplace.

There are a number of additional indicators that all play a very important part in the education system that is in place in the modern day. The funding that is used to run the schools, including grants and aids, the administration, the involvement of the community and the government, and other topics on which Tagore's philosophy does not show a clear picture. Instead of focusing solely on becoming the Universal Man, which is the ultimate reality, the purpose of education in today's world is more on the practical side of things.

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

Conclusion

Rabindranath Tagore's contribution to the field of child development and education cannot be overstated. His child education philosophy policy was very significant and deeply integrated into the National Education Policy of Bangladesh, but it was not effectively implemented in the schools. Many of Rabindranath's views on education in independent Bangladesh centred on efforts to improve education reform. This reform process is neither smooth nor swift. Government goals and reform strategies may not always align with school requirements and learning environments for children's education. This is frequently due to a lack of educational space, a large number of students in the classroom, the absence of reference materials, a dearth of educational resources, and the absence of educational technology for children. Due to these organisational and financial concerns, many primary and pre-primary teachers have vehemently opposed any educational reform in Bangladesh. On the other hand, many new classrooms attempt to implement new teaching techniques without understanding the theory and fundamental principles underlying them, resulting in radical change. Followers of Rabindranath's educational philosophy should therefore consider curriculum-related teaching methods, school rules and regulations, the role of the teacher, and the role of the school. This document makes no mention of Rabindranath, despite the fact that post-war Bangladeshi schools have a tendency towards modernization of the educational system. However, Rabindranath's philosophy has not lost its relevance or utility for Bangladeshi children and early childhood educators, and if read carefully and extensively, it provides a timeless lesson on how to improve current school practices. In fact, the seed he sowed at the beginning of the twentieth century is still bearing fruit and being valued.

References

- Abdul Malek et al., *Sikhabiggan o Bangladesher Shikkha*. 5th ed., Raymon Publishers, 2015.
- Abdullah Al Muti, “Rabindra Bhabnay Sikkha O Poribesh.” *Poribesh Shongkot Ghoniye Ashche*, 2nd ed., The University Press Lmt., Dhaka, Bangladesh, 2006.
- Ankhi Goon Roy, “Reflection of Tagore’s Educational Thought on his Dream School Patha Bhavana, Santiniketan.” *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, vol. 9, no. 1, Jan. 2021.
- Arupratan Bhattacharya, *Jaganananda Rachana Samagra*. 2nd ed., Ananda Publishers, 1990.
- Best, John W., et al. “Research Methods.” *Research in Education*, 1st ed., Pearson Education Limited, Harlow, England, 2014.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design*. 5th ed., SAGE Publications, 2018.
- Danes Ali Ahmed, “Rabindranath Tagore: An Analysis of Indian Educational & Contribution of Indian Education.” *Pratidhwani the Echo*, vol. 7, no. 3, Jan. 2019.
- <http://www.jstor.org/stable/23329365>. Accessed 26 Jun. 2022.
- Huxley, Aldous. “Reflections on Tagore.” *Indian Literature*, vol. 4, no. 1/2, 1960.
- Kamrunnesa Begum and Salma Akhter. *Prathomik Sikkha: Bnagladesh*. 3rd ed., Unique Press, 2000.
- Md. Saiful Islam, *Rabindranath Ebong Unish Shatoker Renaissance*. 2nd ed., Murdhanna, 2012.

Reflection of Rabindranath Tagore's Educational Philosophy on Pre-primary and Primary Education of National Education Policy and Practice in Bangladesh

National Education Policy (NEP) 2010, Ministry of Education. Peoples Republic of Bangladesh, 2010.

Mohanlal Shukhadia University, "Research Methodology and Types of Research." *Mohanlal Shukhadia University*, <https://www.mlsu.ac.in/E-Contents>.

Nisha Goswami, and D. S. Malviya, "Relevance of Educational Philosophy of Rabindranath Tagore in Modern India." *International Journal of Indian Psychology*, vol. 3, no. 4, ser. 60, 25 Sept. 2016, <https://doi.org/10.25215/0304.084>.

Rabindranath Tagore, "Somadhan." *Kalantar*, Riya Prokashani, Dhaka, Dhaka, 2014.

Rabindranath Tagore, *Bishwa Parichyy*. 5th ed., Visva Bharati Granthanbivag, 1940.

Rabindranath Tagore, *Chithipatra*. 18th ed., Visva Bharati Granthanbivag, 1966.

Rabindranath Tagore, *Sikkha*. 13th ed., Visva-Bharati Granthanbivag, 2010.

Ram Tirath, "Role and Impact of Rabindranath Tagore Education Philosophy in Contemporary Indian Education." *International Journal of Business Administration and Management*, vol. 7, no. 1, 2017.

Sabina Yasmin and Mahbuba Akhter Rumi. "Impact of Pre-Primary Education on Children in Bangladesh: A Study on Government Primary Schools in Sylhet City." *American Journal of Educational Research*, vol. 8, no. 5, 2020, <https://doi.org/10.12691>.

Samir Ranjan Nath and Goutam Roy. *Bangladeshe Prak Prathomik Sikkha*. 1st ed., Shonghoti, 2018.

Subhamoy Ghosh, translator. *Soviet Union-e Rabindranath*. 1st ed., Radical Impression, 2014.

The Chittagong University Journal of Arts and Humanities

Thriveni C. "Rabindranath Tagore's Philosophy on Indian Education." *Eternal Bhoomi Magazine*, 6 Feb. 2018. <https://bhoomimagazine.org/2018/02/06/rabindranath-tagores-philosophy-on-indian-education/>

UNESCO, "The National Education Policy 2010." *Diversity of Cultural Expressions*, 29 Nov. 2018, <https://en.unesco.org/creativity/policy-monitoring-platform/national-education-policy-2010>.

الرَّجَّاجُ: عِبْقَرِيَّتُهُ وَاتِّجَاهَاتُهُ النُّحْوِيَّةُ
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম*

প্রতিপাদ্যসার

আয-যাজ্জাজ উপাধীতে ভূষিত আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবন সিররী ইবন সাহাল আল-বাগদাদী আন-নাহভী(২৪১ হি./৮৫৫ খ্রি.-৩১১ হি./৯৩৩ খ্রি.) হলেন বাসরাপন্থী শীর্ষস্থানীয় ভাষাবিজ্ঞানী ‘আরবি ব্যাকরণের অন্যতম সম্রাট। তিনি ‘ইলমে নাহ্বর প্রতি মনোনিবেশ করে খ্যাতিমান নাহরবিদ ছা’লব (২০০ হি./৮১৫ খ্রি.-২৯১ হি./৯০৩ খ্রি.) ও আল-মুবাররিদ (২১০ হি./৮২৬ খ্রি.-২৮৬ হি./৯০০ খ্রি.) এর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। আর অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু তাঁর ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: ক. আস-সিরাফী (২৯০ হি./৯০২ খ্রি.-৩৬০ হি./৯৭০ খ্রি.), খ. আর-রুম্মানী (২৯৬ হি./৯০৮ খ্রি.-৩৮৬ হি./৯৯৬ খ্রি.), গ. আবু ‘আলি আল-ফারেসী (২৮৮ হি./৯০০ খ্রি.-৩৭৭ হি./৯৮৭ খ্রি.), ঘ. আয-যাজ্জাজী (মৃ. ৩৩৯ হি./৯৫০ খ্রি.)। তিনি বর্ণাঢ্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন আরবি ভাষা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, জ্ঞানী, আলংকারিক, কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। ‘আরবি ব্যাকরণে তাঁর অবদান অপরিমিত। তিনি আল-কুরআন, ‘আরবি ব্যাকরণ, ভাষাবিজ্ঞান, অভিধান, কবিতা ও ছন্দ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করে ‘আরবি ভাষা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো: ক. মা’য়ানিউল কুরআন, খ. আল-ইশতিকাক, গ. ফা’য়ালতু ওয়া আফ’য়ালতু, ঘ. শরহ আবয়িয়াতে সিবাওয়াই, ঙ. আল-আরুদ, চ. আল-কাওয়াফি, ছ. আন-নাওয়াদির। তিনি আহমদ ইবন হাম্বলের মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আল-যাজ্জাজ এর ‘আরবি ব্যাকরণে বর্ণাঢ্য প্রতিভা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

* অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

[ملخص المقالة: الرَّجَّاج (٢٤١هـ/٨٥٥م-٣١١هـ/٩٢٣م) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل البغدادي النحوي، يعدّ من النخاة الأفاضل، ومن الأعلام الفضلاء المهرة المتفنين الأبرزين في العلوم المتعددة والفنون والمعارف المتنوعة. كما يعدّ من العلماء المتقدمين المبرزين في النحو واللغة، جمع بين نحو البصرة والكوفة. وكان أحد الأئمة في العلوم العربية عمومًا، كما كان من أعلم الناس بالأدب والنحو والصرف واللغة خصوصًا. وله مصنفات عديدة مفيدة. يتم هذا البحث وفق مناهج البحث العلمي من المنهج الوصفي، والتاريخي، والنقدي. ولهذا المقال أهداف عديدة أهمها: الكشف عن تعارف الرجّاج وآراءه النحوية، وبيان مكانته العلمية بين النحويين المعاصرين. لقد يظهر بهذا المقال أنّ آراء الرجّاج النحوية متعددة، خالف الجمهور في أغلبها، فكانت له آراء انفراد بها عن سابقه. كما يكشف به أنّه أحد النخاة الأفاضل والعباقرة الأبرزين في عصره الذهبي. لقد ظهرت في عهده مدرستان مشهورتان هما: المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية، فقد جمع بينهما، حيث استخدم بعض المصطلحات الكوفية والبصرية. وينتفع بهذا المقال الأدباء واللغويون والنحويون وفقهاء اللغة العربية، ومحبوها.]

المقدمة: يعتبر الرجّاج (بفتح الزاي والجيم المشددة وفي آخرها جيم أخرى) من النخاة الأفاضل، لقّب بالرجّاج لأنّه كان يخرط الرُّجَّاج أي كان يعمل في صناعته. ولذا ينسب إلى حرفته هذه. (القاضي، سنة ١٩٩٢م، ص ٣٩؛ الطنطاوي، ١٩٩٠م، ص ١٧٢؛ السيوطي، سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م، ص ٣٧٤) وكان من أهل الفضل والدين المتين وحسن الاعتقاد وجميل المذهب. (الصّفي، ١٩٩٠م، ج ٥، ص ٢٢٨؛ والسيوطي، المصدر السابق، ص ٣٧٤؛ الجبوري، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ج ١، ص ١٥؛ ابن خلكان، ١٣٦٧هـ/١٩٤٨م، ج ١، ص ٣١؛ الخطيب البغدادي، ١٣٤٩هـ/١٩٣١م، المجلد السادس، ص ٨٩) قد صنف في هذا الموضوع كتبًا كثيرة قيمة أبرز بها على المتقدمين، وأعجز المتأخرين. وكان من أفرد الدهر وغرائبه، وأعلم الناس في فنّه. قد تأثر في العلوم والفنون والمعارف بالعلماء الأفاضل المعاصرين الذين أخذوا عنهم، أبرزهم: ثعلب (٢٠٠هـ/٨١٥م-٢٩١هـ/٩٠٣م)، والمبرد (٢١٠هـ/٨٢٦م-٢٨٦هـ/٩٠٠م)، وغيرهما. فتكوّنت عبقريته كعقريّة نموذجية مثالية، كما تأثر به خلق كثير من النبلاء والفضلاء الذين أخذوا عنه، أشهرهم: أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (٢٩٠هـ/٩٠٢م-٣٦٠هـ/٩٧٠م)، وأبو الحسن عليّ بن عيسى الرّماني (٢٩٦هـ/٩٠٨م-٣٨٦هـ/٩٩٦م)، وأبو عليّ الفارسيّ النحوي (٢٨٨هـ/٩٠٠-٣٧٧هـ/٩٨٧م)، وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (٣٣٩هـ/٩٥٠م). (ابن كثير، ١٩٩٠م، ج ١١، ص ١٥٨-١٥٩) وغيرهم الذين لعبوا دورًا مهمًا في تطوير العلوم والفنون. وكان الرُّجَّاج شخصية

الزَّجَّاجُ: عبقرِيَّتُهُ واتجاهاته النحويَّة (আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

عظيمة وعبقرية ضخمة من أئمة النحو واللغة والأدب ورجالها وأعلامها. نودّ أن نذكر في هذا المقال العلمي تعارفه وعبقريته العلمية عمومًا، وعبقريته النحويَّة خصوصًا.
ولادة الزَّجَّاج ونشأته:

الزَّجَّاجُ اسمه الأصليّ إبراهيم، وكنيته أبو إسحاق، واسم أبيه السَّري. ولد أبو إسحاق الزَّجَّاج بالدورة من بغداد سنة ٢٤١هـ/٨٥٥م في العصر الذهبي العصر العباسي في خلافة جعفر المتوكل على الله (٢٣٢هـ/٨٤٦م-٢٤٧هـ/٨٦١م). ونشأ ببغداد منتدى العلماء والفضلاء والأدباء والشعراء واللغويين والنحويين. ترعرع بها في رعاية الوالدين، وأكبَّ على طلب العلم في نعومة أظفاره فجلس في خلقات العلماء واللغويين والنحويين حتى ازدادت علومه ومعارفه في شتى الموضوعات عنفوان شبابه. فأخذ عن علماء المعاصرين الأفاضل.

تعلّم الزَّجَّاج:

كان الزَّجَّاج يخرط الزُّجَّاج، وكان دخله من هذا العمل ضئيلا لا يكاد يتجاوز الدرهمين، وربما كان درهما واحداً أو درهما والنصف، وتافت نفسه مع ما فيه من الضيق والإقلال إلى تعلّم النحو ومعرفة اللغة، فأقبل على مدرستين عظيمتين في وقت طلب العلم. أمّا المدرسة الأولى: فمجلس ثعلب (٢٠٠هـ/٨١٦م-٢٩١هـ/٩٠٤م)، وأمّا المدرسة الثانية: فحلقة المبرّد النحويّ (٢١٠هـ/٨٢٦م-٢٨٦هـ/٩٠٠م) التي اتخذها في المسجد، فانتقل الزجّاج إلى حلقة المبرّد وترك ثعلبًا. فقد جاء في كتب التواريخ أنّ الزَّجَّاج أخذ عن العلماء الأفاضل المعاصرين، ومن أشهرهم اثنان وهما:

الأول: ثعلب (٢٠٠هـ/٨١٥م-٢٩١هـ/٩٠٣م): هو أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي. ولد سنة ٢٠٠هـ/٨١٥م. كان أحد أئمة الكوفيين في النحو واللغة في عصره، وكان ثقة مشهورا بصدق اللهجة والغريب ورواية الشعر. حيث أطلق البصريّون أبا العباس، فالمراد به المبرّد، وحيث أطلقه الكوفيون فالمراد به ثعلب. (زيدان، ١٩٤٨م، ج ١، ص ٤٨٩) وفي هذا الصدد يقول السيوطي: ثعلب اثنان: أشهرهما: الإمام أبو العباس أحمد بن يحيى، والثاني: أبو العباس محمد بن عبد الرحمن. (السيوطي، ١٩٤٨م، ج ٢، ص ٣٨٧) قد جرت بين المبرّد (٢١٠هـ/٨٢٦م-٢٨٦هـ/٩٠٠م)، وثعلب مناظرات علمية نحوية. وكان المبرّد

يشتهي الاجتماع في المناظرة بثعلب والاستكثار منه، ولكن ثعلب يرفض ذلك ويمنع منه؛ لأنّ المبرّد كان حسن العبارة، حلو الإشارة، فصيح اللسان، وبلغ البيان، ولكنّ مذهب ثعلب مذهب المعلمين، فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبرّد على الظاهر إلى أن يعلم الباطن. أخذ الزّجاج عن ثعلب علوما كثيرة من الأدب والنحو، واللغة. (الجبوريّ، المصدر السابق، ج ١، ص ١٥) ولثعلب تصانيف كثيرة مفيدة، أشهرها: كتاب الفصيح، وكتاب قواعد الشعر، وكتاب معاني القرآن، وكتاب إعراب القرآن، وأما ثعلب، وقد نشرتها محققة باسم مجالس ثعلب مرتين في دار المعارف في مجموعة ذخائر العرب، إحداها في سنة ١٣٦٨هـ، والأخرى في سنة ١٣٨١هـ، وغيرها. (زيدان، سنة ١٩٨٣م، ج ١، ص ٤٩٥؛ ابن خلكان، سنة ١٩٤٨م، ج ٣، ص ٤٤١-٤٤٢؛ الزجاجة، سنة ١٣٨٢هـ، ص ١٥) توفّي ثعلب سنة ٢٩١هـ/٩٠٣م.

الثاني: المبرّد (٢١٠هـ/٨٢٦م-٢٨٦هـ/٩٠٠م) هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الثماليّ البصريّ إمام اللغة والعربية ببغداد في عصره. لم يكن في عصره ولا بعده مثله. أخذ النحو عن الأساتذة البارعين المعاصرين. أشهرهم أبو حاتم السجستاني (١٦٥هـ-٢٥٠هـ)، وأبو عمر الجرميّ (ت ٢٢٥هـ)، وأبو عثمان المازنيّ (ت ٢٤٧هـ). وكان يعول إلى المازنيّ. وإلى المبرّد انتهى علم النحو وعلم العربيّ بعد طبقة الجرميّ (ت ٢٢٥هـ)، والمازنيّ (ت ٢٤٧هـ). روى عن المبرّد عدد كثير من التلاميذ البارزين العلوم العربية عمومًا، وعلم النحو خصوصًا، أبرعهم: أبو إسحاق الزّجاج (ت ٣١١هـ) أخذ عنه الأدب والنحو. (الجبوريّ، المصدر السابق، ج ١، ص ١٥) وأبو بكر بن السراج (ت ٣١٦هـ)، وابن درستويه (ت ٣٤٧هـ)، والوشاء (ت ٣٢٥هـ)، ونفطويه (ت ٣٢٣-٢٤٤هـ). وكان المبرّد كثير الذاكرة، وشديد المناظرة، وحسن العبارة، وفصيح اللسان، وبلغ البيان. وللمبرّد أربعة وأربعون مؤلفًا في شتى موضوعات من الأدب واللغة والنحو والعروض والبلاغة والقرآن والتاريخ والأخلاق والسلوك، وغيرها. أشهرها ما يلي: كتاب "الكامل في الأدب واللغة"، وكتاب "المقتضب في النحو"، وكتاب "التغاضي والمرائي"، و"رسالة في الجواب على سؤال وجهه إليه الواثق بشأن الشعر والنثر"، وكتاب "طبقات النحويين البصريين وأخبارهم"، وكتاب "معاني القرآن"، وكتاب "الأنواء والأزمنة"، وكتاب "قواعد الشعر"، وكتاب "الحث على الأدب والصدق، وأداب الجليس"، وكتاب "المدخل إلى كتاب سيبويه". (زيدان، ١٩٨٣م، ج ١، ص ٤٩٥-٤٩٦؛ الفخوري، سنة ١٩٨٦م، ج ١، ص ٥٨٨-٥٨٩؛ فروخ، سنة ١٩٨٥م، ص ٣٥٥) روى أنّ الزّجاج كان يخرط الزجاج، فأحبّ علم النحو حتى لزم المبرّد. وكان المبرّد لا يعلم مجّانا، ولا يعلم بأجرة إلا على قدرها، فقال له المبرّد: أيّ شيء صناعتك ؟ أجاب: أخرط

الزَّجَّاجُ: عبقرِيَّتُهُ واتجاهاته النحويَّة
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

الزَّجَّاجُ، وكسبي في كلِّ يوم درهم ودانقان، أو درهم ونصف، وقال: أريد أن تبالغ في تعليمي وأنا استغنيتُ عن التعليم أو احتجتُ إليه. فضمن معه أن يعطي الزَّجَّاجُ المبرِّدُ كلَّ يوم من عمله درهماً إلى وفاة أحدهما، ولزمه ملازمة، وكان يخدمه في شؤنه العديدة، وظلَّ يؤدِّي إليه ذلك المقدار من الدرهم إلى وفاة أحدهما، حتى صار الزَّجَّاجُ متقنًا في علم النحو. وكان المبرِّدُ يأمر من يريد أن يقرأ عليه شيئاً من كتاب سيبويه، أو غيره بأن يعرض على الزَّجَّاجِ أولاً ما يريد أن يقرأه. (ابن النديم، *الفهرست*، ج ٢، ص ٦٦) استطاع الزَّجَّاجُ خلال فترة قصيرة أن يحصلَ على علوم وافرة من أساتذته، وأصبح من المتميِّزين والمقربين. روى أبو سليمان الخطَّابي عن أحمد بن الحسين الفرائضي، قال: كان أصحاب المبرِّدِ إذا اجتمعوا واستأذنوا يخرج الأذن فيقول: إن كان فيكم أبو إسحاق الزَّجَّاجُ، وإلا انصرفوا، فحضرُوا مرةً، ولم يكن الزَّجَّاجُ معهم؛ فقال لهم ذلك فانصرفوا. وثبت رجل منهم- يقال له عثمان-، فقال للأذن: قل لأبي العباس: انصرف القوم كلَّهم إلا عثمان، فإنَّه لم ينصرف. فعاد إليه الأذن وأخبره، فقال: قل له إن عثمان إذا كان نكرة انصرف، ونحن لانعرفك فانصرف راشداً.

العلماء الأفاضال الذين تأثروا بالزَّجَّاجِ:

١. السَّيرافي (٢٩٠هـ/٩٠٢م-٣٦٠هـ/٩٧٠م) هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله ابن المرزبان النحويّ ولد بسيراف سنة ٢٩٠هـ/٩٠٢م، ونشأ بها. درس السَّيرافي ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض. وقرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد (٣٢٤هـ)، واللغة على ابن دريد، وأخذ النحو عن ابن السراج. كان فقيهاً على مذاهب العلماء العراقيين. إنَّه لقي الزَّجَّاجَ فأخذ عنه. وولَّى القضاء ببغداد في آخر عمره. وأفتى في جامع الرصافة خمسين سنة على مذهب أبي حنيفة فما وجد له خطأ، ولم يأخذ على الحكم أجراً. توفِّي السَّيرافي في رجب سنة ٣٦٨هـ/٩٧٨م في خلافة الطائع لله تعالى بن المطيع لله تعالى عن عمر قارب المائة، صام منها ما يزيد على أربعين سنة، ودفن بمقبرة الخيزران ببغداد. وله كتب عديدة، أشهرها: هو "شرح كتاب سيبويه"، وكتاب "ألفات الوصل والقطع"، كتاب "أخبار النحويين البصريين"، وكتاب "الوقف والابتداء"، وكتاب "صنعة الشعر والبلاغة"، وكتاب "شرح مقصورة ابن دريد". (الشاطر، سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ص ٩٠؛ النديم، ١٩٨٣م، ج ٢، ص ٦٨؛ القاضي المصدر السابق، ص ٢٨)

٢. أبو الحسن علي بن عيسى الرُّمَّانِي (٢٩٦هـ/٩٠٨م-٣٨٦هـ/٩٩٦م): الرُّمَّانِي اسم منسوب إلى الرُّمَّان وبيعه. أصله من سمرمري. ولد ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين الهجرية. وقيل: سنة ست وسبعين ومائتين. كان من أفاضيل النحويين البصريين والمتكلمين البغداديين، مفن في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو، والكلام. أدرك الزَّجَّاج وقرأ عليه "الكتاب". وله تصانيف كثيرة، أشهرها: "معاني القرآن" وشرح إعرابه" وكتاب "شرح كتاب سيبويه"، وكتاب "نكت سيبويه"، وكتاب "أغراض كتاب سيبويه"، وكتاب "المسائل المفردات من كتاب سيبويه"، وكتاب "شرح المدخل للمبرد"، وكتاب "شرح مختصر الجرمي"، وكتاب "شرح المسائل للأخفش صغير وكبير"، وكتاب "شرح الألف واللام للمازني"، وكتاب "شرح المؤجز لابن السَّراج"، وكتاب "شرح كتاب الأصول لابن السَّراج"، وكتاب "التصريف"، وكتاب "الهجاء"، وكتاب "الإيجاز في النحو"، وكتاب "المبتدأ في النحو"، وكتاب "النكت في إعجاز القرآن" وكتاب "الاشتقاق الصغير" وكتاب "الاشتقاق الكبير" و"كتاب الألفات في القرآن"، كتاب "إعجاز القرآن". وله شروح وتصانيف في علم الكلام. توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة من الهجرة. (القاضي، سنة ١٩٩٢م، ص ٣٠-٣١؛ القفطي، سنة ١٣٦٩هـ/١٩٤٩م، ج ٢، ص ٢٩٥-٢٩٦): ابن النديم، المصدر السابق، ص ٦٩)

٣. أبو عليّ الفارسيّ (٢٨٨/٩٠٠-٣٧٧هـ/٩٨٧م): هو أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ النحويّ يعدّ واحداً من أفذاذ علماء العربيّة عموماً ومن أكابر أئمة النحويين خصوصاً في القرن الرابع الهجري، احتلّ مكانة مرموقة في عصره والعصور التالية. فقد عدّ أنحى من جاء بعد سيبويه، وذلك لشخصيته المستقلة. وكان صاحب المؤلفات الكثيرة. أخذ أبو عليّ علم النحو عن جماعة من النحاة البارعين، أشهرهم: أبو بكر محمد بن السريّ السراج (ت ٣١٦هـ)، وأبو إسحاق إبراهيم بن السريّ الزجّاج (ت ٣١١هـ)، يقول ابن السراج في هذا الصدد: أبو عليّ الفارسي الحسن بن أحمد قرأ النحو على أبي إسحاق الزجّاج، وعلى أبي بكر بن السراج. (ابن السراج، ج ١، ص ١٤) وأبو بكر مبرمان (ت- ٣٤٥هـ/٩٥٦م)، وأبو بكر الخياط (ت ٣٢٠هـ)، وغيرهم. وأخذ عنه عدد كثير من حذاق النحويّين الذين لعبوا دوراً هاماً في تطوّر النحو وتنميته وتهذيبه ومن أجّلهم: أبو الفتح عثمان بن جنيّ (ت ٣٩٢هـ)، وعليّ بن الفرج الرعيّ (ت ٤٢٠هـ)، وأبو طالب أحمد بن بكر العبديّ (ت ٤٠٦هـ)، وأبو الحسين محمد بن أحمد المعروف بالزعفرانيّ (ت ٣٩٣هـ) وغيرهم. لقد صنّف أبو عليّ الفارسيّ مؤلفات بديعة عجيبة حسنة في مختلف الموضوعات من النحو والصرف والقراءات، لم يسبق أحد إلى مثلها، حتى بلغت نحو الأربعين.

الزَّجَّاجُ: عبقرِيَّتُهُ واتجاهاته النحويَّة
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

وقدر كبير منها مسائل أملاها في البلدان التي نزل بها فنسبت إليها. ومن أشهرها ما يلي: كتاب الحجة في القراءات السبعة، وكتاب "الإيضاح في النحو" والتكملة في التصريف، وكتاب مختصر العوامل الإعراب، وكتاب المسائل المشكلة، وكتاب "المسائل المصلحة" وكتاب المسائل البغدادية، وكتاب المسائل القصيرية، وكتاب المسائل البصرية، والمقصود والممدود، وتعليقة على كتاب سيبويه، وكتاب العوامل المائة، وكتاب جواهر النحو، وإعراب القرآن، والأوليات في النحو، وكتاب نقص الهاذور، وكتاب التتبع لكلام أبي عليّ الجبائيّ في التفسير، وكتاب تفسير قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.

٤. الزجّاجيّ (٣٣٩هـ/٩٥٠م): هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجّاجيّ من نهاوند، نسب إلى شيخه الزجّاج، لأنه لازمه وأخذ عنه. نزل بغداد ولزم الزجّاج حتى برع في النحو ثم سكن طبرية وأملّى وحدث بدمشق عن أبي بكر بن السراج، وعليّ بن سليمان الأخفش الصغير، ونفطويه، وابن دريد، وأبي بكر بن الأنباري، وغيرهم. روى عن الزجّاجيّ أحمد بن شرام النحويّ، وأبو محمّد بن أبي نصر. وله تصانيف كثيرة في الأدب، اللغة والنحو، وغيرها، أشهرها: كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر، الإدكار بالمسائل الفقهية، وكتاب اشتقاق أسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التنزيل وما يتعلق بها من اللغة والمصادر والتأويل. وكتاب الجمل في النحو، ولذلك الكتاب حظوة عند المغاربة تداني كتاب سيبويه عند المشارقة، وكتاب الإيضاح في علل النحو، كتاب تعليقات على صيغة الطلاق في بيت من الشعر، وكتاب الكافي في النحو، وكتاب القوافي، وشرح كتاب الألف واللام للمازني، وشرح خطبة أدب الكاتب، واللامات، والمخترع في القوافي، وكتاب الأمالي، وكتاب حروف المعاني، وكتاب الهجاء، وكتاب شرح رسالة سيبويه، كتاب شرح رسالة ابن قتيبة في أدب الكاتب، وكتاب شرح الألف واللام للمازني، ومجالس العلماء أو غرائب مجالس النحويين، المجموعة في معرفة أنواع الشعر وقوافيه، وكتاب المخترع في القوافي، وكتاب مختصر الزاهر، وغيرها. وتوفّي في طبرية بدمشق سنة ٣٣٩هـ/٩٥٠م. (الزجّاجي، سنة ١٣٨٢هـ، ص ١٠-١٣ السيوطي، المصدر السابق، ص ٥٤٨؛ الشاطر، المصدر السابق، ص ٨٨؛ ابن كثير، المصدر السابق، ج ١١، ص ١٥٩؛ الطنطاويّ، المصدر السابق، ص ١٧٤)

حياة الزجاجة التعليمية:

إنَّ الزَّجَاجَ بدأ حياته التعليمية منذ طلب بعض بني مارمة. (جاء في كتاب بغية الوعاة لفظ "مارقة" بالقاف) من شيخه المبرِّد معلِّمًا لأولادهم لتعليم النحو، فأَسَى لهم المبرِّدُ الزَّجَاجَ، فخرج فكان يعلِّمهم وأنفذ إليه كلَّ شهر ثلاثين درهما، ومضت مدَّة على ذلك. وكان الزجاجة يعلِّمهم علمَ النحو. فلم يزل حتى أنَّ عبيد الله بن سليمان (٢٢٦هـ/٨٤٠-٢٨٨هـ/٩٠٠م) الذي هو وزير المعتضد بالله (٢٤٢هـ/٨٥٦م-٢٨٩هـ/٩٠١م) طلب منه معلِّمًا لابنه القاسم، فقال له: لا أعرف لك إلا رجلاً زجاجًا بالصرّة مع بني مارمة، فقدم إليه الخليفةُ الزَّجَاجَ. فصارت له خطوة كبيرة لدى الوزير عبيد الله حتى اتخذه كاتباً له ونديماً. وكان الزجاج يدرّس ولده القاسم علم النحو والأدب إلى أن ولي الوزارة بعد والده، فزاد لديه فضلُ الزجاج، حتى نال ثروة ضخمة. كان الوزير القاسم يعظّمه تعظيماً. فقد فوّضه بأن يقبل رقايع أصحاب الحاجات في الدولة ويساومهم على إنجازها. إذ توفّي القاسم عام ٢٩١هـ/٩٠٣م كان الزجاج جمع بوساطته مبلغاً كبيراً من الثروة يزيد على أربعين ألف دينار. (فروخ، ج ١، ص ٤٠) قال الزجاج: وكنت أعطي المبرد ذلك الدرهم في كلِّ يوم إلى أن مات. ولا أخليه من التفقيد معه بحسب طاقتي. يقول الزجاج في هذا الصدد: كنت أؤدب القاسم بن عبيد الله وأقول له: إن بلغك الله مبلغ والدك ووليت الوزارة ماذا تصنع بي؟ فقال: ما أحببت. فقال له: تعطيني عشرين ألف دينار. وكانت غاية أمنيّتي، فما مضت إلا سنون حتى ولّى القاسم الوزارة وأنا على ملازمتي له، وقد صرّ نديمه، فدعّني نفسي إلى إذكاره بالوعد ثم هبته، فلما كان يوم الثالث من وزارته قال لي: يا أبا إسحاق لم أرك اذكرتني بالنذر! فقلت: عولت على رعاية الوزير أيده الله، وأنّه لا يخرج إلى إذكاري لنذر عليه في أمر خادم واجب الحقّ، فقال لي: إنّه المعتضد، ولولاه ما تعاطمني دفع ذلك إليك في مكان واحد. ولكن أخاف أن يصير لي معه حديث فاسمح لي بأخذه متفرقاً. فقلت: يا سيدي افعل. فقال: اجلس للناس وخذ رقايعهم في الخوائج الكبار، واستجعل عليها ولا تمتنع من مسألتي شيئاً تخاطب فيه، صحيحاً كان أو محالاً، إلى أن يحصل لك مال النذر. قال ففعلت ذلك وكنت أعرض عليه كلَّ يوم رقايعاً فيوقع فيها، وربما قال لي كم ضمن لك على هذا فأقول كذا وكذا، فيقول: غبنت، هذا يساوي كذا وكذا، ارجع فاستزد فاراجع القوم فلا أزال أماكسهم ويزيدوني حتى أبلغ الحدّ الذي رسمه، قال: وعرضت عليه شيئاً عظيماً، فحصلت عندي عشرون ألف دينار وأكثر منها في مديدة، فقال لي بعد شهر: يا أبا إسحاق حصل مال النذر؟ فقلت: لا! فسكت، وكنتُ أعرض فيسألني في كلِّ شهر أو نحوه هل

الزَّجَّاجُ: عبقرِيَّتُهُ واتجاهاته النحويَّة
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

حصل المال ؟ فأقول لا خوفا من انقطاع الكسب، إلى أن حصل عندي ضعف ذلك المال، وسألني يوما فاستحييت من الكذب المتصل، فقلت: قد حصل ذلك ببركة الوزير. فقال: فرجت والله عني فقد كنت مشغول القلب إلى أن يحصل لك، قال ثم أخذ الدواة ووقع لي إلى خازنه بثلاثة آلاف دينار صلة، فأخذتها وأمتنعت أن أعرض عليه شيئا ولم أدر كيف أقع منه، فلما كان من غدٍ جئته وجلست على رسي. فأومأ إلى هات ما معك يستدعي مئي الرقاع على الرسم، فقلت: ما أخذت من أحد رقعة لأن النذر قد وقع الوفاء به، ولم أدر كيف أقع من الوزير، فقال: يا سبحان الله أتراني كنت أقطع عنك شيئا قد صار لك عادة. (الخطيب البغدادي، المصدر السابق، المجلد السادس، ص ٩٠-٩٢)

وفاة الزجاج:

قد شئت آراء المؤرخين في تعيين تاريخ وفاة الزجاج، وأصحها: أنه توفي ببغداد في خلافة المقتدر بالله (٢٩٥هـ/٩٠٧م-٣٢٠هـ/٩٣٢م) يوم الجمعة من تاسع عشر من جمادى الآخرة سنة ٣١١هـ/٩٢٣م، وقد تجاوز الثمانين. (الصَّفيدي، المصدر السابق، ج ٥، ص ٢٢٨، ابن جني، سنة ١٣٧٣هـ/أغسطس سنة ١٩٥٤م؛ ابن النديم، المصدر السابق، ص ٦٦؛ الجبوري، المصدر السابق، ج ١، ص ١٥؛ ابن خلكان، المصدر السابق، ج ١، ص ٣٣؛ الخطيب البغدادي، المصدر السابق، المجلد السادس، ص ٩٣) كما أيده المبرِّد بقوله: في إحدى عشرة وثلاثمائة توفي أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج النحوي، صاحب كتاب معاني القرآن. (ابن الأثير، سنة ١٣٨٧هـ/١٩٦٦م، ج ٨، ص ١٤٥)

عقيدة الزجاج:

كان الزجاج يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأصول، كما كان يعتقد في الفروع اعتقاد رأى أحمد بن حنبل ويتعصب له حيث التمس من الله -عزَّ وجلَّ- آخر ما سمع منه بقوله: "اللهم احشروني على مذهب أحمد بن حنبل."

عبقريّة الزّجاج النحويّة:

إنّ الزّجاج يعتبر أحد مشاهير الشخصيات العبقريّة. له قدح معلى ومكانة مرموقة بين النحاة المعاصرين في العلوم العربيّة عموماً، في علم النحو خصوصاً. فقد كان إماماً بلا نزاع في النحو البصري بعد المبرّد. وكان مناصراً لآراء شيخه المبرّد، كما يناصر النحويين البصريين الآخرين.

اتجاهات الزّجاج النحويّة:

للزّجاج آراء بديعة يخالف في بعضها جمهور النحاة النحويين، وفي بعضها جمهور النحاة البصريين، ومن أهمها ما يلي:

الأول: خالف أبو الفداء ذهب الزّجاج إلى أن "زيداً" منصوب على البديل من لفظ أحد في مثل قولنا: لا أحد في الدار إلا زيدا. والجمهور على رفع زيد على البديل من المحلّ، قال أبو الفداء: "لا أحد في الدار إلا زيد ولا إله إلا الله" بالرفع على البديل من المحلّ ولا يجوز النصب على البديل من لفظ أحد وإله، خلافاً للزّجاج، وإنما تعيّن البديل من المحلّ دون اللفظ لأنّ العامل لفظاً لما كان (لا) وهي إنما تعمل للنفي وما بعد "إلا" إذا وقع في سياق النفي كان مثبتاً، والبديل في حكم تكرير العامل، فلو قدّرت بعد "إلا" لزّم الجمع بين المتناقضين لأنّ (لا) تقتضي نفي ما بعدها، "إلا" تقتضي إثباته. (أبو الفداء، سنة ٢٠٠٠م، ج ١، ص ٥٠)

الثاني: ذهب الزّجاج إلى منع تقديم "حقاً" في مثل قولنا: حقّاً زيد قائم. غلب على أبي الفداء عرض آراء الزّجاج، من ذلك نقله لرأيه المانع فيه فقال أبو الفداء: "قال الزّجاج ولا يجوز تقديم كلمة "حقاً" مثل قولنا: "حقاً زيد قائم" قال: فإن وسطته كقولنا: "زيد حقاً قائم" جاز ذلك. ولم يذكر إمام النحاة سيبويه امتناع تقديمه". (أبو الفداء، سنة ٢٠٠٠م، ج ١، ص ٥٠)

الثالث: يظنّ الزّجاج أنّ كلّ لفظين اتّفقا ببعض الحروف وإن نقص حروف إحداهما عن الأخرى، فإن إحداهما مشتقة من الأخرى، فيقول: الرجل مشتق من الرّجل، وإنما سعى الثور ثوراً، لأنّه يثير الأرض، والثوب سعى ثوباً لأنّه ثاب لباساً بعد أن كان غزلاً، وإنّما سعى القرنان قرنانياً لأنّه مطبق لفجور امرأته. فقد نقل يحيى بن عليّ المنجم أنّه سأله: من أيّ شيء اشتقّ الجرجير؟ فقال: لأنّ الريح تجرّجره، قال: وما معنى تجرّجره؟ أجاب: تجرّره، قال: ومن هذا قيل للحبل الجدير، لأنّه يجرّ على الأرض، قال: والجرّة لم سمّيت جرّة؟ أجاب: لأنّها تجرّ على الأرض، فقال: لو جرت على الأرض لانكسرت، قال: فالمجرّة لم سمّيت مجرة؟ أجاب: لأنّ الله جرّها في السماء جرا. قال: فالجرجور الذي هو اسم المائة من الإبل لم سمّيت به؟

الزَّجَّاجُ: عِبْقَرِيَّتُهُ وَاتِّجَاهَاتُهُ النُّحَوِيَّةُ
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

أجاب: لأنَّها تجرّ بالأزمة وتقاد. قال: فالفصيل المجر الذي يشق طرف لسانه لئلا يرتضع أمّه ما قولك فيه ؟ قال: لأنَّهم جروا لسانه حتى قطعوه. قال: فإن جروا أذنيه فقطعوه تسميه مجرا، قال: لا يجوز ذلك. قال يحيى بن عليّ: قال: قد نقضت العلة التي أتيت بها على نفسك، ومن لم يدر أن هذا منّا قضيّة فلا حسن له، قال حمزة: وشهدت ابن العلاف الشاعر وعنده من يحكي عن كتاب الزجّاج أشياء من شنيع الاشتقاق الذي فيه، ثم قال: إنّي حضرته وقد سئل عن اشتقاق القصعة، قال: لأنَّها تقصع الجوع أي تكسره، قال ابن العلاف: يلزمه أن يقول: الخفض مشتق من الخفيض والعصفر مشتق من العصفور والدبّ مشتق من الدبّ والعذب من الشراب مشتق من العذاب، والخريف من الخروف والعقل مشتق من العاقل والحلم مشتق من الحلمة والإقليم مشتق من القلم وغيرها.

الرابع: ذهب الزجاج إلى أن الضمير "هو" و"هي" الهاء فقط، والواو والياء زائدتان لحذفهما في المثنى والجمع، بينما كان يرى بقية البصريين أنّ "هو" و"هي" جميعا أصلان. (ضيف، ج ١، ص ٢٥٠)
الخامس: يرى الزجاج أن الفعل المضارع إنّما يدلّ أنّ الفعل المضارع إنّما يدلّ على المستقبل فقط، لأنّ اللحظة الحالية التي ننطق فيها بكلمة يكتب بمجرد أن ننطق بها تصبح ماضية خلافا لما ذهب إليه سيبويه وجمهور النحويين فإنّهم كانوا يرون أنّ الفعل المضارع يدلّ على الحال والمستقبل.
السادس: ذهب الزجاج إلى أنّ المثنى مبنيّ لتضمنه حرف العطف إذ أصل قام الزيدان: قام زيد وزيد وكأنّه مبنيّ لنفس العلة التي بنيت لها الأعداد المركبة، مثل ثلاثة عشر. خالفه الجمهور، وهم ذهبوا إلى أنّ المثنى معرب.

السابع: ذهب الزجاج إلى أنّ المثنى والجمع حركة الإعراب في المفرد. يرى جمهور البصريين أنّ المثنى والجمع عوض عن التنوين في المفرد.

الثامن: ذهب الزجاج إلى أنّ الضمير في "هو" و"هي" الهاء فقط والواو والياء زائدتان لحذفهما في مثل "هما" و"هم" و"هنّ" وحذفهما أيضا في المفرد في بعض لغات الإعراب، كقول بعضهم: "دارٌ لسُعدى إذْه من هَواكا." يرى أغلب البصريين أنّ "هو" و"هي" أصلان، فالضمير في كلّ منهما مجموعة الحرفين. (سيبويه، سنة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، ج ١، ص ٢٧)

التاسع: إنّ الزجّاج ذهب حول مسوغات الجملة الخبرية التي لا تحتوي على ضمير المبتدأ إلى أن يضمّر في الشرط التالي لها مثل: زيد يقوم عمرو إن قام.

العاشر: فقد رأى الزجّاج أنّ الكاف في "كأن" جارة غير زائدة، ومن أجل ذلك قدر فيها التعلق فقال: إنّها اسم بمنزلة مثل وقدرها مبتدأ محذوف الخبر وما بعدها في تقدير مصدر مضاف إليها فمثل "كأن" محمداً أخوك "تقديره عنده: مثل إخوة محمد إياك موجود وهو بُعد واضح في التقدير. خالفه الخليل بن أحمد الفراهدي وإمام النحاة سيبويه، وغيرهما، فإنهم ذهبوا إلى أنّ "كأن" مركبة من كاف التشبيه و"إنّ" فالأصل في "كأنّ زيدا أسد" إنّ زيدا كالأسد ثم قدم حرف التشبيه اهتماماً به وفتحت همزة "إنّ" لدخول الجار.

الحادي عشر: أجاز الزجّاج بأن يدخل لام الابتداء بعد "إن" على الخبر ومعموله التالي سواء أكان مفعولاً أم ظرفاً أم جاراً ومجروراً، نحو: إن محمداً القائم لفي الدار، وإن محمداً القاريء للكتاب. والتكلف في نحو ذلك لو اوضح جدا.

الثاني عشر: أجاز الزجّاج إعمال "لعلّ" و"كأنّما" إذا اقترنت بهما "ما" الزائدة حملاً على "ليت" فإنه إذا اقترنت بها "ما" الزائدة فلا يجوز إلغاء عملها لدى أغلب النحويين، مثل: لعلمنا خالداً قائم، وكأنما زيدا شاعر.

الثالث عشر: ذهب الزجّاج إلى أنّ "إيا" من قبيل الأسماء الظاهرة، لا من الضمائر. وهذا ذهب الخليل وسيبويه والأخفش والمازني إلى أنّه من قبيل الأسماء المضمرة. أمّ الجمهور فلهم ثلاثة أقوال. هذا القول أحد الأقوال الثلاثة فيه. (الشاطبي، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م)، ج ١، ص ٢٨٦

الرابع عشر: أنه من قبيل الأسماء الظاهرة، لا من الضمائر، وهو رأي الزجّاج.

الخامس عشر: ذهب الزجّاج إلى أن المفعول له صورة من صور المفعول المطلق لبيان النوع، مثل: قمتُ أدباً، كأنه قيل فيه: تأديتُ بالقيام، فالتأديب مجمل والقيام بيان ل كأنه قيل: تأديب بالقيام أدباً. ولأجل ذلك قال: إنّ المفعول له هو مفعول مطلق منتصب بفعل مضمر من لفظه جعل عوضاً منه، ولذلك لا يظهر، وقد كان سيبويه يرى أنّ ناصب المفعول له الفعل السابق له، لأنّه علّة لمضمونه، ولذلك كان الأصل أن يجزّ باللام، مثل: قمتُ للإكرام، فتحذف اللام وأداة التعريف، ويقال: قمتُ إكراماً.

الزَّجَّاجُ: عِبْقَرِيَّتُهُ وَاتِّجَاهَاتُهُ النُّحْوِيَّةُ
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

السادس عشر: ذهب الزجاج إلى أن كلمة "الأن" بنيت لتضمنها معنى الإشارة، لأنَّ معناها هذا الوقت. والحال أنَّ المبرد ذهب حول تعليل بناء "الأن" بإقترانها دائماً بأداة التعريف دون أخواتها.

السابع عشر: ذهب الزجاج إلى أن "إذا" الفجائية ظرف زمان، ولذلك منع كونها خبراً لما بعدها في نحو: فإذا زيد بل الخبر محذوف، لأنَّ الزمان لا يخبر به عن الجئة. والحال أنَّ الأخفش ذهب إلى أن "إذا" الفجائية حرف، وذهب المبرد إلى أنَّ "إذا" الفجائية ظرف مكان. (ضيف، المصدر السابق، ج ١، ص ٢٥٠؛ القُوجَوِي، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م)، ج ١، ص ٨٨)

الثامن عشر: ذهب الزجاج إلى أن "المفعول معه" منصوب بفعل مضمر بعد الواو، مثل قولنا: "استيقظ وطلوع الفجر" تقديره عنده: استيقظ ولابس طلوع الفجر، وما أشبه ذلك لأنَّ الفعل في رأيه يعمل في المفعول وبينهما الواو، كأنما فاته أنه يعمل في المعطوف وبينهما الواو في مثل: قام خالد وزيد. وذهب الأخفش إلى أنَّه منصوب على الطرفية. وذهب أغلب النحويين إلى أنَّ عامل المفعول معه هو الفعل، أو معناه بتوسط الواو.

التاسع عشر: أجاز الزجاج تقديم المستثنى على فعله، مثل: إلَّا خالد ذهب التلاميذ، مستشهداً بقول الشاعر:

خلا الله لا أرجو سواك، وإنما + أعد عيالي شعبة من عيالك

(الأنباري، سنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ج ١، ص ٢٢٣)

العشرون: يرى الزجاج أنَّ تمييز "كم" الاستفهامية إذا سبقها حرف جارٍ يكون مجروراً لدخولها على "كم" وهي العاملة فيها، ولا ليس "من" الجارة المضمرة عاملة. وبالأیدی الأخرى أنَّ الفراء ونفر من النحاة ذهبوا إلى أنَّ تمييز "كم" الاستفهامية يجوز جرّه إذا سبقها حرف جارٍ، نحو: على كم فقير أحسنت. وهم يرون أنَّ التمييز مجرور حينئذ بكلمة "من" المقدرة التي حذفت تخفيفاً. وكان أصل العبارة "على كم من فقير أحسنت".

الحادي والعشرون: يرى الزجاج أنَّ "أيمن" في مثل "أيمن الله" حرف جارٍ بمعنى القسم. ويرى أغلب النحويين البصريين أنَّ "أيمن" في مثل ذلك مرفوعة بالابتداء، وحينئذ خبرها محذوف. وليس حرفاً جاراً.

الثاني والعشرون: ذهب الزجاج إلى أن جواب "لو" حين يكون جملة اسمية، كقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ). (سورة ٢: البقرة: ١٠٣) فيها جواب "لو" جملة "مَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" لأنها تنبئ عن قولك "لأثيبوا" (الزجاج، سنة ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م، ج ١، ص ١٨٧) واللام الداخلة عليها هي التي تدخل عادة في جواب "لو" وليست هي لام القسم. وبالأيدي الأخرى ذهب أغلب النحاة إلى أن جواب "لو" حين يكون جملة اسمية محذوف، فتقديره: جملة مقدرة "لأثيبوا" ومعنى الكلام أن ثواب الله خير لهم من كسبهم بالكفر والسخر. أما "لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ" فجواب القسم، وتقديره: والله لمثوبة. الثالث والعشرون: ذهب الزجاج إلى أن لفظ "القلم" في نحو: "كتبت بهذا القلم" أعرب لكونه عطف البيان، لا لكونه "نعتا". وبالأيدي الأخرى أن أغلب النحويين البصريين أعرب لفظ "القلم" في المثال المذكور لكونه نعتا، كما نقل ذلك عن الإمام سيبويه. وإنهم لم يلتفتوا إلى أنه قد يسى التأکید وعطف البيان صفة.

الرابع والعشرون: ذهب الزجاج إلى أن لفظ "الفاء" في نحو: "خرجت فإذا زيد قائم" للسببية فقط. وذهب المازني إلى أن ذلك "الفاء" زائدة.

الخامس والعشرون: ذهب الزجاج إلى أن لفظ "قلقل" و"صلصل" و"جرجر" و"قرقر" والألفاظ التي يماثلها على وزن فاعل. وبالأيدي الأخرى أن أغلب النحاة ذهبوا إلى أنها على وزن فاعل.

السادس والعشرون: ذهب الزجاج إلى أن أصل "اتخذت" كان "اوتخذت" فقلبت الواو تاء. وذهب جمهور النحاة إلى أن وزن "اتخذت" على وزن "افعلت" بتكرار التاء.

السابع والعشرون: ذهب أغلب النحويين إلى أن الهمزة في لفظ "مصائب" من الشاذ الذي لا يقاس عليه، وأن القياس يقتضى فيه أن يكون "مصاوب" لأن الواو أصلية فلا تقلب همزة. إنما تقلب في مثل "صحائف" من صحيفة، و"حمائل" من حمولة، و"قلائص" من قلوص، مما حرف المد فيه زائدة على الحروف الأصلية. وذهب الزجاج إلى تصحيح مثل ذلك وأن الواو أبدلت همزة، وكأنه كان يرتضى أن تجمع معيشة على وزن معائش. لقد خالفه جمهور النحويين البصريين، كما خالفه سيبويه.

الثامن والعشرون: ذهب أغلب الزجاج إلى أن العلم كله مرتجل. خالفه سيبويه فإنه يرى أن العلم كله منقول، أي جاء كله على طريقة النقل.

الزَّجَّاجُ: عبقرِيَّتُهُ واتجاهاته النحويَّة
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

التاسع والعشرون: يقول الفراء حول "حيث" علة الضم: "لأنها تدلّ على محذوف مثل قبل وبعد." وقال الزجاج: أصل حيث أنها منعت الإضافة فحركت بالضم لالتقاء الساكنين، وأختير لها ذلك لأنها غاية الثلاثون: اتجاهه الفراء حول معنى الضعف: يقول هشام: إذا قال رجل مخاطبا لأحد: إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه معناه: فلك مثلاه. يقول: العرب لا تفرد واحدهما وإنما تتكلم بهما بالتثنية. وقال غيره: الضعف يقع على المثليين. يقول الفراء: أراكم مثلكم كأنك قلت: أراكم ضعفكم، وأراكم مثليكم، يريد ضعفيكم، فهذا على معنى الثلاثة. تفسيره عنده كما تقول وعندك عبد: أحتاج إلى مثله، فأنت محتاج إليه وإلى مثله، وتقول: أحتاج إلى مثلي عبدي، فأنت إلى ثلاثة محتاج. ويقول رجل: معي ألف وأحتاج إلى مثله فهو يحتاج إلى ثلاثة. فلما قوى أن يكون الألف داخلا في معنى المثل صار المثل اثنين، والمثلان ثلاثة. واحتج الزجاج على مذهب الفراء، فقال: هذا باب الغلط فيه غلط بين في جميع المقاييس وجميع الأشياء، لأننا إنما نعقل مثل الشيء ما هو مساوٍ له، وتعقل مثليه ما يساويه مرتين. (الأنباري، سنة ١٩٦٠م، ص ١٣١؛ الفراء، ١٩٨٠م، ج ١، ص ١٩٤؛ الزجاج، ج ١، ص ٣٨٢-٣٨٣؛ د. تركي العتيبي، ١٩٩٥م، ص ٣٤٦)

الحادي والثلاثون: قد اختلف النحاة في رتبة الحاضر والمستقبل، فذهب أبو إسحق الزجاج إلى أن المستقبل أول الأفعال. واحتج لذلك بأن الأفعال المستقبلية تقع بها العدادات ثم توجد فتكون حالا ثم يمضي عليها الزمان فتكون في الماضي، وتبعه تلميذه الزجاجي. وبالأيدي الأخرى ذهب أبو بكر بن السراج إلى أن الحاضر هو أول الأفعال. (ابن جني، ج ٢، ص ٣٣)

الثاني والثلاثون: قد ذهب الزجاج إلى أن الحال الدالة على ترتيب مثل قولنا: "ادخلوا رجلا رجلا" و"قرأت الكتاب كلمة كلمة" و"حفظت القصيدة بيتا بيتا" فيها أن الاسم الأول حال، والثاني تأكيد له، وفي نصب الثاني على التوكيد نظر، لأنه لو كان توكيدا لأدى ما أداه الأول. (السامرائي، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م، ج ٢، ص ٢٨٣)

مؤلفات الزجاج:

كانت حياة الزجاج زاخرة بالعطاء، وقد ترك عدداً كبيراً من المؤلفات التي اشتهرت بعد وفاته. كان الزجاج صاحب مؤلفات كثيرة في موضوعات عديدة لا يحصى عددها، لذا اختلف آراء المؤرخين في عددها. فذكر

صاحبُ معجم المؤلفين خمسة كتب، وصاحب سير أعلام النبلاء ستة، وذكر السيوطي في كتابه "بغية الوعاة" أحد عشر كتاباً، وابن النديم في كتابه "الفهرست" ثلاثة عشر كتاباً، وابن خلكان أربعة عشر كتاباً، وذكر حاجي خليفة في كتابه "كشف الظنون" سبعة عشر كتاباً. مهما يكن الحال قد يوجد له في كتب التواريخ أحد وعشرين كتاباً، وهي ما يلي:

١. كتاب "معاني القرآن" في التفسير، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، (بيروت: عالم الكتب)، ط ١، سنة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، عدد الأجزاء: هذا كتاب مختصر حول إعراب القرآن ومعانيه. قد بدأ الزجاج بإملاء هذا الكتاب في صفر ٢٨٥هـ/٨٩٨م حتى أكمله في ربيع الأول سنة ٣٠١هـ/٩١٣م.
٢. كتاب "ما فسّره من جامع المنطق" ألفه خصيصاً للخليفة المعتضد.
٣. كتاب "الاشتقاق"
٤. كتاب "القوافي" أو الكافي في أسماء القوافي.
٥. كتاب "العروض"
٦. كتاب "الفرق"
٧. كتاب "خلق الإنسان"
٨. كتاب "خلق الفرس"
٩. كتاب "مختصر في النحو"
١٠. كتاب "فعلت وأفعلت" هو كتاب في علم الصرف
١١. كتاب "ما ينصرف وما لا ينصرف"
١٢. كتاب "شرح أبيات سيبويه"
١٣. كتاب "النوادر" (الصّفدي، المصدر السابق، ج ٥، ص ٢٢٩؛ ابن النديم، المصدر السابق، ج ٢، ص ٦٦)
١٤. "المؤاخذات على الفصيح لثعلب"
١٥. كتاب "الأأنواء" (صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي، كتاب الوافي بالوفيات، المصدر السابق، ج ٥، ص ٢٢٩)
١٦. كتاب "المثلث"
١٧. كتاب "الفرق بين المذكر والمؤنث"
١٨. كتاب "الردّ على ثعلب في الفصيح"

الرَّجَّاجُ: عبقريته واتجاهاته النحوية
(আয়-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

١٩. كتاب "الأُمالي" وذلك في الأدب واللغة. وهذا الكتاب اشتهر بآمالي الرَّجَّاج. والأُمالي ثلاثة وهي: الأُمالي الكبرى، الأُمالي الوسطى، والأُمالي الصغرى.
٢٠. كتاب "المقصود والممدود"
٢١. كتاب "الوقف والابتداء"
٢٢. كتاب "الإبانة والتفہيم عن بسم الله الرحمن الرحيم"
٢٣. كتاب "تفسير أسماء الله الحسنى."
٢٤. الشجرة أو التقريب.
٢٥. كتاب إفساد الأضداد. (الجبوري، المصدر السابق، ج ١، ص ١٥؛ الصّفي، المصدر السابق، ج ٥، ص ٢٢٩؛ ابن النديم، المصدر السابق، ج ٢، ص ٦٦؛ ابن خلكان، المصدر السابق، ج ١، ص ٣٢)
- هذه الكتب تدلّ على عبقريته الفذة في الأدب واللغة عموماً وفي علم النحو خصوصاً. وهي ثروة ثمينة في العلوم والفنون والمعارف الإسلامية.
- الخاتمة والنتائج:**

إنَّ أبا إسحاق إبراهيم بن السّري بن سهل البغداديّ المعروف بالرَّجَّاج نحويّ كبير يعتبر من النخبة الأفاض والأعلام الأبرزين في العلوم والفنون والمتنوعة. وكان أحد الأئمة والعباقرة في العلوم العربيّة عموماً، كما كان من أعلم الناس بالأدب والنحو والصرف واللغة خصوصاً. وكان يُعتبر من رجالات علمية وموسوعية. وله كتب متنوعة نافعة في شتى الموضوعات، وله مكانة عالية ورتبة سامية بين النحويين المعاصرين. كما له آراء نحويّة متنوعة، واتجاهات متعددة خالف الجمهور في أغلبها.

المراجع والمصادر:

- ١- القرآن الكريم.
- ٢- القاضي أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعري، تاريخ العلماء النحويين، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، (القاهرة: هجر)، ط ٢ سنة ١٩٩٢م، ص ٣٩
- ٣- الشيخ محمّد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، (القاهرة: دار المعارف)، ط ٢، ص ١٧٢

- ٤- الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، *لبّ الباب في تحرير الأنساب*، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١ سنة ١٤١١هـ/١٩٩١م)، ص ٣٧٤
- ٥- صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، *كتاب الوافي بالوفيات*، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج ٥، ص ٢٢٨
- ٦- الإمام العلامة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، *لبّ الباب في تحرير الأنساب*، المصدر السابق، ص ٣٧٤
- ٧- كامل سليمان الجبوري، *معجم الأدباء*، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م)، ج ١، ص ١٥.
- ٨- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط ١، ١٣٦٧هـ/١٩٤٨م)، ج ١، ص ٣١
- ٩- الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، *تاريخ بغداد*، (بغداد: المكتبة العربية، ١٣٤٩هـ/١٩٣١م)، المجلد السادس، ص ٨٩
- ١٠- أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، *البداية والنهاية*، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، (القاهرة: دار الحديث)، ج ١١، ص ١٥٨-١٥٩
- ١١- زيدان، جرجي، *تاريخ آداب اللغة العربية*، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ١٩٨٣م)، ج ١، ص ٤٨٩
- ١٢- السيوطي، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، *المزهر في علوم اللغة وأنواعها*، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج ٢، ص ٣٨٧
- ١٣- زيدان، جرجي، *تاريخ آداب اللغة العربية*، (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة سنة ١٩٨٣م)، ج ١، ص ٤٩٥
- ١٤- الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، *أمالي الزجاجي*، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، (القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة)، ط ١ سنة ١٣٨٢هـ، ص ١٥
- ١٥- الفاخوري، حنا، *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (بيروت: دار الجيل سنة ١٩٨٦م)، ج ١، ص ٥٨٨-٥٨٩
- ١٦- فروخ، عمر، *تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية*، (بيروت: دار العلم للملايين، ط ٥ سنة ١٩٨٥م)، ص ٣٥٥
- ١٧- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد، *وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان*، تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبد الحميد، (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، سنة ١٩٤٨م)، ج ٣، ص ٤٤١-٤٤٢.

الرَّجَّاجُ: عِبْقَرِيَّتُهُ وَاتِّجَاهَاتُهُ النُّحَوِيَّةُ
(আয-যাজ্জাজ: তাঁর প্রতিভা ও ব্যাকরণগত দৃষ্টিভঙ্গি)

- ١٨- ابن النديم، *الفهرست*، (طهران، الطبعة الثانية ١٩٨٣م)، ج ٢، ص ٦٦
- ١٩- محمد الشاطر أحمد محمد، *المؤجر في نشأة النحو*، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، سنة ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م، ص ٩٠)
- ٢٠- القاضي أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعري، *تاريخ العلماء النحويين*، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، (القاهرة: هجر، ط/٢، سنة ١٩٩٢م، ص ٣٠-٣١)
- ٢١- القفطي، *إنباه الرواة*، تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، (مصر: دار الكتب، سنة ١٣٦٩هـ/١٩٤٩م)، ج ٢، ص ٢٩٥-٢٩٦
- ٢٢- ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي، *الأصول في النحو*، المحقق: عبد الحسين الفتلي، (بيروت: مؤسسة الرسالة)، ج ١، ص ١٤
- ٢٣- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، *بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة*، تحقيق: محمد عبد الرحيم، (بيروت: دار الفكر)، ص ٥٤٨
- ٢٤- ابن كثير الدمشقي، أبو الفداء الحافظ، *البداية والنهاية*، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، (القاهرة: دار الحديث)، ج ١١، ص ١٥٩
- ٢٥- الشيخ محمد الطنطاوي، *نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة*، المصدر السابق، ص ١٧٤
- ٢٦- فزوخ، عمر، *تاريخ الأدب العربي*، (بيروت: دار العلم للملايين، ط ١)، ج ١، ص ٤٠
- ٢٧- الخطيب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي، *تاريخ بغداد*، المصدر السابق، المجلد السادس، ص ٩٠-٩٢
- ٢٨- أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، *المنصف لابن جني*، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، (بيروت: دار إحياء التراث القديم، ط ١، سنة ١٣٧٣هـ/أغسطس سنة ١٩٥٤م)
- ٢٩- ابن الأثير، الشيخ العلامة عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني، *الكامل في التاريخ*، (بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، سنة ١٣٨٧هـ/١٩٦٦م)، ج ٨، ص ١٤٥
- ٣٠- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي، *الكناش في فني النحو والصرف*، التحقيق: الدكتور رياض بن حسن الخوام، (بيروت: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، سنة ٢٠٠٠م)، ج ١، ص ٥٠

- ٣١- ضيف، شوقي، أحمد شوقي عبد السلام، *المدراس/النحوية*، (القاهرة: دار المعارف، ط١)، ج١، ص ٢٥٠
- ٣٢- سيويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، *الكتاب*، المحقق: عبد السلام محمد هارون، (القاهرة: مكتبة الخانجي، ط٣، سنة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م، ج١، ص ٢٧)
- ٣٣- أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي، *المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)*، المحقق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، (مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧م)، ج١، ص ٢٨٦
- ٣٤- محمد بن مصطفى القُوجوي، *شيخ زاده*، شرح قواعد الإعراب لابن هشام، التحقيق: إسماعيل مروة، (بيروت: دار الفكر المعاصر)، ودمشق: دار الفكر، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٥م)، ج١، ص ٨٨
- ٣٥- كمال الدين الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، *الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين*، الباب: مسألة هي يجوز تقديم حرف الاستثناء في أول، (بيروت: المكتبة العصرية، ط١ سنة ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، ج١، ص ٢٢٣)
- ٣٦- الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، *معاني القرآن وإعرابه*، المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، (بيروت: عالم الكتب، ط١، سنة ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م)، ج١، ص ١٨٧
- ٣٧- الأنباري، محمد بن القاسم، *الأضداد*، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت سنة ١٩٦٠م)، ص ١٣١
- ٣٨- الفراء، *معاني القرآن*، (بيروت: عالم الكتب، ط٢، ١٩٨٠م)، ج١، ص ١٩٤
- ٣٩- الزجاج، *معاني القرآن وإعرابه*، تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي، (بيروت: منشورات المكتبة العصرية، صيدا)، ج١، ص ٣٨٢-٣٨٣
- ٤٠- تركي بن سهو بن نزال العتيبي، *هشام بن معاوية الضير*، (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ط١، ١٩٩٥م)، ص ٣٤٦
٣٩. أبو الفتح عثمان بن جني الموصل، *الخصائص*، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة)، ج٢، ص ٣٣
٤٠. د. فاضل صالح السامرائي، *معاني النحو*، (الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م)، ج٢، ص ٢٨٣

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقويم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

ড. মোহাম্মদ আমির হোসাইন*

প্রতিপাদ্যসার

কা'ব বিন যুহাইর একজন প্রথিতযশা মুখাদরাম কবি। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে কাব্য প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি তাঁর এ প্রতিভা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কুৎসায় কবিতা রচনা করেন বিধায় তাঁকে হত্যার নির্দেশ জারি করা হয়। পরে তিনি মহানবী (সা.) এর প্রশংসায় 'বানাত সুয়াদ' নামক কাসিদা রচনা করেন এবং তা তাঁকে আবৃত্তি করে শুনান। এতে মহানবী (সা.) খুশি হয়ে তাঁকে নিজের চাদর উপহার দেন, যা পরবর্তীতে উমাইয়া শাসকবর্গ অভিষেক অনুষ্ঠানে বরকতের উদ্দেশ্যে পরিধান করতেন। কাসিদাটির সাহিত্যিক মূল্যমান ছিল অনেক উচ্চ মানের। কাসিদায় ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বর্ণনার ধারাবাহিকতা, শব্দের প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসার নিপুণতা তাঁকে মুখাদরাম কবিদের শ্রেষ্ঠ কবির স্বীকৃতি এনে দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

مقدمة:

إن كثيراً من الشعراء الأجلاء والأدباء الأعزاء الذين خلفوا أثراً قيمة في الشعر العربي. وعلى رأسهم الشاعر العلام كعب بن زهير بن أبي سلمى. وهو من الشعراء المخضرمين وأحد من المادحين للنبي - صلى الله عليه وسلم-، وكان شعره مملوءاً بالمدائح النبوية والصحابية الكرام. والشعراء من بعده نسجوا على منواله، وساروا على نهجه في إنشاء القصائد المدحية للنبي -صلى الله عليه وسلم- من عصره حتى الآن، فظهرت قصائد عديدة ومقطوعات متنوعة في الأدب العربي، تمتعت بها الشعراء العربية عامة والشعراء المسلمين خاصة. فمن أشهر قصائده "بانت سعاد"، و"من سرّه كرم الحياة"، و"رحلت إلى قومي"، و"بان الشباب"، ونواطق خالدة"، و"متى مايتيني قدري"، "أ من أمّ شداد"، و"أمن دمنة الدار" وغير ذلك. ففي الأدب العربي قصائده رائدة قديمة التي نالت اهتماماً ملحوظاً عند الدارسين المحدثين، والمستشرقين^١، والعرب^٢ على حدٍ سواء، ممّن تصدّى منهم لدراسة أدب عصر صدر الإسلام عامة. وفي هذه المقالة ذكرنا حياته الطيبة ومساهمته الشعرية الفذة النادرة كي يستفيد بها الدارسين ممن له ظمناً في الأدب العربي.

لمحة من سيرة كعب بن زهير

اسمه ونسبه

هو أبو عقبة كعب بن زهير^٣ بن أبي سلمى^٤ بن ربيعة بن رياح بن العوام بن قُروط بن الحارث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاطم بن عثمان بن مزينة^٥، ومن ثم يقال له المزني^٦، ولقبه أبو المضرب^٧، وهو من فحول الشعراء المخضرمين الذين أدركوا العصرين الجاهلية والإسلام^٨، وأمه كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم بن عطفان، وهي أم سائر أولاد زهير^٩، تزوجها زهير على زوجته الأولى أم أوفى التي لم تكن يعيش لها ولد ولما تزوج كبشة أصابتها الغيرة، فطلبت منه الطلاق، فطلقها ثم ندم بعد ذلك^{١٠}.

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقويم
(কা'ব বিন য়হাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

نشأته وتعليمه

ولد كعب في غطفان قوم أمه كبشة وترعرع فيها، وظل تاريخ ولادته مجهولا، وكان في صباه يرعى ماشية أبيه، وقد روي أنه أسر وأفتدى نفسه بفرس له يدعى الكميت وكان من أشهر الخيول سرعة وجمالا.^{١١}

إن الشاعر العلام كعب بن زهير نشأ في أسرة شاعرية، فأمه كبشة شاعرة وأبوه زهير شاعر، وجده أبو سُلَى وعمته سُلَى والخنساء وخال أبيه بشامة بن الغدير وأبنا عمته تماضر والخنساء وأخوها صخر وأبنا بنته سُلَى العوثبان و فريض وأخوه بجير وابنه عقبة وحفيده العوَّام كلهم شعراء.^{١٢} وقال العلامة محمد على الصباح : كان أعضاء أسرة كعب كلهم من الشعراء. كان الشعر يسير في دماء العائلة ويسكن في الموروثان الجبينية لتلك العائلة التي قدر لها ان تحتفي بالشعر تألدا ووالدا.^{١٣}

الحصول على المهارة الشعرية:

إن كعب بن زهير بن أبي سُلَى بدأ ينظم الشعر منذ حداثة طفوليته وهو دون المراهقة، فنهاه أبوه، مخافة أن يروي عنه ما لا خير فيه فيشوّه مجد الأسرة، وما زال يهذّب لسانه ويجهّز شاعريته برواية الشعر حتى استقام له النظم. وكان الشعر يكتنفه من كل جانب فروى الشعر لأبيه زهير ولغيره من الرواة.^{١٤}

زهير ينهاه عن الشعر قبل أن يستحكم

كان في صباه يرعى ماشية أبيه في الصحراء، وينظم الشعر فيها، فيزجره والده ويضربه مخافة أن يكون شعره لم يستحكم، كلما يضربه يزيد فيه، فغلبه، فطال عليه ذلك، فأخذه فحبسه،^{١٥} فمكث محبوسا عدة أيام، ثم أخبره أنه يتكلم به، فدعاه فضربه ضربا شديدا، بيد أنه لم يستطع أن يصرفه عن الشعر.

إذن زهير لكعب في قول الشعر:

ففي يوم من الأيام غضب زهير بن أبي سُلمى على ابنه، فخرج من بيته فأردف ولده كعب على ناقته، وانطلق به إلى الصحراء، وأخذ يقول البيت ويستجيز ابنه، فوثق عندئذ باستحكام ملكته، وأذن له في الشعر.^{١٦} وبعد ذلك كان أبوه يخرج به إلى الصحراء فيلقي عليه بيتا أو شطرا ويطلب إليه أن يجيزه تمرينا له وتدريباً على صوغ الشعر ونظمه.^{١٧} والرواة متفقون على أن الشعر لم يتصل في ولد أحد من فحول الشعراء في الجاهلية اتصاله في ولد زهير،^{١٨} وفي الإسلام في ولد بجير. وقد انعقد إجماع الرواة على أن "كعباً" كان أحد الفحول الموجودين في الشعر العربي والمقدم في طبقة و يصفون شعره بقوة التماسك، وجزالة اللفظ وسمو المعنى.^{١٩}

وصية زهير أولاده لقبول الإسلام

وكان زهير بن أبي سُلمى عالماً ماهراً، وشاعراً كبيراً، وكان متمسكاً على التوحيد والبعث كما ظهر في شعره، قال الشاعر:^{٢٠}

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتنم الله يعلم
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أويجعل فينقم

وقد أجمع النقاد بأنه كان لا يفاضل ويتجنب وحشي الكلام، ولم يمدح أحداً إلا بما فيه، وكان كثيراً ما يلتقي بأهل الكتاب ويسمع منهم ويتحدث إليهم ويفكر فيما دعى إليه منهم، وسمع منهم بأن خاتم الأنبياء سيأتي، فانتظر له، فلم يجده، وتوفي قبل مبعث الرسول -صلى الله عليه وسلم-. وفي ذات ليلة رأى زهير في المنام أن أسباب السماء قدمت إليه، فلما هم أن ينالها نأت عنه، ثم أفاق من نومه، ولم يشك في أن لهذه الرؤيا دلالتها وتأويلها، فجمع بنيه الثلاثة (سالمًا وكعبًا وبجيرًا) وقال لهم: أنه كائن خبرا، وأوصاهم أن ينتفعوا به وبما يحدث به من أخبار السماء.^{٢١} فلما جاء الإسلام انتظر كعب وبجير لقبول الإسلام.

هجاء النبي والإسلام

أسلم أخوه بجير قبيل السنة السابعة للهجرة وشهد فتح مكة، ويوم حنين، وغزوة الطائف، فرأى كعب بن زهير ذلك انحرافاً عما كان عليه آبائه، وخروجاً عن شيم الجاهلية، وراح يهجو الإسلام

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقويم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

ونبيه هجاء مرا،^{٢٢} كما هجاء النساء اللواتي دخلن في الإسلام، فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- على كعب غضبا شديدا.^{٢٣}

سبب إهدار دم كعب

أسلم أخوه بجير فلما سمع هذا الخبر كتب كعب إلى أخيه بجير رسالة شعرية، وهي :
ألا بلغا عني بجيراً رسالةً فهل لك فيما قلتَ ويحك هل لك
شربت مع المأمون كاساً رويةً فانهلك المأمون منها وعلك
وخالفت أسباب الهدى وتبعته على أي شيءٍ وثبَ غيْرُكَ ذلكا
على خلقٍ لم تلفِ أمّا ولا أباً عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا

فلما بلغ هذه الأبيات إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدر دمه، وقال : "من لقي كعبا فليقتله".^{٢٤}
وفي الناحية الأخرى نجد وجهاً آخر في إهدار دم كعب بن زهير، وهي تشييب النساء، كما قيل:
إنّما أمرَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِهِ وَقَطْعِ لِسَانِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ تَشَبَّهَ بِأُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ.^{٢٥}
وكلاهما سببان لإهدار دمه، فالأول مشهور جداً.

قبول الإسلام

إذا أمعنا النظر إلى كتب الأحاديث والتواريخ نجد ثلاثة آراء في قبول إسلام كعب بن زهير، نوجزها فيما يلي:

الأول: واسطة الرجل الجهينة: بين محمد بن إسحاق بأنه لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة من الطائف ذهب كعب إلى المدينة وصلى الفجر في المسجد النبوي ولاقاه بواسطة رجل من جهينة، فاستأمنه تائباً فأسلم، فأنشد قصيدته المشهورة "بانت سعاد" في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-^{٢٦}.

الثاني : أنه ذهب إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بواسطة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- فبايع على يد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنشده القصيد "بانت سعاد".^{٢٧}

الثالث : ذهب كعب بن زهير إلى النبي ﷺ من غير واسطة، فلما دخل المسجد عرفه، ثم قال : الأمان يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- "مامون والله"، وأنشده القصيدة.^{٢٨}

وفاته:

وقد وجد كعب بن زهير حياة طويلة، وفي تاريخ وفاته اختلاف، فقال البعض أنه مات في ٢٤هـ^{٢٩} في خلافة عثمان -رضي الله تعالى عنه-، وقيل مات سنة ٤١ هـ / ٦٦١ م^{٣٠} في خلافة معاوية -رضي الله تعالى عنه-، وقيل ٢٦ هـ / ٦٤٥ م^{٣١}.

أخلاقه وشخصيته:

كان كعب بن زهير في الجاهلية فتى مقداماً وفارساً لا يشق له غبار، وكان يقضي معظم وقته متجولاً في الصحراء برفقة أصحابه طلباً للصيد، كما كان شاعراً فحلاً، لذا عدّه سيدنا عمر -رضي الله عنه- أشعر شعراء الجاهلية، وقد عُرف عن كعب في الجاهلية تحليته بالأخلاق العربية الأصيلة مثل المروءة، والكرم، والشجاعة، والنخوة، والحمية، والجلم، ومقت الضيم، وبعد إسلامه أضاف إلى هذه الأخلاق فضائل الإسلام، وما يحمله من قيم نبيلة.^{٣٢}

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

إن الشاعر كعب بن زهير كانت له مكانة علمية بين الشعراء المعاصرين، قال أبو عمر -رحمة الله عليه-: كان كعب بن زهير شاعراً مجوداً كثير الشعر، مقدماً في طبقة هُوَ وأخوه بجير. وكعب أشعرهما، وأبوهما زهير فوقهما. وقال خلف الأحمر: لولا قصائد لزهير ما فضلت على ابنه كعب^{٣٣}. وقال أبو عبد الله : وكان كعب شاعراً فحلاً مجيداً.^{٣٤} وكان الحكيم من نابي الشعراء توسل إليه أن ينوّه بذكره في شعره حتى يشتهر، فقال^{٣٥}:

فمن القوافي شأنها من يحوكها إذا ما مضى كعب وفوّز جرول
كفيتك لا تلقى من الناس واحداً تنخل منها مثل ما تنتخل

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقييم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

خصائص شعر كعب بن زهير:

علما منا بأن الشاعر العلام كعب بن زهير له ديوان ينطوي على فخر ومدح وهجاء وغزل ورثاء وما إلى ذلك من الأغراض التقليدية. وقد ذكر له الرواة شعرا كثيرا لم يصل إلينا منه إلا القليل.^{٣٦} بعض خصائص شعره فيما يلي :

(١) هجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين: إدراكا منا بأنه لما سمع خبر إسلام أخيه بجير كتب رسالة شعرية إلى أخيه، وهجا فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- هجاء مرا، فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- غضبا حتى هدر دمه، قال كعب:

ألا أبلغا عني بُجيراً رسالةً
فهل لك فيما قلتَ ويحك هل لك
شربتَ مع المأمونِ كأساً رويةً
فانهلك المأمونُ منها وعلك
وخالفت أسباب الهدى وتبعته
على أي شيءٍ وَيَبَ غَيْرُكَ دَلْكَ
على خلقٍ لم تلفِ أمّا ولا أباً
عليه ولم تدرك عليه أخاً لك^{٣٧}

(٢) دعوة قومه إلى الإسلام : حينما أسلم وحسن إسلامه ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام،

فأسلم أناس كثيرون على يده، ويقص قصة رحلته إلى قومه في قصيدة "رحلتُ إلى قومي"، وقال:^{٣٨}

رَحَلْتُ إلى قومي لأدْعُو جُلُهم
إلى أمرٍ حَزْمٍ أحكمته الجوامعُ
ليُوفُوا بما كانوا عليه تَعَاقدُوا
بخيفٍ مني والله راءٍ وسامعُ
وتوصلَ أرحامٍ وبفرجٍ مغرَمُ
وترجعَ بالودِّ القديم الرواجعُ
فأبلغَ بها أَفْنَاءَ عُثْمَانَ كُلِّها
وأوساً فبلغها الذي أنا صانعُ
سأدعوهم جهدي إلى البرِّ والتقى
وأمرِ العلا ما شايعتني الأصابعُ
فكونوا جميعاً ما استطعتم فإنه
سيُلبسُكم ثوبٌ من الله واسِعُ
وقومُوا فأسُوا قَوْمَكُمْ فاجمعوهم
وكونوا يداً تبني الغلا وتدافعُ
فإن أنتم لم تفعلوا ما أمرتكم
فأوفوا بها ، إن العهد ودائعُ

(٣) توكله على الله : وبعد إسلام كعب بدل أخلاقه وشيمه، وفي كل أمر يتوكل على الله -عزَّ

وجلّ= الذي يربي العباد ويمن عليهم بالرزق والنعمة، وبعضهم عده من زهاد المسلمين لأنه لا يستحسن

أن يجمع الرزق للغد، بل كان منهم ممن يرى أن ذلك خطيئة لا تغتفر، لأن الله متكفل العباد برزقهم،

وليس لهم إلا أن يسلموا أمرهم له، فهو القادر أن يرزقهم ويرزق الخلق كلهم، وقال: ^{٣٩}

أَعْلَمُ أَنِّي مَتَى مَا يَأْتِي قَدْرِي فليس يحبسُهُ شَحٌّ وَلَا شَفَقُ

بينما الفتى معجبٌ بالعيش مغتبطٌ إذا الفتى لِلْمَنَايَا مُسَلِّمٌ غَلِقُ

والمرء والمال ينهى ثم يذهبه مر الدهور ويفنيه فينسحق

فلت نخافي علينا الفقر وانتظري فضل الذي بالغني من عنده نثق

إن يفن ما عندنا فالله يرزقنا ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق

(٤) إرسال الحكمة: الحكمة هي عصارة التجارب الحياتية وافراز للحوادث والنوازل وإلهام بعد

تفكير وتدبر للأمور، والحكمة هي نتيجة قناعة راسخة، فهي "ضالة المؤمن، حيث وجدها فهو أحق بها".

والله عز وجل: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ ^{٤٠} و الحكمة في شعر كعب ليست بمستحيل؛ لأنه ابن زهير بن

أبي سلمى الشاعر الذي زخرت معلقته بكثير من المواعظ والحكم، فليس غريباً أن يشتمل ديوان كعب

على حكم كثيرة مبثوثة هنا وهناك في ثناياه، وأكثرها يمثل مقطوعات صغيرة مستقلة يبدو عليها أثر

الإسلام واضحاً، إذ استفاد كعب من تعاليم دينه، يقول كعب: ^{٤١}

لَوْ كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْ شَيْءٍ لِأَعْجَبَنِي سَعَى الْفَتَى وَهُوَ مُخْبَوٌّ لَهُ الْقَدَرُ

يَسْعَى الْفَتَى لِأُمُورٍ لَيْسَ مُدْرِكُهَا والنفسُ واحدةٌ والهَمُّ منتشرٌ

والمرء ما عاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ لا تَنْتَهِي الْعَيْنُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْأَثَرُ

وقال أيضاً: ^{٤٢}

قَدْ يُعَوِّزُ الْحَازِمُ الْمَحْمُودُ نَيْتَهُ بَعْدَ التَّوَّاءِ وَيُثْرِي الْعَاجِزُ الْحَمَقُ

فَلَا تَخَافِي عَلَيْنَا الْفَقْرَ وَانْتَظِرِي فَضْلَ الَّذِي بِالْغِنَى مِنْ عِنْدِهِ نَثِقُ

(٥) قصيدة المديح: إن لكعب بن زهير قصيدة مشهورة في مدح النبي -صلى الله عليه

وسلم- بأسم "بانث سعاد" أو البردة". وهي قصيدة رائعة التي كتبها كعب في مدح الرسول -صلى الله عليه

وسلم- وصحبه من المهاجرين، شبه فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنور الذي يستضاء به الكرة

الأرضية وبالسيف المهند الذي كان أعلى وأثمن في ذلك العصر، وهو رمز من رموز القوة وأداة من أدواتها.

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقييم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

وذلك عندما اضطر المسلمون يحملونه لحماية الدين الإسلامي ولنشر الدعوة الإسلامية في أصقاع الأرض، يقول كعب: ^{٤٣}

إن الرّسولَ لنور يستضاء به مهنّد من سيوفِ الله مسلّولُ

ثم مدح الشاعر كعب بن زهير المهاجرين الكرام بأنهم قوم مطيعون، يفعلون ما يؤمرون، كما أنهم هجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة طائعين من أمر نبيهم كما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ولا يخافون فيه لومة لائم، وهم تحملوا عبء الدعوة الإسلامية، وتحملوا العذاب وابتعدوا عن الأهل والوطن والأموال تضحية منهم في سبيل الدين الجديد. وهم أبطال شجعان لا يمكن بحال تنفك صفة الشجاعة عنهم، وإنهم كانوا يضربون الأعداء ولا يفرحون بها، وإننا نرى في نحورهم طعن الرماح، لا في ظهورهم؛ لأنهم لا يفرون من ميادين الحرب قط، ويستقبلون الشهادة فيها طائعين، وقال كعب: ^{٤٤}

في عُصْبَةٍ من قُرَيْشٍ قال قائلهم	بِبَطْنٍ مَكَّةَ لما أَسْلَمُوا زُلُومًا
زالوا فما زال انكاسٌ ولا كَشَفٌ	عند اللِّقَاءِ ولا ميلٌ معازيلُ
شُمُّ العَرَائِينِ أبطالٌ لَبُوسُهُمُ	من نَسِيجِ داوُدَ في الهيِجا سراويلُ
بِبيضِ سَوَابِغٍ قد شَكَّتْ لها حَلَقُ	كأنَّها حَلَقُ القَفْعَاءِ مَجْدُولُ
يَمْسُشُونَ مَشْيَ الجِمالِ الرُّمَرِ يَعْصِمُهُم	ضربٌ إذا عَرَدَ السَّودُ التَّنابلُ
لا يفرحون إذا نالت رماحهم	قومًا وَلْيَسُوا مَجَازِيْعاً إذا نِيلُوا
لا يَقَعُ الطَّعْنُ إلّا في نُحُورِهِم	ما إنْ لهم عن حياضِ الموتِ تَهْلِيلُ

(٦) الإعتذار وطلب العفو : علما منا بأن الشاعر العلام كعب بن زهير اعترف ذنبه

المكسوب بهجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحبه اعترافا مكشوفاً، بقوله: ^{٤٥}

تعلّم رسولُ الله أنك مدركي وأن وعيداً منك كالأخذ باليد

فالبيت يتضمن اعترافاً عن كعب بأنه اقترن ذنباً، وأن يد الرسول -صلى الله عليه وسلم- سوف تطالبه مهما ابتعد به المهرب، ومهما اتخذ من اشكال التخفي، ثم جاء الشاعر على هدفه الأصيل، وهو الاعتذار وطلب العفو من الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيقول : إنه سمع بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أهدر دمه وأمر لقتله فجاءه تائباً طائعاً، يطلب منه العفو الذي هو مأمول ومقبول عنده، فقال: ^{٤٦}

أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي والعفو عند رسول الله مأمولٌ
مهلاً هداً الذي أعطاك نافلةً ال قرآن فيها مواعِظٌ وتفصيلٌ

فعفاه النبي -صلى الله عليه السلام- بما صنع قبله، وخلع بردته الشريفة من جسده وأعطاه الشاعر وألبسه، وما زالت هذه البردة عنده، ثم عند أهله، حتى اشتراها الخليفة معاوية بن أبو سفيان منهم بأربعين ألف درهم، وتوارثها الخلفاء الأمويون، فالعباسيون حتى أخذها التتر منهم سنة أخذ بغداد^{٤٧}.
وجدير بالذكر بأن القصائد المدحية المشهورة للرسول -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة، أحدها قصيدة "بانت سعاد" لكعب بن زهير، ثانیها "قصيدة البردة" لبوصيري، ثالثها "نهج البردة" لأمير الشعراء شوقي بك^{٤٨}. ولا شك فيه بأن قصيدة "بانت سعاد" قصيدة مدحية التي سر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- وفرح بها فرحاً شديداً، فأهدى الرسول -صلى الله عليه وسلم- الشاعر بردته الشريفة احتراماً له وجائزة لقصيدته.

قال عبد العزيز: "قصيدة بانت سعاد" لا تعدُّ من القصائد المدحية، ولم يكن المدح غرضها الرئيسي، ولم يقل الشاعر طمعاً في عطاء، أو رغبة في نوال، كما جرت العادة في قصائد المديح في الأدب العربي، فهي قصيدة اعتذار بالدرجة الأولى، فهي- في نظر البعض- "إلى الاستطعاف والاستبراء أقرب منها إلى الثناء والإطراء، وبعبارة أخرى هي دفاع عن النفس أكثر منها مديحاً"^{٤٩}.

الابتداء بالمقدمة الغزلية:

اختلف الباحثون في أن قصيدة "بانت سعاد" ابتدأت بالمقدمة الغزلية أم لا؟ فقال بعض الباحثين: ابتدأ كعب بن زهير قصيدته "بانت سعاد" بالمقدمة الغزلية على أنه تقليد جاهلي، اتبع فيه خطأ الجاهلين، ويرى الدكتور عبد العزيز المانع "أنها صيغة فنية لا ينبغي أن نأخذ مادتها دائماً على أنها صورة لصاحبها"^{٥٠}. كما علَّلها في بحث آخر له بأن سماعها من قبل الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان نوعاً من السماحة الدينية، وتالياً لقلوب الناس، واستمالة الشعراء إلى جانب الدعوة الجديدة^{٥١}. وقال البعض الغزل في مقدمة قصيدة كعب "بانت سعاد" ليس بغزل حقيقي، كما أن سعاد ليست بامرأة

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقويم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

حقيقية؛ لأن المؤلف في الغزل هو أن يذكر الشاعر معشوقته بأحسن صفاتها الخلقية والخلقية على حد سواء، كما أنه يتودد ويتذلل، ويخطب وُدّها، ويطلب وصالها، ويحاول كسب رضاها إن هي أبدت صدوداً، وإذا تعرض الشاعر الصدود منها، فإنه يأمل ويتمنى أن تعود إلى عهدها السابق؛ ولأنه لا يعقل بأن يبدأ الشاعر بمقدمة غزلية وهو مهذور الدم، وأن المقدمة الغزلية التي يظهر الشاعر فيها بمظاهر العشق، لا يتفق مع حالته النفسية القلقة.

وربط بعض الباحثين بمقدمة القصيدة الغزلية رابطة عميقة بينها وبين نفسية كعب بن زهير، وقال: إن المطلع الغزلي يتضمن معنيين اثنين، أحدهما: الالهفة الشديدة على سُعاد ذات الجمال البارع، والثاني: السخط الشديد على خلق سُعاد الحسني المتلون، وهذان المعنيان يقابلان تماماً نفسية كعب، فالوجه الأول في صفات سُعاد الحسنيّة يقابل لهفته في الحصول على عفو الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أما سُعاد في وجهها السيئ المتلون فيرمز إلى تخلي أصدقائه عنه^{٥٣}.

استعمال الألفاظ البدوية الصعبة:

قد ظهر في شعر كعب بن زهير تأثره ببيئته البدوية القاسية بشكل واضح، فهو كان يكثر في شعره من الألفاظ البدوية الصعبة التي تحتاج إلى شرح وتوضيح، وهو بذلك سار على خطى سابقيه، أمثال امرؤ القيس، وأوس بن حجر، وزهير بن أبي سلمى، ومن الأمثلة على ذلك قوله:^{٥٤}

أَمَسَتْ سُعَادُ بِأَرْضٍ لَا يُبْلَغُهَا إِلَّا الْعِتَاقُ النَّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ
وَلَنْ يُبْلَغَهَا إِلَّا عُذَافِرَةٌ فَمِهَا عَلَى الْأَيْنِ إِرْقَالٌ وَتَبْغِيلُ

إنّ الألفاظ البدوية التي جاءت في هذه الأبيات هي (المراسيل، عُذَافِرَةٌ، تَبْغِيلُ)، وهي ألفاظ بدوية جزلة، لكن بعد إسلام كعب حلّت محلّها ألفاظ القرآن الكريم، والمعاني الإسلامية.

أثر القرآن الكريم في شعر كعب بن زهير:

تأثر شعر كعب بن زهير بعد إسلامه بالقرآن الكريم والحديث النبوي لفظياً ومعنوياً، وقد ظهر هذا التأثير في قصيدته "بانث سعاد"، حيث اعترف أنّ الذي أنزل علي الرسول -صلى الله عليه وسلم- القرآن هو الله، وأنّه حق، وفي هذا دلالة واضحة على أنّ الشاعر لا بد قد اطلع على القرآن الكريم وتعرف على الدين الإسلامي الجديد قبل أن يلقي هذه القصيدة بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والأبيات الآتية توضح ذلك:^{٥٥}

أُنْبِئْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي والعفو عند رسول الله مأمولٌ
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلةً القرآن فيها مواعيطٌ وتفصيلٌ

يظهر في هذه الأبيات تأثر كعب بالآية الكريمة: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^{٥٦}

الفصاحة والبلاغية في شعر كعب بن زهير:

إذا أمعنا النظر إلى أشعار كعب بن زهير وجدناها ما تجمع إلى ملاحه اللفظ وفصاحتها، عمق المعنى وطرافتها، وأشعاره مملوءة بالفصاحة والبلاغة من التشبيه والاستعارة والكناية والاسترداد والطباق والمقابلة والمبالغة وغير ذلك مما يحتاج إلى البيان، فنحن نشير إلى بعضها، وهي فيما يلي:

- أما التشبيه^{٥٧} فنجدّه في عدة مواضع من قصيدة بانث سعاد. فقد شبه العوارض بالراح المعلول، ووعد سعاد بالماء الغرابيل، فقال:

تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول^{٥٨}.

ولا تمسل بالوعد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل^{٥٩}.

- أما الطباق^{٦٠} فقد أورده كعب في كثير من مواضع قصيدته، فقال:

هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها، ولا طول^{٦١}.

ضخم مقلدها عبل مقيدها في خلقها عن بناب الفحل تفضيل^{٦٢}

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقييم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

في البيت الأول طباق بين مقبلة ومدبرة، وقصر وطول. وفي الثاني طباق بين ضخم وعبل.

- وأما البالغة^{٦٣} فقد أتى بها عند ما بالغ في مدح الممدوح، فقال:

فيغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من القوم معفور خراويل^{٦٤}

يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان واقرب زهاليل^{٦٥}

فبالغ في عيش الضرغامين بأنهما لا يأكلان إلا لحم القوم. وفي البيت الثاني بالغ في لبان الناقة بأن القراد لا يستطيع أن يمشي عليها ويزلق عنها.

- أما ارسال المثل هو أن يوتى بكلام صالح يتمثل به في مواطن كثيرة، مثلاً

فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدّر الرحمن مفعول^{٦٦}

كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً وما مواعيدها إلا الأباطيل^{٦٧}

ففي هذين البيتين "فكل ما قدّر الرحمن مفعول" و "كانت مواعيد عرقوب لها مثلاً" يتمثل بهما في مواضع شتى.

- تأكيد المدح بما يشبه الذم^{٦٨}، فقال:

لا يقع الطعن إلا في نحورهم ومالهم من حياض الموت تهليل^{٦٩}

الخاتمة:

ففي الختام نقول بأن أشعار كعب بن زهير لها أهمية كبرى في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي كليهما، وهذه الأشعار أسمى القوة في تأثير الأدباء والفضلاء، أظهر بها مهارته الشعرية وفطنته العميقة في رحاب الأدب العربي. وله قوة جاذبية التي جذب بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- حتى أعطاه بردهته المباركة جائزة على قصيدته "بانت سعاد". نظرا إلى هذه الأهمية القصوى تدرس قصائده في أكثر مدارس

بنغلاديش والبلاد الإسلامية الأخرى وجامعاتها، والباحثون يعكفون عليها عبر القرون ليستخرجوا منها اللآلي المكنونة والكنوز الزخيرة. وهي لاتزال تدرس جيلا بجيل في المعاهد الدينية إلى يوم القيامة.

المصادر والمراجع

-
- ^١ كارل بروكلمان، *تاريخ الأدب العربي*، ترجمة: عبد الحليم النجار، ط ٥، (مصر: دار المعارف، ١٩٨٣م)، ج ١، ص ١٥٦؛ ريجيس بلاشير، *تاريخ الأدب العربي*، ترجمة: إبراهيم الكيلاني، ط ٢ (دمشق: دار الفكر، ١٩٨٤م)، ص ٣٠١؛ كارلو ناللينو، *تاريخ الآداب العربية*، ط ٢ (مصر: دار المعارف، ١٩٧٠م)، ص ١٠٤.
- ^٢ ابن حجر العسقلاني، *الإصابة في معرفة الصحابة*، تحقيق: علي البجاوي (القاهرة: دار نهضة مصر، ب، ت)، ج ٥، ص ٥٩٢؛ ابن عبد البر النمري القرطبي، *الاستيعاب في معرفة أسماء الأصحاب*، المصدر السابق، ص ١٣١٣؛ ابن الأثير الجوزي، أبو الحسن علي بن أبي المكرم محمد، *أسد الغابة في معرفة أسماء الصحابة*، تحقيق: محمد إبراهيم ألبنا وآخرين (القاهرة: دار الشعب للطباعة والنشر، ب، ت)، ج ٤، ص ٤٧٥.
- ^٣ وزهير تحقير أزهر على الترقيم ويجوز أن يكون تحقير زهر وذهب الفراء إلى أنه لا يحقر الاسم تحقير الترقيم إلا أن يكون علماً كزهير وبجير ونحوهما. أنظر: أبو الفتح عثمان بن جني، *المبهم في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة*، ط ١ (دمشق: دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٨م)، ص ١٦٨.
- ^٤ بضم السين وسكون اللام (سُلّى)، أنظر: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، *جمهرة اللغة*، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط ٢ (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٨م)، ج ٢، ص ٤٥٩؛ أبو عمرو إسحاق بن مزار الشيباني، *الجبم*، تحقيق: إبراهيم الأبياري، (القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٩٧٤م)، ص ٢٠٠.
- ^٥ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، *معرفة الصحابة*، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ط ١ (الرياض: دار الوطن للنشر، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م)، ج ١، ص ٤٢٥.

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقييم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

- ^٦ أبو عبد الله محمد بن سلام، *طبقات فحول الشعراء*، تحقيق: محمود محمد شاكر، (جدة: دار المدني، ب، ت)، ج ١، ص ١٠٦؛ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق، *معجم الصحابة*، تحقيق: صلاح بن سالم المصراطي، ط ١ (المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية، ١٤١٨هـ)، ج ٢، ص ٣٨٠.
- ^٧ واسم أبنة عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى. وسمي بذلك لأنه كان يجلس إلى امرأة فيعشقها، فجاء إخوتها فضربوه، فعرف بالمضرب، كما لقب أبوه بأبي المضرب. أنظر: أبو المجد اسعد بن إبراهيم الشيباني، *المنذكرة في القاب الشعراء*، المكتبة الشاملة، ج ١، ص ٧؛ وقال صلاح الدين إنه شَبَّبَ بِامْرَأَةٍ فَضَرَبَهُ أَخُوهَا بِالسَّيْفِ ضربات كثيرة فلم يمت. أنظر: صلاح الدين خليل بن أيبك، *الوافي بالوفيات*، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركلي مصطفى (بيروت: دار إحياء التراث، ٢٠٠٠م)، ج ٢٤، ص ٢٥٩.
- ^٨ ديوان كعب بن زهير، تحقيق: على فور (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م)، ص ٥.
- ^٩ نفس المصدر، ص ٥.
- ^{١٠} حسن حسين، *ثلاثية البردة برودة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم*، ط ١ (الدوحة: دار الكتب القطرية، ١٤٠٠هـ)، ص ١٩.
- ^{١١} حنا الفاخوري، *الجامع في تاريخ الأدب العربي* (بيروت: دار الجيل، ب، ت)، ص ٤٠٢.
- ^{١٢} أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، *معجم الشعراء*، ط ٢ (لبنان: دار الكتب العلمية، ١٩٨٢م)، ص ٣١٩.
- ^{١٣} جرجي زيدان، *تاريخ آداب اللغة العربية، الجرا الأول*، ص ١٨٣.
- ^{١٤} *الجامع في تاريخ الأدب العربي*، المصدر السابق، ص ٤٠٠.
- ^{١٥} بطرس البستاني، *أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام* (بيروت: دار الجيل، ١٩٨٩م)، ص ٢٦٧.
- ^{١٦} *أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام*، المصدر نفسه، ص ٢٦٧.
- ^{١٧} دكتور شوقي ضيف، *تاريخ الأدب العربي*، ط ٢٠ (القاهرة: دار المعارف، ٢٠٠٢م)، ج ١، ص ٨٣-٨٤.
- ^{١٨} *في الأدب الجاهلي*، ص ٢٩٠.
- ^{١٩} د. طه حسين، *في الشعر الجاهلي*، ص ٣٠٦-٣٠٩.

- ^{٢٠} ديوان زهير بن أبي سلمى، ص ٨١.
- ^{٢١} ثلاثية البردة بردة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ص ٢٠.
- ^{٢٢} الجامع في تاريخ الأدب العربي، المصدر السابق، ص ٤٠٢.
- ^{٢٣} كامل سلمان الجابوري، معجم الشعراء، ج ٤ (بيروت: دار الكتب الإسلامية، ٢٠٠٣م)، ص ٢٢٨.
- ^{٢٤} أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد، تحقيق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، *أسد الغابة في معرفة الصحابة*، ط ١ (الناشر: دار الكتب العلمية، ١٩٩٤م)، ج ٤، ص ٤٤٩.
- ^{٢٥} *الكامل في التاريخ*، المصدر السابق، ج ٢، ص ١٤٥: البغدادي، *خزانة الأدب*، ج ٩، ص ١.
- ^{٢٦} أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، *معرفة الصحابة*، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ط ١ (الرياض: دار الوطن للنشر، ١٩٩٨م)، ج ١، ص ٤٢٥.
- ^{٢٧} *معجم الصحابة*، المصدر السابق، ج ٢، ص ٣٨١.
- ^{٢٨} *أسد الغابة في معرفة الصحابة*، المصدر السابق، ج ٤، ص ٤٤٩.
- ^{٢٩} *أدباء العرب*، ص ٢٦٨.
- ^{٣٠} نفس المصدر، ص ٢٦٨.
- ^{٣١} ديوان كعب بن زهير، ص ٥.
- ^{٣٢} أبو هدايا حامد، *"الصورة الشعرية في شعر كعب بن زهير"*، مجلة كلية الآداب (٢٠١٠)، العدد ٢٢، صفحة ٢١-٢٤، ٦، ٧، ٨، بتصرف.
- ^{٣٣} أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، *الاستيعاب في معرفة الأصحاب*، ط ١، (بيروت: دار الجيل، ١٩٩٢)، ج ٣، ص ١٣١٥.
- ^{٣٤} *معجم الشعراء*، ص ٣٤٢.
- ^{٣٥} *تاريخ الأدب العربي*، المصدر السابق، ص ١٨٣.
- ^{٣٦} *الجامع في تاريخ الأدب العربي*، المصدر السابق، ص ٤٠٢.
- ^{٣٧} محمد علي صباح، كعب بن زهير حياته وشعره (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٠م)، ص ٤٥.

كعب بن زهير وخصائص شعره: دراسة وتقويم
(কা'ব বিন যুহাইর ও তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন)

- ^{٣٨} ديوان كعب بن زهير، ص ١٤.
- ^{٣٩} المصدر نفسه، ص ٦٧.
- ^{٤٠} سورة البقرة: ٢٦٩.
- ^{٤١} ديوان كعب بن زهير، ص ٣٧-٣٨.
- ^{٤٢} المصدر نفسه، ص ٤٢.
- ^{٤٣} المصدر نفسه، ص ٦٧.
- ^{٤٤} المصدر نفسه، ص ٦٧.
- ^{٤٥} المصدر نفسه، ص ٢٥٨.
- ^{٤٦} ديوان كعب بن زهير (المكتبة الشاملة)، ص ٥٧.
- ^{٤٧} ، أبو الفرج علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأئمة المأمون، ط٢ (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٢٧هـ)، ج ٣، ص ٢٠٢.
- ^{٤٨} نفس المصدر، ص ٥.
- ^{٤٩} عبد العزيز عبده قلقيلة، خط سير الأدب العربي، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩٠م)، ص ١٠٥.
- ^{٥٠} حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في صدر الإسلام، ط ١ (بيروت: دار الجيل، ١٩٨٧م)، ص ٤٨.
- ^{٥١} عبد العزيز بن ناصر المانع، قصيدتا الأعشى الإسلاميتين، هل نرفض نسبتهما إليه (مجلة بحوث كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، س ٢، ج ٢٤، ١٤٠٥/١٤٠٤هـ)، ص ٩٤.
- ^{٥٢} عبد العزيز المانع، قراءة في قصيدة بانة سعاد، (مجلة المجمع العلمي العراقي، ج ٣، ٢، رجب ١٤٠٢هـ، نيسان ١٩٨٢، ص ٣٦٦-٣٦٧).
- ^{٥٣} عبد الحليم حفي، مطلع القصيدة العربية ودلالاته النفسية (القاهرة: الهيئة المصرية للطباعة والنشر، ١٩٥١م، ص ٧٧).
- ^{٥٤} ديوان كعب بن زهير (المكتبة الشاملة)، ص ٤٧.

- ^{٥٥} المصدر نفسه، ص ٤٩.
- ^{٥٦} سورة الأعراف: ١٩٩.
- ^{٥٧} هو مشاركة أمر لأمر آخر في معنى بأدوات معلومة، ما لم يكن على وجه الاستعارة الحقيقية، ولا الاستعارة بالكناية، ولا التجريد. أنظر: أحمد الهاشمي، تحقيق: لجنة من الجامعيين، ط ٢ (بيروت: مؤسسة المعارف، ١٩٩٩م)، ص ٢١٩.
- ^{٥٨} الدكتور مجيب الرحمن، كعب بن زهير وشعره (داكا: البركة لائبريري، ٢٠٠٨م)، ص ١١١.
- ^{٥٩} نفس المصدر، ص ١١٣.
- ^{٦٠} هو الجمع بين الشئ وضده في الكلام، أي بين معنيين متقابلين في الجملة، وهما قد يكونان اسمين، أو حرفين، أو مختلفين. أنظر: أحمد الهاشمي، المصدر السابق، ص ٣٠٣.
- ^{٦١} الدكتور مجيب الرحمن، كعب بن زهير وشعره، ص ١١٠.
- ^{٦٢} نفس المصدر، ص ١١٥.
- ^{٦٣} هو أن يدعي المتكلم لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حداً مستبعداً أو مستحيلاً. أنظر: أحمد الهاشمي، المصدر السابق، ص ٣١٢.
- ^{٦٤} الدكتور مجيب الرحمن، كعب بن زهير وشعره، ص ١٢٢.
- ^{٦٥} نفس المصدر، ص ١١٦.
- ^{٦٦} نفس المصدر، ص ١٢٠.
- ^{٦٧} نفس المصدر، ص ١١٣.
- ^{٦٨} هو أن يثبت من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها. أنظر: محمد مطاهر على، دروس البلاغة (داكا: مفطى لائبريري، ب. ت)، ص ١٣١.
- ^{٦٩} الدكتور مجيب الرحمن، كعب بن زهير وشعره، ص ١٢٤.

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

ড. মুহাম্মদ সোলাইমান*

প্রতিপাদ্যসার

মানুষের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিরসন করে সংশোধন সাধনের মাধ্যমে মীমাংসা করে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের একটি অন্যতম বিধান। আর এ সংশোধনমূলক কার্যকলাপকে বলা হয় ইসলাহ বা মীমাংসা। ইসলামি শরিয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাদিস শরীফে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্যমূলক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের পূর্বে সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানিতে ভরপুর ছিল তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা। পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল আরবজাতি। সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি হতে মুক্তি দিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাব। তিনি খুবই দ্রুততম সময়ে তাঁর উত্তম আদর্শের মাধ্যমে কলুষিত সমাজকে উত্তম সমাজে রূপান্তর করেন। মানুষের নৈতিক চরিত্রকে ইসলাহ বা সংশোধন করে শ্রেষ্ঠ সংস্কারকের আসনে অলংকৃত হন। কিন্তু আজ মুসলমানদের মধ্যে সেই ইসলাহ বা মীমাংসামূলক কার্যকলাপের নিদারুণ আকাল পড়েছে। ইসলামের অনুসারী হয়েও মানুষের মধ্যে সংশোধন করে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা দিনে দিনে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্যায় দেখেও না দেখার ভানে মত্ত। সংশোধন করে দেওয়া দূরের কথা বরং পারস্পরিক সংঘাত কীভাবে সৃষ্টি করে তামাশা দেখা যায় সেই প্রচেষ্টাতেই লিপ্ত। তাই নিজের হারানো চরিত্র ইসলাহ বা সংশোধনপূর্বক ইসলাহমূলক কার্যকলাপে নিবেদিত হওয়ার নিমিত্তে ইসলামি শরিয়ত প্রদত্ত দিকনির্দেশনার বর্ণনা দেওয়াই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

التقديم:

الحمد لله الذي خلق الإنسان خليفة في الأرض، وجعله أشرف المخلوقات خلقا وخلقاً، وعلماً ووقراً، حتى سجدته الملائكة كلهم تعظيماً وتكريماً إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين. والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عزوجل على فترة من الرسل، هادياً وشاهداً، ومبشراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، لإصلاح الأمة من الفتن الجاهلية، بتخريجهم من الضلالة والغواية إلى الرشd والهداية، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

فإنما المؤمنون هم الذين يصدقون شديداً بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، معتقدين برسالته، ومحبين إليه أشد حبا من ووالده، وولده، والناس أجمعين، حتى من حياتهم. ويرتبطون بأخوة الإيمان كالبنين المرصوص. فالقرآن قرر هذه الأخوة بقوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".^١

فالأخوة الإيمانية هي أمر عظيم للمسلمين، لأنهم كانوا متفرقين قبل الإيمان، واتفقهم الإيمان على هدف واحد باعتصام حبل الله المتين. كما قال الله تبارك وتعالى "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا"^٢

قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أشتاتا، فدعاهم إلى الإيمان والإسلام، حتى صاروا متحدين بنور الإيمان والإسلام. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم الراحة والسلامة، وأزال منهم رسوم الجاهلية المروجة، وارتبطهم بألفة الأخوة الإسلامية، فصاروا مثل جسد واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مثل المؤمنين في تراحمهم وتواددهم وتواصلهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحصى والسهر »^٣

كانت الأخوة بين المؤمنين في بداية الإسلام ثابتة جداً، ولكنها تزول تضعف يوماً فيوماً، رويداً فريداً، حتى انعدمت منهم في العصر الراهن، فصاروا كالإبل بلا راع، وكالغنم بلا حارس، لعدم الإصلاح بينهم، فحملت

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

عليهم اليهود والنصارى وغيرهم من الأعداء المستعمرين. فاهتم الشريعة الإسلامية بالإصلاح بين الناس عامة وبين المؤمنين خاصة.

الإصلاح لغة:

الإصلاح: نقيض الإفساد، وهو الإتيان بالخير والصواب، كما يقال: أصلح بين القوم، أي وفق وألف بينهم بالموادة، وأصلح الشيء بعد فساده: أقامه، وأصلح الدابة: أحسن إليها. فالصلاح والصلح بمعنى واحد، يقال: صَلَحَ يَصْلُحُ وَيَصْلُحُ صَلَاحًا وَصُلُوحًا فهو صَالِحٌ وَصَلِيحٌ، والجمع صُلَحَاءُ وَصُلُوحٌ؛ الإصلاح مصدر من الإفعال، مشتق من الصلح، معناه اللغوي هو التقويم والتغيير والتحسين. مادته "ص ل ح" قال العلامة ابن منظور في لسان العرب تحقيقاً: "الصَّلَاحُ: ضِدُّ الْفُسَادِ؛ صَلَحَ يَصْلُحُ وَيَصْلُحُ، والإصلاح نقيض الإفساد والمصلحة الصلاح والمصلحة واحدة المصالح والاستصلاح نقيض الاستفساد وأصلح الشيء بعد فساده أقامه وأصلح الدابة أحسن إليها فصلحت."°
قال الامام الراغب الإصفهاني: "الصُّلُحُ يختص بإزالة التَّفَارِقِ بين الناس، والصَّلَاحُ: ضِدُّ الْفُسَادِ، وهما مختصَّان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وإِصْلَاحُ اللَّهِ تَعَالَى الْإِنْسَانَ يكون تارة بخلقه إِيَّاهُ صَالِحًا، وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارة يكون بالحكم له بالصَّلَاحِ".^٦
وقال الحلبي " غلب الصلح على المودة بين الناس وإزالة ما بينهم من الضغائن، والإصلاح فعل ذلك؛ قال تعالى: "أو إصلاح بين الناس"^٧ والصلح في الفقه نوع من ذلك، لأن فيه إزالة خصومةٍ بترك بعض الحق"^٨.
ولقد حفل القرآن الكريم بصور عديدة لدعوات الرسل عليهم السلام إلى الصلاح والإصلاح؛ فقد ورد لفظ الصلاح بجميع مشتقاته في خمس وخمسين سورة، منها ست وثلاثون (٣٦) سورة مكية، وتسع عشرة (١٩) سورة مدنية. في حوالي مائة وتسع وسبعين آية (١٧٩). منها مائة وخمس عشرة آية (١١٥) مكية، وأربع وستون (٦٤) آية مدنية. كما ورد لفظ الصلاح بمشتقاته في حوالي أربعة وتسعين وثلاثمائة (٣٩٤) نص حديثي.

الإصلاح اصطلاحاً:

وللإصلاح تعريفات عديدة من أهمها ما يلي:

١. هو إزالة الخلل والفساد الطارئ على الشيء^٩

٢. إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من الفساد^{١٠}.

وكل هذه التعريفات تدور حول معنى إزالة الفساد الذي يطرأ على الشيء، وإعادته إلى ما كان عليه من الصلاح والاعتدال والنفع.

فأقول إنما المراد بالإصلاح هو اختيار الخطوة لإزالة الخصومة بين المخاصمين من المؤمنين وعامة الناس، وإنشاء التأليف في قلوبهم، وإعادة المحبة المفقودة بينهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية صلى الله عليه وسلم حتى يعودوا إلى مجدهم التليد في العالم الراهن، ويحفظوا على المودة والألفة بينهم، ويقلعوا أسباب التفرقة منهم بالأخوة الإيمانية الشديدة.

ماذا ورد في كتاب الله حول الإصلاح

إن الله تبارك وتعالى أصلح عباده الضالين بالأنبياء والمرسلين، عبر القرون من أبينا آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختتم به باب الرسالة والنبوة. واعترف بالإسلام ديناً حيث قال: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ"^{١١} حتى أكمل هذا الدين، وأتم نعمته على المؤمنين، ورضى لهم الإسلام ديناً، كما قال في كتابه المبين "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"^{١٢}. إن الله يحب المؤمنين، ولا يريد دخولهم في النار، بل يحب أن يدخلهم في الجنة، حتى دعاهم إلى الإصلاح، كي يكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة.

الإصلاح مهمة الأنبياء والمرسلين:

١. إن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء كلهم ليصلحوا الناس بالتوحيد والرسالة، وليخرجوا من الظلمات إلى النور. فمهمة الأنبياء والمرسلين هي الإصلاح بين الناس. قد انتشر الفساد في كل أمة، كفساد العقيدة

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

والشرك في قوم نوح، والفاحشة واللواط في قوم لوط، والتطيف بالكيل والوزن، والبخس في المال، وغيرها من الأعمال الشنيعة القبيحة الكثيرة، كانت تجري في كل أمة حتى أرسل الله عزوجل فيهم الأنبياء والرسل تطهيراً من الأخلاق الخبيثة بالإصلاح كما بين الله تبارك وتعالى على لسان شعيب عليه وسلم عند دعوته "إِنْ أُريدُ إِلَّا الإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ" ^{١٣} وأوصى موسى أخاه هارونَ . عليهما السلام . حين استخلفه في قومه بقوله: "اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ" ^{١٤}

ولما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الإسلامية في مكة المكرمة، وجد فيهم كثيراً من الفساد في العقيدة، والعبادة، والأخلاق، فأصلحهم بالجد والكد حتى جعلهم خير الأمم في بقعة الأرض جميعاً كما قال الله تبارك وتعالى "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" ^{١٥}

أخرجهم من الأخلاق الذميمة إلى الأخلاق المحمودة كما نرى في قول جعفر بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أمام النجاشي "أَيُّهَا الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيءُ الْجَوَارِ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا ، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُؤَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ الْجِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصَلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالِدَّمَاءِ وَهَتَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّيَامِ ؛ فَعَدَدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ" ^{١٦}

فالأمور المذكورة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاذ، والأمور التي نهاهم عنها كلها من الأمور المصلحة في المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المصلح الأعظم في العالم، كما هو أصلح القوم في وقت قليل بأسوته الحسنة وبحكمته البالغة، ليس له نظير ولا مثيل، قال تعالى "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ" ^{١٧}

فتلاوة كتاب الله تعالى، والتزكية، وتعليم الكتاب والحكمة، وسيلة من الوسائل الهامة لإصلاح الناس من الضلالة والغواية، فالرسول صلى الله عليه وسلم حول العالم كله من فساد إلى صلاح وإصلاح في أقل من ربع قرن من الزمان؛ فكان صلى الله عليه وسلم مثلاً وقدوة للمصلحين. وأنه صلى الله عليه وسلم بشر المصلحين بالجنة فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَصْلَحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ»^{١٨} ومن هنا تأتي أهمية ومكانة الصلاح والإصلاح في الشريعة الإسلامية ومدى حاجته إليه في المجتمع المعاصر.

٢. الإصلاح كالعروة الوثقى للأخوة الإيمانية:

الأخوة الإيمانية هي أشد أخوة من الأخوة النسبية، لا تكسر هذه الأخوة إلا بالفساد بينهم. فيدمرها العصاة من المؤمنين الفاسقين بأعمالهم الشنيعة. فالإصلاح بينهم أمر إلهي، كي يرتبطون بالأخوة الوثقى بإصلاح أخلاقهم الرزيلة. فالإصلاح بين المؤمنين أمر إلهي، لأن الله تبارك وتعالى قيد المؤمنين بقيد الأخوة، وأمرهم للإصلاح بينهم عند المنازعة، لإقامة السلامة، وإزالة القلق والاضطراب من المجتمع. قال الله عز وجل "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"^{١٩}

أي وإن حدث أن فئتين وجماعتين من إخوانكم المؤمنين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بينهما، واسعوا جهدكم للإصلاح بينهما. فإن اعتدت إحداهما على الأخرى، وتجاوزت حدها بالظلم والطغيان، ولم تقبل الصلح، وصممت على البغي، فقاتلوا الفئة الباغية، حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه، وتقلع عن البغي والعدوان، وتعمل بمقتضى أخوة الإسلام. فإن رجعت وكفت عن القتال، فأصلحوا بينهما بالعدل، دون حيف على إحدى الفئتين، واعدلوا في جميع أموركم، فإن الله يحب العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم، ليس المؤمنون إلا إخوة، جمعتهم رابطة الإيمان، فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا شحنة،

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

ولا تباغض ولا تقاتل ، فأصلحو بين إخوانكم المؤمنين ، ولا تتركوا الفرقة تدب ، والبغضاء تعمل عملها ، واتقوا الله تعالى بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، لتنالكم رحمته ، وتسعدوا بجنته ومرضاته.^{٢٠}
ههنا أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين للإصلاح عند ما وقعوا في المقاتلة بينهم، ولصيانة الإخوة الإيمانية من الخسران بالعدل والقسط، وبخشية الله رب العالمين، لدفع مشكلة التنازع بين المؤمنين. وبه يحفظ الدماء، ويصان الأعراض والأموال، ويقام الدول والمجتمعات.

٣. المصلح أفضل من المتنفل المتعبد ببدنه وماله:

الإصلاح بين الناس أمر شديد، فمن يسعى بهذا الأمر العظيم ربما يواجه المصائب والشدائد حتى كاد أن يهلك نفسه. فأعلن له النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عظيماً فروي عن أبي الدرداء، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ؟ " قَالُوا: بَلَى قَالَ: " إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ "^{٢١}

"والمراد بذات البين: المخاصمة والمهاجرة بين اثنين بحيث يحصل بينهما بين، أي: فرقة ... وفي الحديث: حث وترغيب في إصلاح ذات البين، واجتناب عن الإفساد فيها؛ لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين، وفساد ذات البين ثلثة في الدين فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه"^{٢٢}

ويروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: هي الحالقة: لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. ذلك أن الإفساد بين الآخرين يؤدي إلى القطيعة التي حرّمها الشرع كما روي عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان: فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام "^{٢٣}

٤. الإصلاح أفضل من الصدقة:

الصدقة صفة محمودة للإنسان، فاهتم بها الشريعة الإسلامية غاية الاهتمام، ولكن الإصلاح خير من الصدقة، كما ورد فيه أحاديث كثيرة فمشاهيرها مذكورة في الذيل: منها ما نقله ميرك عن المنذري، عن أبي

هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "«ما عمل شيء أفضل من الصلاة وإصلاح ذات البين»". رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "«أفضل الصدقة إصلاح ذات البين»". رواه الطبراني والبخاري وفي سننه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وحديثه هذا حسن لحديث أبي داود والترمذي، عن أبي الدرداء. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "«يا أبا أيوب! ألا أدلك على صدقة يحب الله موضعها؟» قلت: بلى يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال: "تصلح بين الناس؛ فإنها صدقة يحب الله موضعها". رواه الأصبهاني. وفي رواية له والطبراني أيضا: "«ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تغاضبوا وتفاسدوا»". وفي رواية للطبراني، والبخاري: "«ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟» قال: "من أصلح بين الناس أصلح الله أمره، وأعطاه بكل كلمة تكلم بها عتق رقبة، ورجع مغفورا له ما تقدم من ذنبه".^{٢٤}

٥. الإصلاح يمنع العذاب الإلهي:

إنما الإصلاح يدفع نزول العذاب الإلهي، لأن الناس إذا انحرفوا عن الإصلاح، ويغضبوا أبصارهم عن المنهيات، ولا يأمررون بالمعروف، عم فيهم العذاب من الله تعالى ولو كان فيهم الصالحون. قال الله تبارك وتعالى: "وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ"^{٢٥} يقول الإمام القرطبي عليه الرحمة في تفسير هذه الآية الكريمة: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى أي أهل القرى. بِظُلْمٍ أي بشرك وكفر. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق: أي لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد، كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان، وقوم لوط باللواط؛ ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال في الدنيا من الشرك، وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب. وفي صحيح الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده"^{٢٦}

إن تتأمل بهذه الآية الكريمة نري أن الله عزوجل لم يقل "وأهلها صالحون" فالصالحون والمصلحون بينهما تفاوت عظيم وفرق بعيد، فإن الصالحين هم الذين يتبعون أحكام الشريعة بأنفسهم فحسب، ولا يسعون أن يصلحوا الأغيار من الطغيان والعصيان. وبالعكس أن المصلحين هم الذين يسلكون على سبيل

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

الهدى بأنفسهم، ويجتهدون لإصلاح الناس بأقوالهم، وأفعالهم، وخطواتهم حتى يقيموا الصلاح والراحة بين الناس في المجتمع. فلا يفيد كثرة الصالحين بدون إصلاح، بل يفيد المصلحون المقلون بإصلاحهم. وجاء في الحديث الذي روى عن زينب بنت جحش: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها»، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أفهلك وفيما الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثرت الخبث»^{٢٧}

(وفيما الصالحون) أي: أنعذب فهلك نحن معشر الأمة، وال حال أن بعضنا مؤمنون، وفيما الطيبون الطاهرون، ويمكن أن يكون هذا من باب الاكتفاء على تقدير الاستغناء، أي: وفيما الصالحون ومنا القاسطون، (قال: " نعم ") ، أي: يهلك الطيب أيضا إذا كثرت الخبث بفتحتين أي: الفسق، والفجور، والشرك، والكفور، وقيل: معناه الزنا، والمقصود: أن النار إذا وقعت في موضع واشتدت أكلت الرطب واليابس، وغلبت على الطاهر والنجس، ولا تفرق بين المؤمن والمنافق، والمخالف والموافق، وسيأتي أن الله إذا أنزل بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.^{٢٨}

فثبت أن مكان المصلحين أفضل من مكان الصالحين، لأن الله عز وجل يعم العذاب في الأمة بكثرة الخبث وإن كان فيهم الصالحون كثيرا، فإنهم لا يمنعون الناس عن الفسق، والفجور، والشرك، والكفور، والزنا، واللواط، والربا، والرشوة وغيرها من الأعمال الخبيثة المرجة في المجتمع، ولا يأمرهم بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، بل يشتغلون بالأعمال الصالحة لاحتفاظ أنفسهم، ولا يفكرون لصيانة أغيارهم من النار. وهذا أمر معدوم المراعات لحقوق الآخرين. فما تنفع عبادتهم عن عذاب الله شيئا، بل يهلكهم الله بعذابه مع كونهم عابدين صالحين طائعين. كما روي عن خَالِدٍ، وَإِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ»^{٢٩}

فعقاب الله يعم الناس جميعا إن لم يوجد فيهم عقلية الإصلاح. فالصالح المطلق يحفظ نفسه فقط بالعبادة، والصالح المصلح يحفظ غيره بإصلاحه مع احتفاظ نفسه، فهو خير من الصالح المطلق، فإنه لا

يريد إصلاح الأغيار. فحث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمته للإصلاح بقوله " من رأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فليغيَرهُ بيده، فإن لم يَسْتَطِعْ فبِلِسَانِهِ، فإن لم يَسْتَطِعْ فبِقَلْبِهِ، وذلك أضعفُ الإيمانِ".^{٣٠} لقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يجب أن يُختار للإصلاح، فمن استطاع من الناس أن يدفع المنكر بيده فليدفع بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ثم بقلبه على الأقل الذي هو أضعف الإيمان، عسى الله أن ينجينا من عذابه وعقابه بضعفنا هذا.

٦. الإصلاح سبب الأمان من الخوف والأحزان: فبالإصلاح يحصل على الأمان من المخاوف والأحزان في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: "فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"^{٣١} إن الإيمان بالله أساس راسخ، وقاعدة جامعة لمن ينالون رضا الرحمن فلا يسخط عليهم أبدًا، على أن الإيمان إذا ما قورن بالصالح والإصلاح في الأرض كان صاحبه والجا الطريق ذاته. لقد أكد الله تعالى في آية أخرى على قضية الإصلاح والسعي في مسالك الأرض لتحقيقها؛ درءًا للفساد والإفساد، وإذا جمع صاحبها التقوى كان من جملة المتصفين بالأمن والسعادة: "يَا بَنِي آدَمَ إِذَا تَبَيَّنَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"^{٣٢}

٧. الإصلاح سبب الرحمة والمغفرة:

وبالإصلاح يوجد رحمة الله عز وجل ومغفرته، لأن المصلحين هم الذين يبذلون جهودهم لدفع المفسدين، ليقوموا به الراحة والسلامة في المجتمع الإنساني بتقواهم. فيغفرهم الله تعالى ويرحمهم، كما قال الله تبارك وتعالى: "وإن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا"^{٣٣}، وقال الله جل وعلا -: "إن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا"^{٣٤} ورتب على عدم اصطلاح المتخاصمين عقوبة عظيمة، فرفع عنهم المغفرة حتى يصطلحا، فمن ينقذهما ويصلح بينهما فله أجر جزيل. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا »^{٣٥}.

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

৪. أجر المصلح:

إن الله لا يضيع أجر العاملين، فالمصلح هو العامل الذي يعمل لإصلاح الناس، ليخرجهم من الفساد إلى الصلاح. وهذا العمل عمل شديد، فربما أنه يواجه الخطر العظيم حتى كاد أن يموت في هذا السبيل. فحفظ الله له أجرا عظيما عنده، حيث قال سبحانه وتعالى: "لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا"^{٣٦} وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح الله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة، على ما أذن الله وأمره"^{٣٧} بل ووعد من فعل ذلك يبتغي رضا الله بالأجر العظيم، فمن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر، أو يصلح بين الناس (ابتغاء مرضاة الله)، يعني: طلب رضى الله بفعله ذلك (فسوف نؤتيه أجرا عظيما)، يقول: فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيما، ولا حدًا لمبلغ ما سعى الله: (عظيمًا) يعلمه سواه"^{٣٨}

فالله تعالى يعطي المصلح أجرا عظيما ازاء عمله إن ابتغي رضاه في نيته، ولا يضيع أجره كما قال تعالى: "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ"^{٣٩}.

فيجب على المصلح أن يصحح أولا نيته لنيل الأجر العظيم من الله الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه"^{٤٠}.

وسائل الإصلاح:

إن الله أمرنا أن نصلح بين الناس في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وهكذا أوضح لنا طرق الإصلاح ووسائله، فالآن نتفتش إلى تلك الوسائل التي أوصانا بها الله عزوجل للإصلاح بين الناس. فمنها

١. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا مفتاح عظيم للإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح لا ينفذ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يؤمر الناس بالمعروف ولم ينه عن المنكر لا يكونون من الصالحين المصلحين، بل ينهمكون في سبيل الغي والضلالة لعدمهما. فحثنا الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر في آيات كثيرة كما نرى:

١. "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" ٤١
 ٢. "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" ٤٢
 ٣. "يَا بَنِي آدَمَ اقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" ٤٣
- تدل هذه الآيات الكريمة على أهمية الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالناس إذا اختاروا سبل المعروف بأثر المصلحين فيجتنبون عن المنكر طبعاً، حتى يكونوا من الصالحين والمصلحين والمتقين والفائزين في الدنيا والآخرة.
- فيعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الذرائعة للإصلاح بين الناس.

٢. الدعوة إلى الإصلاح بالحكمة والموعظة الحسنة:

الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ذريعة هامة للإصلاح بين الناس، فإن الناس كانوا قبل الإيمان من المفسدين كما قال تبارك وتعالى: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ" ٤٤

قال الصابوني "أي وإذا قال لهم بعض المؤمنين: لا تسعوا في الأرض بالفساد بإثارة الفتن، والكفر والصدّ عن سبيل الله قال ابن مسعود: الفساد في الأرض هو الكفر، والعمل بالمعصية، فمن عصى الله فقد أفسد في الأرض {إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ} أي ليس شأننا الإفساد أبداً، وإنما نحن أناسٌ مصلحون، نسعى للخير والصالح فلا يصح مخاطبتنا بذلك ألا فانتبهوا أيها الناس، إنهم هم المفسدون حقاً لا غيرهم، ولكن لا يفتنون ولا يخسسون، لانطماس نور الإيمان في قلوبهم." ٤٥

فأمر الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الإيمان بالحكمة والموعظة الحسنة لإصلاح المنافقين والكفار من الإفساد حيث قال الله تبارك وتعالى: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" ٤٦ أي أدع يا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم، واللفظ واللين، بما يؤثر فيهم وينجع، لا بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} أي وجادل المخالفين بالطريقة التي هي أحسن ومن طرق المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين، والرفق واللين {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} أَيِ إِنْ رَبِّكَ يَا مُحَمَّدُ هُوَ الْعَالِمُ بِحَالِ الضَّالِّينَ وَحَالِ الْمُهْتَدِينَ. فعليك أن تسلك الطريق الحكيم في دعوتهم ومناظرتهم، وليس عليك هدايتهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.^{٤٧}
فعلى المصلح أن يكون لينا، ولا يكون غليظا لأن لا ينفر الناس منه كما قال الله تبارك وتعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ"^{٤٨}

٣. القصاص والحدود والعقوبات:

إن الله تبارك وتعالى شرع القصاص والحدود والعقوبات للإصلاح بين الناس، وهذه كلها شرعت لإصلاح العباد رادة للمفسدين. فَمَنْ قَتَلَ بَغِيرَ حَقِّ قَتْلِ، وَلَوْ لَمْ يُقْتَلْ لِقَامَتِ الثَّارَاتِ، وَصَارَ كُلُّ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ سَرَقَ قُطِعَ، وَلَوْ لَمْ يُقَطَّعْ لَصَارَتِ الْبِلَادُ مَنَهَبَةً؛ كُلُّ يَأْخُذُ مَا يَشَاءُ وَيَذَرُ، وَمَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ يُرَوِّعُ عِبَادَ اللَّهِ وَيَقْتُلُهُمْ وَيَأْخُذُ أَمْوَالَهُمْ، أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْحِرَابَةِ بِالتَّقْتِيلِ أَوْ بِالصَّلْبِ، أَوْ بِالتَّقْطِيعِ مِنْ خِلَافٍ، أَوْ بِالنَّفْيِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ قَذَفَ مُحَصَّنًا جُلْدًا، وَشَرَعَ التَّعْزِيرُ لَوْلِي الْأَمْرِ؛ لِيُؤَدَّبَ كُلُّ مَعْتَدٍ بِمَا يَرُدُّهُ عَنِ الْعُودَةِ إِلَى فِعْلَتِهِ، فَيَأْمَنَ النَّاسُ وَيَطْمَئِنُّونَ. قال تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ"^{٤٩} وقال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"^{٥٠}

فإقامة القصاص والحدود والعقوبات تصلح الناس من الإفساد، وتمنعهم من الجرائم في المجتمع، قال ابن عابدين - رحمه الله - "شرعت العقوبة لمصلحة تعود على كافة الناس، من صيانة الأنساب والأموال، والعقول، والأعراض، وزجراً عما يتضرر به العباد من أنواع الفساد."^{٥١}

٤. إجراء القضاء:

القضاء في الإسلام أهم الذرائع للإصلاح بين الناس. وهو "الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة."^{٥٢} لأن القضاء يدفع النزاع بين المتخاصمين، وبه يصلح المجتمع الإنساني من الفتنة والفساد حتى تهب فيه ريح الراحة والسلامة. فاهتم الإسلام

بالقضاء لرد التنازع إصلاحاً بين الناس بالعدل والإنصاف. القضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يصلحون الأمة بالقضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: "وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا"^{٥٣} وقوله تعالى: "يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ"^{٥٤}

فحببنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة والتبليغ وبالحكم والفصل في الخصومات كما أشار إليه قوله تعالى: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ"^{٥٥} وقوله تعالى: "وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ"^{٥٦} وقوله تعالى: "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"^{٥٧} ٤، وقوله تعالى: "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ"^{٥٨}. وقوله تعالى: "وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ"^{٥٩} وأيضاً ثبتت مشروعية القضاء من السنة النبوية صلى الله عليه وسلم ووردت فيه أحاديث كثيرة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اجْتَمَعَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ»^{٦٠} وغير ذلك من الأحاديث الشريفة. وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.^{٦١}

الخاتمة:

فصفوة الكلام أن الإصلاح أمر عظيم في العصر الراهن. فمن أخذ الخطوة للإصلاح في العصر الحديث فهو يعد من المهذبين، لأن كثيراً من الناس فقدوا المروءة والإنسانية، لا إحساس لهم في قلوبهم، كأنهم ماتوا وهم لا يشعرون، إنهم يشغلون كل يوم بالقتل والقتال لسبب حقير، ويقاثلون بعضهم بعضاً، فلا ألفة ولا رافة في فوادهم حتى صار الاجتماع ممزقاً لعدم الأخوة والمروءة. فمست الحاجة إلى الإصلاح بين الناس لإقامة السلامة في المجتمع الإنساني. فعلينا أن نتصف بصفة الإصلاح بين الناس ولو كان هذا الأمر شديداً، فإن الله تبارك وتعالى اهتم به اهتماماً بليغاً، وحث الناس إليه في القرآن العظيم بالآيات الكثيرة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خطوات كثيرة لإصلاح الأمة، فهبت فيهم ريح الطيب والسلامة، ورغب

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

أَمَتُهُ إِلَيْهِ بِالْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ. فَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعُهُمْ كَانُوا مِنَ الْمَصْلُحِينَ الْعِظَامِ وَلَقَبُوا بِالْخَيْرِ قَرْنًا فَرَوَى عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ".^{٦٢}

المراجع والمصادر:

١. سورة الحجرات، آية: ١٠.
٢. سورة آل عمران، آية: ١٠٣.
٣. الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، مكارم الأخلاق، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٩ هـ)، ج ١، ص ١١٠.
٤. المرسى، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط، (بيروت: دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠ م)، ج ٣، ص ١٥٢.
٥. ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب، (بيروت: دار صادر، ١٤١٤ هـ)، ج ٢، ص ٥١٦.
٦. الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، (بيروت: دار القلم، ١٤١٢ هـ)، ج ١، ص ٤٨٩، ٤٩٠.
٧. سورة النساء: ١١.
٨. أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٩٦ م)، ج ٢، ص ٣٤٧.
٩. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، (دمشق: دار الفكر، ١٩٩٣ م)، ص ٢١٥.
١٠. عبد الله إبراهيم جلغوم، المعجم/المفهرس الشامل، (المملكة العربية السعودية: الرياض: ٢٠١٥ م)، ص ٦٩٩-٧٠٣.

١١. سورة آل عمران: ١٩.
١٢. سورة المائدة: ٣.
١٣. سورة هود: ٨٨.
١٤. سورة الأعراف: ١٤٢.
١٥. سورة البقرة: ١٤٣.
١٦. أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٩ م)، ج ٣، ص ٢٦٥.
١٧. سورة الجمعة: الآية، ٢.
١٨. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، المعجم الأوسط (القاهرة: دار الحرمين، ١٤١٥ هـ)، ج ٣، ص ٢٥٠.
١٩. سورة الحجرات: الآيات، ٩، ١٠.
٢٠. محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٧ م)، ج ٣، ص ٢١٧.
٢١. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل (بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٢١ هـ)، ج ٤٥، ص ٥٠٠.
٢٢. محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٥ هـ)، ج ١٣، ص ١٧٨.
٢٣. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (بيروت: دار طوق النجاة، ١٤٢٢ هـ)، ج ٨، ص ٥٣.
٢٤. الملا علي بن محمد القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (بيروت: دار الفكر، ١٤٢٢ هـ)، ج ٨، ص ٣١٥٤.
٢٥. سورة هود: الآية ١٧.
٢٦. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، (الرياض: دار عالم الكتب، ١٤٢٣ هـ)،

أهمية الإصلاح بين الناس في الشريعة الإسلامية: دراسة تحليلية
(ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের তাৎপর্য: একটি বিশ্লেষণ)

২৭. ২৭. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (المرجع السابق)، ج ٩، ص ٦١.
২৮. الملا علي بن محمد القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (المرجع السابق)، ج ٨، ص ٣٣٤٦.
২৯. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، (بيروت: المكتبة العصرية، د.ت)، ج ٤، ص ١٢٢.
৩০. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل (نفس المرجع)، ج ١٧، ص ١٢٧.
৩১. سورة الأنعام: ٤٨.
৩২. سورة الأعراف: ٣٥.
৩৩. سورة النساء: ١٢٩.
৩৪. سورة الإسراء: ٢٥.
৩৫. أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم، (بيروت: دار الجيل، ١٣٣٤هـ)، ج ٨، ص ١١.
৩৬. سورة النساء: ١١٤.
৩৭. الطبري، أبو جعفر، جامع البيان في تأويل القرآن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠م)، ج ٩، ص ٢٠١-٢٠٢.
৩৮. الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج ٩، ص ٢٠٢.
৩৯. سورة الأعراف: ١٧٠.
৪০. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (المرجع السابق)، ج ١، ص ٦.
৪১. سورة آل عمران: ١٠٤.
৪২. سورة آل عمران: ١١٠.
৪৩. سورة لقمان: ١٧.

٤٤. سورة البقرة: ١١، ١٢.
٤٥. محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (القاهرة: دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٩٧ م)، ج ١، ص ٣٠.
٤٦. سورة النحل: ١٢٥.
٤٧. محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، (المرجع السابق)، ج ٢، ص ١٣٧.
٤٨. سورة آل عمران: ١٥٩.
٤٩. سورة المائدة: ٤٥.
٥٠. سورة البقرة: ١٧٩.
٥١. حاشية ابن عابدين، ج ٦، ص ١٢٦.
٥٢. النظام القضائي، موقع الإسلام، <http://www.al-islam.com>
٥٣. سورة الأنبياء: ٧٨-٧٩.
٥٤. سورة ص: ٢٦.
٥٥. سورة المائدة: ٤٨.
٥٦. سورة المائدة: ٤٢.
٥٧. سورة النساء: ٦٥.
٥٨. سورة النساء: ١٠٥.
٥٩. سورة النور: ٤٨.
٦٠. النيسابوري، أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود المجاور بمكة، *المنتقى من السنة المسندة*، (بيروت: مؤسسة الكتاب الثقافية، ١٩٨٨ م)، ص ٢٤٩.
٦١. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين الدمشقي الحنبلي، *المغني*، (القاهرة: مكتبة القاهرة، ١٩٩٦ م)، ج ١٠، ص ٣٢.
٦٢. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه*، (المرجع السابق)، ج ٢، ص ٩٣٨.

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣ هـ/ ١٨٨٩-١٩٧٣ م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. ত্বাহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

ড. হুমায়ুন কবির*

প্রতিপাদ্যসার

ড. ত্বাহা হুসাইন কিংবদন্তী আধুনিক আরবি সাহিত্যের একজন। তিনি আরবি সাহিত্য সমৃদ্ধিকরণে বিশাল অবদান রেখেছেন। তিনি প্রাচ্যবিদ ডুরখেইমের হাতে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর দুটি কিতাব: ‘আশ-শি’রুল জাহেলী’ এবং ‘মুসতাকবিলাহু ছাকাফা’ সাহিত্য জগতে বিশাল স্থান দখল করেছে। ড. ত্বাহা হুসাইনকে বেশ কয়েকটি সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল, যেমন প্যারিসে ষষ্ঠ ভাষাবিদ সম্মেলনে, প্যারিসে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের ২১তম সম্মেলনে, লন্ডনে প্রাচ্যবিদদের এবং আরবের বিভিন্ন সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন। ড. ত্বাহা হুসাইন তাঁর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্যিক, অ্যাকাডেমিক এবং রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে পশ্চিমা উদারনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে সাজিয়ে ছিলেন। তিনি উদার ধারণা এবং মূল্যবোধের পক্ষে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আরব ও ইসলামিক বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তাদের মধ্যে: আহমেদ লুথফি আল-সাইদ, ইসমাইল মাজহার, কাসেম আমিন, ত্বাহা হুসাইন, আবদুল আজিজ ফাহমি, মিশেল আফলাক, আব্দুল সাদেহ, সুকার্নো, সুহার্তো, নেহেরু, মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক, জামাল আবদুন নাসের, আনোয়ার সাদাত অন্যতম। ড. ত্বাহা হুসাইন মিসরে ১৮৮৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯৭৩ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মিসরে আরবি সাহিত্যে সংস্কারের প্রবক্তা। তিনি ১৯১৪ খ্রি. ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। দীর্ঘদিন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর রচনাবলি হলো: যিকরু আবিল আ’লা আল-মা’আররী, ফালসাফাতু ইবনে খালদুন আল ইজতিমাইয়া, আলিহাতুল ইউনান, দুর্সুত তারিখিল কাদীম, নিজামুল ইছনাইন, রুহত তারবিয়াহ, কাসাসুন তামছিলিয়া, ক্বাদাতুল ফিকরি, হাদিছুল আরবি’আ, ফিশ্ শিরিল জাহেলী, আল আইয়াম, নাকদুন নাছর, দু’আউল কারাওয়ান, আদিবুন, মাআল মুতানাবি, মুছতাকবিলাহু ছাকাফা ফি মিসর, ছাওতু বারিস, জাল্লাতুল হায়াওয়ান, আল ওয়াদুল হক অন্যতম।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

التقديم

طه حسين هو عميد الأدب العربي الذي ما زالت مؤلفاته تساهم حقل اتساع الأدب العربي، وهو أحد أبرز بلغاء عصره وعلم الخبراء في صناعة الفصاحة والبيان وهو المؤسس الحقيقي للخطاب الحدائي العربي وواضع منطلقاته الفكرية؛ نظرا لرؤيته الشمولية لقضايا التحديث في العالم العربي، ولروحته العلمية الناقدة وقدرته على التحاور، واعتداده بالذهنية في المنهج العلمي.

وكان د. طه حسين من أبرز دعاة التغريب في العالم الإسلامي حيث تلقى علومه على يد المستشرق دوركايم وقد نشر آرائه في كتابيه "الشعر الجاهلي ومستقبل الثقافة في مصر". وقد اختير الدكتور طه حسين لتمثيل المجمع في عدة مؤتمرات مثل مؤتمر اللغويين السادس بباريس، والمؤتمر الحادي والعشرين للمستشرقين الذي عقد بباريس أيضا، والمستشرقين في لندن، وأدار الإدارة العامة للثقافة العربية في الجامعة العربية، وحضر ورأس مهرجانات ومؤتمرات أدبية في أقطار عديدة، سخر طه حسين كل جهوده الفكرية والأدبية والأكاديمية والسياسية، لخدمة الفكر الليبرالي الغربي الذي آمن به، ووقف حياته للدعوة للمفاهيم والقيم الليبرالية، وانخرط طويلا في معركة "القديم والجديد". وأشهر دعاة العلمانية في العالم العربي والإسلامي: أحمد لطفي السيد، إسماعيل مظهر، قاسم أمين، طه حسين، عبد العزيز فهمي، ميشيل عفلق، أنطون سعادة، سوكارنو، سوهارتو، نهرو، مصطفى كمال أتاتورك، جمال عبد الناصر، أنور السادات صاحب شعار "لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين"، د. فؤاد زكريا. د. فرج فودة وقد اغتيل بالقاهرة مؤخرا، وغيرهم.

تعارفه

هو الدكتور طه بن حسين بن علي بن سلامة ويعد من كبار المحاضرين وعميد الأدب العربي وأحدث ضجة في عالم الأدب العربي وهو في الواقع عميل الفكر الغربي، ولد سنة ١٣٠٧هـ، وتوفي سنة ١٣٩٣هـ^١

ولادته:

وُلد طه حسين سنة ١٣٠٧هـ/١٨٨٩م لأب مصري من قرية في صعيد مصر على مقربة من مدينة مغاغة الواقعة على الجانب الأيسر للنيل في قرية (الكيلو) بمغاغة من محافظة المنيا (بالصعيد المصري). وكان أبوه موظفا صغيرا في شركة زراعية من شركات السكر، وأنجب أبناء كثيرين، كان طه

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣ هـ / ١٨٨٩-١٩٧٣ م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

سابعهم، وفقد بصره في الثالثة من عمره؛ ولكنه عُوِّضَ عن بصره ذكاءً حادًا وذاكرة قوية. وحدّد
فقدته لبصره الطريق الذي يختاره في حياته، وهو طريق التعليم^٢.

زوجة طه حسين الفرنسية

تزوج طه حسين بامرأة اسمها سوزان وكانت "زميلته" في جامعة مونبيلييه أثناء بعثته إلى فرنسا. وقد
ذكر إعجابه بها وبصوتها العذب في الجزء الثالث من ذكرياته "الأيام"، التي كانت تقرأ عليه كتباً من
عيون الأدب الفرنسي والتاريخ الروماني واليوناني. واقترن بها يوم ١٩ أغسطس ١٩١٩ م. وأنجبت له
أمنية ومؤنس. وقد توفيت أمينة قبل أمها بأشهر قليلة. ومؤنس اعتنق النصرانية وأعلنها في إحدى
الكنائس بفرنسا^٣.

حياته العلمية:

وبدأ حياته في الأزهر (١٩٠٢-٠٨) ثم بالجامعة المصرية القديمة وهو أول من نال شهادة "الدكتوراه"
منها (١٩١٤) بكتاب "ذكرى أبي العلاء" وسافر في بعثة إلى باريس فخرج بالسوربون سنة ١٩١٨ م وعاد
إلى مصر^٤.

حياته العملية:

ومن المعلوم أن أبا طه حسين جاء إلى صعيد مصر مدير المنيا من بلد غير معلوم من المغرب، وكان
يعمل وژانا في شركة يهودية للسكر، وطه حسين هو الذي تبنى إصدار قرار بتعيين الحاخام اليهودي
(حاييم ناحوم أفندي) حينذاك عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة ليكون عيناً على المفكرين
ورجال اللغة، كما أنه عين عدداً من الأساتذة الأجانب في كلية الآداب استوردهم وبعضهم يهود وكلهم
كانوا يحاربون الإسلام أو يشككون فيه، وأول دكتوراه منحتها (كلية الآداب) في جامعة القاهرة تحت
إشراف الدكتور طه حسين كانت بعنوان (القبائل اليهودية في البلاد العربية) تقدم بها (إسرائيل
ولفنسون) عميد جامعة هاداسا في تل أبيب الآن^٥.
وعين محاضراً في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم كان عميداً لتلك الكلية فوزيراً للمعارف. وفي هذه
البرهة تمكن من جعل التعليم الثانوي والفني مجاناً. وكان من أعضاء المجمع العلمي العربيّ المراسلين
بدمشق ثم رئيساً لمجمع اللغة بمصر^٦.

ودخل الأزهر عام ١٩٠٢م ويحفظ ويتابع دروس شيوخه بوعي وفهم. ووحدته وعماه جعلته ينزع في تفكيره منزع التطرف والعنف وهذا ما جعله يصطدم بأساتذته الواحد بعد الآخر. وقد كان تفتح ذهنه واتسعت آفاق تفكيره حين بدأ يحضر دروس الأدب على يد سيد علي المرصفي، والأستاذ ينحو في دروسه منحنى اللغويين والنقاد مع ميل للتفقه والتحليل ويعنى بمفردات اللغة وإظهار ما في البيت من بيان وبديع ومعان. وأرضت هذه الدروس نفس طه وتعلق بها وحفظ ما كان يعرض له من ديوان الحماسة وغيره.

ونمت فيه الكفايات ومكنته من القدرة على التمييز والتحليل، وبدأت ذاتيته وقابلياته تنضج نضجا مبكرا وسريعا، يتناسب مع حدة ذكائه وقوة مداركه. وظهرت في هذه الفترة في أقواله وتقريراته، ملكة النقد وكانت مجلبة لإتعا به مع رفاقه ومع مدرسيه. وكره طه بعد المرحلة الثانية من دراسته الأزهرية دروس الأزهر واجتوى حلقات الشيوخ ما عدا درس الأدب.

وحضر درسين إثنين للإمام محمد عبده فاستهواه حديثه ورغب أن يلازمه لكن الشيخ لم يعد لحلقته وإنما نقل إلى الإفتاء. وكان عام ١٩٠٨م عاما فاصلا بينه وبين حياة الأزهر وشيوخ الأزهر، في هذا العام فتحت الجامعة المصرية الأهلية فانتفى إليها وقضى فيها سنوات ثلاثا يختلف إليها وإلى الأزهر. وقد وجد في دروس الجامعة اختلافا كثيرا ووجد حرية البحث، فشغف بهذه الدروس حبا وتفتحت لها نفسه، وكان أثر ذلك عميقا فيها كما كون في نفسه نزعة التطرف والنقد وهو على استعداد لهذه الخصلة.

ووجد في الجامعة مبتغاه، وفي ظل البحث التحليلي أخرج رسالته عن أبي العلاء المعري "تجديد ذكرى أبي العلاء" التي نال بها درجة الدكتوراه بتفوق. فلما وزعت مطبوعة ثارت حولها ضجة ورمي بالإلحاد وقدم أحد النواب إلى الجمعية العامة استجوابا أثار به موضوع رسالة طه حسين وطالب بفصله ونزع الشهادة عنه ولولا تداركه رئيس المجلس (سعد زغلول) لتغير مجرى حياته.

وفي ٥ مارس ١٩١٤م سافر على نفقة الجامعة إلى فرنسا ليكمل دراسته فكان ذلك حدثا لم يتيسر لغيره من أمثاله.

وفي "مونبيليه التي يدرس فيها الأدب الفرنسي واللغة اللاتينية تعرف على "سوزان" التي كان لها الأثر الأكبر في وجهته القادمة.

واجتاز امتحان الليسانس عام ١٩١٧م وفي هذا العام تم زواجه بها. وفي هذا العام كان طه يستعد للدكتوراه برسالة عن "ابن خلدون" وفلسفته الاجتماعية.

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

وفي سنة ١٩١٩م قفل إلى مصر وتم تعيينه أستاذا للتأريخ القديم.
وفي عام ١٩٢٥م ألحقت الجامعة بالحكومة فتم تعيين طه حسين أستاذا دائما للأدب العربي بكلية الآداب. وفي أثناء دروسه للتأريخ القديم كان يكتب في "السياسة" حديث الأربعاء على نمط حديث الاثنين الذي كان يكتبه "سان بيغ". وأثارت هذه الأحاديث نقدا وهجوما من المؤرخين والكتاب لتشويهه فيها تاريخ المسلمين. وفي هذه الفترة كان طه حسين جم النشاط يكتب ويحاضر وينشر ويؤلف حتى فاضت شهرته وغطت سمعة الآخرين. وأخرج محاضراته في الظاهرة الدينية عند اليونان في كتاب عام ١٩١٩م يحمل اسم "آلهة اليونان".
وفي عام ١٩٢٠م أخرج "صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان".
وفي عام ١٩٢١م أصدرت له مطبعة الجريدة ترجمة لكتاب (الواجب) بالاشتراك مع محمد رمضان.
وفي عام ١٩٢١م أيضا ترجم كتاب "نظام الاثنين" لارسطو.
وفي عام ١٩٢٢م أعيد طبع كتاب "ذكرى أبي العلاء" بعد أن نفذت طبعته الأولى.
وفي عام ١٩٢٣م نقل (روح التربية) عن غوستاف لوبون ونشرته الهلال لمشتركيها.
وفي عام ١٩٢٤م كتب سلامة موسى مقالا في الهلال رفع فيه طه حسين إلى زعامة الأدب الحديث.
وفي عام ١٩٢٤م نشر طه كتابه "قصص تمثيلية" من الفرنسية.
وفي عام ١٩٢٥م أخرج الجزء الأول من كتابه (حديث الأربعاء).
وفي ١٩٢٥م نشر كتابا باسم "قادة الفكر".
وفي ١٩٢٦م نشر كتابه "حديث الأربعاء" الجزء الثاني.
وفي ١٩٢٦م نشر كتابه "الشعر الجاهلي" فأثار ظهوره ثورة عاصفة كادت تعصف بطه وكرسيه وأدبه، وانبرت أقلام الأدباء والمؤرخين وعلماء المسلمين يردون عليه بأعنف ما عرف النثر الأدبي من النقد والهجاء، وأخرجت المطابع كتباً عديدة في الرد عليه وريحت المكتبة العربية كتباً غاية في الجودة والنقد وأدب الحوار.
وأحيل طه حسين سنة ١٩٢٦م إلى النيابة وحققت معه وانتهت من قرارها سنة ١٩٢٧م. وكان قرارها فيه تفنيد لمزائق متطرفة ارتكبتها طه حسين في كتابه. وتفنيد آراء أخذها من المستشرقين أمثال رينان ومرغليوث وغيرهما، وصور كتابه وجمع من الأسواق.
وفي سنة ١٩٢٨م عين الدكتور طه عميدا لكلية الآداب فأثار هذا التعيين أزمة حادة للجامعة وللدكتور طه، فقد كان علي الشمسي وزيرا للمعارف وكان وفديا يحقد على طه فتدخل للحيلولة دون

هذا التعيين ويريد أن ينتقم للوفد الذي لم ينس زعماءه مقالات طه حسين ويعلمون صلته بالأحرار الدستوريين، وأصر الوزير إلا أن يستقيل وأصر الدكتور طه إلا المباشرة في العمادة، وقبل أن يستقيل بشرط واحد هو أن يعين ويأشر وظيفته ولو ليوم واحد ويوقع بعض الأوراق ثم يقدم استقالته، وبذلك حسم النزاع واستمر أستاذا للأدب العربي.

وفي سنة ١٩٣٠ م انتهت مدة "ميشو" الفرنسي عميدا فاخترت الكلية الدكتور طه حسين عميدا، ووافق وزير المعارف "مراد سيد أحمد" وبعد حين طلب منه أن يستقيل ليصبح رئيسا لتحرير جريدة الشعب لسان حال حزب صدقي باشا فرفض الطلب وأثر البقاء في الجامعة وألحت عليه الجهات الرسمية على قبول رئاسة تحرير الجريدة فأصر على الرفض، وهذا ما جعل صدقي يضمير في نفسه الانتقام من الدكتور طه.

وابتداء من ٢٩ مارس ١٩٣٢ م لزم الدكتور بيته وشرع يكتب في جريدة السياسة ويتولى رئاسة تحريرها حين يكون الدكتور هيكل غائبا عن القاهرة، وكان ائتلاف بين الأحرار والوفد فطلب من الدكتور طه أن يكتب في جريدة (كوكب الشرق) التي كان يصدرها حافظ عوض. واستقال من كوكب الشرق واشترى امتياز جريدة الوادي وتولى الإشراف على التحرير واستمر إلى تشرين الثاني ١٩٣٤ م يدير الوادي.

وأعيد في وزارة نسيم إلى الجامعة سنة ١٩٣٤ م وعين أستاذا في كلية الآداب وفي مارس من سنة ١٩٣٦ م اختير عميدا للكلية واستمر في العمادة حتى مارس ١٩٣٩ م وأعيد انتخابه للعمادة لكن حكومة محمد محمود لم ترض إعادته عميدا فاستقال من العمادة وبقي أستاذا في الكلية للأدب.

وفي كانون الأول من عام ١٩٣٩ م عين مراقبا للثقافة في وزارة المعارف واستمر بعمله الرسمي إلى شباط ١٩٤٢ م مع بقاءه يلقي محاضراته في كلية الآداب.

وعاد الوفد سنة ١٩٤٢ م إلى الحكم فاختره نجيب الهلالي وزير المعارف مستشارا فنيا بوزارة المعارف ثم انتدب مديرا لجامعة الإسكندرية واستمر في هذين المنصبين إلى تشرين ١٩٤٤ م.

وفي ١٦ تشرين الأول سنة ١٩٤٤ م أحيل إلى التقاعد واستمر خارج المناصب الحكومية، وفي ١٣ كانون الثاني ١٩٥٠ م عين وزيرا للمعارف في الوزارة الوفدية.

ومن سنة ١٩٥٢ م انصرف إلى الإنتاج الفكري وإلى النشاط في المجالس العلمية واللغوية، فهو عضو في مجمع اللغة في القاهرة، والمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، والمجمع المصري في دمشق، والمجمع العلمي العراقي، وعضو مراسل لعدة مجامع علمية في الخارج.

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣ هـ / ١٨٨٩-١٩٧٣ م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية

(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة مدريد وجامعة كمبردج، ونال وسام الباشوية ووسام الليجون دونير مو طبقة كرانند أوفيسية، ونال الدكتوراه الفخرية من جامعات ليون، ومونبيليه، ومدريد، وأكسفورد، وانتخب رئيساً للمجمع اللغوي بعد وفاة أحمد لطفي السيد سنة ١٩٦٣ م.^٧

صفاته:

هو صاحب التجديد في الأدب العربي في مصر، وحركته تقوم على الانطلاق في التفكير الحر الرزين جرياً وراء الحقائق، وكان بلا منازع عميداً، المستشرقين والمبشرين في العالم العربي والإسلامي.^٨ وكان يحب الرباط وقد كان الرباط وثيقاً جداً بين (طه حسين) و(لطفي السيد) وآية ذلك:

* أول رسالة علمية في الجامعة منحت لطله حسين.

* وحينما تحولت الجامعة الأهلية إلى حكومية اشترط لطفي السيد أن يكون طه حسين أستاذاً فيها.

* وحينما أقيل طه حسين لعدوانه على الإسلام استقال لطفي السيد من الجامعة تضامناً معه.^٩

وكافح المحافظين في الدين والأدب والسياسة، وكافح من أجل تغذية أمتة بالمثل الأدبية عند اليونان وعند الغربيين، ويختط طرقاً جديدة في أبحاثه الأدبية وفي عالم القصة، يسعفه في ذلك استعداد أدبي أصيل، وهو استعداد شهد له به عالمه العربي، فمنح في سنة ١٩٥٩ م جائزة الدولة التقديرية في الآداب تنويهاً بجهوده الأدبية، كما شهد له به العالم الغربي فمنح درجة الدكتوراه الفخرية من جامعات أوربية مختلفة. ونقف وقفة قصيرة عند قصته الأولى "الأيام"^{١٠}

حصول الجوائز:

وحاز طه حسين مناصب وجوائز شتى، منها تمثيلية مصر في مؤتمر الحضارة المسيحية الإسلامية في مدينة فلورنسا بإيطاليا عام ١٩٦٠ م، وانتخابه عضواً في المجلس الهندي المصري الثقافي، والإشراف على معهد الدراسات العربية العليا، واختياره عضواً محكماً في الهيئة الأدبية الطليانية والسويسرية؛ وهي هيئة عالمية على غرار الهيئة السويدية التي تمنح جائزة بوزان. ولقد رشحته الحكومة المصرية لنيل جائزة نوبل، وفي عام ١٩٦٤ م منحته جامعة الجزائر الدكتوراه الفخرية، ومثلها فعلت جامعة بالرمو بصقلية الإيطالية، عام ١٩٦٥ م. وفي السنة نفسها ظفر طه حسين بقلادة النيل، إضافة إلى رئاسة مجمع اللغة العربية، وفي عام ١٩٦٨ م منحته جامعة مدريد شهادة الدكتوراه الفخرية، وفي عام ١٩٧١ م رأس مجلس اتحاد المجامع اللغوية في العالم العربي، ورشح من جديد لنيل جائزة نوبل،

وأقامت منظمة اليونسكو الدولية في اورغواي حفلا تكريميا أدبيا قل نظيره. وشغل طه حسين أيضا منصب وزير التربية والتعليم في مصر.^{١١}

بعض أساتذته:

حصل طه حسين على دراسة العلوم الدينية واللغوية بالأزهر، وكان الشيخ سيد المرصفي يدرس الأدب، فأعجب به، ولزم دروسه التي كان يقرأ فيها الكامل للمبرّد والأُمالي لأبي علي القالي وحماسة أبي تمام. ولم يلبث أن أخذ يضطرب في محيط الحركات الإصلاحية التي كان ينادي بها تلاميذ محمد عبده، من مثل قاسم أمين الذي كان يدعو إلى حرية المرأة، ولطفي السيد الذي أخذ يدعو في "الجريدة" إلى مقاييس جديدة في السياسة والأخلاق والاجتماع. وسرعان ما تحول إلى هذا المعلم يستضيء به في حياته العقلية، فاختلف إلى صحيفته، مستمعا لأفكاره تارة، وكتابا بإرشاده وعلى هديه تارة أخرى. وفتحت الجامعة الأهلية أبوابها للطلاب سنة ١٩٠٨م فانتظم فيها، وسمع إلى مَنْ كانوا يحاضرون بها من المصريين أمثال: الشيخ المهدي ومحمد الخضري وحفي ناصف، ومن المستشرقين أمثال: نالينو وجويدي. وسرعان ما انكشف له آفاق جديدة في بحث الأدب ودراسته؛ بفضل المناهج العلمية في النقد التي استمع إليها من الأساتذة الأوربيين. واتجه تَوًّا إلى تعلم الفرنسية في مدارس ليلية وعلى أيدي بعض المعلمين؛ حتى يفهم المحاضرات التي كانت تُلقَى بهذه اللغة. ولا نصل إلى سنة ١٩١٤م حتى نجده يتقدم إلى درجة الدكتوراه برسالة عن أبي العلاء، ويظفر بالدرجة التي يبتغيها بين الإعجاب والثناء.^{١٢}

دعوة طه حسين وحضارة البحر المتوسط:

دعا الدكتور طه حسين إلى الإقليمية المصرية مع إعلانه الدعوة إلى الفرعونية وإنكار رابطتها العربية والإسلامية، والادعاء بأن لها رابطة بالغرب ودول البحر المتوسط وأن العقل العربي هو عقل يوناني استمد ثقافته من الفلسفة اليونانية في القديم، وهو عقل غربي في الحديث استمد ثقافته من أوروبا. وقد كان هدف طه حسين من هذه الدعوى عزل مصر عن العرب والعالم الإسلامي وإدخالها في الحلف اللاتيني الذي أنشأته إيطاليا وفرنسا وأسبانيا بوصفها دول البحر الأبيض المتوسط، وكانت فرنسا هي التي تقود هذه الدعوة، والنظرية تقوم على أساس أن مصر قطعة من أوروبا، كما أعلن ذلك الخديو إسماعيل وأنها جزء من حوض البحر المتوسط.^{١٣}

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

وفاته:

توفي طه حسين يوم الأحد ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣م=١٣٩٣هـ عن عمر ناهز ٨٤ عاما.^{١٤}

مساهمته في الأدب العربي:

طه حسين ساهم في حياتنا الثقافية والتعليمية، ووضع لها برنامجا مفصلا في كتابه "مستقبل الثقافة" الذي أصدره في سنة ١٩٣٩م وهو يقع في جزأين. وكان قد ترك الجامعة ليعمل في وزارة التربية والتعليم. وعُين مستشارا فنياً لهذه الوزارة، ثم عين مديرا لجامعة الإسكندرية سنة ١٩٤٢م فأتم إنشاءها.

وفي أثناء ذلك يقبل على الدرس والكتابة، فنراه بعد أن أعاد كتابه القديم عن أبي العلاء باسم "تجديد ذكرى أبي العلاء" ينشر عنه بحثا جديدا باسم "مع أبي العلاء في سجنه"، يصور فيه جوانب نفسية وفلسفية دقيقة لهذا العقل الكبير، وأفرد بعد ذلك بكتيب سماه "صوت أبي العلاء" نثر فيه بعض أشعاره. واتجه إلى القصة، فنشر "أحلام شهرزاد" و"شجرة البؤس" و"دعاء الكروان"، وهو فيها جميعا يعبر عن مثله القومية والإنسانية.^{١٥}

مؤلفاته في الأدب العربي:

وله تصانيف كثيرة في الأدب العربي، وهي فيما يلي:

١- ذكرى أبي العلاء المعري:

وهو أول كتاب صدر له نال به رسالة الدكتوراه سنة ١٩١٤م وقد طبع لأول مرة بمطبعة الواعظ سنة ١٣٣٤هـ-١٩١٥م في ٤١٠ صفحة. وطبع ثانية بمطبعة المعاهد بمصر سنة ١٩٢٢م في ٣٨٤ صفحة من غير حذف أو تغيير. وطبع الثالثة بعنوان تجديد ذكرى أبي العلاء في دار المعارف سنة ١٩٣٧م في ٣١١ صفحة. وطبع طبعة رابعة سنة ١٩٥٠ ثم طبعة خامسة في دار المعارف سنة ١٩٥٨م.

٢- فلسفة ابن خلدون الاجتماعية:

وهو رسالة الدكتوراه التي قدمها إلى السوربون سنة ١٩١٧م ونال بها إجازة الدكتوراه من جامعة باريس وترجمها عبد الله عنان بعنوان (فلسفة ابن خلدون الاجتماعية) طبعت بمطبعة الاعتماد لأول مرة سنة ١٣٤٣هـ-١٩٢٥م.

٣- آلهة اليونان:

الظاهرة الدينية عند اليونان وأثرها في المدنية طبع في مطبعة المنار سنة ١٩١٩ م، في ٩٦ صفحة.

٤- دروس التاريخ القديم:

وهي الدروس التي كان يلقيها في الجامعة المصرية بين عام ١٩١٩ م وعام ١٩٢٤ م شملت اليونان والرومان نشر بعضها في مجلة الجامعة.

٥- صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، مطبعة الهلال بمصر سنة ١٩٢٠ م.

٦- الواجب ترجمه عن الفرنسية لمؤلفه جول سيمون وطبع في مطبعة الجريدة سنة ١٩٢١ م في أربعة أجزاء.

٧- نظام الاثنين تأليف أرسطو طاليس ترجمه عن اليونانية وطبع بمطبعة الهلال وأعيد طبعه في دار المعارف في ١٩٢٢ صفحة.

٨- روح التربية تأليف جوستاف لوبون عن الفرنسية طبع بمطبعة الهلال في ١٦٣ صفحة.

٩- قصص تمثيلية لجماعة من أشهر الكتاب الفرنسيين طبع في المطبعة التجارية سنة ١٩٢٤ م.

١٠- قادة الفكر طبع سنة ١٩٢٥ بمطبعة الهلال بـ ١٣٥ صفحة. وأعيد طبعه بمطبعة المعارف سنة ١٩٢٩ م ثم أعيد مرات عديدة كان آخرها سنة ١٩٥٩ م.

١١- حديث الأربعاء، سلسلة مقالات نشرها في السياسة وطبع منها المجلد الأول في المكتبة التجارية بالقاهرة سنة ١٩٢٥ م وطبع الجزء الثاني بمطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٦ م، وطبع الجزءان الثانية بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ١٩٣٧ م وطبع هذان الجزءان في دار المعارف ١٩٥٩ م وطبع الجزء الثالث في دار المعارف سنة ١٩٥٧ م الأول بـ ٤١٢ ص، والثاني بـ ٣٤٧ ص، والثالث بـ ٢٣٠ صفحة.

١٢- في الشعر الجاهلي طبع بمطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٢٦ م ثم سحب الكتاب من الأسواق.

١٣- في الأدب الجاهلي وهو كتاب (في الشعر الجاهلي) بعد أن حذف منه فصل وأضيفت إليه فصول، طبع لأول مرة بمطبعة الاعتماد بالقاهرة سنة ١٩٢٧ بـ ٣٧٥ ص، وطبع ثانية في دار المعارف سنة ١٩٥٨ بـ ٣٣٣ ص.

١٤- في الصيف نشره سنة ١٩٢٨ م ولم يظهر في كتاب إلا سنة ١٩٣٣ م وطبع في بيروت للمرة الثانية مع رحلة الربيع والصيف بدار العلم للملايين سنة ١٩٥٧ م.

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

- ١٥- الأيام، الجزء الأول نشر أولا في الهلال المجلد ٣٥ ج ٢ ص ١٦١-١٦٨ وتوالى نشره من سنة ١٩٢٦-١٩٢٧م ثم جمع بكتاب وطبع بمطبعة أمين عبد الرحمن في سنة ١٩٢٩م وأعيد طبعه سنة ١٩٤٢م ثم في سنة ١٩٤٩م. ثم في سنة ١٩٥٨م
- ١٦- حافظ وشوقي طبع بمطبعة الاعتماد ب١٢١ ص وذلك سنة ١٩٣٣م.
- ١٧- على هامش السيرة الجزء الأول المطبعة الرحمانية وقد أعيد مرارا سنة ١٩٣٥م، ١٩٥٣م.
- ١٨- نقد النثر لقدامة بن جعفر حققه بالاشتراك مع عبد الحميد العبادي، دار الكتب.
- ١٩- دعاء الكروان، وقد أعيد طبعه مرارا منها طبعة دار المعارف سنة ١٩٥٩ ب ١٦٠ صفحة.
- ٢٠- من بعيد طبع بمطبعة الرحمانية ب٣١١ ص. وأعادت طبعه الشركة العربية للطباعة والنشر سنة ١٩٥٨ ب ٣٠٥ صفحة.
- ٢١- أديب، طبع بمطبعة الاعتماد سنة ١٩٣٥ ب ٢٥١ ص، وأعيد طبعه سنة ١٩٤٤م، وطبع ثالثة سنة ١٩٥٣م بمطابع جريدة المصري من مجموع كتب للجميع.
- ٢٢- الحياة الأدبية في جريدة العرب مكتب النشر وأعيد طبعه في كتاب "ألوان" سنة ١٩٥٨م.
- ٢٣- مع أبي العلاء في سجنه مطبعة المعارف ب ٢٤٥ ص وطبع مرة أخرى سنة ١٩٥٦م ب ٣٣٦ ص.
- ٢٤- أندروماك لراسين، المطبعة الأميرية ببولاق.
- ٢٥- من حديث الشعر والنثر، مطبعة الصاوي القاهرة ب ٣١٢ ص، وطبع ثانية سنة ١٩٤٨م وثالثة بدار المعارف سنة ١٩٥٧م ب ١٨٤ ص.
- ٢٦- القصر المسحور بالاشتراك مع توفيق الحكيم، طبع بدار النشر الحديث سنة ١٩٣٧م.
- ٢٧- مع المتنبي ظهر في شباط سنة ١٩٣٧م في جزأين ب ٧١٦ صفحة ضمن مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر وأعادت طبعه دار المعارف سنة ١٩٥٧م بمجلد واحد وأعيد طبعه سنة ١٩٦٠م.
- ٢٨- الحب الضائع نشرته مجلة الراديو (مسلسلة)، عام ١٩٣٧-١٩٣٨ ثم نشر في العدد ١٠٠ من سلسلة "اقرأ" التي تصدرها دار المعارف شهريا ١٩٥١م.
- ٢٩- مستقبل الثقافة في مصر جزءان طبعا بمطبعة المعارف سنة ١٩٣٨ وأعيد طبعه سنة ١٩٤٤م.
- ٣٠- من الأدب التمثيلي اليوناني، لجنة التأليف والترجمة والنشر. وأعيد في دار المعارف.
- ٣١- الأيام، الجزء الثاني طبع سنة ١٩٣٩م ثم أعيد طبعه بدار المعارف سنة ١٩٥٦م.
- ٣٢- لحظات، في جزئين طبعته دار المعارف سنة ١٩٤٢م.

- ٣٣- على هامش السيرة، الجزء الثاني طبعته دار المعارف سنة ١٩٤٢ وأعيد طبعه في دار المعارف سنة ١٩٥٣ م.
- ٣٤- على هامش السيرة، الجزء الثالث، طبعته دار المعارف سنة ١٩٤٣ وأعادت طبعه ١٩٥٥ م، وسنة ١٩٥٨ وسنة ١٩٦١ م.
- ٣٥- صوت باريس، مجموعة قصصية تمثيلية، طبعته دار المعارف ١٩٤٣ وأعيد طبعه سنة ١٩٥٦ ضمن كتب للجميع.
- ٣٦- أحلام شهرزاد، العدد الأول من سلسلة اقرأ طبعته دار المعارف، سنة ١٩٤٣.
- ٣٧- شجرة البؤس، طبعته دار المعارف وصدر عن نادي القصة ثانياً سنة ١٩٥٣ ضمن سلسلة الكتاب الذهبي وطبع عن دار المعارف سنة ١٩٥٨ م.
- ٣٨- جنة الشوك عن دار المعارف سنة ١٩٤٥ م.
- ٣٩- فصول في الأدب والنقد. أصدرته دار المعارف سنة ١٩٤٥ م.
- ٤٠- صوت أبي العلاء، العدد ٢٣ من سلسلة اقرأ عن دار المعارف سنة ١٩٤٥ م.
- ٤١- زاديح أو القدر مترجم من فولتير، صدر عن مطبعة الكاتب المصري وأعيد طبعه سنة ١٩٦٠ م، من دار العلم للملايين، بيروت.
- ٤٢- أندرية جيد: من أبطال الأساطير اليونانية أوديب أسبوس، صدرته مطبعة الكاتب المصري.
- ٤٣- المعذبون في الأرض، نشرته مجلة الكاتب المصري سنة ١٩٤٨، ثم طبع في صيدا سنة ١٩٤٩ وطبع في سلسلة اقرأ وطبعته الشركة العربية سنة ١٩٥٨.
- ٤٤- مرآة الضمير الحديث، قامت بطبعه دار الملايين ١٩٤٩، وطبع بعنوان نفوس للبيع ضمن مجموعة كتب للجميع سنة ١٩٥٣ م.
- ٤٥- الوعد الحق: طبع في دار المعارف في العدد ٨٦ من سلسلة اقرأ وطبع سنة ١٩٥٤ و١٩٥٩ و١٩٦٠ م.
- ٤٦- جنة الحيوان: طبع بمطابع جريدة المصري سنة ١٩٥٠ م.
- ٤٧- رحلة الربيع، العدد ٦٩ من سلسلة اقرأ طبع دار المعارف سنة ١٩٤٨، ثم أعيد نشرها مع رحلة الصيف طبعتهما دار العلم للملايين بيروت ١٩٥٧.
- ٤٨- ألوان: نشرته دار العلم للملايين بيروت سنة ١٩٥٢. ثم أعادت طبعه مجدداً سنة ١٩٥٨.
- ٤٩- عليّ وبنوه: الجزء الثاني دار المعارف وطبع مرة ثانية ١٩٦١ م.
- ٥٠- بين بين: نشرته دار العلم للملايين سنة ١٩٥٢ م.

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

- ٥١- شرح لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء بالاشتراك مع إبراهيم الأبياري العدد ١٣ من ذخائر العرب.
- ٥٢- من هناك، مطبعة روز اليوسف من سلسلة الكتاب الذهبي، ١٩٥٥، وضم صوت باريس.
- ٥٣- خصام ونقد نشرته مطابع دار العلم للملايين، بيروت، سنة ١٩٥٥م.
- ٥٤- نقد وإصلاح: نشرته مطابع دار العلم للملايين، بيروت، سنة ١٩٥٦ وطبع ثانية سنة ١٩٦٠.
- ٥٥- رحلة الربيع والصيف دار الملايين أخرجته سنة ١٩٥٧ ويضم رحلة الربيع وفي الصيف.
- ٥٦- مرآة الإسلام، مطبعة المعارف بمصر سنة ١٩٥٩ ب ٣١١ ص.
- ٥٧- من لغو الصيف، نشرته دار العلم للملايين، بيروت ١٩٥٩م.
- ٥٨- من أدب التمثيل الغربي، نشرته دار العلم للملايين سنة ١٩٥٩م.
- ٥٩- أحاديث نشرته دار العلم للملايين سنة ١٩٥٩م.
- ٦٠- الشيخان أبو بكر وعمر نشرته دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٠م.
- ٦١- المذكرات، دار الآداب بيروت شباط ١٩٦٧م.
- ٦٢- الجزء الأول من الفتنة الكبرى (عثمان)، دار المعارف وكان الجزء الثاني من الفتنة قد صدر بعنوان علي وبنوه سنة ١٩٥٢م.
- ٦٣- كلمات: في الأدب والنقد أصدرته دار العلم للملايين سنة ١٩٦٧م.
- ٦٤- خواطر: في الأدب والنقد أصدرته دار العلم للملايين سنة ١٩٦٧م.^{١٦}

ترجمة كتبه:

ترجمت "الأيام" إلى الإنكليزية والفرنسية والعبرية والصينية والروسية والفارسية والإيطالية والألمانية والمجرية، وقد ترجم الأيام الجزء الثاني إلى الإنكليزية والفرنسية وترجمه كراتشكوفسكي إلى الروسية وظهرت ترجمته سنة ١٩٦٠م.

ودعاء الكروان نقل إلى الفرنسية. ومستقبل الثقافة إلى الفرنسية. والوعد الحق إلى الفارسية. وعلي وبنوه إلى الفارسية والأوردية.^{١٧}

مقالات طه حسين:

وللدكتور طه حسين مقالات سياسية وأدبية ونقدية واجتماعية، وله مقدمات لكتب عديدة كان يكتبها لأصدقائه وطلابه لو جمعت لأربت على عشرات الكتب.^{١٨}

أعماله الجمعية:

أما أعماله الجمعية: فقد ساهم في لجانه الكثيرة ومنها:

- ١- لجنة المعجم الكبير وقد اختير مشرفا عليها منذ إنشائها.
- ٢- لجنة اللهجات.
- ٣- لجنة الأدب.
- ٤- لجنة الأصول.
- ٥- لجنة التاريخ والجغرافيا.
- ٦- لجنة الألفاظ والأساليب.
- ٧- لجنة نشر التراث القديم.^{١٩}

وألقى في المجمع بحوثا وكلمات منها:

- ١- كلمة في استقبال الدكتور عبد الحميد بدوي ونشر في المجلة، الجزء السادس ص ٢١٨.
- ٢- بحث (فن من الشعر يتطور بأعين الناس)، المجلة، الجزء السابع ص ٢٤.
- ٣- كتاب الرد على النحاة، لابن مضاء، بحث عنه، نشر في المجلة، الجزء السابع ص ٧٦.
- ٤- كلمة في استقبال الأستاذ محمود تيمور، سنة ١٩٥٠ م، الجزء الثامن ص ٤٣.
- ٥- كلمة في استقبال الأستاذ محمد توفيق دياب، المجلة، الجزء العاشر ص ١٥١.
- ٦- كلمة في استقبال الأستاذ توفيق الحكيم، سنة ١٩٥٤ م، الجزء العاشر ص ١٧٥.
- ٧- مشكلة الأعراب المحلية، الجزء الحادي عشر، ص ١٧٥.
- ٨- كلمة في استقبال أحمد حسن الباقوري، المجلة ج ١٣ ص ٢٤١.
- ٩- في تأبين الدكتور محمد حسين هيكل، سنة ١٩٥٧، المجلة ج ١٣ ص ٢٨٧.
- ١٠- كلمة في تأبين الأستاذ انوليتمان، المجلة، ج ١٤ ص ٣٣٤، ألقاها بالنيابة عن الدكتور طه حسين الدكتور محمد عوض محمد، يوم ٢٧ من ذي العقدة سنة ١٣٨٣ هـ ٢١ نيسان ١٩٦٣ م.
- ١١- كلمة في تأبين الدكتور عبد الوهاب عزام، المجلة، ج ١٤ ص ٣٤١.
- ١٢- تأبين الأستاذ أحمد لطفي السيد، مجلة المجمع، الجزء الثامن عشر، ص ١١٣.^{٢٠}

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

مميزات أدب طه حسين:

لأدبه مميزات كثيرة منها ما يلي:

١. أدبه متأثر بالغرب لأن طه حسين يقول نفس ما قاله الغربيون من أن الإسلام كان متأثراً بالتوراة والإنجيل، فاتّهم القرآن بأنه قد تعمد طمس ذكر الأديان السابقة.
٢. أدبه خال عن التعلق الديني: لأن جهود طه حسين في تغريب اللسان العربي في مصر، واستبداله بالعجمة والعامية لتذوب معالم الدين، وتقطع العلاقة بين المرء ولسان دينه.^{٢١}
٣. تفضل الأستاذ الدكتور طه حسين بإلقاء محاضراته على تأثير الوثنية واليهودية والنصرانية على الشعر العربي.^{٢٢}
٤. الاعتماد على الجمل القصار، وإيرادها فيما يشبه التكرار أو الإعادة للمعنى الواحد دون أن يحس القارئ بشيء من الملل أو الضيق أو السآمة، لامتلاكه ثروة لغوية عريضة.
٥. يكثر من صيغ الاستنكار والنفي والتعليل والاستطراد الخفيف مما يخفف على القارئ عند قراءة موضوع واسع أو مقال طويل.
٦. يتوجه بالحديث إلى المخاطب، حتى يبدو كأنه يحدث قارئه ولا يكتب إليه، مع الترفع عن الابتدال والإسفاف مهما كان الموضوع الذي يتناول، والابتعاد عن استعمال الألفاظ الغربية، والأساليب العامية.
٧. يؤثر لوازم معينة عند البدء والانتقال والتفصيل لم تؤلف في كتابات غيره مثل: مهما يكن من شيء، تستطيع أن تسميه كذا، وإنما هو شيء آخر غير كذا، ومما لا شك فيه، ومثل: الرغم والسخط والرضى والإسراف والبراعة، وغير ذلك من الألفاظ التي يلحظها القارئ، ويتميز بها عن غيره.
٨. تبدو فيه شخصيته الأدبية فيما يكتب قصة أو مقالا أو كتابا فتراه يؤدب العلم والمنطق والتاريخ، مع إشراق الدباجة، ووضوح العبارة، وسهولة الألفاظ، وتوقيع موسيقي وجرس خفيف على الأذان، ومن هنا عجز الجميع عن محاكاته أو تقليده.
٩. يحتفظ بصورة بديعية واحدة رغم تحرره من صور البديع هي فن المطابقة، ويؤثر السجع عند الحاجة، ويأتي به بين كلمتين متجاورتين في الجملة الواحدة، وقد يتجاوز مع سجع بين نهاية جملتين مثل: "كان الشيخ مهيّبا رهيباً، وكان فخماً ضخماً".^{٢٣}

أسلوب طه حسين في الأدب العربي:

١. لم ينفرد الأستاذ طه حسين بانتحال الجديد والتجديد، ولا هو أول من زعم ذلك أو حامى عنه أو كابر عليه، فقد سبقه آخرون لكنه أول من اجتراً على الأدب العربي بالمسخ والتكلف، وقال فيه بالرأي الأحق، وأداره على الوهم البعيد، وتناوله من حيث يأخذه علماً ليتركه جهلاً وهو يحسب أنه أخذه جهلاً وتاركه علماً.^{٢٤}

٢. كان أول من استعمل الركاقة في أسلوب التكرار.^{٢٥}

٣. يتحسّن بالقبح، ويرفع المنازعة مما لا نزاع فيه، فكان يزعم أنه لا ينسأغ لأديب أن يرد عليه هذه الطريقة، وأنه هو لا يحصي من قلّده فيها، حتى رميناه في جريدة "السياسة" بهذه الكلمة التي تراها فجعل من بعدها يتحفظ على نفسه ويتوقى التكرار بجهده، وقد أثبتنا الكلمة لأنها ستأتي الإشارة إليها، ثم لأنها مما يحسن أن يحفظ للتاريخ ليعرف من بعدنا كيف كان "جديد" من قبلهم.^{٢٦}

٤. وفي أسلوب طه حسين ألوان من الموسيقى: فكثيراً ما نجد عنده الموازنة: أحيانا مع السجع والجناس، وربما مع المطابقة أو الترادف أيضاً، وأحيانا أخرى عارية عنها جميعاً أو عن بعضها دون بعض. ثم إن هذه الموازنة قد تكون في الجملتين كاملتين أو في الجملة الواحدة كلها أو في جزء فقط منها. ومن ذلك قوله: "إنك لطويل اللسان، كثير الكلام"^{٢٧}

نظريات طه حسين:

١. يقول بأن هذا القرآن لا علاقة له بصناعة البشر وأنه متفرد بكونه من عند الله فقال: لقد قلت في بعض أحاديثي عن نشأة النثر عند العرب. وإن القرآن ليس شعراً ولا نثراً وإنما هو قرآن له مذاهبه وأساليبه الخاصة في التعبير والتصوير والأداء. فيه من قيود الموسيقى ما يخيّل لأصحاب السذاجة أنه شعر وفيه من قيود القافية ما يخيّل إليهم أنه سجع وفيه من الحرية والانطلاق والترسل ما يخيّل إلى بعض أصحاب السذاجة الآخرين أنه نثر. ومن أجل هذا خدع المشركون من قريش فقالوا: إنه شعر وكذبوا في ذلك تكديبا شديداً ومن أجل هذا خدع كذلك بعض المتتبعين لتاريخ النثر فظنوا أنه أول النثر العربي وتكذيبهم الحقائق الواقعة تكديبا شديداً فلو قد حاول بعض الكتاب الثائرين وقد حاول بعضهم أن يأتوا بمثله لما استطاعوا إلا أن يأتوا بما يضحك ويثير السخرية^{٢٨}

٢. واعتبر طه حسين أنّ الإسلام لم يخرج مصر عن عقليتها الأولى، وبأنّ رضا مصر عن الفتح الإسلامي لم يبرأ من السخط، ولم يخلص من الثورة والمقاومة، وبأنها لم تهدأ، ولم تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ظلّ ابن طوسون، وفي ظلّ الدول المختلفة التي قامت بعده.^{٢٩}

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية

(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

٣. كان يقول طه حسين: "إنَّ سبيل النهضة واضحةٌ مستقيمةٌ ليس فيها عوج ولا التواء، وهي أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهدم أندادا، ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرِّها، حُلُوها ومُؤرِّها، وما يُحَبِّبُ منها وما يُكره، وما يُخمد منها وما يُعاب"٣٠.

٤. ويقول الدكتور طه حسين: إن المثقفين العرب الذين لم يتقنوا لغتهم ليسوا ناقصي الثقافة فحسب، بل في رجولتهم نقص كبير ومهين أيضا.٣١

٥. يقول الدكتور طه حسين: "إن القرآن تلى بلغة واحدة، ولهجة واحدة هي لغة قريش ولهجتها، لم يكد يتناولها القراء من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته، وتعددت اللهجات فيه، وتباينت تباينا كثيرا إلى أن يقول: "والحق أن ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير، وليس منكرها كافرا ولا فاسقا ولا مغتمزا في دينه، وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات واختلافها، للناس أن يجادلوا فيها وأن ينكروا بعضها ويقبلوا بعضها".٣٢

٦. جعلت الدكتور طه حسين يعد القرآن، نمطا ثالثا فوق الشعر وفوق النثر. فهو "قرآن".٣٣

٧. يقول طه حسين: يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا تربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة، مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة أو تأثيرات بيئات متباينة، فمثلا نرى القسم المكي يمتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة، كما نشاهد أن القسم المدني أو الليثري تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة، فأنتم إذا دققتم النظر وجدتم القسم المكي يتفرد بالعنف والشدة، والقسوة والحدة والغضب والسباب والوعيد والتهديد.٣٤

٨. فالأدب عند الدكتور طه حسين هو مأثور الكلام نظما كان شعرا أو نثرا، ومؤرخ الأدب لا يكتفي بمأثور الكلام، وما يتصل به من علوم ومن دراسة تاريخ العقل الإنساني وتاريخ العلوم والفلسفة والفنون.٣٥

٩. ويرى الدكتور طه حسين أن أبا بكر حينما قال للأَنْصار: «الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ» لم يفكر في إطلاق الإمامة لقريش كلها دون تحديد، وإنما كان يفكر هو وعمر وأبو عبيدة في المهاجرين الذين سبقوا إلى الإسلام فأمنوا به قبل أن يؤمن غيرهم.٣٦

٨. ومعلوم أن الدكتور طه حسين قد سائر ركب المستشرقين، وذكر أن علينا أن نسير سيرة الأوروبيين، ونسلك طريقهم. وقال في مجال فصل الدين عن الدولة والسياسة.٣٧

٩. موقف طه حسين العلماني من الشريعة الإسلامية:

إن مقال طه حسين "بين العلم والدين" الذي نشره في مجلة "الحديث" عام ١٩٢٧م هو بمثابة تقرير كُتِبَ الدكتور إلى أساتذته عُتاة التغريب، ليكشفَ لهم عن الخطر الذي يُواجهه تحت ماذة "دين الدولة الرسمي الإسلام"، وفيه يكشفُ مفهومه للإسلام بأنه لا يزيدُ عن أن يكونَ صلاةً وصيامًا واحتفالًا بالمولد النبوي والأعياد الرسمية وإطلاق المدافع في رمضان وقيام المحمل. وأمّا بالنسبة للنُظُم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فإنه يدعو مصرَ إلى اعتناق النظرية الغربية، يرى أنه لا سبيل غير ذلك.^{٣٨}

١٠. يقول طه حسين في عِدائه للحكومة الإسلامية والتشريع الإسلامي: "لقد اعتزّمنا أمام أوروبا أن نذهبَ مذهبًا في الحكم، ونسير سيرتها في الإدارة، ونسلُك طريقها في التشريع، والتزّمنا هذا كلّهُ أمام أوروبا، وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلّا التزاما صريحًا قاطعًا أمام العالم المتحضّر بأننا سنسيرُ سيرة الغربيين في الحكم والإدارة والتشريع؟! فلو همّمنا الآن أن نعودَ أدراجنا وأن نُحيّا النُظُم العتيقة، لمّا وَجَدْنَا إلى ذلك سبيلًا".^{٣٩}

١١. يقول في "الفتنة الكبرى": "ليس من شكٍّ أن عليًّا قد أَحَقَّقَ في بسطِ خلافته على أقطار الأرض الإسلامية، ثم هو لم يُخَفِّقْ وحده، وإنما أَحَقَّقَ معه نظامُ الخلافة كلّهُ" وقال: "إنَّ الإسلام لم يُغَيَّرْ حياة العرب، وإنه بقيَ على هامش حياة المسلمين، وإنه لم يستطع أن يفرضَ حياة المسلمين بين أصحاب الحضارات الأخرى".^{٤٠}

مساهمته في النقد الأدبي:

ساهم طه حسين في النقد الأدبي ولم يتيسر له أن يستعين بأدوات البحث العلمي، فاكتمى بالنقد الأدبي الذي يقوم على الذوق، والقصة التي تقوم على الخيال، والاستعراض التاريخي والسياسي الذي يستطيعه كل من يمسك بالقلم كما يقول أنور الجندي! وفي الجامعة المصرية يقول أستاذه الشيخ محمد المهدي: "إن رأس الفتى كالقدر الفارغة تحتها النار تتلظى فلا هو يشفق على القدر فيملؤها بما يقيمها جور النار، ولا هو يبقى على النار إلى أن يتسنى لها الانتفاع بها في الوقت المناسب". وفي الحقيقة إن استعراض النتائج النقدي لطله حسين، يوقفنا على حقيقة خطيرة ومؤسفة، وهي أنه كان في نقده يسير على غير قواعد. كان يكتفي بما يسميه هو نقدا ذوقيا.

فلذا عابه عليه صديق عمره والمدافع عنه ضد الثائرين عليه عباس العقاد: "نرى الدكتور يقول مرة: إن أصول النقد الأدبي واحدة، قد وضعها اليونان قديما وفرغوا منها، وتلقاها منهم الإنجليز كما تلقاها منهم الفرنسيون فهم لا يختلفون ثم أراه يقول بعد أشهر قليلة: إن النقد ليس له أصول مقررة

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣ هـ / ١٨٨٩-١٩٧٣ م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية

(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

عند الناقد، فضلا عن الأمم الكبيرة والعصور الكثيرة، وأن الناقد يستحسن أو يستهجن، والمرجع إلى ذوقه وحده في استحسانه أو استهجانه! والدكتور طه في نقده للمؤلفات العصرية، والأدباء والشعراء المعاصرين يميل كثيرا مع هواه، لأنه يعتبر النقد عملا أدبيا محضا. فيعمل على إظهار تذوقه، وتتجلى شخصيته بأغراضها وأهوائها في نقدياته، ومن السهل أن تكتشف عواطف الدكتور وميوله، بل أهواءه وأغراضه من السهل تستكشف أنه متأثر بالحب في هذا الفصل وبالصدقة في هذا الفصل، والبغض والحسد في ذيك الفصل. ومن هنا يرى الكثيرون أنه ليس بعالم، ولا يستطيع أن يكون عالما. ولعل هذا الاتجاه القائم على الميل مع الهوى هو الذي دفع طه حسين إلى أن يغير كثيرا من آرائه فجأة وبلا مقدمات، ولذلك سنجده ينقض اليوم ما بناه بالأمس، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وما ينبغي للكاتب الذي يحترم نفسه وفكره وعقل القارئ له أن يبدي أحكاما فجأة لم تستقر في عقله ولم تنضج في تفكيره.^{٤١}

١. نقده للقرآن:

وإنه نقد القرآن فله اتهام حول إنكاره صلة نص القرآن بوحى السماء ووجود أخطاء نحوية ولغوية وأسلوبية فادحة في معظم آياته. ولا شك أن الباحث الناقد والمفكر الحر الذي لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أي كاتب ديني آخر يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا يربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة وتأثير بيئات متباينة. فمثلا نرى القسم المكي فيه يمتاز بكل ميزات الأوساط المنحطة، كما نشاهد أن القسم المدني الليثي تلوح عليه إمارات الثقافة والاستنارة. وإذا دققتم النظر وجدتم القسم المكي ينفرد بالعنف والقسوة والحدة والغضب والسباب والوعيد والتهديد، ويمتاز كذلك بتقطيع الفكرة واقتضاب المعاني وقصر الآيات والخلو التام من التشريع والقوانين، كما يكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجوم إلى آخر ما هو جدير بالبيئات الجاهلية الساذجة التي تشبه بيئة مكة تأخرا وانحطاطا، أما القسم المدني فهو وديع لين مسالم يقابل السوء بالحسن ويناقش الخصوم بالحجة الهادئة والبرهان الساكن الرزين، كما أن هذا القسم ينفرد بالتشريعات الإسلامية كالمواريث والوصايا والزواج والطلاق والبيع وسائر المعاملات، ولا شك أن هذا أثر واضح من آثار التوراة والبيئة اليهودية التي ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضحة يشهد بها هذا التغيير الفجائي الذي ظهر على أسلوب القرآن. "وهذه آراء الفيلسوف اليهودي جولدزهر^{٤٢}"

زعم أن عدم وضع النقط على الحروف القرآنية في بدء تدوينه قد أدى إلى حدوث اختلاف في نطقه، فهناك كلمات تنطق هكذا: فتبينوا، فتثبتوا.. الخ.

والحق الذي لا مرأى من حوله، مهما أرجف المرجفون، أن القرآن مكلوء برعاية الله إلى أبد الأبدين ودهر الداهرين^{٤٣} وذلك بنص قول الحق سبحانه وتعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.^{٤٤}

ادعى أن لفظة (سورة) مأخوذة من كلمة (شورة) العبرية، بمعنى (سلسلة) وأثار الشك في لفظة (قرآن) هل هي عربية أو عبرية أو مأخوذة من لغات أخرى.

ورأى أن (الكتاب) غير (القرآن)، وأن الكتاب كان موجودا قبل إنزال القرآن، وأن القرآن صورة عربية منه. (نعوذ بالله من ذلك). وهل سمع السامعون في تاريخ الكفر والنفاق بمثل هذا؟^{٤٥}

ومن أخباره أنه كان يشجع تلاميذه في كلية الآداب على أن ينقدوا القرآن في جرأة ينقدونه باعتباره كتابا أدبيا! يمكن أن يقال فيه هذا كذا، وهذا كذا. ويحاول أن يدرسه دراسة فنية.^{٤٦}

٢. نقد طه حسين لابن خلدون:

رسالة طه الماجستير التي نالها طه حسين في فرنسا وهي تحليل ونقد لفلسفة ابن خلدون الاجتماعية وقد اختار الأديب مقجّمته لأنه كان يرى بأن تاريخ الآداب العربية كلها ومنذ عصر الجاهلية إلى عصرنا هذا يحتفظ بذكر رجلين، لم يتصف غيرهما بعمل خارق وعبقري ومبتكر من العرب والمسلمين سوهمما، وهما أبو العلاء المعري الذي استحدث الأدب في مجموعته الشعرية "اللزوميات" وفي رسالة الغفران والعمل الآخر هو مقدمة ابن خلدون، وهو عمل عقلي سمي بالفلسفة الاجتماعية، لكنه أبى أن يطلق على المقدمة صفة العبقريّة، لأن عمله امتزج بالدسائس والمصاعب السياسية فلنتعرف هنا على نقده للمقدمة صفة العبقريّة لعمله امتزج بالدسائس والمصاعب السياسية فلنتعرف هنا على نقده للمقدمة أمام نصوص ابن خلدون وجد طه حسين أنه بالغ في بعض المواقع مبالغة كبيرة وساذجة، حين وصف زواج الخليفة المأمون العباسي، والبذخ الذي كان فيه وخاصة في ذكره للأرقام غير المعقولة فهو يقول إن المأمون قد خصص ١٤٠ بغلة تحمل الخشب إلى المطابخ ٣ مرات في اليوم ولمدة عام كامل، وأن هذا القدر من الخشب قد أحرق في يوم واحد، كما أن ابن خلدون الوحيد بين الأزمان كلها، ومنذ العهد القديم والعصور المتوسطة والعصر الإسلامي، الذي نظر إلى التاريخ بأنه كل لا يتجزأ، وهذا في رأي طه حسين طرفة حقيقة للأسف، فهو يتأمل التاريخ والقصص والوقائع حوله، دون أبسط ضروب النقد وأسفلها، ليذهب الدكتور طه إلى كتابه ويعطي أمثلة لمؤرخين آخرين كانوا قد سبقوه، ففي العهد القديم يمتاز مؤرخو الإغريق والرومان

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية

(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

بصفات النقد وعدم التحيز، أمثال المؤرخ توكوتيدوس وطيوطوس و ليفيوس وبلوتارك بينما ابن خلدون ينظر إلى التاريخ نظرة واسعة النطاق دون دراسة شيء يستحق أن يدرس^{٤٧}.

٣. نقد طه حسين في الشعر الجاهلي:

لقد شك طه حسين في كل شيء يخص الشعر الجاهلي، شك في لغة القحطانيين وفي اقترايحها من لغة العدنانيين، شك في لهجات القبائل العدنانية؛ بل شك في القبائل العدنانية نفسها وفي أننا لا نعرفها معرفة تامة، شك طه حسين في كل خبر أتى لنا عن طريق القصص والرواة، لأن من وجهة نظر طه حسين كيف نستطيع أن نثق في أشعار أمة لا تستطيع الكتابة؟ وكيف علينا أن نصدق أن كل هذا الشعر خرج من بطن هذه الأمة وكأنها جُبلت على الشعر وكان جزءاً من سليقتها^{٤٨}.

٤. نقد طه حسين لأحمد شوقي:

كان أحمد شوقي قد كتب قصيدة "مفاخر الفراعنة"، في جريدة الأهرام بمناسبة اكتشاف مدفن أحد ملوك الفراعنة "توتنخ آمون" عام ١٩٢٣، وهي القصيدة التي تناولها طه حسين في مقال مفصل عبر فيه عن عدم رضاه عن مستوى القصيدة، لكن بشكل أدبي بارع نقدي نعرض منه بعض الأجزاء. ثم بدأ طه حسين يتحدث عن القصيدة فقال "إنها قصيدة من قصائد شوقي فيها الكثير الجيد، وليست تخلو من الرديء، ولشوقي بحمد لله قصائد أمتن لفظاً، وأرصن أسلوباً، وأحسن في النفس موقعاً، وأرفع معنى من هذه القصيدة."

ويشير طه حسين لعد رضاه عن القصيدة فيقول "لا أستطيع أن أتخذ هذه القصيدة مقياساً لشاعرية شوقي، وحسن غوصه، وفوزه بالمعنى الجيد، وحسن أدائه في اللفظ الرشيق، لا أستطيع ذلك، وقد قرأت في الشباب شعر شوقي في الشباب، فوجدت في هذه القراءة لذّة لم أجدها في قراءة شاعر عصري آخر. ليست هذه القصيدة آية من آيات شوقي، وإنما هي قصيدة من قصائده الجيدة، ولعلك إذا أردت أن تتلمس مصدر ما في هذه القصيدة من جودة لم تتجاوز شيئاً واحداً، وهو أن شوقي لم يتكلف في هذه القصيدة لفظاً ولا معنى، وإنما شعر، وأحسن، وجرى قلمه بما أحس وما شعر، وليس هذا بالشيء القليل ولعل هذا هو كل شيء^{٤٩}.

٥. معارك الرافعي مع طه حسين:

هاجم طه حسين كتاب الرافعي "تاريخ الآداب العربية" وقال: إنه لم يفهمه كما هاجم كتابيه حديث القمر ورسائل الأحزان. أريد أن أقول: إنه ينحت كتبه من الصخر ولكني لا أجد في هذه الجملة ما ينبغي لوصف هذه المشقة، وما لي لا أتبسّط معه بعض الشيء فأقول: إن كل جملة من جمل هذا الكتاب تبعث في نفسي شعورًا قويا مؤلما بأن الكاتب يلدها ولادة. وهو يقاسي من هذه الولادة ما تقاسيه الأم من آلام الوضع، يجب أن أكون منصفًا فأنت تستطيع أن تقطع كتاب الرافعي جملا جملا وأن تجد بين هذه الجمل طائفة غير قليلة فيها شيء من جمال اللفظ، وبهرجة تخليك وتستهيئك وفيها معان قيمة لا تخلو من نفع ولكن المشقة كل المشقة في أن تصل هذه الجمل بعضها إلى بعض، ونستخرج منها شيئا قيما لن تظفر من هذا بشيء وأكبر ظني أن الأستاذ الرافعي نفسه لا يحاول أن يقول شيئا حين يكتب هذه الرسائل وإنما هو يذهب في النثر مذهبا غريبا فيتكلف العناء والمشقة في الغوص على المعاني الغريبة ثم يتكلف العناء والمشقة في أن يسبغ على هذه المعاني ألفاظا عربية".^٥

مؤلفاته في النقد: ١. نقد وإصلاح. ٢. كتاب خصم ونقد. ٣. نقد النثر لقدامة بن جعفر حقه بالاشتراك مع عبد الحميد العبادي، دار الكتب.

روايته الشبيهة الوعد الحق:

مَضَتْ سُنَّةُ اللَّهِ فِي التَّمَكِينِ لِعِبَادِهِ أَوَّلَ مَا مَضَتْ فِي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ؛ إِذْ إِنَّهُمْ حَقَّقُوا مَا اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صِفَاتٍ لَخْلَفَائِهِ فِي الْأَرْضِ؛ وَهِيَ الْعِبَادَةُ الْحَقَّةُ لَهُ وَالْإِذْعَانُ وَالتَّسْلِيمُ لِأَوَامِرِهِ. وَعَرَفَ الصَّحَابَةُ مِنْذُ سُوِّعَاتِ إِسْلَامِهِمُ الْأَوَّلَى مَا اشْتَرَطَ اللَّهُ، فَجَدُّوا وَاجْتَهَدُوا لَهُ، فَنَالَهُمْ مَا نَالَهُمْ مِنْ تَهْجِيرٍ وَتَعْذِيبٍ وَمَشَاقِ جَمَّةٍ. وَوَعَدُ اللَّهِ الْحَقُّ لَا يَغِيبُ عَنْ أَعْيُنِهِمْ عَبِيدًا كَانُوا أَوْ أَحْرَارًا، حُكَّامًا أَوْ مُحْكُومِينَ، حَتَّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا وَعَدَهُمْ، وَمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، فَمَضَوْا ثَابِتِينَ عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي رَسَمَهُ لَهُمْ مُعَلِّمُهُمُ الْأَوَّلُ رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ وَقَدْ وَضَعُوا تَمَثِيلًا عَمَلِيًّا لِمَا اسْتَنَّهُ اللَّهُ وَهُوَ "الْوَعْدُ الْحَقُّ" فَتَوَى دَارَ الْإِفْتَاءِ حَوْلَ سَيْنَمَا الْوَعْدِ الْحَقِّ:

فقد علم من ملخص موضوع الفيلم السينمائي الذي اقتبستموه من كتاب (الوعد الحق) والذي اعتزم إخراجَه دون تعرض لأي موقف للرسول الأكرم صلوات الله عليه ولا لأي أحد من آله الطاهرين وخلفائه الراشدين بحيث لا يظهر فيه صورة أو يسمع فيه صوت لأي واحد من هؤلاء البررة والأكرمين فلم أجد بعد هذا البيان ما يمنع من إخراج هذا الفيلم من الوجهة الشرعية بل في إخراجَه نشر لدعوة الحق وإيقاظ للتسمك به في وقت أحوج ما يكون الناس فيه إلى ذلك.

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

وقد قرئ في هذه الفترة كتاب (الوعد الحق) للدكتور طه حسين بك، والحق أنه آية في الإبداع والتصوير والأسلوب والتعبير. وأسأل الله تعالى أن يوفق مؤلفه العلامة لإخراج أمثاله تبياناً للحق وهداية للناس.^{٥١}

وفي كتاب "الوعد الحق":

- يطيل الحديث عن ظلم عثمان رضي الله عنه وطغيانه، وأنه ما زال يضرب ابن مسعود رضي الله عنه حتى كسر ضلعه، وأشبع عمار بن ياسر رضي الله عنه ضرباً حتى أصابه الفتق، وغشي عليه، وفاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب، وهذا دجل من طه حسين وكذب صراح. ويدعي أن عثمان رضي الله عنه نكث عن بيعته لعبد الرحمن بن عوف وانحرف عن طريق صاحبيه، وأن بني أمية في عهد عثمان حكموا حكماً جاهلياً بعيداً عن الإسلام.^{٥٢}

فيه ستة قصص:

١. قصة عمار وياسر وسمية رض ٢. قصة صهيب رض ٣. قصة خباب رض ٤. قصة عبد الله بن مسعود رض ٥. قصة أبي حذيفة وسالم رض ٦. قصة عبد الله بن سهيل وأخته.

نتائج البحث:

١. الدكتور طه بن حسين بن علي بن سلامة ويعد من كبار المحاضرين وعميد الأدب العربي.
٢. وُلد طه حسين سنة ١٣٠٧هـ/١٨٨٩م لأب مصري من قرية في صعيد مصر على مقربة من مدينة مغاغة الواقعة على الجانب الأيسر للنيل في قرية (الكيلو) بمغاغة من محافظة المنيا (بالصعيد المصري).
٢. تزوج طه حسين بامرأة اسمها سوزان وكانت "زميلته" في جامعة مونبيليه أثناء بعثته إلى فرنسا.
٣. وبدأ حياته في الأزهر (١٩٠٢-٠٨) ثم بالجامعة المصرية القديمة وهو أول من نال شهادة "الدكتوراه" منها (١٩١٤) بكتاب "ذكرى أبي العلاء".
٤. عين محاضراً في كلية الآداب بجامعة القاهرة، ثم كان عميداً لتلك الكلية فوزيراً للمعارف.
٥. حاز طه حسين مناصب وجوائز شتى، منها تمثيلية مصر في مؤتمر الحضارة المسيحية الإسلامية في مدينة فلورنسا بإيطاليا عام ١٩٦٠م.
٦. توفي طه حسين يوم الأحد ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣م=١٣٩٣هـ عن عمر ناهز ٨٤ عاماً.

٧. ساهم طه حسين في الأدب العربي بمؤلفات كثيرة منها: ذكرى أبي العلاء المعري، وفي الشعر الجاهلي، وفي الأدب الجاهلي، والأيام، وحافظ وشوقي، ونقد النثر لقدامة بن جعفر، ودعاء الكروان وغير ذلك.

٨. ساهم في النقد الأدبي أيضا كما نقد القرآن وابن خلدون وأحمد شوقي وألف كتباً في النقد مثل ١. نقد وإصلاح. ٢. كتاب خصم ونقد. ٣. نقد النثر لقدامة بن جعفر حققه بالاشتراك مع عبد الحميد العبادي، دار الكتب.

المراجع والمصادر:

١. كاملة الكواري، شرحة نونية القرني، (د.ت)، ج ٦، ص ١٩.
٢. شوقي ضيف، أحمد شوقي عبد السلام ضيف (المتوفى: ١٤٢٦هـ)، الأدب العربي المعاصر في مصر، (مصر: دار المعارف، الطبعة: الثالثة عشرة)، ص ٢٧٧.
٣. محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف، تكملة معجم المؤلفين، وفيات (١٣٩٧-١٤١٥هـ) = (١٩٧٧-١٩٩٥م)، (بيروت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م)، ص ٢١٩.
٤. كاملة الكواري، المرجع السابق، ج ٦، ص ١٩.
٥. سعدي بن مهدي الهاشمي، ابن سبأ حقيقة لا خيال، (الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: السنة الثانية عشرة - العدد السادس والأربعون - ١٤٠٠هـ)، ص ١٤٤.
٦. خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: ١٣٩٦هـ)، الأعلام، (الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار/مايو ٢٠٠٢م)، ج ٣، ص ٢٣١.
٧. علي بن نايف الشحود، موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، ١-٢٩)، ج ٥١، ص ٣٤٤.
٨. الشيخ/إبراهيم خليل أحمد، من كبار علماء النصاري من الله عليه بالإسلام، (الناشر: دار الوعي العربي، د.ت)، ص ٨١.
٩. محمد إسماعيل المقدم، (عودة الحجاب: الجزء الأول: تاريخ معركة الحجاب)، ص ٥٠.
١٠. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص ٢٨٤.

¹¹. <https://ar.wikipedia.org/wiki>

¹². شوقي ضيف، المرجع السابق، ص ٢٧٨.

¹³. أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، (جدة: دار ماجد عسيري للنشر والتوزيع، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م)، ج ١، ص ٢٤٢.

¹⁴. <https://ar.wikipedia.org/wiki>

د. طه حسين (١٣٠٦-١٣٩٣هـ/١٨٨٩-١٩٧٣م) نبذة حياته: دراسة نظرية وتحليلية
(ড. তহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩ খ্রি.) তাঁর জীবনী: তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন)

١٥. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص ٢٨٢.
١٦. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٥١، ص ٣٤٦.
١٧. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٥١، ص ٣٤٦.
١٨. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٥١، ص ٣٤٦.
١٩. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٥١، ص ٣٤٦.
٢٠. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٥١، ص ٣٤٦.
٢١. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٥١، ص ٥١٠.
٢٢. مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي (المتوفى: ١٣٥٦هـ)، تحت راية القرآن، (بيروت: المكتبة العصرية، الطبعة الأولى - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م)، ص ٦٨.
٢٣. السيد مرسي أبو ذكري، المقال وتطوره في الأدب المعاصر، (الناشر: دار المعارف، الطبعة: ١٩٨١-١٩٨٢م)، ص ٢٠٥.
٢٤. مصطفى صادق الرافعي، المرجع السابق، ص ٨٠.
٢٥. مصطفى صادق الرافعي، المرجع السابق، ص ٨٠.
٢٦. مصطفى صادق الرافعي، المرجع السابق، ص ٨٠.
٢٧. إبراهيم عوض، مقالات الدكتور إبراهيم عوض، (د.ت)، ص ٣٤٤.
٢٨. الدكتور/محمد عمارة، تقرير علمي، (رد على كتاب "مستعدين للمجابهة" لسمير مرقص)، ص ٥٨.
٢٩. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ١٨، ص ٤٩٤.
٣٠. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٣١، ص ١٧٣.
٣١. علي بن نايف الشحود، المرجع السابق، ج ٢٩، ص ٣٤٤.
٣٢. عماد السيد محمد إسماعيل الشريبي، كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها، (الطبعة: الأولى/١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م)، رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ١٤١٨٥/١/٢٠٠١م)، ص ٨٩٨.
٣٣. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني (المتوفى: ١٤٢٩هـ)، خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، (رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى)، (الناشر: مكتبة وهبة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م)، ج ١، ص ٢٩٧.
٣٤. عبد المحسن بن زين بن متعب المطيري، رسالة لنيل درجة الدكتوراة من كلية دار العلوم، الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري، (د.ت)، ص ٤٦.
٣٥. علي علي صبح، التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية، (الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث)، ص ٣٣.

- ^{٣٦} . عبد القادر عودة (المتوفى: ١٣٧٣هـ)، الإسلام وأوضاعنا السياسية، (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: ١٤٠١هـ - ١٩٨١م)، ص ١٤٣.
- ^{٣٧} . الأستاذ الدكتور سعد المرصفي، الجامع الصحيح للسيرة النبوية، (الكويت: مكتبة ابن كثير، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م)، ج ٢، ص ٤٢٩.
- ^{٣٨} . أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني، وَأَ مُحَمَّدَاهُ {إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، (مصر: دار العفاني، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م)، ج ٢، ص ٣٤٠.
- ^{٣٩} . أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني، المرجع السابق، ج ٢، ص ٣٤٠.
- ^{٤٠} . أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني، المرجع السابق، ج ٢، ص ٣٤٠.
- ^{٤١} . إبراهيم محمد سرسيق، طه حسين حياته وأدبه في ميزان الإسلام، (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الآخرة ١٣٩٧هـ/ مايو - يونية ١٩٧٧م)، ص ١٩٤.
- ^{٤٢} . أنور الجندي، هل غير الدكتور طه حسين آراءه في سنواته الأخيرة، (د.ت)، ص ٤.
- ^{٤٣} . إبراهيم محمد سرسيق، المرجع السابق، ص ١٩٣.
- ^{٤٤} . القرآن الكريم، الحجر، الآية: ٩.
- ^{٤٥} . إبراهيم محمد سرسيق، المرجع السابق، ص ١٩٣.
- ^{٤٦} . إبراهيم محمد سرسيق، ط المرجع السابق، ص ١٩٣.
- ⁴⁷ . <https://www.albayan.ae/five-senses/heritage/2018-10-15-1.3383504>
- ⁴⁸ . <https://www.aljazeera.net/blogs>
- ⁴⁹ . <https://alwan.elwatannews.com/news/details>
- ^{٥٠} . أحمد أنور سيد أحمد الجندي (المتوفى: ١٤٢٢هـ)، المعارك الأدبية، (الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٣)، ص ٤٣٦.
- ^{٥١} . دار الإفتاء المصرية، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج ٧، ص ٢٤١.
- ^{٥٢} . أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني، المرجع السابق، ج ١، ص ٢٥٠.

تجلی قرآن در دیباجه بوستان سعدی

(Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)

Dr. Mohammad Noor-e-Alam*

Abstract

A conversation about Saadi and his works is always fresh. *Bostan-e-Saadi* is one of the mothers of Persian books, which is famous as a "moral book" in the world of literature. Saadi is a mystic poet. He studied the *Holy Quran* a lot. He wrote a book about the influence of the *Qur'an* called *Saadi Nameh* or *Bostan*. This book was written on the Rhythm of *Bahr-e-Motaqareb*. There are ten chapters in this book; each of them is considered to be necessary for the practical life of man at that time and in the present era. *Bostan-e-Saadi's* manifestation in the preface was full of unique *Quranic* verses. All the words and verses of *Bostan's* manifestation in the preface have been used in the best way to express the verses of the *Qur'an*. He became famous in the world about *Golestan* and *Bostan*. The subject of these two books is 'Education'. But one is in verse and the other is in prose. His contribution to the literature of Iran and the world is a valuable and lasting. The number of poems in *Bostan* is about four thousand verses. This mystic poet told the stories of the ordinary life of the people, historical events and justice with *Bostan's* manifestation in the preface verses. In this article the significance of Saadi's borrowing the *Quranic* verses will be assessed along with the introduction and the characteristics of the poet in *Bostan*.

چکیده : صحبتی مورد سعدی و آثار وی همیشه تازگی است. بوستان سعدی از امهات کتب فارسی است که به عنوان «کتاب اخلاقی» در جهان ادبیات مشهور است. سعدی شاعر عرفانی است. وی قرآن کریم را مطالعه زیادی کرد. او از تأثیر قرآن کتابی به نام سعدی نامه یا بوستان نوشت. این کتاب بر وزن بحر متقارب نوشته شد. در این کتاب ده باب دارد؛ در هر باب به موضوع ضرورت زندگی عملی انسان آن زمان و عصر حاضر هم دیده می‌شود. دیباجه بوستان سعدی پر از آیات قرآن بی‌نظیر است. کلیه لغات و ابیات دیباجه بوستان از تجلی آیات قرآن به بهترین وجه استفاده شده است.

* Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Chittagong

وی درباره گلستان و بوستان در جهان مشهور شدند. موضوع این دو کتاب «تربیت» است. ولی یکی در نظم و دیگری در نثر است. سهم وی از ادبیات ایران و جهان، سهمی ارزشمند و ماندگار است. شماره بیت‌های بوستان در حدود چهار هزار بیت است. این شاعر عرفانی با ابیات دیباچه بوستان، حکایات زندگی عادی مردم، حوادث تاریخی و عدالتی را بیان نمود. در این مقاله بعد از مقدمه و مشخصات شاعر، از آیات قرآنی که در دیباچه بوستان وام گرفته، ذکر شده است.

واژگان کلیدی: آیه قرآن، عدالت، بوستان سعدی، دیباچه بوستان، مردم

آشنایی سعدی:

ابو محمد، مشرف الدین، مصلح، فرزند عبد الله، سعدی شیرازی یکی از برجستگان و مشهورترین شاعر عرفانی و از ستارگان ادبیات جهان است. تذکره نویسان درباره تولد وی تقریباً ۶۰۶ هجری نوشته‌اند. زیرا در کتاب گلستان که در سال ۶۵۶ تصنیف کرده است، اشاره به پنجا سالگی خویش دارد (کاسب، ۱۳۸۱: ۱۶۲) «وی بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را به نور خیره کننده خود روشن ساخت و آن روشنی با چنان نیرویی همراه بود که هنوز پس از گذشت هفت قرن تمام از تأثیر آن کاسته نشده است، و این اثر تا پارسی بر جای است همچنان برقرار خواهد ماند» (ذبیح الله صفا، ۱۳۶۶: ۵۸۶) سعدی نامه یا بوستان منظومه نوین و بی سابقه‌ای که بر وزن بحر متقارب یا وزن شاهنامه فردوسی با موجود آیات قرآن فراوان است. وی در این کتاب اندیشه مردم عادی به سوی زندگی اجتماعی و حکمت عملی نشان داد.

سعدی خواست که «در بوستان اصول سیاسی و اجتماعی لازم برای یک جامعه آرمانی را بیان کند و به انسان عصر خود بیاموزد که چگونه می‌تواند سرنوشت زندگی عملی و سیاسی خود را در دست گیرد و زندگی و جامعه خود را آن طور که می‌خواهد بسازد». (یاحقی، ۱۳۸۹ هـ.ش: ۸۳)

تجلی قرآن در دیباچه بوستان سعدی
(Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)

قبیله سعدی عالمان دین بوده‌اند، سال‌ها در حوزه‌های علمی شیراز و نظامیه بغداد درس خوانده و تلقین و تکرار کرده است و روزگاری دراز نیز به گشت و گذار در کشورهای مختلف جهان گذرانده و سیر آفاق و انفس کرده و در نیمه راه عمر در وطن خویش شیراز مقیم شده و به سرودن و نوشتن و تدوین آثار خویش پرداخته است. از سعدی یک دیوان گرانسنگ دارد که مشتمل بر چهار دفتر «غزل» است که خود، آنها را «طیبات»، «بدایع»، «خواتیم» و «غزلیات قدیم» نامیده است. جز این چهار دفتر، در دیوان او؛ قصیده‌های عربی، قصیده‌های فارسی، مرثیه‌ها، ملمع‌ها، مثلث‌ها، یک ترجیع‌بند زیبا، قطعه‌هایی به نام «صاحبیه»، مثنوی‌ها قطعات، رباعیات و مفردات نیز هست. (کاسب، ۱۳۸۱: ۱۶۳-۱۶۴)

سعدی گلستان را با هشت فصل نوشته؛ «در سیرت پادشاهان»، «در اخلاق درویشان»، «در فضیلت قناعت»، «در فواید خاموشی»، «در عشق و جوانی»، «در ضعف و پیری»، «در تأثیر تربیت»، «در آداب صحبت». لحن کلام این شاعر در گلستان ملایم، خوش و لطیفه آمیز است.

بوستان سعدی که رنگی از شاهنامه فردوسی دارد و مثنوی است که وزن شاهنامه فردوسی و بحر متقارب نوشت و مشتمل بر ده باب دارد؛ «در عدل و تدبیر و رای»، «در احسان»، «در عشق و شور و مستی»، «در تواضع»، «رضا»، «در قناعت»، «در عالم تربیت»، «در شکر بر عافیت»، «در توبه و راه صواب»، «در مناجات و ختم کتاب». ولی دیباچه بوستان زینت یافته است به سخنی مورد توحید و ستایش پیامبر اکرم (ص)، و به شیوه آن روزگاران، مدح سعد- فرزند ابوبکر- حاکم شیراز است. دیباچه سعدی بزرگ است. وی در این دیباچه آیات مختلف قرآن استفاده کرد.

آیات قرآن بر اشعار دیباچه بوستان:

به نام خداوند جان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشنده دستگیر

کریم خطابخش پوزش پذیر (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۳۳)

حکیم سخن در زبان آفرین: پدیدآورنده سخن در زبان آدمی، اشاره به آیات قرآن: «الرَّحْمَنُ - عَلَّمَ الْقُرْآنَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» (سوره الرحمن: ۱-۴) «خدای» گسترده مهر، قرآن را آموزش داد؛ انسان را آفرید، «بیان» را به او آموزش داد. یعنی خداوند متعال بخشنده قرآن را به پیغمبر آموخت و خواندن را به انسان یاد داد، آدمی را آفرید و او را بیان آموخت. بیان وسیله ایست که از ما فی الضمیر حکایت کند و اندیشه‌های یکی را برای دیگران روشن سازد، از اینرو بیان شامل اشاره و گفتار و نوشتن هر سه می‌شود. نیز اشاره به آیات: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا» (سوره بقره: ۳۱)

نه گردنکشان را بگیرد به فور

نه عذر آوران را براند بجور (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۳۴)

نه گردنکشان را بگیرد به فور: اشاره دارد به آیه «وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفَضَّلْنَا بِهِمْ أَجَلَهُمْ فَندَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» (سوره یونس: ۱۱) = «اگر (بر فرض) خدا برای مردم (در پذیرش نفرین و مجازات) بدی [ها]، شتاب می‌کرد همچون شتاب جویی آنان در نیکی [ها]، حتماً برای آنان سرآمد (عمر)شان فرا می‌رسید؛ و [الی] کسانی را که امید به ملاقات ما ندارند، و می‌گذاریم در حالی که در طغیانشان سرگردان می‌شوند. قسمتی از این آیه چنین مقرر می‌دارد: «إِنَّمَا نُمَلِّى لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا» = «به کافران مهلت می‌دهیم، تا بر گناه خود بیفزایند.»

نه عذر آوران را براند بجور: وام گرفته از آیات قرآن «أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ» (آیا ندانسته‌اند که خدا، خود توبه را از بندگان می‌پذیرد)؛ بجور و بغور قید وصفی هستند و از این جهت متصل نوشته شده‌اند. (خزائلی، ۱۳۷۲هـ ش: ۳۴)

دو کونش یکی قطره از بحر علم

تجلی قرآن در دیباچه بوستان سعدی
(Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)

گنه بیند و پرده پوشد به حلم

ادیم زمین سفره عام اوست،

بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۳۵)

«دو کون»: کون با فتح اول مصدر است به معنی بودن که به معنی کائن، دارای وجود هم بکار می‌رود. اشاره از دو کون دنیا و آخرت است و مصراع اشاره به آن دارد که علم خدا به هر یک از موجودات سبب خلق آن موجود است و چون صفات خداوندی، عین ذات و عین یکدیگر می‌باشد. اراده و علم حق یکی است. سعدی این کلمه از آیات قرآن کریم وام گرفت: «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (هنگامی که چیزی را بخواهد، فرمان او فقط این است که به آن می‌گوید: «باش!» پس [فوراً موجود] می‌شود). با این تعبیر ظاهر می‌شود که علم حق به معدوم تعلق نمی‌گیرد و وجود هر چیز با علم خدا به آن چیز همراه است.

«ادیم زمین سفره عام اوست»: در این مصراع سعدی «ادیم» به معنی روی زمین و «عام» مخفف «عام با تشدید است» این مصراع اشاره دارد به آیه قرآن: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» (سوره ملک: ۱۵) (او کسی است که زمین را برای شما رام قرارداد، پس در اطراف آن راه بروید و از روزی‌اش بخورید؛ و زنده کردن (مردگان) فقط به سوی اوست).

«یغما» شهری بوده در ترکستان که مردم زیبا و دلیر داشته. مجازاً یغما بر غارت و چپاول نیز که شاید نمودار دلیری مردم آن شهر بوده است اطلاق شده، مراد از «خوان یغما» سفره‌ایی است که از مال غارتی و باد آورده فراهم شده و به همین مناسبت کسی را از بهره‌مندی مانع نمی‌شوند، در اینجا مقصود این است که دشمن و دوست از خوان بیدریغ خداوندی روزی می‌خورند و هیچکس از آن محروم نمی‌شود. (خزائلی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۳۵)، شاعر بلند آوازه و لسان الغیب حافظ شیرازی در شعرش «خوان یغما» استفاده کرد و گفت:

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان **خوان یغما** را (حافظ شیرازی، ۱۳۶۲ ش: ۴)

لطیف کرم گستر کار ساز

که دارای خلقت و دانای راز (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۳۷)

«لطیف» یکی از نام‌های خداوند متعال است که در قرآن ذکر شد: «لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (سوره انعام: ۱۰۳) (چشم‌های او را در نمی‌یابند؛ ولی او چشم‌ها را در می‌یابد؛ و و لطیف و آگاه است).

«دارای خلق» اشاره است «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» (سوره اعراف: ۵۴)

مر او را رسد کبریا و منی،

که ملکش قدیمست و ذاتش غنی (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۳۸)

«کبریا» به معنی عظمت و جبروت است که از آیات قرآن گرفته شد: «وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (سوره جاثیه: ۳۷) و «منی» یعنی من بودن، بی نیاز و استقلال داشتن، این بیت اشاره به خداوند متعال است که وی بی نیاز هستند، همه چیز پیش خداوند نیازمند است.

یکی را به سر بر نهد تاج بخت

یکی را به خاک اندر آرد ز تخت (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۳۸)

خداوند به هر که می خواهد پادشاهی می دهد و از هر که می خواهد پادشاهی می - گیرد. بیت مذکور اشاره به آیات قرآن است: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (سوره آل عمران: ۲۶)

گلستان کند آتشی بر خلیل

گروهی به آتش برد ز آب نیل (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۳۸)

بیت مذکور اشاره به حکایت قرآن کریم درباره نجات از آتش نمرود، مورد حضرت ابراهیم (ع) است که آیات قرآن ذکر شد: «قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ» (سوره

تجلی قرآن در دیباچه بوستان سعدی
(Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)

انبیاء : ۶۹)، «گفتیم، ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش» در قرآن کریم لقب خلیل درباره حضرت ابراهیم آیات دیگر مقرر گردیده است: «وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» (سوره نساء : ۱۲۵)، مصراع دوم سعدی اشاره به حکایتی است که حادثه‌ای در دریای احمد و رود نیل اتفاق افتاده بود؛ مورد حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل است که «فرعونیان» در دریای نیل غرق شدند و به دوزخ رفتند.

فروماندگان را به رحمت قریب

تضرع کنان را به دعوت مجیب (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۴۰)

بیت مذکور سعدی «قریب» یعنی نزدیک و «مجیب» یعنی پاسخ دهنده یا اجابت کننده است. سعدی این دو کلمه از تأثیر این آیات قرآن نوشت: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (سوره بقره : ۱۸۶) = و وقتی که بندگانم، از تو درباره من بپرسند، پس (بگو): در حقیقت من نزدیکم؛ دعا کننده را به وقتی که (مرا) می‌خواند، پاسخ می‌گویم. پس باید (دعوت) مرا قبول کنند، و باید به من ایمان بیاورند، باشد که آنان راه یابند.

قدیمی نکوکار و نیکی پسند

به کلک قضا در رحم نقشبند (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۴۰)

«نکوکار» یعنی محسن است و یکی از صفات خداوند منان است که در آیات قرآن ذکر شد: «وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ» (سوره قصص : ۷۷) و «نیکی پسند» اشاره به آیات در جاهای فراوان قرآن آمده است «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» (سوره بقره: ۱۹۵) یعنی خداوند حتماً نیکوکاران را دوست می‌دارد. و «در رحم نقشبند» اشاره به آیات قرآن: «هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» (سوره عمران: ۶) یعنی او کسی است که

شما را در رحم‌ها آنچنان که می‌خواهد صورت‌گری می‌کند، هیچ معبودی جز آن شکست ناپذیر فرزانه نیست.

ز مشرق به مغرب مه و آفتاب،

روان کرد و بنهاد گیتی بر آب (سعدی، ۱۳۷۲ هـ.ش: ۴۱)

خداوند منان در این دنیا ماه و آفتاب را از مشرق به مغرب روان ساخت و جهان را بر آب بنا نهاد. سعدی شیرازی در عبارتش «روان کرد و بنهاد» به آیات قرآن اشاره نمود: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا» (سوره هود: ۷) و تخت (جهانداری و تدبیر هستی) او بر آب بود؛ تا شما را بیازماید که کدامین شما نیکوکارتر است. و در آیه دیگر ذکر شده است که «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ» (سوره انبیاء: ۳۰) یعنی هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم، پس آیا ایمان نمی‌آورند؟!

زمین از تب لرزه آمد ستوه

فرو کوفت بر دامنش میخ کوه (سعدی، ۱۳۷۲ هـ.ش: ۴۱)

بیت مذکور سعدی کاملاً از آیات قرآن گرفته شد: «وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» (سوره نحل: ۱۵) یعنی در زمین، (کوه‌های) استواری افکند (مبادا) که شما را بلرزاند؛ و نه‌رها و راه‌هایی (قرار داد) تا شاید شما را راهنمایی شوید. آیه دیگر همین اشاره شد: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا - وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا» (سوره نبا: ۶-۷) یعنی آیا زمین را بستر قرار ندادید؟ و کوه‌ها را میخ‌هایی؟

نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ

گل لعل در شاخ پیروزه رنگ (سعدی، ۱۳۷۲ هـ.ش: ۴۲)

مفهوم بیت مذکور سعدی این است که خداوند در نهان برخی از سنگ‌ها خواصی می‌گذارد که به صورت دو سنگ قیمتی فیروزه و لعل ظاهر می‌شوند و همچنین در شاخه درخت که سبز و هم‌رنگ با فیروزه است، گل‌های سرخ فام به رنگ لعل به وجود می‌آورد. (خزائلی، ۱۳۷۲ هـ.ش: ۴۲) در آیات قرآن کریم آمد: «الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ

تجلی قرآن در دیباچه بوستان سعدی
(Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)

تَوْقِدُونَ» (سوره یس: ۸۰) یعنی کسی که برای شما از درخت سبز، آتشی قرار داد، و شما در هنگام (نیاز) از آن (آتش) می‌افروزید.

دگر ره به کتم عدم در برد

وز آنجا به صحرای محشر برد (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۴۲)

در بیت مذکور «کتم» به معنی نهان کردن، اصطلاحاً در معنی مرگ بکار رفته است. شاعر در این کلمه مطلب آیات قرآنی اشاره کرد: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (سوره بقره: ۲۸) یعنی چون که خدا را انکار می‌کنید و حال آنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد، سپس شما را می‌میراند، سپس شما را زنده می‌کند. سپس فقط به سوی او باز گردانده می‌شوید.

محیطست علم ملک بر بسیط

قیاس تو بر وی نگردد محیط (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۴۴)

سعدی در بیت مذکور صفات خداوند متعال را ظاهر کرد و انسان را به عنوان محدود شماره نهاد. در بیت شاعر «محیط است» یعنی علم الهی که پادشاه عالم وجود است بر همه پهنه جهان احاطه دارد و انسان که در این جهان جزئی بسیار کوچک است، وی درباره علم خدا احاطه نتواند یافت. این بیت ناظر است از آیه قرآن: «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» (سوره بقره: ۲۵۵) یعنی و به چیزی از علم او احاطه نمی‌یابند جز به مقداری (که او) بخواهد. پایتخت (علم و قدرت) او، آسمان‌ها و زمین را در برگرفته؛ و نگاهداری آن دو بر او دشوار نیست. و او بلند مرتبه (و) بزرگ است.

مگر بویی از عشق، مست کند

طلبکار عهد الست کند (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۴۶)

در بیت بالای سعدی کلمه «الست» از قرآن کریم گرفته شده است. خداوند متعال در قرآن کریم گفت: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» (سوره اعراف : ۱۷۲) و (یاد کن) هنگامی را که پروردگارت از فرزندان آدم، از پشت (و صلب) شان، نسل آنان را برگرفت؛ و آنان را بر خودشان گواه ساخت؛ (و فرمود) آیا پروردگار شما نیستیم؟ گفتند: «آری، گواهی می دهیم.» (این گواهی را گرفت) تا مبدا روز رستاخیز بگویید: «براستی که ما از این (مطلب)، غافل بودیم.»

امام رسل پیشوای سبیل

امین خدا مهبط جبرئیل (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۴۷)

بیت سعدی مذکور کلمه «امین» یعنی درست کردار و امامت دار، لقب رسول اکرم (ص) است که در قرآن مجید اشاره شده است: «مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ - وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ» (سوره تکویر : ۲۱-۲۲) که در آنجا (در میان فرشتگان، فرمان او) اطاعت شده (و) درستکار است و همنشین شما (پیغمبر) دیوانه نیست.

کلیمی که چرخ فلک طور اوست

همه نورها پرتو نور اوست (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۴۸)

سعدی در بیت بالا حکایت حضرت موسی (ع) که در کوه طور اتفاق افتاد و این حادثه در قرآن کریم توضیح شده، اشاره نمود. «کلیم» به معنی «همسخن» و اصلاً لقب حضرت موسی صاحب کتاب آسمانی تورات است. این بیت شاعر مقتبس از آیات قرآن است: «وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا» (سوره نساء : ۱۶۴) مراد از «کلیم» در اینجا حضرت محمد (ص) است که بر موسی مزیت داده شده، زیرا طور رسول اکرم، چرخ یعنی عرش الهی است که به آنجا عروج فرمود. (خزائلی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۴۸)

چو عزمش بر آهیخت شمشیر بیم

به معجز میان قمر زد دو نیم (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۴۹)

تجلی قرآن در دیباچه بوستان سعدی

(Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)

در بیت بالای سعدی «به معجز» اقتباس از قرآن کریم است: «أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ» (سوره قمر: ۱) یعنی قیامت نزدیک شد و ماه شکافت. شق القمر، یعنی شکافتن ماه، یکی از معجزات رسول خدا (ص) است و بزرگترین معجزه او قرآن کریم است که از شق القمر در حقیقت بزرگتر است و به وسیله قرآن، عرب متعصب دیر باور نزاع دوست و اختلاف جوی را به صورت امتی واحد در آورده است. شق القمر در شعر امیه بن ابی صلت یکی از شعرای جاهلیت نیز آمده است و منجمان جدید معتقدند که ر قمر زمین انشقاقی حادث شده است. (خزائلی، ۱۳۷۲ ش: ۴۹)

چنان گرم در تیه قربت براند

که بر سدره جبریل ازو بازماند (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۵۰)

در بیت مذکور سعدی شیرازی از کلمه «تیه» یک وادی مشهور را شماره نمود که حضرت موسی (ع) و بنی اسرائیل مدت چهل سال در آن وادی گمشده بودند و این کلمه از آیات قرآن مقتبس است که در قرآن آمده: «قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ» (سوره مائده: ۲۶) در اینجا مجازاً از نظر وسعت و بی پایانی، بر جایگاه قرب کامل به حق که محاط در حیرت است. اطلاق گردیده و مراد این است که حضرت پیغمبر بر اسب براق بنشست و در وادی بی پایان قربت، توسن براند (خزائلی، ۱۳۷۲ ش: ۵۰) در آن بیت کلمه دیگر «سدره» یعنی سدره المنتهی یکی از نام درخت در بهشت است و در پیشگاه عرش، نام این درخت در قرآن مجید آمده: «عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى» (سوره نجم: ۱۴) اینجا می گوید که حضرت جبرائیل از سدره المنتهی دیگر قدرت پرواز نداشت و حضرت رسول اکرم (ص) از این مقام برتر رفت و این امر مبین آن است که انسان کامل بر مقربترین فرشتگان مزیت و کرامت دارد.

اگر دعوتم رد کنی ور قبول،

من و دست و دامان آل رسول (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۵۲)

در بیت مزبور «آل رسول» خانواده رسول اکرم (صلعم) که درباره آنان آیات قرآن نازل شد: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» (سوره احزاب: ۳۳) در این آیات آنان را شامل مزیت تطهیر ساخته است و درباره فضیلت آنان حدیث فراوان از رسول اکرم (ص) بیان شد.

که باشند مشتی گدایان خیل

به مهمان دار سلامت طفیل (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۵۲)
در اینجا سعدی «دارالسلام» از آیات قرآن وام گرفته «لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (سوره انعام: ۱۲۷) بعضی دارالسلام یکی از درجات بهشت است در اینجا هم ممکن است مراد این بهشت باشد.

فطویی لباب کبیت العتیق

حوالیه من کل فج عمیق (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۵۷)
اینجا «بیت العتیق» و «من کل فج عمیق» از قرآن گرفته از قرآن کریم: «وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» (سوره حج: ۲۷) و «ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» (سوره حج: ۲۹) یعنی خانه کعبه آزاد است که زائران از سراسر جهان خوشحالی از راههای مختلف می آیند. این حج شروع شد از زمان حضرت ابراهیم (ع)، با دعوت حضرت ابراهیم پیادگان و سواران بر اشتهای لاغر به زیارت خانه کعبه شتافتند و «فج» با فتح اول بمعنی راه باریک است و جمع آن «فجاج» بکسر اول است.

سکندر به دیوار رویین و سنگ، * بکرد از جهان راه یاجوج تنگ
تراسد یاجوج کفر از زراست * نه رویین چو دیوار اسکندر است (سعدی، ۱۳۷۲هـ ش: ۵۹)

در بیت بالا «یاجوج» در قرآن مجید ذکر شده، آنان مردمی خطرناک بوده‌اند که بخ موجب بیان قرآن، ذوالقرنین برا رفع هجوم آنان به اقوام دیگر، سدی از آهن و روی کشیده

تجلی قرآن در دیباچه بوستان سعدی

(Manifestation of the Qur'an in the preface of *Bostan-e-Saadi*)

است و سد سکندر در ادبیات فارسی معروف است. آیه قرآن: «حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا - قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا - قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا» (سوره کهف: ۹۳-۹۵) در آیات مزبور «یأجوز کفر» مراد پادشاهان مغول است که اتابکان با پرداخت شمش های زر از حمله آنان به قلمرو پارس پیش پیری کرده‌اند. (خزائلی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۵۹)

جهان آفرین بر تو رحمت کند

دگر هرچه گویم فسون است و باد (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۶۱)

در این بیت «فسون» اشاره به آیه: «وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ» (سوره فلق: ۴)

نه کشور خدایم نه فرماندهم * یکی از گدایان این درگهم (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۶۵)

سعدی در این بیت گفت «نه کشور خدایم نه فرماندهام» یعنی درگاه حق این چنین گوید و در آستان خداوند، اظهار دارد که او خداوند کشور و فرمانده واقعی نیست و تمام قدرت فقط برای خداست. این ابیات ناظر است از آیه قرآن: «قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» (آل عمران: ۲۶)

حکایت کنند از بزرگان دین،

حقیقت شناسان عین الیقین، (سعدی، ۱۳۷۲ هـ ش: ۶۵)

اینجا «عین الیقین» مقتبس است از قرآن کریم: «ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ» (سوره

تکاثر: ۷) یعنی سه درجه دارد که عین الیقین، علم الیقین و حق الیقین.

نتیجه گیری

با توجه به مباحثه روایات‌های مذکور نتیجه می‌گیرم که دیباچه بوستان سعدی پر از آیات قرآن است. سعدی قرآن کریم را بسیار تلاوت کرد و از آن متأثر شده بود. بدینوسیله

وی دیباچه بوستان را ۲۱۵ بیت نوشت و در آن بسیار آیات قرآن استفاده نمود. وی اولین بیت دیباچه بوستان نوشت «سخن در زبان آفرین» آفریننده سخن در زبان آدمی اشاره دار به آیات قرآن «الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان» گرفت. وی آخرین بیت دیباچه درباره طریقت نوشت. مراد طریقت اهل صفا و سلوک است. عرفا معتقدند علاوه بر اینکه هرکس باید مطیع شریعت باشد، باید طریقتی نیز گزیند. از این رو صوفیان و عارفان را اهل طریقت نیز می‌نامند. بدینوسیله می‌توانم گفت که سعدی هرچه در دیباچه بوستان نوشت از تأثیر قرآن نوشت.

منبع و مأخذ:

۱. ذبیح الله صفا، دکتر (۱۳۶۶هـ ش): تاریخ ادبیات در ایران، جلد سوم، بخش اول، انتشارات فردوسی، تهران- ایران.
۲. یاحقی، دکتر محمد جعفر (۱۳۸۹): کلیات تاریخ ادبیات فارسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، تهران- ایران.
۳. خزائی، دکتر محمد (۱۳۷۲ هـ ش): شرح بوستان، چاپخانه محمد حسن علمی، چاپ نهم، تهران- ایران.
۴. سعدی، مصلح الدین (۱۳۷۲هـ ش): بوستان سعدی، چاپخانه محمد حسن علمی، تهران- ایران.
۵. حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد (۱۳۶۲هـ ش): دیوان حافظ، انتشارات نوین، تهران- ایران.
۶. کاسب، استاد عزیز الله (۱۳۸۱هـ ش): زندگینامه شاعران ایران، انتشارات گلی، تهران- ایران.